বঙ্কিমচন্দ্রের

কপালকুণ্ডলা

সম্পাদনায়

তরুণ ঘোষ

রত্নাবলী

৫৯এ, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০০৯

KAPAL KUNDALA

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ১৯৫৯

প্রকাশক
সুমন চট্টোপাধ্যায়
বত্নাবলী
৫৯এ, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা- ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
অশান্ত সেন

মুদ্রণে
গ্রাফ-ও-প্রিন্ট
১৪এ/বি. এফ. দেশবন্ধুনগর
কলকাতা- ৭০০ ০৫৯

কলেজ স্ট্রীটে প্রাপ্তিস্থান
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন,
কলকাতা- ৭০০ ০০৯

●

জে. এন. ঘোষ অ্যান্ড সন্স
৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,
কলকাতা- ৭০০ ০৭৩

উৎসর্গ

পিতা
শ্রীযুক্ত শান্তিরঞ্জন ঘোষ
শ্রদ্ধাস্পদেষু

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অবতরণিকা : বঙ্কিম পরিচিতি	১-১২
জীবন কথা (১-২) ; সৃষ্টির বিভিন্ন পর্ব (২-৩) ; বঙ্কিমচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা (৩-৬) ; ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র : বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পর্ববিভাগ (৬-৭) ; বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক সত্তার বিবর্তন (৭-১২)	
উপন্যাসপাঠ	১৩-১৪৪
উৎসকথা (১৩-১৪) ; পাঠভেদ (১৫-২৪) ; ঐতিহাসিক তথ্য-প্রসঙ্গ ও উপন্যাস (২৫-৩৩) ; উপন্যাসের তত্ত্ব বিচার (৩৪-৩৮) ; রোমান্স প্রসঙ্গ (৩৯-৪৪) ; কাব্যধর্ম (৪৫-৫০) ; নাট্যলক্ষণ (৫১-৫৬) ; শিল্পকাহিনীর গঠন-কৌশল (৫৬-৬১) ; ঘটনা, সময় ও স্থান ঐক্য (৬২-৬৬) ; ট্র্যাজেডি-ভাবনা (৬৭-৭২) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য প্রভাব : মৌলিকত্ব (৭৩-৭৭) ; ; নামকরণ (৭৮-৮১) ; পরিচ্ছেদের শিরোনাম (৮২-৮৫) ; প্রকৃতির ভূমিকা (৮৬-৯০) ; রাত্রির কাব্য (৯১-৯৪) ; উপন্যাসে তন্ত্রাচার প্রসঙ্গ (৯৫-১০১) ; ভাষা (১০২-১০৬) ; সাংকেতিকতা, অলৌকিকতা ও আকস্মিকতা (১০৭-১১২) : নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কপালকুণ্ডলা (১১৩-১১৫) ; চরিত্র-চিত্রণ : কপালকুণ্ডলা (১১৬-১২০) ; নবকুমার (১২০-১২৩) ; মতিবিবি/লুৎফ-উন্নিসা (১২৩-১২৭) ; কাপালিক (১২৭-১২৮) ; শ্যামা (১২৯) ; মেহের-উন্নিসা (১৩০-১৩১) ; পেষমন (১৩১-১৩২) ; অধিকারী (১৩০) ; জাহাঙ্গীর (১৩২) ; কপালকুণ্ডলা ● ঘরে-বাইরে ● গৃহদাহ : ত্রয়ী নারীচরিত্র/কপালকুণ্ডলা-বিমলা-অচলা (১৩৩-১৩৯) ; ত্রয়ী পুরুষ চরিত্র/নবকুমার-নিখিলেশ-মহিম (১৪০-১৪৪)	
মূল উপন্যাস	১-৫২
শব্দার্থ-টীকা-টিপ্পনি	৫৩-৬৫
তাৎপর্য বিশ্লেষণ	৬৬-৮০

অবতরণিকা

বঙ্কিম পরিচিতি

উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্য ও সমাজে ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্ব। মনুষ্যত্ববোধের আদর্শ সন্ধানের মূলীভূত প্রেরণা থেকে তাঁর সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত হলেও স্বদেশ, স্বজাতি তথা মানবহিতৈষণার সনিষ্ঠ বাসনা তাঁকে যুগন্ধর মহাপুরুষে পরিণত করেছে। ঋষি বঙ্কিম কেবল এক যুগের সৃষ্টি নয়—পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনায় তিনি আমাদের জীবন ও জগতকে সুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করেছেন। —এই অর্থে তিনি যুগোত্তীর্ণ মহাপুরুষ। উদ্দেশ্যহীন, বিপর্যস্ত জীবনধারা—জাতীয় জীবনে অন্ধকারাচ্ছন্ন অচৈতন্যের আবিলতা থেকে মানুষকে মুক্ত করার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষায় তাঁর যাবতীয় সৃষ্টি উৎসারিত হয়েছিল নিরন্তর কঠোর সাধনায়। রবীন্দ্রনাথ এই অনুভূতিকে ব্যক্ত করেছিলেন শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাষায়: "পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম।" (আধুনিক সাহিত্যের অন্তর্গত "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধ)। "বঙ্গভূমির মাতৃবৎসল প্রতিভাশালী" বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সাধনায় কেবল ধ্যানযোগী নন, কর্মযোগীর মত সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ, নীতি—মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি তাঁর প্রতিভাকে উৎসর্গ করেছেন। শতাব্দীর এই শ্রেষ্ঠ মনীষীকে রমেশচন্দ্র দত্ত শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন এই বলে—"The greatest man of the Nineteenth Century." শত শত শতাব্দীর কলুষতা ও মালিন্য, সমাজ-জীবনের দুষ্ট ব্যাধি, সাহিত্য-সংসারে স্তূপীকৃত আবর্জনা বঙ্কিমচন্দ্র একক প্রচেষ্টায় দূর করে সাহিত্য-সমাজে যে কল্যাণ ও শ্রী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাতেই আমাদের জীবনধারা শতমুখে শতধারায় চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। তাঁর সৃষ্টি ও সাধনা চিরকাল অভিনন্দিত হয়েছে।

সাহিত্য ও সমাজকল্যাণে নিবেদিত-প্রাণ বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পী-দার্শনিক, মানব-হিতৈষী দেশপ্রেমিক। স্রষ্টার অন্তর্জীবনকে জানতে হলে তাঁর জীবনকথার পরিচয় নিতে হয়—জীবন-ধারায় বিচিত্র অভিপ্রবাহে মূর্ত হয়ে ওঠে তাঁর সৃষ্টি কৌশলের প্রেরণার উৎসভূমি।

চব্বিশ পরগণার কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন ১৮৩৮ সালের ২৬-শে জুন তারিখে। তাঁর পিতার নাম ছিল—যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাতামহ ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত ভবানীচরণ বিদ্যাভূষণ। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তৃতীয় পুত্র, অগ্রজদ্বয় যথাক্রমে শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র এবং অনুজ পূর্ণচন্দ্র। বাল্যকাল থেকে তাঁর ছিল অসাধারণ মেধা। গ্রাম্য পাঠশালাতে না গেলেও তিনি গুরুমহাশয় হরপ্রাণ সরকারের কাছে শিক্ষালাভ করেন। পিতা যাদবচন্দ্র ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে মেদিনীপুরে বাস শুরু করলে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হন এবং টীড্ ও সিনক্লেয়ারের কাছে পাঠাভ্যাস করেন। ১৮৪৯ সনে অর্থাৎ এগার বছর বয়সে নারায়ণপুর গ্রামের পাঁচ বছরের বালিকার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এই সময়ে কাঁঠালপাড়ায় প্রত্যাবর্তন করে তিনি পণ্ডিত হলধর ন্যায়বাগীশ ও রামধন ন্যায়বাগীশের কাছে সংস্কৃত সাহিত্য ও বাংলা কবিতা সম্পর্কে পাঠ নেন। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা তাঁর অতি প্রিয় ছিল—বহু কবিতা তিনি মুখস্থও করেছিলেন। সাড়ে এগার বছর বয়সে তিনি হুগলী কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত এখানে অধ্যয়ন করেন। পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করার জন্য প্রথমবার আট টাকা ও দ্বিতীয়বার কুড়ি টাকা মাসিক বৃত্তি লাভ করেছিলেন তিনি। ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন আইন পড়ার

উদ্দেশ্যে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৫৭ সালে এনট্রান্স পরীক্ষা শুরু হলে তিনি পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরের বছর, অর্থাৎ ১৮৫৮ সালে বঙ্কিমচন্দ্র বি.এ. পরীক্ষা দেন এবং দশজন ছাত্রের মধ্যে কেবলমাত্র তিনি ও যদুনাথ বসু উত্তীর্ণ হন। এই ১৮৫৮ সালের আগস্ট মাসে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে নিযুক্ত হন। প্রথম পত্নীর মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্র কুড়ি বছর বয়সে রাজলক্ষ্মীকে বিবাহ করেন। চাকুরীরত অবস্থায় ১৮৬৯ সালে তিনি বি.এল. পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় হন। সাহিত্য-সমাজের অশেষ কল্যাণ করে ১৮৯৪ সালের এপ্রিল মাসে এই সাহিত্য সাধকের মৃত্যু হয়।

কর্মসূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রায় অভিন্ন বাংলার সর্বত্র যেতে হয়েছিল, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি কালেক্টার অথবা পার্সোনাল অ্যাসিস্টান্ট বা বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারী হিসেবে তিনি তেত্রিশ বছর চাকুরী করেন এবং যশোর, নেগুঁয়া (মেদিনীপুর), মুর্শিদাবাদ, হুগলী, বারাসাত, জজপুর (কটক), আলিপুর ইত্যাদি জায়গায় তাঁকে যেতে হয়। মানুষ সম্পর্কে বহুবিধ অভিজ্ঞতা তিনি এই সব ক্ষেত্র থেকেই সঞ্চয় করেন। কর্মক্ষেত্রে বরাবরই তিনি ন্যায় নীতি মেনে চলতেন—সুশাসক ও দক্ষ প্রশাসক হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জনও করেছিলেন। গ্রাম-গঞ্জের চুরি-ডাকাতিকে তিনি কঠোর হাতে দমন করেন। কোন অবস্থাতেই তিনি নিজ কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হতেন না। সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য কর্মক্ষেত্রে তাঁর এই কঠোর সংগ্রাম-মানসিকতা সাহিত্য-সৃজনের নেপথ্যেও কাজ করেছিল। বঙ্কিম তাই বলেছিলেন—"আমার জীবন অবিশ্রাম সংগ্রামের জীবন"।

সাহিত্যসাধনায় বঙ্কিমচন্দ্র নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যানুশীলন করেছিলেন। প্রাচ্যের সংস্কৃত সাহিত্য, ধর্ম-দর্শন যেমন তাঁর প্রিয় ছিল, তেমনই ইউরোপীয় সাহিত্যের কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, ইতিহাস, দর্শন, উপন্যাস, রোমান্স সবই তিনি সোৎসাহে পড়েছিলেন। ফরাসী চিন্তানায়ক অগাস্ট কোমত্-এর পজিটিভিজম্-এর সঙ্গে জন স্টুয়ার্ট মিলের ইউটিলিটারিয়ানিজম্ বা উপযোগবাদের দর্শনে তিনি সমান ভাবে আকৃষ্ট হতেন। শেক্স্পীয়ারের রচনাবলী, বিশেষ করে ট্রাজেডি লক্ষণাক্রান্ত নাটকগুলি এবং কীট্স্, বায়রন ও ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের প্রতি তাঁর অন্তরের একটা তীব্র আকর্ষণ ছিল। উপন্যাসের ক্ষেত্রে ওয়াল্টার স্কট, কলিনস্, জর্জ এলিয়ট, লর্ড লিটন, ডিকেন্স তাঁর পছন্দ ছিল। বাল্যকালে ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরে এবং সংবাদসাধুরঞ্জনে তাঁর গদ্য পদ্য প্রকাশিত হয়েছিল এবং কালেজীয় কবির লড়াইতে দীনবন্ধু মিত্র, দ্বারকানাথ অধিকারীর সঙ্গে কিছু কাব্য কবিতা সমকালীন ঐ পত্রদ্বয়ে প্রকাশিত হলেও, এতে কিন্তু বঙ্কিম প্রতিভার যথার্থ স্ফুরণ হয়নি। তবে, তাঁর সাহিত্যানুরাগ ও প্রীতি যে বাল্যকাল থেকেই বিবর্তিত হতে শুরু করেছিল, এগুলি তারই প্রমাণ। কিশোরীচাঁদ মিত্রের Indian Field পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস Rajmohan's Wife ইংরেজী ভাষায়—ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ পায় ১৮৬৪ সালে। বাংলা সাহিত্যে তখনও তাঁর পদার্পণ ঘটেনি। ১৮৬৫ সালে দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের পর বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় প্রকাশ পেল। সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র সৃষ্টিকে চারটি পর্বে বিভক্ত করেছেন সাহিত্যসাধক চরিতমালার আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আদি পর্ব: ১৮৫২ সালে সংবাদপ্রভাকরে বিভিন্ন রচনা প্রকাশ থেকে শুরু করে ১৮৬৫ সালের দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশ কাল পর্যন্ত তেরো বছর।

উদ্যোগ পর্ব: ১৮৬৫ থেকে ১৮৭২ সাল অর্থাৎ বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশ কাল পর্যন্ত সাত বছর। এই পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি উৎকৃষ্ট উপন্যাস লেখেন—দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী।

যুদ্ধ পর্ব : ১৮৭২ থেকে ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত সতেরো বছরের সময়-সীমায় বঙ্কিমচন্দ্র বিবিধ সৃষ্টিকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। এগারোখানি ছোট বড় উপন্যাস লেখেন—**বিষবৃক্ষ** (১৮৭৩,, **ইন্দিরা** (১৮৭৩), **যুগলাঙ্গুরীয়** (১৮৭৪), **চন্দ্রশেখর** (১৮৭৫), **রাধারাণী** (১৮৭৫), **রজনী** (১৮৭৭), **কৃষ্ণকান্তের উইল** (১৮৭৮), **রাজসিংহ** (১৮৮২), **আনন্দমঠ** (১৮৮২), **দেবী চৌধুরাণী** (১৮৮৪) ও **সীতারাম** (১৮৮৭)। এই পর্বে বঙ্কিমের দার্শনিক মননের বিচিত্র পরিচয় পাওয়া যায় বিবিধ সাহিত্যকর্মে **লোকরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর, বিজ্ঞানরহস্য, দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী, সাম্য, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব, বিবিধ প্রবন্ধ** ইত্যাদি।

শান্তিপর্ব : ১৮৮৯ থেকে ১৮৯৪ পর্যন্ত সময়সীমায় ছোট-খাট রচনা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র আর কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ লেখেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা :

বঙ্কিমচন্দ্র কেবল উপন্যাস-নির্মাতা নন্—তাঁর বহুমুখী প্রতিভার বিচিত্র ঐশ্বর্য প্রবন্ধ সাহিত্যের ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, যুক্তিবাদ ও হিতবাদের আলোচনায় প্রকাশিত। বাঙালীর আত্মবিনাশের হাত থেকে বঙ্কিমই বাঙালীকে রক্ষা করেছিলেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের বৈচিত্র্যময় তথ্য ও তত্ত্ব-তাঁর প্রজ্ঞার আলোয় অনন্যসদৃশ শিল্পকর্মে উপস্থাপিত। জটিল বিষয়কে প্রাণোচ্ছল ভাষা-ভঙ্গিমায় প্রকাশ করার দুর্লভ ক্ষমতা ছিল তাঁর। সাহিত্যে যেমন অভিনব যুগের সূচনা হয়েছিল উপন্যাস-রচনায়, তেমনই সাহিত্য, সমাজ, জীবন, স্বাদেশিকতার নবচেতনা, ধর্ম-দর্শন, আধ্যাত্মিকতার নব মূল্যায়ন তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করেছে। জীবন-পর্যালোচনায় তাঁর গভীর অন্তর্মুখীনতা, কাব্যের ভাবজগতে আবেগময় ভাবমুগ্ধতা, স্বদেশপ্রীতির আন্তরিকতা, আবিলতা-বিবিক্ত জীবন-ভাবনা থেকে শ্লেষ-ব্যঙ্গ-তির্যকতায় বিদ্ধ করে নির্জীব প্রথা সর্বস্বতা থেকে মুক্ত করবার বাসনা, কৃষ্ণতত্ত্বে বা ধর্মতত্ত্বে যুক্তি-শৃঙ্খলায় বৈজ্ঞানিক মননের প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি মানবপ্রীতির অকৃত্রিম অনুরাগের মহতী চেতনায় ঋষি বঙ্কিম শুদ্ধ চৈতন্যকে উদ্বোধিত করলেন। নির্জীব বাংলা ভাষা বেগবান, প্রাণবান বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হ'ল। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য প্রতিভার মূল্যায়ন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছিলেন— "তিনি আপনার শিক্ষাগর্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্য প্রেম মহত্ত্ব ভক্তি স্বদেশানুরাগ, শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনরত্ন সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্য গর্বে সেই অনাদর মলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।" ['বঙ্কিমচন্দ্র'—আধুনিক সাহিত্য]

(ক) হাস্যরসিক বঙ্কিম : বঙ্গদর্শন (১৮৭২) মাসিক পত্রিকা প্রকাশের কাল থেকে সাহিত্য শিল্প, ধর্ম-দর্শন, সমাজনীতির নব-মূল্যায়ন শুরু হ'ল। ভাষা, ভাব ও আদর্শের জন্য এই পত্রিকা অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের অধিকারী। বঙ্কিমের মন্ত্রদীক্ষায় একদল লেখকগোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছিল—পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় অধিকারী হয়েও তিনি বাঙালীর ইতিহাস রচনায় ও বাংলা ভাষার সমৃদ্ধির জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালিয়েছেন। তাঁর এই অসামান্য দান শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণযোগ্য। ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত **কমলাকান্ত** তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত—**কমলাকান্তের দপ্তর, কমলাকান্তের পত্র, ও কমলাকান্তের জোবানবন্দী**। জাতীয় জীবনে ভয়াবহ পরিণতির কথা ভেবে, পারিপার্শ্বিক মানুষের আচার আচরণের অসঙ্গতি লক্ষ্য করে বঙ্কিমচন্দ্র নেশাখোর কমলাকান্তের ছদ্মবেশে শ্লেষ ব্যঙ্গের তির্যকতায় বিদ্ধ করে আমাদের মোহমুক্তি ঘটিয়েছিলেন। "এক আধারে ব্যঙ্গের শর্করামণ্ডিত কাব্য, পলিটিক্স, সমাজ-বিজ্ঞান এবং দর্শন পরিবেশনের উপায় সৃষ্টি করিয়া সম্পাদক ও প্রচারক বঙ্কিমচন্দ্র নিজের

কাজ অনেকটা সহজ করিয়া লইলেন। কমলাকান্ত জন্মের ইহাই ইতিহাস।" (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ সংস্করণ **কমলাকান্ত** —ভূমিকা)

কমলাকান্তের পূর্ববর্তী ব্যঙ্গ-কৌতুকপূর্ণ একটি গ্রন্থ বঙ্কিম লিখেছিলেন—**লোকরহস্য** নামে (১৮৭৮) তা পরিচিত। এই প্রবন্ধ পুস্তকে বিবিধ রহস্যময় রচনা স্থান পেয়েছে। বাবু, সুবর্ণগোলক (মিরিয়াম্ এস্. নাইট্ ১৮৯৬ সালে লণ্ডনের একটি পত্রিকায় এটির অনুবাদ: **The Globe of Gold** নামে প্রকাশ করেন), গর্দ্দভ, ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল ইত্যাদি নামকরণের মধ্যে ও বিষয়বস্তুর পর্যালোচনায় লোকরহস্য গ্রন্থটির ব্যঙ্গের তির্যকতা শিল্পরসে উত্তীর্ণ। মানবজীবন ও সমাজ সম্পর্কে তীক্ষ্ম দৃষ্টি না থাকলে, আমাদের সীমাহীন ত্রুটি-বিচ্যুতিকে এমনভাবে শ্লেষে-ব্যঙ্গে বিদ্ধ করে শোধনের পথ পরিষ্কার করা সম্ভব হ'ত না। এই জাতীয় তৃতীয় গ্রন্থ **মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত** ১৮৮০ সালে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। "ইহাতে হাস্যের সঙ্গে যে বিদ্রূপের বিষজ্বালা মিশ্রিত আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। যাহা নিন্দার্হ ও উপহাসযোগ্য বঙ্কিম তাহারই নিন্দা ও উপহাস করিযাছেন"—(অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত)। **লোকরহস্য, কমলাকান্ত ও মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিতে** বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরস সৃষ্টির অন্তরালে অপমান লাঞ্ছনার জ্বালা ও বেদনার অশ্রুসিক্ত বিদ্রূপ লক্ষ্য করা যায়। লঘু বিষয়ের উপস্থাপনার মধ্যে তিনি আমাদের বহুবিধ দুর্বলতাকে, কুসংস্কার ও বক্র-কুটিল মানসিকতা ও আচরণকে শোধন করতে চেয়েছিলেন বলেই তাঁর লেখনীতে বিদ্রোহের সুর শোনা গিয়েছিল। স্বজাতি-বাৎসল্য তাঁর ব্যক্তিজীবনের আত্মশ্লাঘার বিষয় ছিল না—জাতির কল্যাণে তিনি ছিলেন নিবেদিত-প্রাণ। হাস্য কৌতুকময় রচনাগুলি কেবল বম্য-রচনা নয়—তা ছিল জাতীয় জীবনের পরিশুদ্ধি করণের আন্তরিক প্রয়াসজাত ফলশ্রুতি।

(খ) স্বদেশপ্রেমী চিন্তানায়ক, সব্যসাচী বঙ্কিম: ১৮৭৫ সালে **বিজ্ঞানরহস্য** গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছিল। যুক্তি-শৃঙ্খলার পারম্পর্যে তিনি প্রক্টর, লায়েল, হাক্সলি, গ্রেসর প্রমুখ মনীষীদের উপস্থাপিত বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বের প্রাঞ্জল বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। সাধারণের সহজবোধ্য বিষয়বস্তুর এমন চিত্তাকর্ষক ও প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ আলোচনা বাংলা সাহিত্যে অভিনব। **বঙ্গদর্শনে** প্রকাশিত বিভিন্ন সময়ের ভিন্ন স্বাদের রচনাগুলি ১৮৮৭ সালে "বিবিধ প্রবন্ধ" (১ম ও ২য় ভাগ) নামে প্রকাশ পায়। এখানে বঙ্কিম কাব্য-সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, শিক্ষা, অর্থনীতি, দর্শন, স্বদেশপ্রেম, লোকশিক্ষা ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের সাবলীল আলোচনা করেছেন। মানব সেবার মহান্‌ব্রতে তিনি যেমন অঙ্গীকারবদ্ধ ঋষি ছিলেন, তেমনই মনুষ্যত্ববোধ সম্পর্কে তাঁর সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ছিল— "বস্তুতঃ সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।" (**মনুষ্যত্ব কি: বিবিধ প্রবন্ধ**) 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ভাষা-নির্মাণের গুরুত্ব অনুভব করে লেখেন: "রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য মিশাইতে হইবে।" 'চিত্তশুদ্ধি' প্রবন্ধে বঙ্কিম বলেন—"ইন্দ্রিয়াসক্তির অপেক্ষাও এই আত্মাদর, এই স্বার্থপরতা, চিত্তশুদ্ধির গুরুতর বিঘ্ন। পরার্থপরতা ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি নাই। ...চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলন ব্যতীত ধর্মের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য সম্যকরূপ উপলব্ধ হয় না এবং চিত্তশুদ্ধির সকল পথ পরিষ্কার হয় না।" এসবক্ষেত্রে দার্শনিক বঙ্কিম একদিকে বাঙালী জাতির মানসিকতা, উৎপত্তির আলোচনার সঙ্গে মানব-কল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দর্শন, ইতিহাসতত্ত্ব, সমাজ-ভাবনাকে বলিষ্ঠ ভাষায় সব্যসাচীর মত প্রকাশ করেছেন। প্রাচ্য ধর্ম-দর্শন ও সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যের সঙ্গে ইউরোপীয় চিন্তাধারার এক আশ্চর্য মিলন ঘটেছিল

বঙ্কিম মননে। মিল, স্পেন্সার, কোমত, ডারুইন-ডার্বিন, হাক্সলি, প্রমুখ মনীষীদের গ্রন্থপাঠের পাশাপাশি ইংরেজ ঔপন্যাসিক কবিদের রচনার সঙ্গে তাঁর যে নিবিড় যোগ ছিল বিবিধ প্রবন্ধের বিভিন্ন রচনায় তার সাক্ষ্য আছে। **সাম্য** (১৮৭৯) গ্রন্থে স্টুয়ার্ট মিলের প্রভাব থাকলেও বঙ্কিমকে এখানে নতুনভাবে আবিষ্কার করা যায়।

(গ) আধুনিক যুক্তিবাদী ধর্মতত্ত্ব-দর্শনের প্রবক্তা বঙ্কিম : ১৮৮৬ সালে **কৃষ্ণচরিত্র** প্রথম ভাগ প্রকাশ পেলেও সম্পূর্ণ গ্রন্থটি প্রকাশ করেন ১৮৯২ সালে। কৃষ্ণকে ঈশ্বর রূপে না দেখে তিনি কৃষ্ণের পূর্ণ মনুষ্যত্বের পরে প্রাধান্য দিয়ে লিখলেন— "কৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য, মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচারের জন্য অবতীর্ণ। ...কৃষ্ণ সর্বত্র সর্ব্বসময়ে সর্ব্বগুণের অভিব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল। তিনি অপরাজেয়, অপবাজিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, প্রীতিময়, দয়াময়, অনুদ্বেয় কর্ম্মে অপরাঙ্মুখ—ধর্মাত্মা, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ, লোকহিতৈষী, ন্যায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, শান্তা, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, যোগযুক্ত, তপস্বী।" পূর্ণ মনুষ্যত্ব যে আধ্যাত্মিকতায় ঈশ্বর-ভাবনায় উত্তীর্ণ, বঙ্কিমের যুক্তিবাদী মন, এই তত্ত্বকেই কৃষ্ণচরিত্রে ব্যক্ত করেছে। দার্শনিকতা সমৃদ্ধ অন্যসাধারণ গ্রন্থ **ধর্ম্মতত্ত্বে** (১৮৮৮) বঙ্কিমকে নবরূপে আবিষ্কার করি। ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব, অনুশীলন তত্ত্ব, শারীরিকী ও জ্ঞানাজ্জনী বৃত্তি, কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি ইত্যাদি ধর্ম্মতত্ত্বের অলোচ্য বিষয়বস্তু। "অনুশীলন ধর্ম্মের মর্ম্মে এই কথা আছে বটে যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরে সমর্পণ ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। ইহাই প্রকৃত কৃষ্ণার্পণ, ইহাই প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ম্ম। ইহাই স্থায়ী সুখ। ইহারই নামান্তর চিত্তশুদ্ধি। ইহারই লক্ষণ 'ভক্তি, প্রীতি, শান্তি'। ইহাই ধর্ম্ম— ইহা ভিন্ন ধর্মান্তর নাই। (ঈশ্বরে ভক্তি : **ধর্ম্মতত্ত্ব**) প্রাচ্য পাশ্চাত্যের শাস্ত্র-গ্রন্থাদির অধ্যয়ন-অনুধ্যানের অনিবার্য ফলশ্রুতি **ধর্ম্মতত্ত্ব** গ্রন্থটি। বঙ্কিম-ব্যাখ্যাত গীতাতত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে **শ্রীমদ্ভগবদগীতা** (১২৯৩ সালে 'প্রচার' পত্রিকায় প্রকাশিত) গ্রন্থে। যাবতীয় ধর্মগ্রন্থের মধ্যে গীতাকেই শ্রেষ্ঠতম বলেছেন তিনি। "পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও ভাবধারার আলোচনয় তাঁহাকে ধীরে ধীরে অন্তর্মুখীন করে এবং শেষে হিন্দু দর্শন ও শাস্ত্রে, বিশেষ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তিনি সম্পূর্ণ হিন্দুধর্ম্ম উপলব্ধি করেন।" আলোচনা সমাপ্ত করে বঙ্কিম লিখেছিলেন— "এখন সেই স্বদেশহিতৈষীর উদাহবণ মনে কর। যদি স্বদেশহিতৈষী কেবল মাত্র স্বদেশের হিতকামনা করিয়া কর্ম্ম করেন, তবে তাহারই কর্ম্ম নিষ্কাম! আর যদি আপনার যশ মান সম্ভ্রম উন্নতি প্রভৃতির বাসনায় স্বদেশেব ইষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তিনি সকামকর্ম্মা।" "দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম" নামে তিনি আর একটি শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ লিখেছিলেন, তবে তা তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। প্রাচীন ধর্ম্মের অন্তঃপ্রেরণায় যে শক্তি বর্তমান, বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক মনন নিয়ে বিশ্লেষণ করে তার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। আমাদের জীবনযাত্রায় সুস্থ-ভাবনা তারপরেই গড়ে উঠেছিল, এমন সিদ্ধান্ত অন্যায় হবে না।

(ঘ) শিক্ষাবিদ বঙ্কিমচন্দ্র : এই পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র সহজ রচনা শিক্ষা, সহজ ইংরাজী শিক্ষা ইত্যাদি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। এছাড়া সাময়িক পত্রে তিনি বেশকিছু প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থাবলী হিসেবে দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা, ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব, সঞ্জীবনী সুধা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এসব সাহিত্য সমালোচনা সমালোচকের আদর্শ বলে বিবেচিত হলেও, বঙ্কিমের সর্ব প্রধান পরিচয় তাঁর দেশাত্মবোধ, সহজাত মনীষায় তিনি একে লাভ করেছিলেন। আত্মবিস্মৃত শিল্পীর মত তিনি কেবল সাহিত্য সাধনায় মগ্ন ছিলেন না তাঁর আন্তরিক প্রয়াস ছিল দেশের কল্যাণ সাধন অথবা জাতির চিত্তশুদ্ধি।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র।। উপন্যাসের পর্ববিভাগ :

(ক) রোমান্স-রসাশ্রিত উপন্যাস : দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), **কপালকুণ্ডলা** (১৮৬৬), **মৃণালিনী** (১৮৬৯), **চন্দ্রশেখর** (১৮৭৫)। উপন্যাসের বাস্তবতার পরিবর্তে এখানে ইতিহাস-কেন্দ্রিক কল্পনাচারিতা লক্ষ্য করা যায়। "অতীতের বিচিত্র বেশ-ভূষা ও আচার-ব্যবহার, অতীতের আকাশ-বাতাসে লঘুমেঘখণ্ডের মত যে সমস্ত অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস ও কবিত্বময় কল্পনা ভাসিয়া বেড়ায়, রোমান্সলেখক সেইগুলিকেই ফুটাইয়া তুলিতে যত্ন করেন।" (**বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা**—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। রবীন্দ্রনাথের অভিমত ছিল—"....বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, ও মৃণালিনী লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল কাহিনী। ইংরাজীতে যাকে বলে রোমান্স। আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা। সেই দূরত্বই এদের মুখ্য উপকরণ।" ইতিহাসের একনিষ্ঠ পাঠক বঙ্কিম আধুনিক উপন্যাস রচনার কৌশলে সামান্য ইতিহাসকে ঘিরে কল্পনার ইন্দ্রধনুচ্ছটায় কাহিনীবৃত্ত সৃজন করেছেন। ইতিহাস ও রোমান্স বাস্তব জীবনকেও যেন নিয়ন্ত্রিত করেছে এই সব উপন্যাসে।

(খ) পারিবারিক ও গার্হস্থ্য জীবনাশ্রয়ী উপন্যাস : বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), **কৃষ্ণকান্তের উইল** (১৮৭৮)। অনেকের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায় এই দুই উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথ বললেন— "বঙ্গদর্শনের যে জিনিসটা সেদিন বাংলা দেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল সে হচ্ছে বিষবৃক্ষ।" দাম্পত্যপ্রীতি ও সমাজনীতি-কেন্দ্রিক সমস্যার আলোকে বিষবৃক্ষের আখ্যানবস্তু সর্বোত্তম শিল্প-সিদ্ধি লাভ করেছে, একথা অনস্বীকার্য। বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত জীবনধারার সঙ্গে কতটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল কৃষ্ণকান্তের উইলই তার প্রমাণ। বিষবৃক্ষের বালবিধবা কুন্দ অথবা কৃষ্ণকান্তের উইল-এর বালবিধবা রোহিণী পরিবার ও গার্হস্থ্যজীবনে কি প্রভাব ফেলেছে তার অন্বেষণে এবং নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলালের প্রবৃত্তিমুখীন চিত্ত-বিকৃতির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ও পট-পরিবর্তনের নেপথ্যচারী রহস্য উন্মোচনে বঙ্কিম এই উপন্যাসদ্বয়ে সচেষ্ট ছিলেন। বাস্তবজীবন-ভিত্তিক উপন্যাস বলেও এদের অভিহিত করা যায়।

(গ) যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস : রাজসিংহ (১৮৮২)। "রাজসিংহ' প্রবন্ধে (আধুনিক সাহিত্য) রবীন্দ্রনাথ লেখেন— "রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহার নায়ক কে কে ? ঐতিহাসিক অংশের নায়ক ঔরংজেব, রাজসিংহ এবং বিধাতা পুরুষ—উপন্যাস-অংশের নায়ক আছে কি না জানি না, নায়িকা জেবউন্নিসা। রাজসিংহ, চঞ্চলকুমারী, নির্মলকুমারী, মানিকলাল প্রভৃতি ছোটো বড়ো অনেকে মিলিয়া সেই মেঘদুর্দিন রথযাত্রার দিনে ভারত ইতিহাসের রথরজ্জু আকর্ষণ করিয়া দুর্গম বন্ধুর পথে চলিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে লেখকের কল্পনা প্রসূত হইতে পারে তথাপি তাহারা এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিক অংশেরই অন্তর্গত। তাহাদের জীবন-ইতিহাসের, তাহাদের সুখ-দুঃখের স্বতন্ত্র মূল্য নাই।" বঙ্কিমচন্দ্র কেবলমাত্র রাজসিংহ উপন্যাসকেই ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেছিলেন—"আমি পূর্ব্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী, চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।"

(ঘ) জাতীয়তাবোধে উদ্দীপিত অনুশীলন-তত্ত্বাশ্রয়ী উপন্যাস : আনন্দমঠ (১৮৮২), **দেবী চৌধুরাণী** (১৮৮৩) এবং **সীতারাম** (১৮৭৭)। পরিণত বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র এই তিন উপন্যাসে সমষ্টি, ব্যষ্টি ও সমন্বয়ের অনুশীলন সম্পর্কিত তত্ত্বকে আশ্রয় করে জাতি, দেশ ও ধর্ম সম্বন্ধে নতুন চিন্তাধারা ব্যক্ত করলেন। শেষ পর্যায়ের তিনটি উপন্যাসে বঙ্কিমকে ভিন্ন মূর্তিতে অবতীর্ণ

হতে দেখি। বিপিন চন্দ্র পাল 'নবযুগের বাংলা' গ্রন্থে লেখেন "বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শেষ তিনখানি উপন্যাসে এই সন্ধি বা সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন। ইহাই আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী এবং সীতারামের বিশেষত্ব। কেবল রসমূর্ত্তির সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী বা সীতারামের রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। এই তিনখানির উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশবাসীদিগকে ভারতের উচ্চাঙ্গের কর্ম্মযোগে দীক্ষিত করা।" ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বঙ্কিম নিষ্কাম স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে ত্যাগ ও সেবাধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করে আমাদের জাতীয় মুক্তির পথ সৃজন করেছিলেন। অনুশীলন তত্ত্বাশ্রিত দেবী চৌধুরাণীতেও নিষ্কাম ধর্মের স্বরূপ দেখিয়েছেন, ব্যক্তি চরিত্রে তার প্রভাব ও কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ করেছেন। 'সীতারামে' নিষ্কাম ধর্ম-সাধনা ব্যষ্টি ও সমষ্টির সমন্বয় চিন্তায় প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্য ও ধর্মসাধনাকে বঙ্কিম যে অভিন্ন বলে মনে করতেন, আলোচ্য 'ত্রয়ী' উপন্যাসে তা সার্থকভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে।

(ঙ) নতুন আঙ্গিকে অপূর্ণাঙ্গ উপন্যাস : ইন্দিরা (১৮৭৩) এবং **রজনী** (১৮৭৭)। বঙ্কিমচন্দ্র আলোচ্য উপন্যাসদ্বয়ে আঙ্গিক বিন্যাসরীতির এক নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। 'ইন্দিরা' অপূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে ইন্দিরার আত্মকথনে চরিত্র ও কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে—কাহিনীবস্তু জটিলতাহীন হাস্যরসোদ্দীপক। **রজনী** স্বভাবধর্মে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের সমগোত্রীয়—এখানে উপাখ্যান বিভিন্ন চরিত্রের আত্মকথায় প্রকাশ পেয়েছে—তাদের প্রকৃতি ও চরিত্রানুযায়ী সংলাপগুলি বিন্যস্ত। মানবহৃদয়ের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বঙ্কিম যে যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন, 'রজনী'তে তার প্রমাণ আছে। লর্ড লিটন প্রণীত **Last Days of Pompeii** উপন্যাসের নিদিয়া চরিত্রের সঙ্গে রজনী চরিত্রের মিল থাকলেও বঙ্কিমের স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্যই স্বীকার্য।

(চ) উপন্যাসের লক্ষণযুক্ত বড়োগল্প : যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪) এবং রাধারাণী (১৮৮৬)। **যুগলাঙ্গুরীয়** নিছক রূপকথা শ্রেণীর। **রাধারাণী** স্থানে ও কালে আমাদের নিকটবর্তী হলেও কাহিনীর প্রকৃতি বিচারে বাস্তব রাজ্যের প্রত্যন্ত সীমায় তার অবস্থিতি। এ আখ্যায়িকা কোনক্রমেই উপন্যাস নয়। আকৃতি যেমনই হোক প্রকৃতি বিচারে 'রাধারাণী'কে ছোটগল্পও বলা চলে না। একটি ক্ষুদ্রাবয়ব অবাস্তব আখ্যায়িকার মধুর রূপায়ণই 'রাধারাণী'র বৈশিষ্ট্য।" (কথা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র : শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়)। এই দুই রচনাকে ছোটগল্প বলা যায় না— আবার আঙ্গিকের স্বভাব-ধর্মে উপন্যাসও নয়,—দুয়ের মাঝামাঝি সৃষ্টি বলে যুগলাঙ্গুরীয় ও রাধারাণীকে বড়োগল্প বলাই সঙ্গত।

বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক সত্তার বিবর্তন :

সাহিত্যস্রষ্টা ও সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার মূল্যায়ন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত নিবারণ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতে ছিলেন, আর একদিকে ধূম ও ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন। ... বঙ্কিম সাহিত্যে কর্ম্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থির ভাবে পর্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্ব্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কি কাব্য কি বিজ্ঞান কি ইতিহাস কি ধর্ম্মগ্রন্থ যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন।" (বঙ্কিমচন্দ্র : আধুনিক সাহিত্য) ১৮৬৫ সালে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস প্রকাশ করে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের অঙ্গনে সর্বপ্রথম যুগান্তর সৃষ্টি করেছিলেন। আঙ্গিক রচনায়, ভাষা ও ভাবের অপূর্ব সমারোহে, ইতিহাসের রোমান্স-নির্ভর পটভূমিকায় আপন সৃজন শৈলীর বৈচিত্র্যময় প্রকাশ ঘটালেন তিনি। প্রতিভার পূর্ণায়ত

রূপ-এ উপন্যাসে পাওয়া গিয়েছিল, এমন নয়, কিন্তু তাঁর নিত্য নব প্রতিভার উন্মেষ যে অনিবার্য ছিল, প্রথম উপন্যাসেই তার আভাস মেলে। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের এই প্রথম রচনা-প্রকরণে, রচনা নৈপুণ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রতিভার সর্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণতার আভাস। জগৎসিংহ, তিলোত্তমা ও আয়েষার কাহিনীতে একটা নতুন ভাবগত সুরের সংযোজনা দেখি। রোগশয্যায় তিলোত্তমার স্বপ্নদর্শন, পরবর্তী উপন্যাসগুলির অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক প্রসঙ্গের ইঙ্গিতধর্মী পূর্বাভাস। তাঁর জীবনদর্শনের আলোকে দুর্গেশনন্দিনীকেও দেখা যায়। মোহিতলাল মজুমদার, **বাংলা নবযুগ** গ্রন্থের অন্তর্গত 'নব মানব-ধর্ম্ম ও বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে বলেছিলেন— "তাঁহার উপন্যাসগুলিতে—বাংলা সাহিত্যের সেই অতুলনীয় কাব্যকীর্ত্তিগুলিতেও—তিনি মানুষের সেই অভাবনীয় নিয়তিকেই, তাঁহার দেহ-মন-প্রাণ ও আত্মার ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন।" বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ মনীষা ও প্রতিভার ব্যক্তিত্বময় পৌরুষ, তাঁর মানবজীবন সম্পর্কে একটা সুস্থ সচেতনতা, আশ্চর্য সংযম, বাহুল্যবর্জিত কাহিনীবৃত্ত-রচনা-কৌশল—তাঁর অসামান্যতার যাবতীয় দিক প্রথম উপন্যাসে কিছুটা অস্পষ্ট হলেও প্রকাশ পেয়েছিল সন্দেহ নেই। উত্তরকালের স্বজাতি-প্রীতির যে নিদর্শন প্রত্যক্ষভাবে দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠ বা সীতারামে জড়িত ছিল, দুর্গেশনন্দিনীতে তার সামান্য ইঙ্গিত অসামান্যতায় উপস্থাপিত। "এই জাতি-প্রেমকে, বঙ্কিমচন্দ্র— শুধুই আবেগ নয়, একটা সুদৃঢ় ও সর্ব্বতোভদ্র চিন্তাভিত্তির উপরে স্থাপনা করিয়াছিলেন — তিনি ইহাকে মানুষের আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুর পুরাণ, শাস্ত্র, দর্শন নতুন করিয়া পড়িয়াছিলেন এবং য়ুরোপীয় চিন্তার যুক্তি-পাথরে ঘষিয়া তাহার উজ্জ্বলতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেই ভাবচিন্তার উপাদানে মনুষ্যত্বের যে আদর্শ গড়িয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে দেশ-প্রেমকে একটা বড় স্থান দিয়েছিলেন।" (বঙ্কিমচন্দ্রের জাতিপ্রেম : **বঙ্কিম বরণ** : মোহিতলাল মজুমদার)

প্রথম সৃষ্টি থেকেই বঙ্কিমের পথ-অন্বেষণের আগ্রহ ও পথ-সৃজন করার দুঃসাধ্য ব্রত লক্ষ করা যায়। সাহিত্য-সৃজন তাঁর কাছে কেবল মানস-বিলাস নয়—কবিত্বের কল্পলোকে পাড়ি দেওয়া নয়—পূর্ণ মনুষ্যত্ববোধকে প্রতিষ্ঠা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ধর্মতত্ত্বের চর্চায় দেশাত্মবোধের জাগরণ ঘটানো তাঁর তপোব্রত মানসিকতার আন্তরিক অভিলাষ। পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধক বঙ্কিমচন্দ্র— "এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন-রস-রসিক কবিশিল্পী; তাঁহারই স্রষ্টাসুলভ কবিদৃষ্টিতে কাম ও প্রেম, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, চরিত্রনীতি ও প্রাণধর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত—এক বৃহত্তর সত্যের আশ্রয়ে পাশাপাশি স্থানলাভ করিয়াছে। তিনি মানব-প্রীতি ও চরিত্র-নীতি এই দুইয়েরই অসম্পূর্ণতা ঘুচাইয়া, যত কিছু ব্যর্থতা ও সংকীর্ণতা সত্ত্বেও, মানুষের মহিমাকে আধুনিক যুগধর্ম্মের অনুরূপ করিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। (**বাংলার নবযুগ**—মোহিতলাল মজুমদার)। তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভার বিবর্তনের পথটি কেবল সাহিত্য-সৃজনে আত্ম-বিস্মৃত নয়, শিল্পের জন্য শিল্প-সৃষ্টি তাঁর লক্ষ হয়নি—জীবন সম্পর্কে গভীর প্রত্যয়, একটা সুস্থ আদর্শবোধ, স্বাজাত্যপ্রীতি তাঁর মানস-দর্শনের গভীরতায় আশ্লিষ্ট হয়ে চৈতন্যের ভাবানুষঙ্গে অচ্ছেদ্য হয়ে পড়েছিল। আমাদের দেশ, জাতি মনুষ্যত্ব, যুগোপযোগী ধর্ম-চেতনা অথবা যুক্তিবাদ উপন্যাসের ভিত্তিমূলে কাজ করেছিল। ঐকান্তিক নিষ্ঠায় ও কঠোর তপোব্রতে বঙ্কিমচন্দ্র নিত্য-নতুন পথের দিশারী হলেন—আমাদের নির্জীব অজ্ঞান জীবনপ্রবাহে, নতুনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি।

১৮৬৬ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস **কপালকুণ্ডলা** প্রকাশিত হয়। বঙ্কিম-প্রতিভার যথার্থ স্ফূর্তি এখান থেকেই লক্ষ্য করা যায় বলে প্রায় সমস্ত বিজ্ঞ সমালোচকেরা অভিমত দিয়েছেন।

মাত্র সাতাশ বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র যে অপূর্ব রোমান্টিক উপাদান সন্নিবিষ্ট করেন, অনন্য তার সৃষ্টি কৌশল মহিমা। দুর্গেশনন্দিনীর ঘটনা ও চরিত্রের বহির্মুখীস্রোত এখানে অন্তর্মুখীনতায় আরও বেশী গভীর ও ব্যাপ্ত। তাছাড়া, প্রথম উপন্যাসের পরীক্ষা নিরীক্ষা ততটা ফলপ্রসূ হয়নি, পূর্বতন সাহিত্যের রূপ ও ভাবের প্রভাব তাতে স্পষ্ট, কিন্তু কপালকুণ্ডলায় বঙ্কিম নতুন রীতির পরীক্ষায় আশ্চর্যভাবে সফল। ঘটনা বিন্যাসে, চরিত্র রূপায়ণে, অরণ্যজীবনের প্রভাব বর্ণনায় অথবা মানব চরিত্রের অভূতপূর্ব রূপ-নিরীক্ষণে তিনি অদ্বিতীয় শিল্পী বলে গণ্য হবেন। 'কপালকুণ্ডলায়' বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্সকে পরিত্যাগ করেন নি, কিন্তু তার সাথে যুক্ত করেছেন উপন্যাসের রসসিক্ত বাস্তবজীবনের অনুপম সব ছবি। 'কপালকুণ্ডলা'র কাহিনীবৃত্ত তেমন জটিল নয়— "ইহার আখ্যানে ঘটনার বাহুল্য নাই ; ঘটনার ধারাও জটিল নয়, তাহার কারণ,ইহা যে সমাজ ও গৃহ-সংসারে কাহিনী, তাহার জীবনযাত্রা অতিশয় সহজ ও সরল।" **(বঙ্কিম-বরণ)** । সমালোচক শ্রী সুধাকর চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন— "কি চরিত্র চিত্রণে, কি পরিকল্পনায়, কি ভাষায়, কি চিত্তবিশ্লেষণে, কপালকুণ্ডলা বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি।" **(কথা সাহিত্যে বঙ্কিম)**

বঙ্কিমচন্দ্রের দেশাত্মবোধের ভাবনার প্রথম প্রকাশ হয় ১৮৬৯ সালে মুদ্রিত তৃতীয় উপন্যাস **মৃণালিনীতে**। আমাদের জাতীয় শৌর্যবীর্যের প্রতি আস্থাশীল হয়ে বঙ্কিম এই উপন্যাস লেখেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র **রহস্য সন্দর্ভে** মন্তব্য করেন— "বঙ্গভাষায় গদ্যে **মৃণালিনী**'র সদৃশ সুচারু গ্রন্থ অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই।... তাঁহার রচনাচাতুর্য্যের ও গল্পবিন্যাসের ক্ষমতা উত্তরোত্তর সমধিক উৎকৃষ্টতা লাভ করিয়াছে।" যদিও রোমান্সধর্মী উপন্যাস তবু **মৃণালিনী**-তে **দুর্গেশনন্দিনীর** তুলনায় কাহিনী বর্ণনায় ও বিন্যাসে বঙ্কিম অনেক বেশী কুশলী সন্দেহ নেই। চরিত্র-চিত্রণে তাঁর সাফল্য সুনিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন— " এত বিচিত্র চরিত্র, ঘটনা ও উপাখ্যানের সমাবেশ সত্ত্বেও রোমান্সটি শিল্পসার্থক নয়, তার কারণ বোধহয় স্রষ্টার নিজের অব্যবস্থিতচিত্ততা"।(**সাহিত্যশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র :** সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) যাইহোক, হেমচন্দ্রের স্বভাব চরিত্র উদ্ঘাটনে অথবা মনোরমার মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র প্রকাশে বঙ্কিমচন্দ্র যে **দুর্গেশনন্দিনীর** তুলনায় যথেষ্ট প্রাগ্রসর সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বঙ্কিম প্রতিভার ক্রম-বিবর্তনের একটি সূত্র এখান থেকে পাওয়া সম্ভব— (ক) কাহিনীবৃত্ত অনেকটাই সুসংহত (খ) পরিবেশ পরিস্থিতি বিশ্বাসযোগ্য (গ)চরিত্র সৃষ্টিরনেপথ্যে লেখকের গভীর জীবনবোধের স্পষ্ট রূপরেখা (ঘ) স্বদেশপ্রীতির সঙ্গে স্ফুটোন্মুখ মানবিকতা (ঙ) ভাষা-শৈলীর রূপান্তর।

উপন্যাসের রূপ-রীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার অনিবার্য ফসল ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত, সামাজিক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য— " 'বিষবৃক্ষে' কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে পরিচয় নিয়ে সে এল, তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে।" কাহিনীর শুরু থেকে বাস্তব সংসার-জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে উপন্যাসে পূর্ববর্তী তিন-উপন্যাস থেকে আঙ্গিক বিষয়বস্তুর যেমন পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনি রোমান্সসুলভ কল্পনাচারিতা পরিত্যক্ত হয়ে বাস্তবানুগ জীবন-চিত্রণে লেখকের অনুরাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নগেন্দ্রনাথ, সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীকে ঘিরে উপন্যাসের দ্বান্দ্বিক বিষয়বস্তু শিল্পরূপ পেয়েছে। " প্লটটি যথেষ্ট জটিল, কিন্তু আখ্যানের স্বচ্ছন্দগতি, ঘটনার স্বাভাবিক সংস্থান এবং শিল্পবস্তুর সুসংহত, পরিচ্ছন্ন রূপরেখা দেখে মনে হয়, শিল্পীর পরিকল্পনায় কোনো সংশয় কোথাও ছিল না। কাহিনী, চরিত্র, ঘটনা, শাখা-কাহিনী সবকটি উপাদানই উপযুক্ত মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়ে প্লটে পূর্ণভাবে অন্বিত"— (**সাহিত্যশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র :** সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।) উপন্যাসের

নতুন রূপ প্রকরণ সৃজনের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী, **বিষবৃক্ষ** উপন্যাসে তা প্রমাণিত হ'ল। ঔপন্যাসিক প্রতিভার বিবর্তনে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। দাম্পত্য প্রেমকে উজ্জ্বলতর করে তোলবার প্রয়োজনে হয়ত এই উপন্যাসের পরিকল্পনা বঙ্কিম করেছিলেন।

১৮৭৩ সালে প্রকাশিত ছোটগল্পের ক্ষুদ্র আকৃতিযুক্ত **ইন্দিরা** বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে প্রচুর সংযোজন ও সংস্কার করে একশ' সাতাত্তর পৃষ্ঠার একটি নাতিবৃহৎ উপন্যাসে রূপান্তরিত করেন। এখানেও বঙ্কিমচন্দ্র কথা-সাহিত্যের নতুন আঙ্গিকরীতি প্রবর্তন করেন। আত্মকথনের অভিনব রীতিতে ব্যক্তিচরিত্রের গভীরে অবগাহন করে মণি-মুক্তা আহরণ করেছেন তিনি। বর্ণনারীতি ও ভাষাভঙ্গী কেবল চিত্তাকর্ষক নয়, শিল্প-গুণান্বিতও বটে। 'ইন্দিরা'র মতো অন্য একটি 'লঘু-কাহিনী' বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন ১৮৭৪ সালে। গ্রন্থটির নাম **যুগলাঙ্গুরীয়**। অতীতের প্রেম কাহিনী হলেও ক্ষুদ্র উপন্যাসের মধ্যে আধুনিক যুক্তিবাদী মনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। **রজনী** (১৮৭৭) নামক জন্মান্ধ নারীকে নিয়ে তার শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও বাহ্য ঘটনার প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে বঙ্কিমের আত্মকথনরীতির অভিনব নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। ইন্দিরা চরিত্র সমগ্র কাহিনীর বক্তা—কিন্তু **রজনী** উপন্যাসে বঙ্কিম অধিক বাস্তবানুগ পথ ধরে প্রধান চারটি চরিত্রের আত্মকথনের দ্বারা তাদের অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছেন। **ইন্দিরা ও রজনী**—বঙ্কিমচন্দ্রের অভিনব রীতির অপূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমুখ শিল্পীরা কোন কোন উপন্যাসে এই রীতি গ্রহণ করেছিলেন। **রাধারাণী**'তে (১৮৮৬ / ১৮৯৩) বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তব-জীবনের চমৎকার ছবি এঁকেছেন। যদিও আখ্যানের গতিপথ সহজ-সরল, কিন্তু পরিবেশন গুণে স্নিগ্ধ হাস্যরস সুন্দর শিল্পরূপ লাভ করেছে। এই চারটি ক্ষুদ্র উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র মানবহৃদয়ের চিত্ত-সংঘাত, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, হাস্য-কৌতুক অপূর্ব ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের **চন্দ্রশেখর** (১৮৭৫) উপন্যাসে দেখা যায় যে, লেখক আবার সেই রোমান্সরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করে আত্মিক স্বস্তি লাভ করছেন। এখানকার পারিবারিক কাহিনী রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে অনেকটাই যুক্ত। অঙ্কবিন্যাসে পরিকল্পনাপ্রসূত সংহতি ও জমাট কাহিনীগ্রন্থন অবশ্যই দৃষ্ট হবে। মনস্তত্ত্বের সঙ্গে চমকপ্রদ ঘটনা থাকলেও উপন্যাসের ট্রাজেডি চরিত্রভিত্তিক হয়ে উঠেছে। প্রতাপ, চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনী—তিন চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াটি শিল্পীর দৃষ্টিতে পূর্ণায়ত রূপে চিত্রিত। কাহিনীবৃত্তে একাধিক উপকাহিনী যুক্ত হলেও তা সুসংহত। এই উপন্যাসের ইতিহাস আরও অধিক মাত্রায় জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত—অন্ততঃ পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলির তুলনায় তো বটেই। পরিণত শিল্প-সৃষ্টির প্রেরণায় বঙ্কিমচন্দ্রের এটিও একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ঐতিহাসিক উপন্যাস-সৃষ্টির উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিত রচনা হয়েছে **চন্দ্রশেখর** উপন্যাসে। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এখানকার জীবন বহু বিস্তৃত, ট্রাজেডির আর্তনাদ অনেক বেশী ব্যক্তি জীবনের গভীরে প্রোথিত, শিল্পসিদ্ধি বহুলাংশে করায়ত্ত, ব্যঞ্জনার গভীরতা অনুভববেদ্য হয়ে উঠেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র আবার পূর্ণাঙ্গ সামাজিক উপন্যাস রচনার দিকে মনোনিবেশ করেন। সৃষ্টি হয়—**কৃষ্ণকান্তের উইল** (১৮৭৮)। গ্রন্থটি যে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস একাধিক পণ্ডিত-সমালোচক সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছেন। গোবিন্দলাল, ভ্রমর, রোহিণীকেন্দ্রিক কাহিনীবৃত্তে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বচ্ছ, মননশীল, চিত্তাকর্ষক বিচার-বিশ্লেষণ রীতি প্রকাশ পেয়েছে। ঘটনার প্রধান অবলম্বন রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের আসক্তি এবং ভ্রমরের অসুখ। সেই আসক্তির উদ্বোধন ক্ষেত্র বারুণী পুষ্করিণী। ... যে লালসার উদ্ভব বারুণী পুষ্করিণীর কূলে সেই লালসার জলাঞ্জলি

দ্বিতীয় খণ্ডে শীর্ণশরীরা চিত্রা নদীর সমীপবর্তী প্রসাদপুরের বিলাসকুঞ্জে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিকল্পনায় দুটি খণ্ড একটি অপরটির পরিপূরক। (**কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র :** সুধাকর চট্টোপাধ্যায়) অবৈধ প্রেমের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিজীবনে ঔচিত্য বোধের প্রশ্ন তুলেছেন, যা অনেকটাই সামাজিক শাস্ত্রানুমোদিত। রচনা-প্রণালী সহজ, স্বাভাবিক পথে পরিচালিত---চরিত্রভিত্তিক ঘটনার আবর্তে একটা সাবলীলতা লক্ষ্য করা যায় উপন্যাসের সর্বাঙ্গে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসে। "অতি অল্প স্থানের মধ্যে এরূপ গভীর ভাবপ্রকাশ, বিশ্লেষণ ও কবিত্বশক্তির এরূপ অসাধারণ সম্মিলন আর কোন উপন্যাসে পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।" (**বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা** —শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। মোটকথা, পরিকল্পনাগত দিক থেকে, শিল্পচাতুর্যে, চরিত্রায়ণে, পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃজনে, ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় এবং সর্বোপরি উৎকৃষ্ট ভাব-ব্যঞ্জনায় এ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় সৃষ্টি সন্দেহ নেই।

"বঙ্কিমের সব উপন্যাসেই শিল্পকৌশলের ওপর আত্মবিশ্বাস প্রকট, নবীকৃত (৪র্থ-সংস্করণ, ১৮৯৩) **রাজসিংহে** যেন সে বিশ্বাস প্রাধিকারের স্বাক্ষর বহন করে"—সমালোচকের এ সিদ্ধান্ত যুক্তিগ্রাহ্য। পূর্ববর্তী রোমান্সগন্ধী উপন্যাসগুলি থেকে এই উপন্যাসের পার্থক্য সম্পর্কে গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করেছেন--- "আমি পূর্ব্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।" রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসকে প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে অভিহিত করেছিলেন। বঙ্কিমের একাদশ উপন্যাস হিসেবে 'রাজসিংহ' তাঁর প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান বলে স্বীকৃত হবে। জাতীয় চেতনায় বিশ্বাসী আত্মপ্রত্যয়ী লেখক হিন্দুদের বাহুবল দেখানোর উদ্দেশে এ উপন্যাসের পরিকল্পনা করেন। ইংরেজ শাসনে মৃতপ্রায় হিন্দুদের শৌর্য-বীর্য, ধর্মাদর্শকে বঙ্কিম সমুন্নত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রাজসিংহ, চঞ্চলকুমারী, মবারক, নির্মলকুমারী, দরিয়া বেগম বা উদিপুরী, ঔরঙ্গজেব, জেব-উন্নিসা, মানিকলাল ইত্যাদি চরিত্রের আশ্রয়ে ইতিহাসের প্রাঙ্গণকে যেমন উজ্জ্বলতর করে গড়ে তুলেছেন, তেমনি মানব জীবনের বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের নিরন্তর প্রবাহকে ব্যঞ্জনায় অভিসিক্ত করেছেন গ্রন্থকার অপূর্ব দক্ষতায়। ইতিহাস ও মানব জীবন এক সূত্রে বিধৃত হয়েছে। শিল্প-সৃষ্টির দিক থেকে এ উপন্যাস উচ্চাঙ্গের উপন্যাস। মূল-কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনীর, জেব-উন্নিসা-মবারকের দুঃখ বেদনা, মিলন-বিরহের, চমৎকার মেলবন্ধন হয়েছে। চরিত্র-সৃষ্টির অনন্যতা, কাহিনী-গ্রন্থনে সংহতি ও দ্রুততা, পরিবেশ, রচনা-কৌশল, মানবিক বৃত্তির প্রকাশ বা চরিত্রের অন্তর্নিহিত রহস্যউদঘাটন কেবল চিত্তাকর্ষকই নয়—শিল্প-নৈপুণ্যেরও পরিচায়ক। "রাজসিংহ" উপন্যাসেই বঙ্কিম প্রতিভার যথার্থ স্ফূর্তি ঘটেছে বলেই মনে হয়।

পরবর্তী 'ত্রয়ী'-উপন্যাসে, **আনন্দমঠ** (১৮৮২), **দেবী চৌধুরাণী** (১৮৮৪) ও **সীতারামে** (১৮৮৭) বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভা জাতির কল্যাণে নিবেদিত হয়েছে— "বঙ্কিমচন্দ্র জাতির দুরবস্থা নিবারণের জন্য যে প্রেম-ধর্ম্ম প্রচার করিলেন তাহাই এ যুগের নব যজ্ঞধর্ম্ম; সমষ্টির জন্য ব্যষ্টির আত্মত্যাগই সেই যজ্ঞ, উহার জন্যই দেশ ও জাতি-প্রেমের সেই নব-ধর্ম্মসংহিতা। এই প্রেমের মন্ত্রদৃষ্টিই তাঁহাকে ঋষিপদবাচ্য করিয়াছে, তিনিই এ মন্ত্রের আদি-স্রষ্টা। ইহাই শেষে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান; তাঁহার সমগ্র সাহিত্যকর্ম্ম আর কিছুই নয়—এই এক যজ্ঞাগ্নিতে

একই মন্ত্রে নিরবচ্ছিন্ন আহুতি-দান।" (মোহিতলাল মজুমদার : বঙ্কিমবরণ)। ঋষি শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তী উপন্যাসে কবিত্ব ও রচনাশৈলীর প্রাধান্য, উত্তরকালে দার্শনিক সত্তার সঙ্গে জাতি-গঠনের আদর্শবাদের যোগসূত্র দেখেছেন। শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর শিল্পী মনীষীতে পরিণত হলেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় আনন্দমঠ রচিত। গ্রন্থের মূল ভাব দেশপ্রেম বা দেশভক্তি মহাকাব্যিক বিশালতায় উপস্থাপিত। এ সময়ে বঙ্কিম 'অনুশীলনতত্ত্ব', 'ধর্মতত্ত্বের' চর্চা করছেন এবং কৃষ্ণচরিত্রে নতুন বিজ্ঞানপ্রসূত যুক্তিবাদে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বের রূপ আবিষ্কারে মগ্ন ছিলেন। উপন্যাসের ভাব পরিকল্পনায় গীতোক্ত কর্মবাদ যেমন ঐক্য সূত্রে বিন্যস্ত হয়েছে, তেমনি জাতীয়তাবোধের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার মিলন ঘটিয়ে বঙ্কিম আমাদের আত্মকৃচ্ছতার দ্বারা স্বদেশ কল্যাণে ব্রতী হতে উজ্জীবিত করেছেন। দেবী চৌধুরাণী কে গীতার নিষ্কাম কর্ম ও অনুশীলন তত্ত্বে দীক্ষিত করে এক অপূর্ব শিল্পকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য কাহিনী গ্রন্থনে এমনই ঐশ্বর্য আছে যে, তত্ত্বকথা কখনও গল্পরসকে ক্ষুণ্ন করেনি। চরিত্রগুলি বহুলাংশে বাস্তবানুগ হয়েছে। গার্হস্থ্য জীবনে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে উপন্যাসের সিদ্ধান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের স্বতন্ত্রচিন্তার অভিব্যক্তি সমৃদ্ধ। তাঁর শেষ উপন্যাস সীতারামে— "একটা ধর্মতত্ত্বের সমস্যাই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়, কিন্তু এখানেও ধর্মতত্ত্বের প্রাধান্য ঔপন্যাসিকের অন্তর্দৃষ্টিকে ক্ষীণ করিতে পারে নাই।" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) সীতারাম চরিত্রের মহৎ ভাব, তার বিপর্যয় ও বেদনা, প্রবৃত্তির দুর্নিবার আকর্ষণজনিত অনিবার্য নিয়তির খেলা উপন্যাসেরই উপযুক্ত চরিত্র। বাঙালীর শৌর্য-বীর্য ও বহুবলশালী তেজস্বী স্বভাব বঙ্কিম বাঙ্গলার ইতিহাসের পাতায় সীতারামের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন। "চরিত্রকেন্দ্রিক, তথ্যভিত্তিক, লেখকের দেশপ্রেম ও ধর্মতত্ত্ব প্রকাশের মাধ্যম এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটির শিল্পরূপ বোধহয় ত্রয়ীর মধ্যে সমৃদ্ধতম, কাহিনী আরো উত্তেজনাময়, মনোমুগ্ধকর। ভাবাদর্শে আনন্দমঠ বঙ্কিমের মহত্তম সৃষ্টি, কিন্তু শিল্প-সুষমায় 'সীতারাম' ত্রয়ীর প্রথম স্থানীয়। (সাহিত্যশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র)।

সাধারণভাবে বঙ্কিম উপন্যাসে কল্পনার প্রাধান্য থাকলেও তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি চরিতার্থ হয়েছে তাঁর সৃষ্ট প্রবন্ধগুলিতে। আবার, এই বুদ্ধিবৃত্তি উপন্যাসের শিল্পরূপ গঠনে সাহায্য করেছে জগৎ ও জীবনকে দেখবার ও অনুভব করার এক আশ্চর্য জীবন-জিজ্ঞাসা বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল তাঁর উপন্যাসগুলি এই অর্থে রুচি ও রসবোধের যে পরিচয় দিয়েছে, তার মূল্যই প্রধান ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় কয়েকটি সূত্র থেকে—(ক) বাংলা সাহিত্যের প্রথম সফল উপন্যাস সৃষ্টির জনক বঙ্কিম ; (খ) প্রথম পর্বের রচনায় রোমান্সসুলভ কল্পনাচারিতা, ইতিহাস ও মানব-জীবন কেন্দ্রিক ভাবনা ; (গ) সামাজিক উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক জীবনবোধের পরিচয়—প্রবৃত্তির রূপচিত্র ও তার অনিবার্য পরিণতি সম্পর্কে দার্শনিক অনুভূতি ও ব্যঞ্জনা ; (ঘ) অপূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে জীবন সম্পর্কে আগ্রহবোধ ও পর্যবেক্ষণ ; (ঙ) ঐতিহাসিক উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ রূপ আবিষ্কার ও জীবনের সঙ্গে ইতিহাসের মেলবন্ধন ; (চ) বঙ্কিমের জাতিপ্রেম—ব্যষ্টি, সমষ্টি ও অনুশীলনতত্ত্ব এবং তাদের সমন্বয়ের আদর্শ, দেশপ্রেমের ভাবনা অথবা মনুষ্যত্বের আদর্শবোধ, তাঁর মনীষার সর্বশ্রেষ্ঠ দান—শেষ পর্বের 'ত্রয়ী' উপন্যাসে বিধৃত ; (ছ) বাহুল্যবর্জিত ভাষা সৃষ্টি, পরিমিতি বোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরিশীলিত ঋজু ভাষা। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা কেবল সাহিত্য-সেবায় স্ফূর্তি লাভ করেনি, আমাদের জাতীয় জীবনধারাকেও সমানভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিল, এখানেই তাঁর প্রতিভার অনন্যতা॥

উপন্যাস পাঠ

উৎস-কথা

ঙ্কিমচন্দ্র যশোরে ১৮৫৮ সালের ৭-ই আগস্ট ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার হিসেবে র্মক্ষেত্রে যোগদান করেন। এরপর তিনি ১৮৬০ সালের জানুয়ারী মাসে নেগুয়াঁতে (বর্তমানে াথি মহাকুমা) বদলি হন। দুর্গেশনন্দিনীর পর কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬) প্রকাশিত হলেও কাঁথিতে সবাসকালে এই দ্বিতীয় উপন্যাসটির খসড়া প্রস্তুত করতে শুরু করেন। সময়ের দিক থেকে ায় ছ'-বছর পূর্ব থেকে এই রোমান্স-নির্ভর উপন্যাস লিখতে প্রবৃত্ত হন। কালগত ব্যবধানে ঙ্কিম দোষ-ত্রুটিগুলি সংশোধিত করতে পেরেছিলেন বলে এ উপন্যাসের বিবিধ সংস্করণ মোটামুটি 'পরিবর্তিত ছিল। যাইহোক্, রোমান্টিক উপন্যাস লিখলেও বঙ্কিমচন্দ্র কোন কোন বিষয়ে প্রত্যক্ষ ভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়েছিলেন। সুতরাং বাস্তব-জীবন-অভিজ্ঞতা বা অনুভবের শিল্প-সম্মত রূপ ওয়ার প্রচেষ্টা উপন্যাসের কাহিনী, চরিত্র বা পরিবেশ রচনায় লক্ষ্য করা যায়। তবে আধুনিক স্তবতা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সঠিকভাবে প্রতিধ্বনিত না হলেও, বাস্তব অভিজ্ঞতার উপকরণগুলো াব উপন্যাসের কাহিনীর পরিকাঠামো রচনায় অবশ্যই সাহায্য করে থাকবে। ঔপন্যাসিকের ষ্টিভঙ্গীতে রোমান্সের স্বপ্নমাধুরীর প্রাচুর্য ছিল, তাই প্রাত্যহিক জীবন থেকে আহৃত অভিজ্ঞতা । নিদর্শন বাস্তবতায় রস-সম্পৃক্ত হয়ত হয়নি—যেহেতু "The novel's realism does not eside in the kind of life it presents, but in the way it presents it (Ian Watt)—ঙ্গু তাতে উপন্যাস হিসেবে 'কপালকুণ্ডলা'র অবমূল্যায়নও ঘটেনি। এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব।

বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অভিমত দিয়েছেন যে 'কপালকুণ্ডলা'র াহিনীবৃত্তসৃষ্টির নেপথ্যে নেগুয়াঁ (কাঁথির সন্নিকট দরিয়াপুর ও চাঁদপুরের অনতিদূরে) অঞ্চলের ভাবই সর্বাধিক। "বঙ্কিম-প্রসঙ্গ" পুস্তকে পূর্ণচন্দ্র বলেছেন— "যখন বঙ্কিমচন্দ্র নেগুঁয়া মহাকুমাতে লেন, তখন সেইখানে একজন সন্ন্যাসী কাপালিক তাঁহার পশ্চাৎ লইয়াছিল ; মধ্যে মধ্যে নিশীথে াহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিতেন, তবুও মধ্যে ধ্যে আসিত। যখন তিনি সমুদ্র তীরে চাঁদপুর বাঙ্গালায় বাস করিতেন, তখন এই সন্ন্যাসী প্রতিদিন ভীর রাত্রিকালে দেখা দিত। চাঁদপুরের কিছু দূরে সমুদ্রতীরে নিবিড় বনজঙ্গল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের াবণা হইয়াছিল যে, ঐ সন্ন্যাসী সমুদ্রতীরে সেই বনে বাস করিত। কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনা হাকুমায় বদলি হন।" প্রাপ্ত তথ্য থেকে দু'টি বিষয় জানা যায়—(১) সন্ন্যাসী কাপালিকের ঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ পরিচয় ও উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র কাপালিকের চরিত্র পরিকল্পনা ; ২) চাঁদপুরের সমুদ্রতীর ও নিবিড় বনজঙ্গলকে উপন্যাসের প্রধানতম প্রেক্ষাপট হিসেবে গ্রহণ। াথমিক এই উপকরণগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিশেষ এক ভাব-কল্পনা। 'কপালকুণ্ডলা'য় এই াব-কল্পনারই আধিক্য।

পূর্ণচন্দ্রের উল্লিখিত তথ্যে জানা যায়, খুলনায় বদলি হবার পর বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকদিনের জন্য াঁটালপাড়ায় আসেন। এই সময় তাঁর বন্ধু নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রও কাঁটালপাড়ায় আসেন। বঙ্কিমচন্দ্র ার ভাব-কল্পনায় উদ্ভূত এক জটিল প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিলেন বন্ধুবরের কাছে— "যদি শিশুকাল হতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত কোনও স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক কর্ত্তৃক প্রতিপালিত য়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ না দেখিতে পায় এবং সমাজের কিছু জানিতে

না পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজ সংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে এবং তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে?" এই প্রসঙ্গ উত্থাপনের সময় বঙ্কিম-অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র ও অনুজ পূর্ণচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন যে, দরিদ্র-ঘরে বিবাহ হ'লে মেয়েটি চোর হবে। পরে অবশ্য ব্যঙ্গ ত্যাগ করে অভিমত দেন— "কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবে। পরে সন্তানাদি হইলে স্বামি-পুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে; সন্ন্যাসীর প্রভাব তাঁহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে।" বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের কথা মানতে পারেননি। তাঁর রোমান্টিক মন কপালকুণ্ডলা চরিত্রকে নিয়ে এক অপূর্ব আলো-আঁধারি কাব্য রচনা করেছে। বাংলা সাহিত্যে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' উপন্যাস এটি। দীনবন্ধু মিত্র সম্ভবতঃ বঙ্কিমের মানসিকতার গতি-প্রকৃতি অনুভব করে কোন মন্তব্য করেন নি। পূর্ণচন্দ্র এ বিষয়ে জানিয়েছেন— "ভাবগতিকে বুঝিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের একথা মনোমত হইল না। দীনবন্ধু কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না। ইহার পর দুই বৎসরের (?) মধ্যে 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র এই কাপালিক প্রতিপালিতা কন্যাকে সমুদ্রতটবিহারিণী, বনচারিণী, সৃষ্টিছাড়া এক অপূর্ব মধুর প্রকৃতির মোহিনী মূর্ত্তিরূপে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।" [বঙ্কিম-প্রসঙ্গ]

কাপালিক, উপন্যাসের অরণ্যপ্রকৃতি, রসুলপুরের নদী, সমুদ্রতট এবং কপালকুণ্ডলা চরিত্রের উৎস-সূত্র পূর্ণচন্দ্রের বিবরণে অনেকটাই স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক মন বস্তুগত উপকরণকে অবলম্বন করে যে শিল্পসৃষ্টির অনুপম সৌধ রচনা করেছে, সেখানে জীবন থেকে আহৃত চরিত্র ও পরিবেশের গুরুত্ব কতখানি তা ভেবে দেখার মতো। তবে, সৃষ্টির প্রাথমিক উৎস-উপাদান হিসেবে এসবের গুরুত্ব অপরিসীম একথা অনস্বীকার্য। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে (শিরোনাম—সাগরসঙ্গমে) "রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত"— হওয়ার প্রসঙ্গ আছে, সেখানে বঙ্কিমের বাল্যস্মৃতির কিছু প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। পড়াশুনোর জন্য প্রতিদিন বঙ্কিমকে পূর্ণচন্দ্রসহ নৌকা করে নৈহাটির কাঁটালপাড়া থেকে হুগলীতে আসতে হ'ত। গঙ্গা পারাপারের সময় কোন একদিন নিবিড় কুয়াশার মধ্যে তিনি পড়েছিলেন এবং নাবিকদের দিগ্‌ভ্রম হয়েছিল—এসব কথা পূর্ণচন্দ্র "বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা" অংশে জানিয়েছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, টুকরো টুকরো নানান ছবি লেখকের অন্তর্মানসে গভীর রেখাপাত করেছে, প্রেরণা জুগিয়েছে এবং কোন কোন সময় শিল্পসৃষ্টির বিশেষ মুহূর্তকে চিরকালীন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

উপন্যাসের প্রতিনায়িকা চরিত্র মতিবিবি বা লুৎফ-উন্নিসা আক্ষরিক অর্থে ঐতিহাসিক চরিত্র না হলেও ইতিহাসের ভাবধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক অপূর্ব নারীচরিত্র। তার প্রবৃত্তিমুখীন জীবনযাত্রার পরিচয়টিও বাস্তব-জীবন থেকে সংগৃহীত—মতিবিবি সম্পর্কে এমন অনুমান পূর্ণচন্দ্র করেছিলেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়— " 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের 'মতিবিবি' কোন গৃহস্থের কুলত্যাগিনী বধূর গল্প অবলম্বনে অঙ্কিত হয়। তাঁহার মতে ইহার চরিত্রের সঙ্গে মতিবিবির কোন সাদৃশ্য নাই বটে, কিন্তু ঘটনার সাদৃশ্য আছে।" যাইহোক, আখ্যানে, প্রকৃতি-চিত্রণে, উপযুক্ত প্রেক্ষাপট রচনায় কিংবা কাপালিক, কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবির চরিত্র সৃজনে বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছিলেন। শিল্পসৃষ্টির সাফল্যের পিছনে এই বৈচিত্র্যময় অনুভবের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব আছে, এ অভিমত অবশ্যই যুক্তিগ্রাহ্য। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের শিল্পসিদ্ধি হয়ত তাই একক মহিমায় অম্লান হয়েছে। মাত্র সাতাশ বছর বয়সের এই অনুপম সৃষ্টি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক বলে গণ্য হয়েছিল।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের পাঠভেদ

মাত্র সাতাশ বছর বয়সে মহাপ্রতিভাধর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দ্বিতীয় এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস **কপালকুণ্ডলা** লেখেন ১৮৬৬ সালে। ১৮৬৫ সালে দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের সময়ই কপালকুণ্ডলার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়েছিল। যুক্তিবাদী রসজ্ঞ শিল্পী তাঁর আপন সৃষ্টির সংশোধন, পরিবর্জন ও পরিমার্জন করেন বিভিন্ন সংস্করণে—এটাই রীতি। বঙ্কিমের মতো লেখকের এই জাতীয় পরিবর্তন সাধন অনিবার্য ছিল একাধিক কারণে—(ক) তাঁর অতি তীক্ষ্ণ ধীশক্তি; (খ) মার্জিত রুচিশীলতা; (গ) জীবন-সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ নৈপুণ্য; (ঘ) দার্শনিক অনুভব; (ঙ) কাহিনী, চরিত্র ও পরিবেশগত রস-ব্যঞ্জনা; (চ) বিশুদ্ধ শব্দ-প্রয়োগ কুশলতা ও তার বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের ইঙ্গিতময়তা; (ছ) নাট্যধর্মীতার অন্যতম গুণ গতিশীলতার দিকে লক্ষ্য রেখে বিবৃতি-ধর্মী শ্লথ বক্তব্যের সংক্ষিপ্ততা; এবং সর্বোপরি, (জ) সামগ্রিকভাবে শিল্পরসবোধের অঙ্গীভূত সৌন্দর্যলোক সৃজন কবা। এজন্যই কথাশিল্পীর মতামত "চিরদিনই পরিবর্তনশীল" ছিল। কপালকুণ্ডলার প্রথম সংস্করণ ও পরবর্তী সংস্করণগুলিতে পার্থক্য আছে ঠিকই, তবে অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় তা বহুলাংশে কম। এর কারণ হয়ত এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমাবধি এ উপন্যাসের কায়াগঠনে সতর্ক ছিলেন অথবা প্রথম প্রকাশের পূর্বেই গ্রন্থের পরিবর্তন পরিমার্জন পর্বটি সেরে নিয়েছিলেন। যাই হোক, কপালকুণ্ডলার আটটি সংস্করণ হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশাতে। প্রথম সংস্করণ ১৮৬৬, দ্বিতীয় সং— ১৮৬৯, তৃতীয় সং—১৮৭৪, চতুর্থ সং—১৮৭৮, পঞ্চম সং—১৮৮১, ষষ্ঠ সং—১৮৮৪, সপ্তম সং—১৮৮৮ এবং অষ্টম সংস্করণ—১৮৯২।

অল্পবিস্তর পরিবর্তনের চিহ্ন প্রায় সমস্ত সংস্করণেই আছে। এই জাতীয় পরিবর্তনগুলির মধ্যে বিশুদ্ধ শব্দ প্রয়োগ অথবা সংলাপ মাধুর্যের দিকে লক্ষ্য রেখে সাধু অথবা চলিত শব্দপ্রয়োগ; বাক্য, বাক্যাংশের পরিবর্তন, সংযোজন অথবা রূপান্তরসাধন ঘটানো, কমা, যতি, সেমিকোলন, জিজ্ঞাসাচিহ্ন বা বিস্ময়বোধক চিহ্নের পরিবর্তন করে প্রয়োজনমত সংশোধন ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সামান্য এই পরিবর্তনেও হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে অসামান্য ব্যঞ্জনা। তবে, প্রথম সংস্করণের একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ, (চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের পূর্বের একটি পরিচ্ছেদ) পরবর্তী সংস্করণে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়, যে কোন মহান শিল্পী আপনার শিল্প কর্মের মধ্যে নিজেকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারেন না বলে, এক 'অতৃপ্তির অনুভব' তাঁর চৈতন্যের গভীরে পীড়া দেয়। যে কোন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও স্রষ্টার এ অন্তর্বেদনা, শিল্প প্রকরণের অনিবার্য ফলশ্রুতি বলে গণ্য হয়। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার পরবর্তী সংস্করণগুলির পরিবর্তনের নেপথ্যে এই শিল্পবোধের অতৃপ্তি কাজ করে থাকবে। এছাড়া, একাধিক কারণেও পাঠভেদ হ'তে পারে। সেই কারণগুলি অন্বেষণ ও তার প্রয়োজনীয়তা বিচার করাই আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য।

প্রথম সংস্করণের সঙ্গে অষ্টম সংস্করণের পার্থক্য নিরূপণ করলে পাঠভেদের সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যাবে। সপ্তম সংস্করণ পর্যন্ত সামান্য অংশই পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়েছে—তবে চতুর্থ খণ্ডের প্রথমেই একটি পরিচ্ছেদের সম্পূর্ণ অংশ পরিত্যক্ত হওয়ার ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ। যাই হোক, পাঠভেদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে উপযুক্ত কার্য-কারণ সূত্র নিরূপণ ও তার শিল্পগত তাৎপর্য অন্বেষণ করাই আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য।

প্রথম খণ্ড / তৃতীয় পরিচ্ছেদ: প্রথম সংস্করণে ছিল— "পর্ব্বততলচারী ব্যক্তির উপরে শিখরখণ্ড ভাঙিয়া পড়িলে তাহাকে যেমন একেবারে নিষ্পেষিত করে, এ সিদ্ধান্ত জন্মমাত্র নবকুমারের হৃদয়, সেইরূপ একেবারে নিষ্পেষিত হইল।

এ সময়ে, নবকুমারের মনের অবস্থা যেরূপ হইল, তাহার বর্ণনা অসাধ্য। সঙ্গিগণ প্রাণে নষ্ট হইয়া থাকিবেক, এরূপ সন্দেহে পরিতাপযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু আপনার বিপন্ন অবস্থার সমালোচনায় সে শোক শীঘ্র বিস্মৃত হইলেন। বিশেষ যখন মনে হইতে লাগিল যে, হয়ত সঙ্গীরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তখন ক্রোধের বেগে শোক দূর হইতে লাগিল।" অষ্টম সংস্করণে এই চতুর্থ অনুচ্ছেদ অংশটি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে। পরিত্যক্ত হওয়ার সম্ভাব্য কারণ ও শিল্পগত তাৎপর্য—উদ্ধৃত অংশের ঠিক পূর্ববর্তী বাক্যটিতে— "তখন নবকুমারের প্রতীতি হইল যে, হয় জলোচ্ছ্বাসসম্ভূত তরঙ্গে নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে, নচেৎ সঙ্গিগণ তাঁহাকে এই বিজনে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।"— দেখা যায়, নবকুমারকে পরিত্যাগের আনুমানিক দুটি কারণই এখানে ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং মানসিক প্রতিক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ অবাঞ্ছিত, তাই পরিত্যক্ত। নৌকার অনুসন্ধান ও ব্যর্থতার দুঃখ নবকুমারের দুর্ভাগ্যের কারণ এমন ব্যঞ্জনা কষ্টকল্পিত নয়। নবকুমারকে নায়ক চরিত্রের উপযুক্ত করে গড়ে তোলবার প্রয়োজনে এ জাতীয় মানসিক হতাশা ও ক্রোধকে বর্জন করাই ভালো এমন বিবেচনাও অসঙ্গত নয়।

সঙ্গীদের 'বিজনে' পরিত্যাগ করে যাওয়ার মধ্যে সম্ভাব্য দু'টি ইঙ্গিত আছে—(ক) কোন কারণে পরিত্যাগ করে যেতে বাধ্য হয়েছে, অথবা (খ) ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করে গিয়েছে। এই দ্বিবিধ কার্য-কারণসূত্রের অবতারণা বঙ্কিম পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে করেছেন, তাই অষ্টম সংস্করণে পুনরুক্তি দোষের কারণেও পরিত্যক্ত হতে পারে। চরিত্র-নির্মাণে ও কাহিনী বর্ণনায় 'সংহতি' অবশ্যকাম্য। ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারের শিল্প-কৌশলের অভিন্নতাও লক্ষণীয়—বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্রে আমরা নাট্যসুলভ বাক্-নির্মিতি ও সংক্ষিপ্ততা বা ব্যঞ্জনাধর্মিতা লক্ষ্য করি তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসের বিভিন্ন সংলাপে ও বর্ণনায়। তাঁর শৈল্পিক চেতনা has only a few moments at his commands and therefore he must be sparing and economic in his utilization of words. **(The Theory of Drama**—Allardyce Nicoll)

প্রথম খণ্ড / ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: প্রথম সংস্করণে তৃতীয় অনুচ্ছেদের শেষাংশে ছিল— "জাগতীয় পদার্থ বা ঘটনা সকলের সম্বন্ধ বিচারাকাঙ্ক্ষী চিত্তমাত্রেরই এক এক দিন কোন বিচিত্র ঘটনায় চমৎকার হেতুক মনোবৃত্তিসকল নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে; পূর্ব্বের যাবতীয় স্থিরসিদ্ধান্ত সকল উন্মূলিত হয়। নবকুমারের তাহাই হইল। সুতরাং তিনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া যে নিশ্চেষ্ট হইবেন, তাহার বিচিত্র কি?" অংশটি পরিত্যক্ত হয়েছে বক্তব্যের সঙ্গতি সাধনের জন্য। "দ্বার রুদ্ধ করিয়া .....নিশ্চেষ্ট"— এ বর্ণনার সঙ্গে পরবর্তী পংক্তি "সায়ংকৃত্য সমাপনান্তে তণ্ডুল গুলি কুটীর মধ্যে প্রাপ্ত এক মৃৎপাত্রে সিদ্ধ করিয়া আত্মসাৎ করিলেন" বৈপরীত্যের সৃষ্টি করেছে। সুতরাং বিরুদ্ধ "নিশ্চেষ্ট"—অংশটি পরিত্যাগ করে কাহিনীর যুক্তিসঙ্গত ধারাবাহিকতা যেমন অক্ষুণ্ণ রেখেছেন তিনি, তেমনি চরিত্র বর্ণনার সঙ্গতি বিধানও করেছেন। ত্রুটিহীন শিল্পকর্মের নিদর্শন হিসেবে পরিত্যক্ত বাক্যগুলির অপ্রয়োজনীয়তা স্বীকার্য। চরিত্রের কার্যকলাপের অসঙ্গতি-দোষও এ বর্জনের দ্বারা দূরীভূত হয়েছে।

প্রথম খণ্ড / ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: "সৈকতের মধ্যস্থানে নীত হইয়া ... তাঁহাকে শব হইতে হইবে।"—অনুচ্ছেদের শেষাংশের একটি বাক্য পরিত্যক্ত হয়েছে। বাক্যটি ছিল— "লোকে যখন ইতিকর্ত্তব্য স্থির না করিতে পারে, তখন তাহাদিগকে যে দিকে প্রথম আহূত করা যায়, সেই

কেই প্রবৃত্ত হয়।" (প্রথম সংস্করণ)। বাক্যটির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য নয়—নবকুমারের নিরুপায় বস্থা ও কাপালিকের "মত্ত হস্তীর বল" পরবর্তী অনুচ্ছেদে চমৎকারভাবে ব্যক্ত হয়েছে। ভাবানুষঙ্গে াহিনী বর্ণনা চিত্তাকর্ষক। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে মানব-চরিত্রের স্বভাব বর্ণনা করে নবকুমারের মোহমুগ্ধ াবের অনুষঙ্গ রচনার দ্বারা মানব জীবনদর্শনের প্রসঙ্গ উত্থাপন সঙ্গত নয় বিবেচনায় পরিত্যক্ত। ছাট-খাট ভুলভ্রান্তির সংশোধনেও বঙ্কিমচন্দ্রের তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল দেখা যায়।

প্রথম খণ্ড / অষ্টম পরিচ্ছেদ : প্রথম সংস্করণে প্রথম অনুচ্ছেদের তৃতীয় পংক্তিতে ছিল—কিন্তু অন্ধকারে বনমধ্যে রমণীকে সকল সময় দেখা যায় না; যুবতী একদিকে ধাবমান হইলে, বকুমার অন্যদিকে যান, রমণী কহিলেন, 'আমার অঞ্চল ধর।' নবকুমার তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া লিলেন।" এই বাক্যগুলি পরিত্যাগ করে সংযোজিত করেন— "...উপায় নাই। মনে মনে াবিলেন, 'এও কপালে ছিল!' নবকুমার জানিতেন না যে, বাঙালী অবস্থার বশীভূত, অবস্থা াঙালীর বশীভূত হয় না। জানিলে এ দুঃখ কবিতেন না।" প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কাপালিকের নুসরণকারী নবকুমারকে "পলায়ন কর," পরে "এখনও পালাও" এবং সব শেষে—"পলায়ন র; আমার পশ্চাৎ আইস, পথ দেখাইয়া দিতেছি।"—ইত্যাদি আহ্বান ও পথ-নির্দেশ নবকুমারকে পর্শ না করেই সংঘটিত হয়েছিল। প্রথম সংস্করণের বর্জিত অংশটি কপালকুণ্ডলার বন্যদেবীমূর্ত্তির রিপন্থী ছিল। অরণ্যবাসিনী নারীর সামাজিক লোকলজ্জা থাকার কথা নয়—কপালকুণ্ডলার তা লও না। সুতরাং নবকুমারকে অঞ্চল ধরে তার অনুসরণ করতে বলার মধ্যেও অসঙ্গতি নেই। ন্তু, চিত্রটি বহস্যময়ী নারীর রহস্যময় মোহিনীমূর্তির বিরোধী। বাস্তববুদ্ধি থেকে নারীর অঞ্চল বে পুরুষের অনুগমন (এবং সে পুরুষ নব-পরিচিত) দৃষ্টিকটু এবং পূর্ব-পরিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। ছাড়া শিল্পসৃষ্টির দুর্বল নিদর্শন বলেও পরিত্যক্ত হয়ে থাকতে পারে। সংযুক্ত বাক্য-তিনটির মধ্যে বকুমারের দুঃখবোধকে বাঙালীয়ানায় দীক্ষিত করে প্রকাশ করেছেন গ্রন্থকার। বাঙালী অবস্থাব শীভূত ইত্যাদি অংশে বাঙালীর স্বভাব-ধর্মের প্রতি তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত আছে। বক্তব্য সংক্ষিপ্ত ন্তু ব্যঞ্জনাধর্মী।

প্রথম খণ্ড / অষ্টম পরিচ্ছেদ : কি জন্য প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহা জান না"—অধিকারীর ই অভিমতের পরবর্তী অংশ পরিত্যক্ত হয়েছে— "স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ না করিলে যে তান্ত্রিক দ্ধ হয় না, তাহা তুমি জান না। আমিও তন্ত্রাদি পাঠ করিয়াছি। মা জগদম্বা জগতের মাতা। নি সতীর সতীত্ব—সতীপ্রধানা। ইনি সতীত্বনাশসংযুক্ত পূজা কখন গ্রহণ করেন না। এইজন্যেই মামি মহাপুরুষের অনভিমত সাধিতেছি। তুমি পলায়ন করিলে কদাপি কৃতঘ্ন হইবে না। কেবল পর্যন্ত সিদ্ধির সময় উপস্থিত হয় নাই বলিয়া তুমি রক্ষা পাইয়াছ। আজি তুমি যে কার্য্য করিয়াছ—াহাতে প্রাণেরও আশঙ্কা। এইজন্য বলিতেছি পলায়ন কর। ভবানীরও এই আজ্ঞা। অতএব যাও। মামার এখানে রাখিবার উপায় থাকিলে রাখিতাম; কিন্তু সে ভরসা যে নাই, তাহা ত জান।" ই অংশটুকুতে তান্ত্রিক মতবাদের কিছু ভ্রান্তি ছিল। পঞ্চ-'ম'-কার তত্ত্বানুযায়ী (মদ্য, মাংস, ৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন) বীরাচারী সাধক রাজসিক গুণে (রজ) পার্থিব কামনা-বাসনানির্ভর প্রবৃত্তিমুখীন চতনা থেকে মুক্ত হয়ে নিবৃত্তির অন্তর্লীন সাধনায় দীক্ষিত হবেন এবং 'সাত্ত্বিক ভাবে' আরোহণ রবেন, এটাই ছিল শুদ্ধ সাধকের কাছে বাঞ্ছিত সাধন প্রক্রিয়া। পঞ্চ-'ম' কারের অন্তর্নিহিত াৎপর্য—ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে নিঃসৃত অমৃত ধারা পান করে যিনি আবিষ্ট হন, তিনিই 'মদ্য'সাধক; যিনি মৌনী তিনিই 'মাংস'-সাধক; ইড়া-পিঙ্গলারূপ শ্বাস প্রশ্বাসকে যিনি যোগবলে নিয়ন্ত্রণ করেন তিনিই 'মৎস'-সাধক; শিবপুরে যে আত্মা অবস্থান করেন, তার কুণ্ডলীকৃত অবস্থা কোটি কোটি

চন্দ্র-সূর্যের মুদ্রারূপী এমনভাব যে সাধকের অন্তরে আসে তিনিই 'মুদ্রা'-সাধক; আর যিনি কুলকুণ্ডলিনী বা আদ্যাশক্তিকে ষট্‌চক্রপ্রক্রিয়ায় পরমাত্মা শিবের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে দিব্যভাবে ভাবিত হন, তিনিই 'মৈথুন' সাধক। সুতরাং তান্ত্রিক মতবাদের দিক থেকে "স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশের" সঙ্গে "সিদ্ধির" কোন যোগ নেই। বরং পঞ্চ-'ম' কারের 'মৈথুন' প্রসঙ্গের বাহ্যিক অপপ্রয়োগে সাধনার ব্যর্থতা সূচিত হয়। অবশ্য কাপালিকের সাধনাও ব্যর্থ ছিল।

সুতরাং অংশটি পরিত্যক্ত হয়ে নতুন দু'টি বাক্য যুক্ত হয়েছে—"এই বলিয়া অধিকারী তান্ত্রিক সাধনে স্ত্রীলোকের যে সম্বন্ধ, তাহা অস্পষ্ট রকম কপালকুণ্ডলাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কপালকুণ্ডলা তাহা কিছু বুঝিল না, কিন্তু তাহার বড় ভয় হইল" সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য কাপালিকের স্থূল তান্ত্রিক সাধনার ইঙ্গিতসহ অধিকারীর স্নেহপ্রবণ মনটির আশঙ্কা এতে প্রতিফলিত বক্তব্যের সংহতি, কাহিনী বর্ণনার গতিধারা অহেতুক তত্ত্ব-সর্বস্বতায় মন্থর না হয়ে সংযোজিত অংশের দ্বারা গতিমুখী হয়েছে।

প্রথম খণ্ড / নবম পরিচ্ছেদ: প্রথম চারটি পংক্তির পর অষ্টম সংস্করণে পরিত্যক্ত অংশ একটি সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদ— "পুরুষ পাঠক, আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। আপনি যদি কপালকুণ্ডলাকে সমুদ্রতীরে দেখিতেন, তবে একদিনে তৎপ্রতি আসক্তচিত্ত হইতেন কি না, বলিতে পারি না প্রাণরক্ষা মাত্র উপকারের অনুরোধে তাহার পাণিগ্রহণে সম্মত হইতেন কিনা বলিতে পারি না বোধ করি নহে, কেন না, কপালকুণ্ডলা রুক্ষকেশী সন্ন্যাসিনী মাত্র। কিন্তু নবকুমার পরের জন্য কাষ্ঠাহরণ করেন;—এ পৃথিবীর কাঠুরিয়ারা সন্ন্যাসিনীদিগের মর্ম্ম বুঝে; কৃতঘ্ন সহযাত্রীদিগের জন্য নবকুমার মাথায় কাষ্ঠভার বহিয়াছিলেন,—কৃতোপকারিণী সন্ন্যাসিনীর জন্য যে অতুল রূপরাশি হৃদয়ে বহিতে চাহিবেন, তাহার বিচিত্র কি?" উদ্ধৃত অংশে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়—(ক) পাঠককে সম্বোধন করে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের প্রসঙ্গ বলা; (খ) কপালকুণ্ডলার রূপ-বর্ণনা; (গ) নবকুমারের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য ও কপালকুণ্ডলার প্রতি আসক্তির কারণ ব্যাখ্যা। চিন্তাশীল লেখক বঙ্কিমের আলোচ্য অংশটি পরিত্যাগের সম্ভাব্য কারণ—পাঠককে সম্বোধন করে এই প্রসঙ্গে উপস্থাপনায় উপন্যাসের কাহিনী, চরিত্র ও সংলাপের গতি-ভঙ্গের সম্ভাবনা; কপালকুণ্ডলার রূপ-বর্ণনায় যে মোহিনী মূর্তির আলো আঁধারি রহস্যময়তা ইতিপূর্বেই অভিব্যক্ত, তার পুনরুল্লেখ অপ্রয়োজনীয় এবং "রুক্ষকেশী সন্ন্যাসিনী" রূপটি পূর্ব-ভাবের পরিপন্থী; নবকুমারের কাষ্ঠভার-বহনের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আকারেই দেওয়া হয়েছে তাই এখানে তার উল্লেখ এবং কপালকুণ্ডলার জন্য নবকুমারের কাষ্ঠভার বহন সদৃশ "অতুল রূপরাশি" হৃদয়ে বহন—ভাবগত দুর্বলতার প্রতীক বলেই পরিত্যক্ত। তাছাড়া, এই অংশের গল্পরসকে দ্রুত ক্রম পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনে বঙ্কিমচন্দ্র অনুচ্ছেদটি বর্জন করে থাকবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড / প্রথম পরিচ্ছেদ: এই পরিচ্ছেদের প্রথমাংশের কয়েকটি পংক্তি পরিত্যক্ত— "কোন জার্ম্মান লেখক বলিয়াছেন, 'মনুষ্যের জীবন কাব্যবিশেষ।' কপালকুণ্ডলার জীবন-কাব্যের এক সর্গ সমাপ্ত হইল। পরে কি হইবে?"

যদি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনুষ্য অন্ধ না হইত, তবে সংসারযাত্রা একেবারে সুখহীন হইত। ভাবি বিপদের সম্ভাবনা নিশ্চিত দেখিতে পাইয়া, কোন সুখেই কেহ প্রবৃত্ত হইত না। মিল্‌টন যদি জানিতে তিনি অন্ধ হইবেন, তবে কখন বিদ্যাভ্যাস করিতেন না; শাহাজাহান যদি জানিতেন, ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে প্রাচীন বয়সে কারাবদ্ধ রাখিবেন, তবে তিনি কখন দিল্লীর সিংহাসন স্পর্শ করিতে না। ভাস্করাচার্য্য যদি জানিতেন যে, তাঁহার একমাত্র কন্যা চিরবিধবা হইবে, তবে তিনি কখ

রপরিগ্রহ করিতেন না। নবকুমার বা তাঁহার নূতন পত্নী যদি জানিতেন যে, তাঁহাদিগের বিবাহে ফলোৎপত্তি হইবে, তবে কখন তাঁহাদিগের বিবাহ হইত না" দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র অষ্টম সংস্করণে পন্যাসিক সত্তার প্রতি আস্থাশীল। উপন্যাসের গল্পরস ও ঘটনা-সংস্থানগত মুহূর্তগুলি আবশ্যিকভাবে ত বর্ণনাব অপেক্ষা রাখে। বঙ্কিমের মধ্যে গল্প বলার দ্রুত ভঙ্গিমা, নাটকীয় চমৎকারিত্ব সৃষ্টির ভিনব প্রয়োগ কৌশল উত্তরকালের রচিত উপন্যাসে খুব বেশী করে দেখা গিয়েছিল। সুতরাং ৮৯২ সালেব এই সংস্করণে সেই প্রবণতা যে অনেকবেশী পরিণত হবে, এটাইতো স্বাভাবিক। নুষ ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নয় তাই এই দর্শনের পরে অধিক গুরুত্ব দিয়ে কপালকুণ্ডলার বিবাহিত জীবনের ;খময় দিককে স্থির-প্রত্যয়ে জানানো উপন্যাসের কৌতূহল সৃষ্টির পক্ষে ক্ষতিকব। কালী প্রতিমার দপদ্মে বিল্বপত্র স্থাপন ও "পত্রটি পড়িয়া" যাওয়ার প্রসঙ্গ পাঠকের উৎকণ্ঠা ও কপালকুণ্ডলার বিন-পরিণাম জানার আগ্রহকে উদ্রিক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং রসহানি ঘটার সম্ভাবনায় ঙ্কিমচন্দ্র উদ্ধৃত অংশটি বাতিল করেছেন বলে সিদ্ধান্ত করা যায়।

দ্বিতীয় খণ্ড / দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: প্রথম অনুচ্ছেদের পূর্ববর্তী অংশ বর্জিত হয়েছে—"আমি লিয়াছি, নবকুমারের সঙ্গিনী অসামান্য রূপসী। এ স্থলে, যদি প্রচলিত প্রথানুসাবে তাঁহার রূপবর্ণনে বৃত্ত না হই, তবে পুরুষ পাঠকেরা বড়ই ক্ষুণ্ণ হইবেন। আর যাহাবা স্বয়ং সুন্দরী, তাঁহাবা পড়িয়া লিবেন, 'তবে বুঝি মাগী পাঁচপাঁচি!' সুতরাং এই কামিনীর রূপ-বর্ণনে আমাকে প্রবৃত্ত হইতে ইল। কিন্তু কি লইয়াই বা তাঁহাব বর্ণনা করি? কখন কখন বটতলার মা সরস্বতী আমার স্কন্ধে পিয়া থাকেন। তাঁহাব অনুগ্রহে কতকগুলি ফলমূলে ডালি সাজাইয়া রূপ বর্ণনার কার্য্য এক প্রকার াধন করিতে পারি, কিন্তু পাছে দাড়িম্ব, রম্ভা ইত্যাদি নাম শুনিয়া পাঠক মহাশয়ের জঠরানল লিয়া ওঠে, এই আশঙ্কায় সে চেষ্টায় বিরত রহিলাম।" —রচনাংশের হাস্যরস পরিণত শিল্প-রসিক ঙ্কিমের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি পববর্তীকালে। বক্তব্য অনেকটাই স্থূল এবং হাসির উপকরণ র্জিত রুচি সম্পন্ন মনে হয়নি তাঁব। তখনকাব সময়ে বটতলার ছাপা রচনায় / গল্পকথায় আদিরসের াহুল্য ছিল। 'বটতলার মা সরস্বতী আমার স্কন্ধে চাপিয়া থাকেন' সঙ্কেতটি মোটা দাগের বচনা, াই শিল্পভাবনায় পরিত্যক্ত। সুতরাং 'কামিনী'র রূপবর্ণনা বটতলার অনুরূপ না করে, ঐজাতীয় চনার প্রতি কটাক্ষ ব্যতিরেকে মতিবিবিব রূপ সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে এই পরিচ্ছেদেব দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদে। বাহুল্য বিবেচনায় ও অংশটির অর্থ দ্যোতনা রুচিকর না হতে পারে সম্ভাবনায়, স্তব্যগুলি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

দ্বিতীয় খণ্ড / তৃতীয় পরিচ্ছেদ: (১) "নবকুমার মতিবিবির নিকট ..." —অনুচ্ছেদের নবকুমারেব চক্ষু অস্থির হইল"— বাক্যেব পর প্রথম সংস্করণে ছিল—" অধিকাংশ স্ত্রীলোক হুস্বর্ণখচিত হইলে প্রায় কিছু শ্রীহীনা হয়;—অনেকেই সজ্জিতা পুত্তলিকার দশা প্রাপ্ত হয়েন;— কন্তু মতিবিবিতে সে শ্রীহীনতা বা দশা দৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল না।" (২) এছাড়া, "ক্ষণেক রে মতি আপন অঙ্গ হইতে অলঙ্কাররাশি মোচন করিতে লাগিলেন" অনুচ্ছেদের এই প্রথম াক্যটির পরের— "নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিতেছ?" মতি কহিলেন, "দেখুন া।"— অংশটি বর্জিত। প্রথম পরিত্যক্ত বাক্যটিতে কাহিনী বা মতিবিবি চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিহীন ন্তব্য যুক্ত ছিল। বাক্যের নঞর্থক ভাব প্রথম অংশে আছে, আবার মতিবিবিকে অস্ত্যর্থক সিদ্ধান্তে ুক্ত করে অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। বরং পরবর্তী বর্ণনা ও সংলাপে একটা সরসতা ও স্বচ্ছ ভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং রসহানি ঘটতে পারে, এমন বাক্যের বক্রতা াঠিক কারণেই পরিত্যক্ত। দ্বিতীয় বাক্যটিতে নবকুমারের জিজ্ঞাসা পুনরুক্তি দোষ ঘটিয়েছিল বলে

লেখক বাতিল করেছেন। কারণ, এই অনুচ্ছেদের শেষ পংক্তিতে— "নবকুমার কহিতে লাগিলেন, 'ও কি হইতেছে?' মতিতাহারকোন উত্তর করিলেন না।"— একই কথার প্রতিধ্বনি আছে।

দ্বিতীয় খণ্ড / ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: "শ্যামাসুন্দরীব মুখকান্তি গম্ভীর হইল... তবে ফুটিয়া সুখ হইত—" অনুচ্ছেদের পরবর্তী এই অংশ বঙ্কিম শেষ সংস্করণে বাতিল করেছেন—

"শ্যামা কুলীনপত্নী।

আমরাও এই অবকাশে পাঠক মহাশয়কে বলিয়া রাখি যে, ফুলের ফুটিয়াই সুখ। পুষ্পরস পুষ্পগন্ধ, বিতরণই তার সুখ। আদান প্রদানই পৃথিবীর সুখের মূল; তৃতীয় মূল নাই। এ কথা কেবল স্নেহ সম্বন্ধেই যে সত্য, এমত নহে। ধন, মান, সম্পদ, মহিমা, বিদ্যা, বুদ্ধি, সকলেরই সুখদানশক্তি কেবল আদান প্রদান ঘটিত। মৃন্ময়ী বনমধ্যে থাকিয়া এ কথা কখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই—অতএব কথার কোন উত্তর দিলেন না।" ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষাংশ সংলাপপ্রধান হওয়ায় কথোকথনের নাটকীয়তা আগাগোড়া রক্ষিত। শ্যামাসুন্দরী ও মৃন্ময়ীর সংলাপে উভয়চরিত্রের স্বভাব প্রকৃতির ইঙ্গিত সমেত গতিশীল কথাবার্তায় কুলীন পত্নী শ্যামার অন্তর্বেদনা ও কপালকুণ্ডলার প্রতি দরদের ভাব স্পষ্ট। নিরাসক্ত ঔদাসীন্যের ভাবযুক্ত মৃন্ময়ীর চরিত্রাভাসও এই অনুচ্ছেদে লভ্য—একই সঙ্গে তার অরণ্যপ্রীতি ও স্বভাব সম্পর্কে আলোকপাত আছে। নাট্যকারের মত বঙ্কিম যেন এখানে সংলাপের সম্পূর্ণ সঙ্গতি-বিধান (a complete harmony) করেছেন। তাছাড়া, রচনাশৈলীতে কথাবস্তুর অন্তর্নিহিত সংহতিও রক্ষিত হয়েছে (Skilfully blended with the action revealed before us)। তাই সংলাপের ধারাবাহিকতায় বর্ণনাত্মক রীতি পরিত্যক্ত।

তৃতীয় খণ্ড / চতুর্থ পরিচ্ছেদ: প্রথম সংস্করণের পাঠ ছিল— "সে যাহা হউক, এক্ষণে দাসী বিদায় হয়। পামরীর এমন কোন সাধ নাই যে, জাহাঁগীরশাহের ইচ্ছায় নিবারণ না হয়।" (পরিচ্ছেদের শেষ অনুচ্ছেদের পূর্ববর্তী— "কণ্টক হইয়া থাকিব"—অংশের পর) অষ্টম সংস্করণে বর্জিত হয়েছে। শেষ অনুচ্ছেদে "লুৎফ-উন্নিসা আত্মমন্দিরে প্রস্থান করিলেন"— অংশে বিদায়ের প্রসঙ্গ আছে। "রত্নসিংহাসনতলে কেন কণ্টক হইয়া থাকিব"—বক্তব্যের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের সঙ্গে "পামরীর এমন কোন সাধ নাই যে, জাহাঁগীর শাহের ইচ্ছায় নিবারণ না হয়"—বক্তব্যের তেমন সঙ্গতি নেই। এই দুটি বাক্য বাতিল করার মধ্যে লেখকের বিচারবোধের সঙ্গে অতিরিক্ততা-বর্জনের সচেতনতা দেখা যায়।

তৃতীয় খণ্ড / পঞ্চম পরিচ্ছেদ: পরিচ্ছেদের শেষাংশে—" এও ত কিছু বুঝিতে পারিলাম না"— পেষমনের এই উক্তির পরবর্তী বেশ কিছু অংশ বঙ্কিম পরিত্যাগ করেছেন—

লু। এ হীরার অঙ্গুরী তোমায় কে দিয়াছে?

পে। শাহ্‌বাজ খাঁ।

লু। আর সেই পান্নার কণ্ঠী?

পে। আজিম খাঁ।

লু। আর কে কে তোমায় অলঙ্কার দিয়াছে?

পে। (হাসিয়া) করীম খাঁ, কোকলতাব, রাজা জীবনসিংহ, রাজা প্রতাপাদিত্য, মুসা খাঁ—কত লোক দিয়াছে কাহার নাম করিব। এখন যা পরিয়া আগ্রার পরিচারিকামণ্ডলে প্রাধান্য স্বীকার করাই, সে স্বয়ং জাহাঙ্গীরের দান।

লু। ইহার মধ্যে কাহাকে আমি ভাল বাসিতাম?

পে। (হাসিয়া) সকলকেই।

লু। এ ত গেল মুখের কথা। মনের কথা কি?

—এখানে লুৎফ-উন্নিসার আগ্রায় 'দুরন্ত প্রবৃত্তির' প্রশ্রয়ের কথা বিবৃত হয়েছে। তার ব্যাভিচারের পরিচয় ইঙ্গিতধর্মিতায় "ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণে আগুনের মধ্যে" বেড়ানোর প্রসঙ্গ আছে। পরিত্যক্ত অংশের সংক্ষিপ্ত সংযোজনায় একটি বাক্যকে অনিবার্য করে তুলেছেন বঙ্কিম—"লু। আমি এই আগ্রায় কখনও কাহাকে ভালবাসিয়াছি?" (পূর্ববর্তী পরিত্যক্ত অংশের পরবর্তী সংযোজিত বাক্য)। বক্তব্যের সংহতি ও সংক্ষিপ্ততা এখানে ব্যঞ্জনাধর্মী হয়েছে বলা যায়।

চতুর্থ খণ্ড / প্রথম পরিচ্ছেদ: এই পরিচ্ছেদের পূর্ব্বের একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ, যা প্রথম সংস্করণে ছিল, বঙ্কিম অষ্টম বা শেষ সংস্করণে বাদ দিয়েছেন। সমগ্র পরিচ্ছেদটি এরকম ছিল—

"গ্রন্থ খণ্ডারম্ভে

Real Fatalism is of two kinds. Pure or Asiatic Fatalism; The Fatalism of OEdipus, holds that our actions do not depend upon our desires. Whatever our wishes may be, a superior power, or an abstract Destiny, will overrule them and couple us to act, not as we desire, but in the manner predestined. The other kind modified Fatalism I will call it, holds that our actions are determined by our will, our will by our desires, and our desires by the joint influence of the motives presented to us and of our individual character. —J.S.Mill.

এত দূরে এ আখ্যায়িকা হৃদয়ঙ্গামিত্ব প্রাপ্ত হইল। চিত্রকর চিত্তপুত্তলী লিখিতে অগ্রে হস্ত পাদাদির রেখানিচয় পৃথক্ পৃথক্ করিয়া অঙ্কিত করে, শেষে তৎসমুদয় পরস্পর সংলগ্ন করিয়া ছায়ালোকভিন্নতা লিখে। আমরা এ পর্য্যন্ত এই মানসচিত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ রেখাঙ্কিত করিয়াছি। এক্ষণে তৎসমুদায় পরস্পর সংলগ্ন করিয়া তাহার ছায়ালোক সন্নিবেশ করিব।

রবিকরাকৃষ্ট বারিবাষ্পে মেঘের জন্ম। দিন দিন তিল তিল করিয়া, মেঘ সঞ্চারের আয়োজন হইতে থাকে; তখন মেঘ কাহারও লক্ষ্য হয় না; কেহ মেঘ মনে করে না; শেষে অকস্মাৎ একেবারে পৃথিবী ছায়ান্ধকারময়ী করিয়া বজ্রপাত করে। যে মেঘে অকস্মাৎ কপালকুণ্ডলার জীবনযাত্রা গাহমান হইল, আমরা এতদিন তিল তিল করিয়া তাহার বরিবাষ্প সঞ্চয় করিতেছিলাম।

পাঠক মহাশয় 'অদৃষ্ট' স্বীকার করেন? ললাট-লিপির কথা বলিতেছি না, সে ত অলস ব্যক্তির আত্মপ্রবোধ জন্য কল্পিত গল্পমাত্র। কিন্তু কখন কখন যে, কোন ভবিষ্য ঘটনার জন্য পূর্ব্বাবধি এরূপ আয়োজন হইয়া আইসে, তৎসিদ্ধিসূচক কার্য্য সকল এরূপ দুর্দ্দমনীয় বলে সম্পন্ন হয় যে, মানুষিক শক্তি তাহার নিবারণে অসমর্থ হয়, ইহা তিনি স্বীকার করেন কি না? সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে দূরদর্শিগণ কর্ত্তৃক ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। এই অদৃষ্ট য়ুনানী নাটকাবলির প্রাণ; সর্ব্বজ্ঞ সেক্‌স্‌পীয়রের মাক্‌বেথের আধার; ওয়াল্টার স্কটের "ব্রাইড্ অব লেমার মুরে" ইহার ছায়াপাত হইয়াছে; গেটে প্রভৃতি জর্ম্মান কবিগুরুগণ ইহার স্পষ্টতঃ সমালোচনা করিয়াছেন। রূপান্তরে, 'ফেট'ও 'নেসেসিটি' নাম ধারণ করিয়া ইহা ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে প্রধান মতভেদের কারণ হইয়াছে।

অস্মদেশে এই 'অদৃষ্ট' জনসমাজে বিলক্ষণ পরিচিত। যে কবিগুরু কুরুকুলসংহার কল্পনা করিয়াছিলেন, তিনি এই মোহমন্ত্রে প্রকৃষ্টরূপে দীক্ষিত; কৌরবপাণ্ডবের বাল্যক্রীড়াবধি এই করালছায়া কুরুশিরে বিদ্যমান; শ্রীকৃষ্ণ ইহার অবতারস্বরূপ। "যদাশ্রৌষং জ্যাতুষাদ্বেশ্মনস্তান্" ইত্যাদি ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে কবি স্বয়ং ইহা প্রাঞ্জলীকৃত করিয়াছেন। দার্শনিকদিগের মধ্যে অদৃষ্টবাদীর অভাব নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এই অদৃষ্টবাদে পরিপূর্ণ। অধুনা "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি" ইতি কবিতার্দ্ধ পাঠ করিয়া অনেকে অদৃষ্টের পূজা করেন। অপর সকলে "কপাল!" বলিয়া নিশ্চিত থাকেন।

অদৃষ্টের তাৎপর্য্য যে কোন দৈব বা অনৈসর্গিক শক্তিতে অস্মদাদির কার্য্য সকলকে গতিবিশেষ প্রাপ্ত করায়, এমন আমি বলিতেছি না। অনীশ্বরবাদীও অদৃষ্ট স্বীকার করিতে পারেন। সাংসাবিক ঘটনাপরম্পরা ভৌতিক নিয়ম ও মনুষ্যচরিত্রেব অনিবার্য ফল; মনুষ্যচরিত্র মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল; সুতরাং অদৃষ্ট মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল; কিন্তু সেই সকল নিয়ম মনুষ্যের জ্ঞানাতীত বলিয়া অদৃষ্ট নাম ধারণ করিয়াছে। (কবিদিগের "Destiny" দার্শনিকদিগের "Fate" এক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি। ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি; ভিন্ন ভিন্ন নাম বলিতেছি না)।

কোন কোন পাঠক এ গ্রন্থশেষ পাঠ করিয়া ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। বলিতে পারেন, "এরূপ সমাপ্তি সুখের হইল না; গ্রন্থকার অন্যরূপ করিতে পাবিতেন।" ইহার উত্তর, "অদৃষ্টের গতি। অদৃষ্ট কে খণ্ডাইতে পারে? গ্রন্থকারের সাধ্য নহে। গ্রন্থাবম্ভে যেখানে যে বীজ বপন হইয়াছে, সেইখানে সেই বীজের ফল ফলিবে। তদ্বিপরীতে সত্যের বিঘ্ন ঘটিবে।"

এক্ষণে আমরা অদৃষ্টগতির অনুগামী হই। সূত্র প্রস্তুত হইয়াছে; গ্রন্থিবন্ধন করি।"

বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা' পরিকল্পনায় অদৃষ্টবাদ বা নিয়তিবাদকে (Nemesis) যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন—এমন কি এ উপন্যাসের মর্মান্তিক রস-পরিণামের নেপথ্যে অদৃষ্টবাদের অনিবার্য প্রভাব আছে। ভৈরবীর নির্দেশ অবশ্যই অতিপ্রাকৃত ব্যাপার কপালকুণ্ডলাব জীবনে তার অসামান্য প্রভাবেব প্রসঙ্গ সমগ্র কাহিনীবৃত্তে জড়িত হয়ে আছে। কাপালিক-সংসর্গে শিশুকাল থেকে ষোলো বৎসর পর্যন্ত অরণ্যে লালিত কোন স্ত্রীলোক বিবাহের পর সমাজসংসারে অনুবর্তী হয় কিনা এই প্রশ্নের স্থির প্রত্যয় 'হয় না'—এই 'ভাব' কপালকুণ্ডলা-উপন্যাসে আছে এবং ঔপন্যাসিক বঙ্কিম কপালের ট্রাজিক পরিণতির সঙ্গে অদৃষ্টবাদকে যুক্ত করেছিলেন সম্ভবতঃ অন্তরের যুক্তিবাদকে বিশ্বাসযোগ্যতায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনে। প্রথম সংস্করণে বঙ্কিম কপালকুণ্ডলাব মৃত্যুর ইঙ্গিত দিলেও কাপালিক কর্তৃক নবকুমারের প্রাণরক্ষার ব্যাপারটি সেখানে বর্ণিত হয়েছে। কার্য্য-কারণ সূত্রে কাহিনী বা চরিত্র রূপায়ণের জন্য লেখকের অদৃষ্টবাদ চিন্তা সন্দেহ নেই।

অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে বঙ্কিমেব চিন্তাকে পীড়িত করেছিল "অদৃষ্টবাদের লীলা" প্রভাবেব প্রাসঙ্গিকতা। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের অনুবর্তী হয়ে লেখক প্রথম সংস্করণের চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদটি রচনা করেন। এখানে তাঁর উত্থাপিত বক্তব্যের সারাংশ এভাবে বর্ণিত হতে পারে—(১) ইউরোপের অন্যতম যুক্তিবাদী John Stuart Mill -এর অনুসরণে তিনিও বিশ্বাস করেন, আমাদের ইচ্ছার দ্বারা কার্য্যের ফলপ্রাপ্তি হয় না—তাই abstract Destiny আমাদেব জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। (২) চতুর্থ খণ্ডের প্রথম অনুচ্ছেদে উপন্যাসের খণ্ড খণ্ড চিত্রের ঐক্য বিধানের সংকল্প, বিচ্ছিন্ন চিত্রের সমন্বয়ের প্রয়াস ও চতুর্থ খণ্ড যে এই ঐক্য-গ্রন্থনায় রচিত হবে, তাব ইঙ্গিত। (৩) প্রকৃতি চিত্রণে অলক্ষ্য মেঘের জমাট বাঁধা ও বারিপাতের মতো কপালের জীবনবৃত্তান্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনার দ্বারা কতকটা বিক্ষিপ্ত—তাই তার সামগ্রিক ঐক্যবিধান ও পরিণতির চিত্র অঙ্কনের এটাই ছিল প্রস্তুতি পর্ব (দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)। (৪) মানবজীবন-লীলায় অদৃষ্টবাদের প্রভাব—পরিচ্ছেদে প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপস্থাপনা (তৃতীয় অনুচ্ছেদ)। (৫) অদৃষ্টবাদের প্রমাণ আমাদের প্রাচীন কাব্যসহিত্যে বিশেষতঃ মহাভারতে ও শ্রীমদ্ভগবদগীতায় (চতুর্থ অনুচ্ছেদ)। (৬) অদৃষ্ট মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল, মনুষ্যচরিত্র ও তাই (৫ম অনুচ্ছেদ)। (৭) এই অদৃষ্টবাদের ফলাফলকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের ক্রম-পরিণতি এবং বিরুদ্ধ ভাবনার অসারতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত (৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ) (৮) চতুর্থ খণ্ডে কাহিনীর গতিধারা যে অদৃষ্টবাদের অনুগামী তা জ্ঞাপন।

প্রবন্ধধর্মী এই পরিচ্ছেদ রচনার অন্তরালে যুক্তিবাদী লেখকের বৈজ্ঞানিক মননটি ধরা পড়ে। উপন্যাসের ভাববস্তুর সঙ্গে অথবা কাহিনী ধারার ক্রম-পরিণতির জন্যে এবং কপাল চরিত্রের মর্মান্তিক

মৃত্যু ইঙ্গিতের মধ্যে প্রথম সংস্করণের এই পরিচ্ছেদটির একটা নিগূঢ় যোগ আছে, অনস্বীকার্য। কিন্তু বিবৃতিধর্মী তাত্ত্বিক প্রবন্ধের সঙ্গে উপন্যাসের বর্ণনা রীতির তেমন প্রত্যক্ষ যোগ না থাকায় বঙ্কিমচন্দ্র অষ্টম বা শেষ সংস্করণে এই অংশটি পরিত্যাগ করেছিলেন। ভাবগত-ঐক্য বজায় কাহিনী বর্ণনাই যথেষ্ট। নাটকের মত উপন্যাসেও তা প্রত্যাশিত—"The characters, then, are subordinate to the action in the sense that through the characters the playwright endeavours to elucidate, explain and illuminate a certain action." **(The Theory of Drama—N.coll).** কপালকুণ্ডলা চরিত্রের মধ্য দিয়ে অদৃষ্টবাদের লীলা চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। সুতরাং অদৃষ্টবাদের উপর স্বতন্ত্র প্রবন্ধ নির্দেশিকা রচনা অপ্রয়োজনীয়, তাই সঙ্গত কারণেই পরিত্যক্ত। ঘটনা-সংস্থান ও চরিত্রের কার্যকলাপের মধ্যে "মনুষ্যের জ্ঞানাতীত বলিয়া অদৃষ্টের" প্রভাব বর্তমান—চতুর্থ খণ্ডে তার চমৎকার বর্ণনা আছে। কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ, বর্ণনা ও ভাবের মধ্যে ঐক্য, সমন্বয় সূত্র অদৃষ্টবাদকে মূর্ত করে তুলেছে—প্রাজ্ঞ বঙ্কিমের সঙ্গত এই চিন্তা থেকে পরিচ্ছেদটি বর্জিত। এতে উপন্যাসের আঙ্গিক বিন্যাসরীতিও ত্রুটিমুক্ত হয়েছে বলেই মনে হয়।

চতুর্থ খণ্ড / নবম পরিচ্ছেদ: প্রথম সংস্করণে পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদটি থাকায় এই পরিচ্ছেদটি দশম পরিচ্ছেদ বলে গণ্য হয়েছিল। "শ্মশানভূমিতে শবভুক্ পশুগণ...ধ্বনি করিতেছিল"—প্রথম অনুচ্ছেদের শেষ পংক্তির পরে ছিল—

"শবভুক্ পক্ষিগণের বৃহৎ পক্ষসঞ্চালনের ক্বচিৎ ধ্বনি শুনা যাইতেছিল। কপালকুণ্ডলা মানসচক্ষে সেই প্রেতভূমিতে কত প্রেতিনীকে নরদেহ চর্ব্বণ করিতে দেখিতে লাগিলেন; কত পিশাচীকে কর্দ্দমোপরে সশব্দে নাচিয়া বেড়াইতে শুনিতে লাগিলেন।" অংশটি বঙ্কিমচন্দ্র পরিত্যাগ করেছিলেন সম্ভাব্য দু'টি কারণে—(১) অব্যবহিত পূর্ববর্তী পংক্তিতে যে কথা বলা হয়েছে ..."শবভুক্ পশুগণ কর্কশকণ্ঠে ক্বচিৎ ধ্বনি করিতেছিল,"—তা পরবর্তী বাক্যে দ্বিতীয়বার বলা অর্থহীন। তাছাড়া পরিবেশ রচনায় সংক্ষিপ্ততা ও শব্দের ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিত কাম্য। সেদিক থেকে অংশটি বাতিল করা সঙ্গতই হয়েছে। (২) কপালকুণ্ডলার মানসচক্ষে পিশাচী ও প্রেতিনীর বীভৎস কার্যকলাপ-দর্শন কিছুটা বাস্তব-বিরুদ্ধ ভাব ও অহেতুক। কারণ এ অনুচ্ছেদে সাধারণ ভাবে কাপালিক কেন্দ্রিক তান্ত্রিক সাধনার উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করা হয়েছে। সুতরাং একক ভাবে কপালকুণ্ডলার মানস-দর্শন অভিপ্রেত নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্ত সঠিক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

চতুর্থ খণ্ড / নবম পরিচ্ছেদ: পরিচ্ছেদের শেষ দু'টি পংক্তির পরিবর্তে প্রথম সংস্করণে নিম্নোক্ত সমাপ্তি অংশটি ছিল—

কাপালিক আসনে বসিয়া দেখিলেন, ইহাদের প্রত্যাগমনের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা বাটী প্রত্যাগমন করিলেন কিনা এই আশঙ্কায় কাপালিক আসন ত্যাগ করিয়া শ্মশানভূমির উপর দিয়া কূলে গমন করিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণেক পরে জলমধ্যে কোন পদার্থ ভাসিয়া ডুবিল দেখিলেন—বোধ হইল, যেন মনুষ্যমস্তক মনুষ্যহস্ত। লম্ফ দিয়া অনায়াসে দৃষ্ট পদার্থ কূলে তুলিলেন। দেখিলেন, এ নবকুমারের প্রায় অচৈতন্যদেহ। অনুভবে বুঝিলেন, কপালকুণ্ডলাও জলমগ্না আছেন। পুনরপি অবতরণ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পাইলেন না।

তীরে পুনরারোহণ করিয়া কাপালিক নবকুমারের চৈতন্যবিধানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নবকুমারের সংজ্ঞালাভ হইবামাত্র, নিশ্বাস সহকারে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। সে বাক্য কেবল, "মৃন্ময়ি! মৃন্ময়ি!"

কাপালিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃন্ময়ি কোথায়?" নবকুমার উত্তর করিলেন, "মৃন্ময়ি—মৃন্ময়ি—মৃন্ময়ি।"

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র অংশটি পরিত্যাগ করেছিলেন একাধিক কারণে—(১) কপালকুণ্ডলার মৃত্যু পরিণাম অদৃষ্টবাদের প্রভাবজাত হলেও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেষাংশে সংযোজিত হওয়া দরকার। (২) নবকুমারের রূপমুগ্ধতার অনিবার্য-পরিণাম প্রসঙ্গ প্রথম সংস্করণেব দৃশ্যচিত্রে বিম্বিত হতে পারে এমন অনুমান। (৩) কাপালিকের দ্বারা নবকুমারের উদ্ধারপ্রাপ্তি ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ পরিণতি হতে পারে না বিবেচনা। (৪) ইতিপূর্বেই কাপালিকের দুই হাত ভেঙ্গে যাওয়ার প্রসঙ্গ আছে। সুতরাং হস্তবিহীন তান্ত্রিকের দ্বারা নবকুমারকে জলমগ্ন অবস্থা থেকে উদ্ধার ব্যাপারটি যুক্তিসম্মত নয়। (৫) সর্বোপরি, এই জাতীয় উপসংহার সামগ্রিক কোন ব্যঞ্জনায় আভাসিত নয় এই ভাবনা। এই সমস্ত যুক্তিগ্রাহ্য কারণে সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র উদ্ধৃত অংশটি পরিত্যাগ করে নিম্নোক্ত বাক্যটি কেবল সংযোজিত করেন—

"সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে, বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?" সাহিত্যে এই সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতধর্মী সমাপ্তি প্রকৃত শিল্পরীতির উদাহরণ হতে পারে। কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে হারিয়ে যাওয়ার ব্যঞ্জনাটি অনুভব করার মত। উপন্যাস শিল্পের টেকনিক্ বা রচনা শৈলীর গুণে উপসংহারটি অনেক বেশী মনোজ্ঞ ও শিল্পসুন্দর হয়েছে সন্দেহ নেই। সুতরাং শিল্পগত প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নাটকীয় কৌতূহলকে বজায় রেখেছেন এবং সমাপ্তির অন্তর্লীন ব্যঞ্জনায় অষ্টম সংস্করণের এই সংশোধন সমৃদ্ধ হয়েছে বলা চলে।

কপালকুণ্ডলার শিল্পরস সৌন্দর্য প্রথম সংস্করণে অক্ষুন্ন থাকলেও রূপদক্ষ শিল্পীর মত বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিটি সংস্করণে সামান্য কিছু পরিমার্জন পরিবর্ধন করেছিলেন সামগ্রিক রূপকর্মের অভিন্ন রসদৃষ্টিতে। চতুর্থ খণ্ডের একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ বাদ দেবার পর প্রথম সংস্করণের ৩২-টি পরিচ্ছেদ অষ্টম সংস্করণে ৩১ টিতে পরিণত হয়। চারটি খণ্ডের পরিচ্ছেদগুলি এভাবে বিন্যস্ত—প্রথম খণ্ডে—৯টি পরিচ্ছেদ; দ্বিতীয় খণ্ডে— ৬টি পরিচ্ছেদ; তৃতীয় খণ্ডে— ৭টি পরিচ্ছেদ এবং চতুর্থ খণ্ডে—৯টি পরিচ্ছেদ। কিন্তু ১৮৯২ সালে সর্বশেষ সংস্করণের সংশোধিত রূপটি সব দিক থেকে লেখকের সুবিবেচনার ফলশ্রুতি। এই বিচারবোধের নেপথ্যে অবশ্যই তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে গভীর বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও শিল্প-নৈপুণ্যের সঙ্গে অন্বিত তাঁর রসবোধের মেলবন্ধন ঘটেছিল। উপন্যাস হিসেবে কপালকুণ্ডলার স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে, একথা বঙ্কিম জানতেন। সামান্য কিছু পরিবর্তন যেটুকু তিনি করেছিলেন তাতে নবকুমার চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছিল।

যাইহোক, রোমান্সের কল্পনাচারিতার সঙ্গে বাস্তবরসপুষ্ট চরিত্র প্রতিনিধি নবকুমারের দিকে লেখকের নজর দিতে হয়েছিল অনিবার্যভাবেই। জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত বঙ্কিম অভিজ্ঞতার আলোয় শিল্পকুশলী মন নিয়ে এটুকু সংস্করণ করেছিলেন পূর্ণায়ত উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রের, সংলাপ ও বর্ণনার একটা শিল্পসম্মত রূপ দিতে। যদিও পরিবর্তন সামান্য, তথাপি তা উপন্যাসের প্রয়োজনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে, একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। বঙ্কিমের শিল্পসিদ্ধির স্বরূপটিও এই সংশোধনের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছে বলে মনে হয়।

গ্রন্থঋণ : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত **কপালকুণ্ডলা**।

ঐতিহাসিক তথ্য-প্রসঙ্গ ও উপন্যাস

উপন্যাসের বৈচিত্র্যময় শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসের বাস্তবতা কেবল সমকালীন প্রত্যক্ষ জীবন-নির্ভর বাস্তবতা নয়। ইতিহাসের চরিত্র, ঘটনা, পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য আমাদের প্রবহমান জীবন ধারার সঙ্গে গভীরভাবে অন্বিত। সুতরাং ঐতিহাসিক উপাদানের মধ্যে মানবপ্রেম-প্রীতি, হিংসা-বিদ্বেষ, সংঘাত-মিলনের চিরন্তন মানবিক বৃত্তির পরিচয় বর্তমান অভিজ্ঞতা থেকেও অনেক সময় মূল্যবান বলে মনে হয়। বরং ইতিহাসের সুদূর দূরত্বে জীবনের একটা সামগ্রিক রূপ শিল্প-স্রষ্টার অন্তরে ধরা পড়ে—জীবন-দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে। সামাজিক, কাব্যধর্মী, আত্মজীবনীমূলক, রহস্যকেন্দ্রিক, বীরত্ব-ব্যঞ্জক, হাস্যরসাত্মক ইত্যাদি বহুবিধ উপন্যাসের শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসেরই সর্বাধিক প্রাধান্য। ইতিহাসের তথ্য ও তত্ত্ব এবং শিল্পেব সত্য এমনভাবে নিবিড় বন্ধনে আর কোথাও সংযুক্ত নয়। অতীত কাহিনী, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সংস্কার, সামাজিক-রাষ্ট্রীয় বা পবিবারিক ইতিবৃত্ত, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, পবিবেশ-পরিস্থিতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রেম-বিরহ-মিলন ইত্যাদি ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিষয়বস্তু বলে গণ্য। 'বিশেষ' কথাবস্তু বা ইতিহাসের তথ্য 'নির্বিশেষ' সত্যে বা মানবজীবনের সঙ্গে যুক্ত সার্বিক সত্যের শিল্পরূপে অসামান্য ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। ইতিহাসের কালগত চেতনা শিল্পের চিরন্তন ভাবনায় দ্যোতিত হয়। এখানেই ঐতিহাসিক উপন্যাস বা নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব।

এরিস্টটল শিল্প-সৃষ্টির মধ্যে ইতিহাসের তুলনায় অনেক বেশী জীবন-দর্শনের প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন (Art is more philosophical than History)। ইতিহাস যা ঘটেছে কেবল তারই ইতিবৃত্ত, কিন্তু সাহিত্য ইতিহাসের 'বিশেষ' ঘটনাবস্তু বা চরিত্রকে নিয়ে 'সামান্য' (Universal) ভাবকেই ব্যক্ত করে। সুতরাং শিল্পের লক্ষ্য কেবলমাত্র ইতিহাসের মতো ঘটনাধারার অবিকল অনুকরণ নয়—তারও কিছু বেশী এবং 'অতিরিক্ত' এই ভাবটিই শিল্প-সৃষ্টির সৌন্দর্য। এখানেই শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও স্বাতন্ত্র্য। শিল্প-প্রেরণায় যে সৌন্দর্যবোধ স্রষ্টার অন্তরে থাকে, তা বস্তুকে অবলম্বন করে ব্যক্ত হয়েও নির্বস্তুক। সৌন্দর্য-সুষমার ব্যাপ্তি বস্তু-আশ্রিত, তবে বস্তুকে অতিক্রম করে নির্বিশেষ চিরন্তন সত্যে উদ্ভাসিত হয় বলে শিল্পেব গুরুত্ব এত বেশী।

ঐতিহাসিক নাটক বা উপন্যাসে যে ইতিহাসের কথাবস্তু বর্ণিত হয়, নাট্যকার বা ঔপন্যাসিকের তা বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করবার অনিবার্য দায়িত্ব থাকে। সমালোচক Hudson এ বিষয়ে বলেন—It is far more important that it should represent faithfully the manners, tone and temper of the age with which it deals. **(An Introduction to the Study of Literature—Hudson).** ইতিহাস ও উপন্যাসের সম্মিলনে শিল্প সৃষ্টির বিন্যাস-রীতি এইভাবে বর্ণনা করা যায়—(ক) কাহিনীবৃত্তে ইতিহাসের ঘটনাবস্তু (খ) চরিত্র-নির্মাণে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব (গ) কাহিনী ও চরিত্রের বিশ্বস্ত অনুসরণ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ধারার যথাযথ বিবরণ, (ঘ) পরিবেশ রচনায় যুগ ও কালের পরিধিকে মেনে চলা, (ঙ) ঘটনা, সময় / কাল, স্থানগত ঐক্য এবং ভাবগত সংহতির পরিচয় (চ) সাধারণ মানব-জীবন-কাহিনীর মধ্যে শাশ্বত মানবিক অভিব্যক্তির রূপময় প্রকাশ (ছ) পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ, মানসিকতায় ইতিহাসের প্রতিবিম্বন (জ) দেশ-কালের অবিকল চিত্র।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় কিনা নিরূপণ করতে গিয়ে সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার "বঙ্কিম-বরণ" গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন— "ইহাতে কোন বৃহৎ ঐতিহাসিক পটবিস্তার নাই, নায়কনায়িকার কেহই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি নহে। তথাপি ইহাতেও ইতিহাস-রস আছে। ইহার কাহিনী বর্তমানের নহে—তাহাতে মোগলযুগের আবহাওয়া রহিয়াছে; সংসার ও সমাজ চিত্রে প্রাক্ আধুনিক যুগের ছাপ রহিয়াছে। ...ইহা কোন বিশেষ আদর্শের ঐতিহাসিক উপন্যাস না হইলেও, একরূপ ইতিহাস-রস যখন ইহার কাব্যরসকে সমৃদ্ধ করিয়াছে তখন এক অর্থে ইহাও ঐতিহাসিক উপন্যাস বা ইতিহাসগন্ধী রোমান্স।" বঙ্কিমচন্দ্র একমাত্র "রাজসিংহ"কেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা দিয়েছেন—সুতরাং "কপালকুণ্ডলা"কে ঐতিহাসিক রস-ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত করা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। তথাপি ঔপন্যাসিক একজন নিষ্ঠাবান্ ইতিহাস-প্রেমিক ছিলেন এবং তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসে ইতিহাসের সুদূর অতীত প্রাণবন্ত রূপরেখায় জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিল্পের কথাবস্তুতে রূপান্তরিত হয়েছে। কখনও কাহিনী, কখনও চরিত্রে, কখনও বা পরিবেশে ইতিহাস তথ্য-সত্য চলমান ঘটনাবস্তুর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র স্বাভাবিক ছন্দ-সুষমায় ইতিহাস ও মানবজীবনের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। তাই "কপালকুণ্ডলা" ঐতিহাসিক উপন্যাস না হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত ইতিহাসের প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

"প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর" পূর্বেকার কাহিনী নিয়ে উপন্যাসের কথাবস্তুর উপস্থাপনা। সেসময় বাংলাদেশে পর্তুগীজদের আক্রমণ ও হাঙ্গামায় জনজীবন বিপর্যস্ত ছিল, এমন ইঙ্গিত গ্রন্থকার দিয়েছেন। প্রথম দৃশ্যেই ইতিহাসের পশ্চাৎপটে জীবন-সমস্যার রূপ-অন্বেষণ। শিল্পস্রষ্টা বঙ্কিমের ইতিহাস প্রীতি এত গভীর ছিল যে জীবনকে তিনি ইতিহাসের প্রত্যক্ষ আলোয় পর্যালোচনা ও নিরীক্ষণ করেছেন—জীবনের এক অপূর্ব রূপ রঙ্,—বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব দোলা, উত্থান-পতনে পথরেখা, কামনা-বাসনার ও ছন্দহীনতার বৈচিত্র্যময় ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ রূপটি ফুটে উঠেছে। জীবন ও ইতিহাস—একই ছন্দে তালে দোলায়িত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে "দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে" জীবনধারায় পাঠককে নিয়ে গিয়ে লেখক সহজভঙ্গিমায় ইতিহাসের প্রাঙ্গণে দাঁড় করিয়েছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ বিশ্বস্তভাবে অনুসৃত হয়েছে উপন্যাসে। ইতিহাসের প্রাপ্ত তথ্য কে বঙ্কিমচন্দ্র কখনও বিকৃত করেন নি—কল্পনাকে তার অনুবর্তী করেছেন সার্থক ভাবে।

অপূর্ব কৌশলে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের ঘটনাকে উপন্যাসের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। প্রথম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে অধিকারী কর্তৃক নবকুমারের পরিচয় জিজ্ঞাসার অবকাশে প্রথম বিবাহের প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে এবং প্রসঙ্গ-সূত্রে উড়িষ্যায় পাঠানের আধিপত্য খর্ব করার জন্য আকবরশাহের প্রচেষ্টার কথা আছে। "এই সময়ে পাঠানেরা আকবরশাহ কর্তৃক বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত হইয়া উড়িষ্যায় সদলে বসতি করিতেছিল। তাহাদিগের দমনের জন্য আকবরশাহ বিধিমতে যত্ন পাইতে লাগিলেন। ...তখন মোগল পাঠানের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ...পাঠানেরা তৎকালে ভদ্রাভদ্র বিচারশূন্য।" এ সম্পর্কে আধুনিক কালের ঐতিহাসিকের অভিমত বঙ্কিমচন্দ্রের কালে প্রাপ্ত ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ— "Ak bar had annexed Bengal to the empire in 1575 after the defeat of Daud, but the Afghans were not completely crushed. They found an able and ambitious leader in Usman, who though outwardly loyal to the Mughals, cherished the dream of restoring Afghan independence. He had rebelled once before in 1599 in the reign of Akbar, but he was suppressed

by Raja Man Singh. ..Both sides engaged each other in battle. ..The battle ended in the defeat of the Afghans who retreated to their entrenchments. .The news of this victory was receivd at court (April 1, 1612) with great delight and Jahangir suitably rewarded the officers, who had distinguished themselves in the campaign." **(A short History of Muslim Rule in India**—Dr. Ishwari Prasad)। প্রায় আক্ষরিক অর্থে লেখক ইতিহাসকে অনুসরণ করেছেন। পিতাসহ পদ্মাবতীর পুরুষোত্তম দর্শন-শেষে প্রত্যাগমনকালে পাঠানদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং নবকুমার কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। বাঙালী নবকুমারের সঙ্গে পদ্মাবতীর সূত্র ধরে ইতিহাসের জটিল আবর্তে কাহিনীবৃত্তের সংযোগ-সূত্র লেখক সৃষ্টি করে নিয়েছেন।

বাংলাদেশের সপ্তগ্রাম এককালে সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। ইতিহাসের যথাযথ অনুসরণে বাংলার অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে সপ্তগ্রামের উল্লেখ করে বঙ্কিম বলেছেন— "এককালে যবদ্বীপ হইতে রোমক পর্যন্ত সর্বদেশের বণিকেরা বাণিজ্যার্থ এই মহানগরে মিলিত হইত; কিন্তু বঙ্গীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির লক্ষণ জন্মিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তন্নগরের প্রান্তভাগ প্রক্ষালিত করিয়া যে স্রোতস্বতী বাহিত হইত, এক্ষণে তাহা সঙ্কীর্ণশরীরা হইয়া আসিতেছিল। ...এ কারণ বাণিজ্য বাহুল্য ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল। .....সপ্তগ্রামের সকলই গেল। বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীতে যে সকল নূতন সৌষ্ঠবে তাহার প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছিল। তথায় পর্তুগীসেরা বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া সপ্তগ্রামের ধনলক্ষ্মীকে আকর্ষিতা করিতেছিলেন। ...কিন্তু নগরের অনেকাংশ শ্রীভ্রষ্ট এবং বসতিহীন হইয়া পল্লীগ্রামের আকার ধারণ করিয়াছিল।" (ইতিহাস খণ্ড : ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। প্রাচীনসমৃদ্ধ নগরী 'সপ্তগ্রাম' কিভাবে হতশ্রী হয়েছিল, তা বর্ণনা ইতিহাস সম্মত। পর্তুগীস আক্রমণ ও তার ফলাফল তথ্য-সমৃদ্ধ। পরিবেশ রচনায় ঔপন্যাসিকের নিষ্ঠা ও পরিচ্ছন্ন ইতিহাস-চেতনা তাঁকে উত্তরকালে শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করতে সহায়তা করে থাকবে। এ উপন্যাস যেন তারই খসড়া-রচনা।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ঐতিহাসিক উপাদান সন্নিবিষ্ট হয়েছে তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে। পদ্মাবতী বা মতিবিবি বা লুৎফ-উন্নিসার সূত্র ধরে উপন্যাসের কাহিনীও প্রথম খণ্ডে সপ্তগ্রামের সঙ্গে দিল্লী আগ্রার সংযোগ-সূত্র তৈরী করেছিল। লেখকের কল্পনা সুদূর মোগল সাম্রাজ্যের রাজ-অন্তঃপুর থেকে বাংলার সপ্তগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। অথচ কি আশ্চর্য শিল্প কৌশল—কোথাও কোন বহমান গতিধারা বিঘ্নিত হয়নি। কপালকুণ্ডলা-নবকুমারের জীবনের সঙ্গে মোগল রাজত্বের রাজধানী থেকে চয়ন করা মতিবিবির সমন্বয় "ত্রি-ঐক্য"-সূত্রের দিক থেকেও যথাযথ। কাহিনীবৃত্ত, সময় ও স্থানের অনুবর্তী হয়ে ইতিহাসের চলমান গতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেছে প্রসঙ্গগুলি। যাইহোক্, ঔপন্যাসিক এই অংশে ইতিহাসকে কতদূর প্রত্যক্ষ অনুসরণ করেছেন, তার পরিচয় পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত অংশে—

(১) "আকবরশাহের নিকট কাহারও গুণ অবিদিত থাকিত না; শীঘ্রই তিনি ইঁহার গুণগ্রহণ করিলেন। লুৎফ উন্নিসার পিতা শীঘ্রই উচ্চপদস্থ হইয়া আগ্রার প্রধান ওমরাহ মধ্যে গণ্য হইলেন।" (তৃতীয় খণ্ড : ১ম পরি) —মতিবিবি চরিত্রটি কাল্পনিক। কিন্তু সম্ভাব্য-চরিত্র হিসেবে মতিবিবি পরিকল্পিত। মেহের উন্নিসা (শের আফগানের স্ত্রী) বাংলাদেশ থেকে দিল্লীশ্বরী হয়েছিলেন এবং নূরজাহান হয়ে নিকট আত্মীয়দের রাজকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন। এই ঘটনার ছায়াপাতে মতিবিবি ও তার পিতার মোগল রাজ-অন্তঃপুরে রাজকার্যে প্রবেশের পরিকল্পনা হয়ত লেখক করেছিলেন।

যাইহোক ঘটনাটি ইতিহাস-সমর্থিত কাহিনীর সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্যপূর্ণ। কল্পনা এখানে ইতিহাসের অনুগ হয়েছে, তাই অসঙ্গতি দোষে দুষ্ট নয়। বঙ্কিমের কল্পনা সুদূর ইতিহাসের পথ ধরে চলাতেও কত স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক ছিল, মতি চরিত্র পরিকল্পনায় তার প্রমাণ আছে।

(২) যুবরাজ সেলিমের (পরবর্তীকালে যিনি জাহাঙ্গীর নামে পরিচিত হন) সঙ্গে লুৎফ-উন্নিসা কাহিনীর সংযুক্তি বঙ্কিমের গভীর ইতিহাস-পাঠের ফল। মোগল সাম্রাজ্যে রাজপুরুষ, যুবরাজ, আমীর-ওমরাহদের জীবনযাত্রার ভাবধারা লেখক গ্রহণ করেছিলেন—কল্পিত চিত্র-চরিত্রে তারই প্রতিফলন দেখা যায়। ঐতিহাসিক তথ্যের লঙ্ঘন নয়, বরং ইতিহাসের অন্তর্লীন ভাবধারায় মতিবিবিকে যুবরাজ সেলিমের প্রধানা মহিষীর (মানসিংহের ভগিনী) প্রধানা সহচরী হিসেবে নিযুক্ত করে তথ্য-সত্যের অনুমোদন করেছেন তিনি।

(৩) মেহের-উন্নিসার এবং খসরুর বিদ্রোহের সঙ্গে এ উপন্যাসের যোগসূত্র নিবিড় না হলেও মতিবিবি-সেলিম প্রসঙ্গে বঙ্কিম মোগল হারেমের চিত্রকে সংযোজিত করেছেন। মতিবিবি—"উপযুক্ত সময়ে তাঁহার পাটরানী হইবেন"—এমন অবস্থায় দৃশ্যপটে মেহের-উন্নিসার প্রবেশ। "আকবর শাহের কোষাধ্যক্ষ (আকৃতিমাদ-উদ্দৌলা) খাজা আয়াসের কন্যা মেহের-উন্নিসা যবন-কূলে প্রধানা সুন্দরী।" এখানে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসকে আক্ষরিক ভাবে অনুসরণ করেছেন— (ক) She (Miherun-nissa / Nurjahan) still possessed the beauty of her early youth, and the portraits that have come down to us indicative of her superb loveliness. **(A Short History of Muslim Rule in India**—Dr. Ishwari Prasad)। (খ) "She (Nurjahan) still retained, and continued to do so for years together, the beauty and freshness of her early youth." **(The Mughul Empire**—Dr. A. L. Srivastava)।

বঙ্কিমের বর্ণনায় পাই— "একদিন কোষাধ্যক্ষ রাজকুমার সেলিম ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিলেন। সেই দিন মেহের-উন্নিসার সহিত সেলিমের সাক্ষাৎ হইল এবং সেই দিন সেলিম মেহের-উন্নিসার নিকট চিত্ত রাখিয়া গেলেন।" (তৃতীয় খণ্ড : ১ম পরিচ্ছেদ)। ঐতিহাসিক বেণীপ্রসাদ মেহের-উন্নিসার সঙ্গে বিবাহের পূর্বে সেলিমের সাক্ষাৎকার স্বীকার না করলেও কোন কোন ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ একথা স্বীকার করেন। যেমন—(ক) "He (Jahangir) had been in love with her when she was still a maiden, during the life time of Achabar (Akhar); ....(The Dutch writer De Laet's opinion) (ঈশ্বরী প্রসাদের গ্রন্থে উল্লিখিত)। (খ) ডাঃ ঈশ্বরী প্রসাদ তাঁর গ্রন্থে বলেছেন—"In March, 1611, i.e. four years after the death of her husband Jahangir once chanced to see her at the fancy bazar and was charmed by her beautiful appearance." (গ) ডাঃ এ. এল. শ্রীবাস্তবও একই অভিমত দিয়েছেন— "Peerless in beauty and unrivalled in feminine accomplishments, she aspired to the conquest of the heir-apparent, prince salim, who ardently desired to marry her; but Akbar would not agree to such an alliance."

উপন্যাসের এই অংশের বর্ণনা ইতিহাসের তথ্য-সত্যের অনুগত সন্দেহ নেই— "শের আফগান নামক একজন মহাবিক্রমশালী ওমরাহের সহিত কোষাধ্যক্ষের কন্যার সম্বন্ধ পূর্বেই হইয়াছিল। সেলিম অনুরাগান্ধ হইয়া সে সম্বন্ধ রহিত করিবার জন্য পিতার নিকট যাচমান হইলেন। কিন্তু নিরপেক্ষ পিতার নিকট কেবল তিরস্কৃত হইলেন মাত্র। সুতরাং সেলিমকে আপাততঃ নিরস্ত হইতে

হইল। আপাততঃ নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু আশা ছাড়িলেন না। শের আফগানের সহিত মেহের-উন্নিসার বিবাহ হইল। কিন্তু সেলিমের চিত্তবৃত্তি সকল লুৎফ-উন্নিসার নখদর্পণে ছিল; —তিনি নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে, শের আফগানের সহস্র প্রাণ থাকিলেও তাঁহাব নিস্তার নাই, আকবরশাহের মৃত্যু হইলেই তাঁহার প্রাণান্ত হইবে—মেহের-উন্নিসা সেলিমের মহিষী হইবেন।" (তৃতীয় খণ্ড-প্রথম পরিঃ)। মেহের-উন্নিসার সঙ্গে শের আফগানের বিবাহের প্রসঙ্গ ইতিহাস থেকে বঙ্কিম গ্রহণ করেছেন। সেলিমের আকবরের কাছে মেহেরকে বিবাহ-করার বাসনা ব্যক্ত করা ও আকবর কর্তৃক এই প্রস্তাব বাতিল করার বিষয়টি ইতিহাস সম্মত। আকবর শাহের মৃত্যুর পর শের আফগানের যে নিস্তার নেই— প্রসঙ্গটিও ইতিহাস-অনুগ। তবে শের আফগানকে সেলিম সত্যই হত্যা করেছিলেন কিনা, ঐতিহাসিকরা সে বিষয়ে একমত নন। বঙ্কিম প্রসঙ্গের ইঙ্গিত দিয়েছেন—কিন্তু জাহাঙ্গীর-নূরজাহান বিবাহের কাহিনীবৃত্ত অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় লিপিবদ্ধ করেন নি। যাইহোক এবিষয়ে ঐতিহাসিকদের মতামত কি ছিল দেখা যাক্। (ক) "Mehr-un-nissa was, therefore, married to Sher Afgan, a persian adventurer who had migrated to India and entered Akbar's service. When Jahangir became king, he contrived to kill sher Afgan and obtain possession of Mehr-un-nissa. He succeeded and had her brought to court. He married her four years later and raised her to the status of his chief queen." **(The Mughal Empire**—Dr. A. L. Srivastara) (খ) Miher-un-nissa ...gren up in the meantime and at the age of 17 was married to Ali Quli Istajtu, a persian adventurer, who is better known in history as sher Afgan. **(A Short History of Muslim Rule**—Dr. Ishwari Prasad). সুতরাং দেখা যায় বঙ্কিম ইতিহাসের অনুসরণে সেলিমের সঙ্গে মেহেরের বিবাহ প্রসঙ্গের পূর্বাভাস দিয়েছেন যা আকবর শাহের মৃত্যুর পর সংঘটিত হয়েছিল।

খসরুকে কেন্দ্র করে যে রাজ-সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে ষড়যন্ত্র হয়েছিল, তার বিবরণও ইতিহাসের সাক্ষ্যে পাওয়া যায়। খসরু ছিলেন রাজা মানসিংহেব ভগিনী এবং সেলিমের পুত্র—বিবরণের মধ্যে ইতিহাসের সত্য প্রতিফলিত। "রাজপুত কন্যা বাদশাহ পত্নী" হবেন এবং আকবর মৃত্যু-শয্যায়,—এমন অবস্থায় ভাবী সেলিম-পত্নী মেহেরের সঙ্গে কথোপকথনে লুৎফ-উন্নিসার এ অভিমত তাৎপর্যপূর্ণ। রাজপুতজাতিকে কেন্দ্র করে বিঙ্কিমের হিন্দু জাতীয়তা প্রতি এখানে প্রকাশিত। সেলিমকে ত্যাগ করে খসরুকে সিংহাসনে বসাবার অভিপ্রায়ে যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল, ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে তার সত্যতা জানা যায়।

(১) It will be remembered that when Akbar lay on his death-bed, Raja Man Singh, had formed a conspiracy to set aside the claims of Salim and to place his son khusrau on the throne in his stead. After Akbar's death a reconcilation was effected between the valiant Raja and Salim. **(A. Short. Hist. of Mus. Rule-Dr. Prasad)**

(২) Khan A'zam and Man Singh conspired to seize and imprison Salim on a day on which it had been arranged that he should visit his father, but he was warned in time of their intentions and returned without entering the palace. **(The Cambriedge History of India,**—Haig and burn)।

খাঁ আজিম বা আজম খসরুর শ্বশুর -- সুতরাং জামাতার কল্যাণে মাতুল মানসিংহের সঙ্গে হাত মেলানো তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। ইতিহাসের তথ্য-সত্যের পরে নির্ভর করে বঙ্কিম অংশটি লিখেছিলেন। খাঁ আজিমের অভিমত--- "উড়িষ্যা ভিন্ন অন্য আশ্রয় নাই। কেবল সেই স্থানে মোগলের শাসন তত প্রখর নহে।" ---সম্পূর্ণ ইতিহাসের সত্যানুসারী। মোগল-পাঠানের সংঘাত এবং ১৫৯০ সালে মানসিংহ কর্তৃক উড়িষ্যা জয় প্রসঙ্গ স্মরণীয়--- "Bengal was at this time seething with discontent. The turbulent Afghans, who still hoped to revive their lost supremacy, gathered there form all parts of the Country and fomented intrigues against the state." (Dr. Prasad).

তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে আবার মোগল ইতিহাসের স্বাদস্থ হয়েছেন বঙ্কিম। ইতিহাসের একনিষ্ঠ পাঠক ঔপন্যাসিক বিশ্বস্তভাবে প্রধান ঘটনা, ষড়যন্ত্র, চরিত্রের স্বভাব-প্রকৃতিকে এবং সমকালীন যুগের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ইঙ্গিতধর্মী মন্তব্য করেছেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যে ইতিহাসের সমস্ত ঘটনার আভাস আমাদের মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। উপন্যাসের কাহিনীবৃত্তের মধ্যে ইতিহাস-সংযোজনার এটিও একটি অন্যতম কারণ সন্দেহ নেই। ইতিহাস-প্রীতির অন্যান্য নিদর্শন--- (১) "এ সময়ে শের আফগান বঙ্গদেশের সুবাদারের অধীনে বর্দ্ধমানের সমাধ্যক্ষ হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। (তৃতীয় খণ্ড : ৩য় পরি)। ইতিহাসে পাই---When Jahangir became king, he forgave Sher Afgan for his past conduct and appointed him fauzdar of Burdwan in Bengal and granted him a jagir there (1605) (Dr. A L Srivastava) (২) মতিবিবির সঙ্গে মেহের-উন্নিসা "দিল্লীর সাম্রাজ্যলাভের জন্য প্রতিযোগিনী" হয়েছিলেন প্রসঙ্গটি প্রত্যক্ষভাবে ইতিহাসের তথ্যানুসারী না হলেও মোগল রাজঅন্তঃপুরে কর্তৃত্ব দখলের লড়াই ঐতিহাসিক ভাবসত্যের অনুগামী সন্দেহ নেই। (৩) মেহের-উন্নিসা চরিত্র ও তার রূপ সৌন্দর্য চিত্রণে লেখক অতীত ইতিহাসের বিবরণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লেখেন--- "মেহের-উন্নিসা তৎকালে ভারতবর্ষ মধ্যে প্রধানা রূপবতী এবং গুণবতী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাদৃশ রমণী ভূমণ্ডলে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সৌন্দর্যে ইতিহাসকীর্তিতা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে তাঁহার প্রাধান্য ঐতিহাসিকমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কোন প্রকার বিদ্যায় তৎকালিন পুরুষদিগের মধ্যে বড় অনেকে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। নৃত্যগীতে মেহের-উন্নিসা অদ্বিতীয়া ; কবিতা-রচনায় বা চিত্রলিখনেও তিনি সকলের মন মুগ্ধ করিতেন। তাঁহার সরস কথা তাঁহার সৌন্দর্য অপেক্ষা মোহময়ী ছিল।" (৩য় খণ্ড : ৩য় পরিঃ)

এবিষয়ে আধুনিক ঐতিহাসিক, ডাঃ ঈশ্বরী প্রসাদের অভিমত হ'ল--- "At the time of her marriage, . . She still possessed the beauty of her early youth and the portraits that have come down to us are indicative of her superb loveliness. ... She possessed a strong and virile intellect, and could understand the most intricate political problems without any difficulty. ...She was fond of poetry and wrote verses which are still admired. She was a genuine lover of beauty and did much to increase the splendour and glory of the Mughal court."

এই পরিচ্ছেদে মতিবিবির দুটি সংলাপে ইতিহাসের প্রতিধ্বনি শোনা যায়--- (১) মেহেরের

উদ্দেশে— "সেলিম এ পর্যন্ত তোমার সৌন্দর্যের মোহ ভুলিতে পারেন নাই, এই কথা বলা আমার উদ্দেশ্য।" (২) "কিন্তু সম্প্রতিকার আগ্রার সংবাদ এই যে,— আকবরশাহ গত হইয়াছেন। সেলিম সিংসনাবঢ় হইয়াছেন। দিল্লীশ্বরকে কে দমন করিবে?" প্রথম উদ্ধৃতিতে মেহের-উন্নিসার সৌন্দর্য রূপে আকৃষ্ট সেলিমের প্রসঙ্গ ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে আকবরের মৃত্যু ও সেলিমের জাহাঙ্গীর রূপে সিংহাসন অধিকার ইতিহাসের আক্ষরিক অনুসরণ। সেলিমের প্রতি মেহের-উন্নিসার অনুরাগ প্রসঙ্গে বঙ্কিম উল্লেখ করেছেন— "কাহাকে বিস্মৃত হইব? আত্মজীবন বিস্মৃত হইব, তথাপি যুবরাজকে বিস্মৃত হইতে পারিব না।" সেলিমের প্রতি মেহের-উন্নিসার অনুরক্ত হওয়ার প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকের মত— "Time assuaged her grief and she became reconciled to her imperial lover. Towards the close of May, She became the legally married wife of the lord of Hindustan." (Dr Prasad)। ইতিহাসে দেখি, মাত্র সতের বছর বয়সের অপূর্ব সুন্দরী মেহের-উন্নিসাকে সেলিম দেখেছিলেন এবং বিবাহও করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আকবরশাহের অনিচ্ছায় সে বিবাহ সম্ভব হয়নি। শের আফগানের স্ত্রী হলেও সেলিম মেহেরের রূপমুগ্ধ ছিলেন আবার বিপরীত দিক থেকেও মেহেরের সেলিমের প্রতি আকর্ষণ ইতিহাসের সত্য কাহিনীর সমর্থনে লিখিত হয়েছে। এই পরিচ্ছেদের শেষাংশে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন— "মেহের-উন্নিসা প্রণয়শালিনী", "যিনি পরে আত্মবুদ্ধি প্রভাবে দিল্লীশ্বরেরও ঈশ্বরী হইয়াছিলেন;" এবং "মেহের-উন্নিসা জাহাঁগীরের যথার্থ অনুরাগিণী।" —এই সমস্ত প্রসঙ্গে লেখকের ইতিহাস নিষ্ঠা প্রশংসনীয়।

তৃতীয় খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে মতিবিবির সঙ্গে জাহাঙ্গীরের কথোপকথনকালে মেহের উন্নিসা যে দিল্লীশ্বরী হবেন একথা গোপন করতে চেয়েছেন। ইতিহাসে দেখি,— Nurjahan was brought to the court and placed in charge of Salima Sultana Begam, who was Jahangir's step-mother and very kind and friendly to him. (Dr. A. L. Srivastava)। মজার কথা, জাহাঙ্গীর মেহের-উন্নিসা বা নূরজাহানকে অন্তঃপুরে রেখে প্রায় চার-ছয় বিবাহের ইচ্ছাকে গোপন করেছিলেন। বঙ্কিম এই সময়ের চিত্র দিতে গিয়ে তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে জাহাঙ্গীরের অন্তর্মানসের চিত্রটি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন। মতিবিবির সঙ্গে কথোপকথনে মেহেরের জাহাঙ্গির-প্রীতি প্রকাশ পেয়েছে। তৃতীয় খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে শেষমন্ ও মতিবিবির বাক্যালাপে দিল্লীর আমীর ওমরাহগণের মধ্যে ইন্দ্রিয় সুখান্বেষণ ইত্যাদি প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের সূক্ষ্ম সত্য ঘটনার পরেও যেন গভীর দৃষ্টি দিয়েছিলেন। ইতিহাসের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে ঔপন্যাসিক তথ্য ও সত্যের সমন্বয় ঘটিয়েছেন বারবার।

একদিকে মোগল সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য, মুসলমান সম্রাট, সম্রাটতনয় ও আমীর-ওমরাহদের লালসার স্থূলতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, ওমরাহ কন্যাদের মোগল হারেমে প্রতিষ্ঠালাভের প্রতিযোগিতা, সংঘাত-বিদ্বেষ, প্রেম-ভালোবাসার বৈচিত্র্যময় চিত্র এবং অন্যদিকে মতিবিবিকে ঘিরে বাংলার সঙ্গে দিল্লী-আগ্রার সম্পর্ক স্থাপন ও তৎকালের বাংলার সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসের পরিচয়-দিয়ে লেখক উপন্যাসের অপূর্ব রোমান্সধর্মী আখ্যায়িকা রচনা করেছেন। তৎকালীন সমাজ-জীবনের পরিচয় বঙ্কিম দিয়েছেন সামান্য ইঙ্গিতে অথচ অসামান্য ব্যঞ্জনায়। যেমন—মোগল-পাঠানের সংঘাতের ফলে উড়িষ্যা ও বাংলার সামাজিক জীবনে অশান্তি ও অব্যবস্থার চিত্র— উড়িষ্যা থেকে প্রত্যাবর্তন কালে দস্যুহস্তে লাঞ্ছিতা মতিবিবি; জলপথে পর্তুগীস জলদস্যুদের ডাকাতি অথবা স্থলপথের দস্যুভয়

জন-জীবনের অশান্তির প্রতীক ("এ সকল কালে চটির নিকটেও দুষ্ক্রিয়া করিতে দস্যুরা সঙ্কোচ করিত না")। অর্থনৈতিক অবস্থাও সুবিধের ছিল না—অর্থাভাবে ভিক্ষাবৃত্তিও চলত—কপালকুণ্ডলার কাছে ভিখারীর আগমন ও অলঙ্কার নিয়ে পলায়ন প্রসঙ্গ স্মরণযোগ্য) (২য় খণ্ড/৪র্থ পরিঃ)। সপ্তগ্রামের ঐশ্বর্যময় দীপ্তির অবসান হয়েছে—শ্রীহীন নগরীর উপকণ্ঠে কেবলমাত্র রাজপুরুষদের বাস—নবকুমারের গৃহও এই অংশে— "সপ্তগ্রামের এক নির্জ্জন ঔপনগরিক ভাগে নবকুমারের বাস।" কিন্তু গৃহের পশ্চাতে নিবিড় বন, জঙ্গলাকীর্ণ সপ্তগ্রাম সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ঐশ্বর্যহীন নগরীতে রূপান্তরিত। দিল্লী-আগ্রা অথবা বঙ্গদেশের চিত্রাঙ্কনে ঔপন্যাসিক ইতিহাসের দ্বারস্থ হয়েছেন—ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এ উপন্যাসের কাহিনী, চরিত্র ও পরিবেশ সৃজন করেছেন।

কিন্তু 'কপালকুণ্ডলা'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় না একাধিক কারণে। কারণগুলি হ'ল—(১) উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলি ইতিহাস-খ্যাত চরিত্র নয়। নবকুমার-কপালকুণ্ডলা ছাড়া মতিবিবিও ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। (২) দিল্লী-আগ্রা বা সপ্তগ্রামের দৃশ্য-চিত্রে ইতিহাসের অনুসরণ থাকলেও প্রত্যক্ষ ভাবে তা নায়ক-নায়িকার চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে নি। রবীন্দ্রনাথের কথায়—"রাজ্যের উত্থান-পতন মহাকালের সুদূর কার্য পরম্পরা, যে সমুদ্র গর্জনের সহিত উঠিতেছে পড়িতেছে সেই মহান কলসঙ্গীতের সুরে তাঁহাদের ব্যক্তিগত বিরাগ অনুরাগ বাজিয়া উঠিতে থাকে"—কপালকুণ্ডলায় তেমন কোন ঘটনা নেই। (৩) মেহের-উন্নিসা, সেলিম বা আকবরশাহের জীবন-প্রবাহের সঙ্গে উপন্যাসের কথাবস্তুর যোগসূত্রটি অত্যন্ত ক্ষীণ। (৪) বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স-রস-নির্ভর কল্পনাচারিতা ইতিহাসের বিগত ঘটনার মধ্যে উত্থান-পতন, কামনা-বাসনা, লালসার স্থূলতা, সংঘাত-মিলন, প্রেম- প্রতিহিংসার নিত্য উঠাপড়া লক্ষ্য করেছেন। লেখক যেন কালগত ব্যবধানের দূরত্বে চিরন্তন-সৌন্দর্যের অন্বেষণ করেছেন—রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং মানবিক বৃত্তিগুলির প্রকাশময় সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে কল্পনার প্রশ্রয় ঘটিয়েছেন। (৫) মতিবিবির কল্পিত চরিত্র প্রাণবন্ত রূপরেখায়, প্রমত্ত কামনা বাসনার দুর্দমনীয় স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে দীক্ষিত করে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক ভাব-সামীপ্যে তাকে নির্মাণ করেছেন। নবকুমারের প্রথমা পত্নী পদ্মাবতীর ধর্মান্তরিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাসের মধ্যে তার প্রবেশ। ইতিহাসের সঙ্গতি-সূত্র থাকলেও ঘটনাটি ঐতিহাসিক নয়। (৬) ইতিহাসের তুলনায় মতিবিবি "উপন্যাস অংশের" প্রয়োজনেই যেন নির্মিত চরিত্র। কপালকুণ্ডলা চরিত্রকে নিয়ে ঔপন্যাসিক রোমান্স-লক্ষণাক্রান্ত উপন্যাস লিখেছিলেন। এখানে কল্পনারই প্রাধান্য, কপালকুণ্ডলায় তারই পরীক্ষা নিরীক্ষা। কিন্তু উপন্যাসের বাস্তবতা মতিবিবির চরিত্রে বহুলাংশে রক্ষিত এবং এই বাস্তবতার সূত্র ধরে মোগল হারেমের বা সাম্রাজ্যের ইতিবৃত্ত বর্ণনা। ইতিহাসের প্রাঙ্গণে বাস্তবজীবনের আলো ফেলে উপন্যাসের শিল্পরূপ সৃজন করেছেন বঙ্কিম। সুতরাং এখানকার ইতিহাস কেবল বাস্তবতার জন্ম দিয়েছে এটুকুই ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা। ঔপন্যাসিকও এর অতিরিক্ত দাবী করেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস অনুগত্য 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে খুব উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেলেও উপন্যাসের শিল্পকৃতিতে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাধান্য ছিল না। রোমান্স-রচয়িতার কল্পনা-প্রবণ মন নিয়ে তিনি কপাল চরিত্রকে ঘিরে পরীক্ষা নিরীক্ষা মূলক "রাত্রির কাব্য" রচনা করেছিলেন। শিল্প-কৌশলের প্রয়োজনে এখানে ইতিহাস উপন্যাসের অঙ্গীভূত হয়েছে। সুতরাং এ উপন্যাসে ইতিহাস গৌণ, রোমান্স রসই মুখ্য। আর রোমান্সের সঙ্গে যুক্ত বাস্তব জীবন ইতিহাসের হাত ধরে আখ্যানের কেন্দ্রভূমিতে পদার্পণ করেছে। অনবদ্য গঠনকৌশলের অনিবার্য অংশ হ'ল ইতিহাসে

সংঘটিত সামান্য ঘটনাবৃত্ত বা ঘটনাবৃত্তের ইঙ্গিত। উপন্যাসে সর্বমোট ৩ টি পরিচ্ছেদের মধ্যে ৬টিতে মোগল ইতিহাসের পরিচয় এবং ২টি পরিচ্ছেদে সপ্তগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধ নগরীর হতশ্রী হবার প্রসঙ্গ আছে। সংখ্যার দিক থেকে ইতিহাস এক-চতুর্থাংশ। লেখকের উদ্দেশ্য যে ইতিহাসের চরিত্র-চিত্র নির্মাণের দ্বারা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা নয়,তা পরিষ্কার হয় উপন্যাসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট মতামতে। কাপালিকের দ্বারা অরণ্য জীবনে লালিত পালিত কপালকুণ্ডলা বিবাহের পর সংসারী হতে পারে কিনা— মনস্তাত্ত্বিক এই অন্বেষণের অনিবার্য ফল কপালকুণ্ডলা উপন্যাস সৃষ্টি।

এজন্যই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন— "কপালকুণ্ডলার রোমাণ্টিক আবেষ্টন রচনায় বঙ্কিম অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ইতিহাস ও প্রেমকে যতদূর সম্ভব পশ্চাতে রাখিয়া রোমান্সের এমন একটি উৎস আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা আমাদের বাস্তব-জীবনের কঠিন মৃত্তিকা হইতে স্বতঃই উৎসারিত হইতে পারে।" (বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা)। ইতিহাসের তথ্য-সত্য অক্ষুণ্ণ রেখে ঐতিহাসিক নিষ্ঠা বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে দেখিয়েছেন সত্য কিন্তু এ উপন্যাসের রস-পরিণাম রোমান্স রসসিক্ত জীবন-নির্ভর। তাকে কখনই ইতিহাস-নির্ভর বলা যায় না। সুতরাং এককথায় এই উপন্যাসকে ইতিহাসগন্ধী রোমান্স বলা গেলেও ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে চিহ্নিত করা চলে না। বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ বিচারে ঐতিহাসিক না হ'লেও 'কপালকুণ্ডলা' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। অসাধারণ শিল্প-প্রতিভার পরিচায়ক গ্রন্থ বলে 'কপালকুণ্ডলা' স্বীকৃত হবে।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে তত্ত্ব

উপন্যাস, নাটক ও গল্পে লেখকের জীবন-ভাবনার শিল্প-সম্মত রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। শিল্পীর সৃষ্টিশক্তির প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য বিস্ময়করভাবে এখানে উপস্থাপিত হয়। রূপ ও রীতির পরীক্ষা নিরীক্ষার সঙ্গে অনিবার্য ভাবে যুক্ত থাকে লেখকের শিল্প-ভাবনা, যা একান্তই জীবনাশ্রিত। কখনও নাটকীয় দ্রুতগতিতে, কখনও কাব্যিক ব্যঞ্জনায়, অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সের চমকে বা সূক্ষ্মচতুর আয়রণিতে কাহিনীবৃত্ত, চরিত্র, সংলাপে লেখকের জীবন দর্শনের আলোয় তা প্রকাশ পায়। উপন্যাসে গল্পের প্রাধান্য স্বীকৃত হলেও (The fundamental aspect of the novel is its story-telling aspect— E.M.Forster) মানুষের অন্তর্জীবনের গভীরে অলৌকিক অদৃষ্টবাদ বা নিয়তি শক্তির লীলা প্রদর্শনে ঔপন্যাসিক কখনও কখনও মনোযোগী হন। কারণ, সমালোচকের মতানুসারে— Man's destiny will always be an object for speculation। মানব-জীবনে দুর্নিরীক্ষ্য অদৃষ্টশক্তির ক্রিয়া সম্পর্কে কোন কোন নাট্যকার / ঔপন্যাসিক আগ্রহী হয়েছেন। শেক্সপীয়ারের নাটকে এসবের উদাহরণ আছে। জুলিয়াস সীজরের প্রেতাত্মা দর্শন বা ম্যাক্‌বেথের ডাইনীরা অতিপ্রাকৃতের উদাহরণ। মানব-জীবনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যকে নিয়তি বা অদৃষ্টবাদে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন কেউ কেউ। মিষ্টিক তত্ত্বকে সমগ্রসৃষ্টির নেপথ্যে প্রত্যক্ষ করে তাকে অপ্রাকৃত শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেছেন অনেক ঔপন্যাসিক। বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রই অলৌকিক শক্তিকে জীবনের আঙ্গিনায় স্থাপন করে, সৃষ্টি-রহস্যের গভীরে যেন অবগাহন করতে চেয়েছেন। সেই জীবন-জিজ্ঞাসার যে রূপ 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে অঙ্কিত, তার পর্যালোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য।

জীবন-জিজ্ঞাসার গভীরতা বঙ্কিম-মণীষায় দেখা গিয়েছিল তাঁর জীবন রহস্য অন্বেষার সুগভীর আর্তি থেকে—"এই জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়? সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি।" পুরুষ-প্রকৃতি কেন্দ্রিক সাংখ্যদর্শন-তত্ত্ব ও ঈশ্বর বঙ্কিমকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। তাঁর কথায়—"সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ লইয়া তন্ত্রের সৃষ্টি। সেই তান্ত্রিক কাণ্ডে দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে। ..... সেই তন্ত্রের প্রসাদে আমরা দুর্গোৎসব করিয়া এই বাংলাদেশের ছয়কোটি লোক জীবন সার্থক করিতেছি। যখন গ্রামে গ্রামে, নগরে মাঠে জঙ্গলে শিবালয়, কালীর মন্দির দেখি, আমাদের সাখ্য মনে পড়ে; যখন দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী পূজার বাদ্যশুনি, আমাদের সাংখ্য দর্শন মনে পড়ে।" বঙ্কিমের মননে সাংখ্যদর্শনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব থেকে 'কপালকুণ্ডলায় তন্ত্র-মন্ত্রের সৃষিট এবং ঈশ্বর ভাবনা, জীবন-নিয়তি বা জীবন-নিয়ামক ভাবনা বলে গণ্য হয়েছে। এ সম্পর্কে অধ্যক্ষ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য তাঁর "বঙ্কিম-মনীষা" গ্রন্থে লিখেছেন— "ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রেরও তত্ত্বজিজ্ঞাসার বিরাম ছিল না। .....তাঁহার প্রায় সকল প্রধান উপন্যাসেই এমন পাত্র পাত্রীর পরিকল্পনা তিনি করিয়াছেন, যাঁহারা হয় স্বয়ং তত্ত্বদর্শী, নতুবা তত্ত্বজিজ্ঞাসু। দুর্গেশনন্দিনীর অভিরাম স্বামী, মৃণালিনীর মাধবাচার্য, চন্দ্রশেখরের রামানন্দ স্বামী এবং চন্দ্রশেখর স্বয়ং, আনন্দমঠের সত্যানন্দ, চিকিৎসক, দেবী চৌধুরাণীর ভবানী ঠাকুর—ইহারা সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ, সাধক, বহুদর্শী, তত্ত্বজ্ঞ ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু। কপালকুণ্ডলা, রজনী, সীতারাম প্রভৃতি উপন্যাসে যদিও ঐ স্তরের কোন চরিত্র নাই বটে, তথাপি মনুষ্যজীবন ও জগৎ সম্বন্ধে অতি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা ও তাহার সমাধানের প্রয়াস ইহাদের সর্বত্র লক্ষণীয়।"

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মাধুর্যময় রূপ প্রকাশ পেয়েছে কাব্যিক ব্যঞ্জনায়। কিন্তু প্রকৃতির এই বাহ্যরূপের অন্তরালে যে ভয়ঙ্কর মূর্তি আছে, তারও ইঙ্গিত আছে প্রকৃতির স্বরূপ-বৈচিত্র্যে। এই দুই ভাব-মূর্তিতে প্রকৃতি তত্ত্বের পূর্ণতা। কপাকুণ্ডলা ও ভৈরবীকে প্রকৃতিতত্ত্বের পূর্ণতায় বঙ্কিম সৃষ্টি করেছেন "কপালকুণ্ডলা যেমন দিগভ্রান্ত নবকুমারকে পথ দেখাইতেছে, ভৈরবীও তদ্রূপ কর্তব্যবিমূঢ়া কপালকুণ্ডলাকে 'কাপালিকগত পথপ্রতি সঙ্কেত করিতেছে। একটিতে উদ্ধারের ও রক্ষার পথ, অপরটিতে মৃত্যুর ও বিনাশের পথ। একটিতে প্রকৃতির কল্যাণময়ী মূর্তি, অপরটিতে প্রকৃতির ভয়ঙ্করী রুদ্রভীষণা মূর্তি।" (**বঙ্কিম-মনীষা**)। চরিত্রায়নে কপালকুণ্ডলায় প্রকৃতির স্নেহময়ী অনুপম সৌন্দর্যের রূপমূর্তি— তার স্নিগ্ধতা, লাবণ্য, মাধুর্য ও ছন্দ-সুষমায় প্রকৃতিলোকের সঙ্গে চরিত্রের অভিন্নতা দেখা যাবে। আবার রহস্যময়ী প্রকৃতির নিঃসীম ঔদাসীন্যের মত কপালও সংসারসম্পর্কে অনাসক্ত, উদাসীন। কাপালিকের তন্ত্র-সাধনার কাঠিন্য ও নিষ্ঠুরতা প্রকৃতিরই যেন করাল ভীষণ মূর্তি। উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা চরিত্র—আশ্রিত প্রকৃতির দুই রূপ— এবং কাপালিকের ভয়ঙ্কর মূর্তি,— এই তিন অভিব্যক্তিকে বঙ্কিম প্রকৃতি ভাবনায় বিন্যস্ত করেছেন। কিন্তু এখানে এই কথাটিই সর্বাধিক স্মরণযোগ্য, বঙ্কিমচন্দ্র আপন মনীষায় মানব-জীবনের স্বরূপ অন্বেষণে প্রকৃতিচেতনাকে মানবজীবনের পরে আরোপিত করে জীবনের বৈচিত্র্যময় দিককে শিল্পরূপে ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং কপালকুণ্ডলা ও কাপালিক— এই দুই চরিত্রে প্রকৃতি তত্ত্বেরই প্রাধান্য। আবার এই প্রকৃতি তত্ত্বের সঙ্গে তান্ত্রিকতার নিগূঢ় যোগসূত্র থেকে সাংখ্যদর্শনজাত পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বের প্রসঙ্গ নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। তত্ত্ব ও জীবন অভিন্ন ও একার্থবোধক হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র **কৃষ্ণচরিত্র** প্রবন্ধে বললেন— "সাংখ্যের স্থূল কথা এই, জড়জগৎ বা জড়জগন্ময়ী শক্তি পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। পরমাত্মা বা পুরুষ সম্পূর্ণরূপে সঙ্গশূন্য; তিনি কিছুই করেন না এবং জগতের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ নাই। জড়জগৎ এবং জড়জগন্ময়ী শক্তিকে ইহারা 'প্রকৃতি' নাম দিয়াছেন। এই প্রকৃতিই সর্বসৃষ্টিকারিনী, সর্বসঞ্চারিণী, সর্বসঞ্চালিনী এবং সর্বসংহারিণী। এই প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব হইতে প্রকৃতি-প্রধান তান্ত্রিক ধর্মের উৎপত্তি।" 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের নবকুমার চরিত্র, ধরে নেওয়া যায়, পুরুষতত্ত্বেরই সম্পূর্ণ রূপ। সঙ্গশূন্যতার একাকীত্বে সমুদ্রতীরে সে বিসর্জিত, প্রকৃতি রূপিনী কপালকুণ্ডলার মোহিনী শক্তিতে বিমুগ্ধ, এক আশ্চর্য পুরুষ চরিত্র। তার রূপমুগ্ধতা, কামনা বাসনাযুক্ত পৌরুষ কপালিনীর কঠিন হৃদয়ে প্রতিহত হয়েছেও তার সীমাহীন ঔদাসীন্যে নবকুমারের জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। প্রকৃতিরূপিণী কপালের আকর্ষণ ও বন্ধন যেমন সত্য, তেমনই প্রকৃতির অধীন হওয়াও পুরুষের স্বভাব। প্রকৃতির অশেষ প্রাধান্য সৃষ্টিকারিণী ও সর্বসংহারকারিণী মূর্তিটির আশ্চর্য শিল্পরূপ আছে কপালকুণ্ডলা চরিত্রের মধ্যে। নবকুমারের রূপমুগ্ধতার কারণ সে, বন্ধন তারই রূপময়তার দুর্নিবার আকর্ষণে এবং পরিণাম ওদাসীন্যের সর্বসংহারকারিণী রূপে। "কারণ রমণী ঈশ্বরের কীর্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া; পুরুষ দেবতার সৃষ্টি মাত্র। স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়া। যতক্ষণ সে দুর্বল ততক্ষণ সে জীব বা ক্ষুদ্র মানবক ততক্ষণ ঐ নারীও মায়াময়ী মায়া; সেই মায়ার মহামায়ারূপ দেখিতে পাইলেই ঐ দ্বন্দ্ব হইতে সে মুক্তিলাভ করে এবং তখন সেই মহামায়ার অঙ্কশায়ী হইয়া 'শান্তং শিবং'— অবস্থার পরমানন্দ ভোগে অধিকারী হয়। 'কপালকুণ্ডলায়' সর্বপ্রথম এই তত্ত্ব উঁকি দিয়াছে; সেখানে নায়িকার প্রকৃতি মূর্তি অতিশয় সরল স্বভাব উদাসীন; তাহার নারীরূপও অসম্পূর্ণ, তাই নায়ক কোন সাধনারই সুযোগ পাইল

না।" (বঙ্কিমবরণ—মোহিতলাল মজুমদার)।

অদৃষ্টবাদ বা নিয়তিবাদের তত্ত্ব-ভাবনা ভবানী চরিত্রকে ঘিরে প্রকাশ পেয়েছে। 'ভৈরবী যে সৃষ্টিশাসনকর্ত্রী মুক্তিদাত্রী'—বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-জিজ্ঞাসায় কেবল তা সত্য বলে মনে হয়নি, তার সুদূরপ্রসারীপ্রভাব ও ফলাফলের শিল্পরূপ দেখিয়েছেন তিনি বিশ্বস্তভাবে কপালকুণ্ডলা চরিত্রে। তাই কাপালিকের মত সে ও শক্তিপ্রসাদ প্রার্থিনী এবং কালিকার ইচ্ছাশক্তিতে জীবনের সুখদুঃখ পরিমাপে আগ্রহী। কপাল চরিত্রে ভবানী সম্পর্কে অপরিবর্তনশীল বিশ্বাস, আস্থা ও ভক্তি তার জীবনকে শুধু নিয়ন্ত্রিত করেনি তার পরিণামকেও নির্দেশ করেছে এবং বঙ্কিম ভাব ব্যঞ্জনায় যেন বোঝাতে চেয়েছেন,আমাদের জীবন-ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে এই অদৃশ্য শক্তিরই দুর্নিবার প্রভাব। অধিকারীর "আশ্রয়ে' মন্দির মধ্যে মানবাকার পরিমিতা করাল কালীমূর্তি" ভয়ঙ্করের প্রতিমূর্তি হয়েও নবকুমারের সঙ্গে 'বিবাহ' বিষয়ে দেবী অর্ঘ্য গ্রহণ করায় মঙ্গলদায়িনী। পতিগৃহ যাত্রার প্রাক্কালে ইনিই আবার বিমুখা— 'অভিন্ন বিশ্বপত্র' পড়ে যাওয়ায় তার ইঙ্গিত। সংসারজীবনে শ্যামার সঙেগ কথোপকথনে মৃন্ময়ীর জীবনাকাশে কালিকাশক্তির অপ্রসন্নতার ক্রিয়ারূপ ইঙ্গিত কি গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তার প্রমাণ আছে কপালের উক্তিতে "অপরিচিত ব্যক্তির সহিত অজ্ঞাত দেশে আসিতে শঙ্কা হইতে লাগিল ; ভালমন্দ জানিতে মার কাছে গেলাম। ত্রিপত্র মা ধারণ করিলেন না— অতএব, কপালে কি আছে জানি না।" (২-য় খণ্ড / ৬ ষ্ঠ পরি)। 'অপ্রগাঢ় নিদ্রায় কপালের স্বপ্নদর্শনেও ভৈরবীর নির্দেশ রূপকাশ্রয়ে যেন ব্যক্ত হয়েছে। ভক্তবৎসলা ভবানী অনুগ্রহ করে স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন—সুতরাং ভক্তিভাবে তাঁর নির্দেশ কার্যকরী করার জন্য কপাল কৃতসঙ্কল্প হলেন। "এখন সেই বিশ্বশাসনকর্ত্রী, সুখদুঃখবিধায়িনী, কৈবল্যদায়িনী ভৈরবী স্বপ্নে তাঁহার জীবনসমর্পণ আদেশ করিয়াছেন / কেনই-বা কপালকুণ্ডলা সে আদেশ পালন না করিবেন।" (৪র্থ খণ্ড / ৮-ম পরিচ্ছেদ)। "কপালকুণ্ডলা আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ; যথায় গগন-বিহারিণী ভয়ঙ্করী দেখিয়াছিলেন, সেই দিকে চাহিলেন ; দেখিলেন, রণরঙ্গিনী খল খল হাসিতেছে ; এক দীর্ঘ ত্রিশূল করে ধরিয়া কাপালিকগত পথপ্রতি সঙ্কেত করিতেছে। কপালকুণ্ডলা অদৃষ্ট বিমূঢ়ার ন্যায় বিনা বাক্যব্যয়ে কাপালিকের অনুসরণ করিলেন।" (৪ র্থ / ৮-ম পরি :)। কপালচরিত্রে প্রকৃতি ও ভবানী—প্রভাব দুই ভিন্ন ভাবের প্রতীক নয়, বরং একই ভাবের দু'টি বৈচিত্র্যময় দিক।

কপালকুণ্ডলা চরিত্রের স্বভাবে প্রকৃতির ও কাপালিকের প্রভাব যেমন দেখিয়েছেন বঙ্কিম, তেমনই নবকুমার-মৃন্ময়ী আখ্যানে ভবানী বা অদৃষ্টের সীমাহীন স্পষ্ট বা দুনিরীক্ষ্য প্রভাবকে কার্যকরী করে দেখিয়েছেন তিনি। প্রকৃতির স্নেহময় অপূর্ব রূপরাশির মত কপালও নবকুমারের পরে করুণার্দ্র, মমতাপূর্ণ (নবকুমারকে পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ ? এবং উদ্ধারের প্রসঙ্গ স্মরণীয়) আচরণ করেছিল। আবার প্রকৃতির মত ঔদাসীন্যে নবকুমারের পরে সে আকর্ষণহীনা, সংসার বৈরাগ্যে দীক্ষিতা। অন্তঃকরণে তান্ত্রিকের মত কালিকার অনুগ্রহ লাভে আত্মবিসর্জনে নিষ্কম্পা। অন্যদিকে, কাপালিক চরিত্রটি প্রকৃতির করালমূর্তির প্রতীকী ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ হলেও এ চরিত্রে বঙ্কিম কালিকার প্রভাবকে চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন— কয়েকটি উদাহরণ— (১) ভৈরবীপ্রেরিতোঽসি ; মামনুসর ; পরিতোষঃ তে ভবিষ্যতি। (১ম / ৪র্থ) (২) আমি এক স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। ......যেন ভবানী আসিয়া আমার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছেন। ভ্রূকুটি করিয়া আমায় তাড়না করিতেছেন ; কহিতেছেন, 'রে দুরাচার, তোরই চিত্তাশুদ্ধি হেতু আমার পূজার এ বিঘ্ন জন্মাইয়াছে। তুই এ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়লালসায় বদ্ধ হইয়া এই কুমারীর শোণিতে এতদিন আমার পূজা করিস্ নাই। অতএব, এই কুমারী হইতেই

তোর পূর্ব্বকৃত্যফল বিনষ্ট হইল। ..... সেই কপালকুণ্ডলাকে আমার নিকট বলি দিবে। যতদিন না পার, আমার পূজা করিও না।" (৪ র্থ / ৬ষ্ঠ) সুতরাং ভবানী বা কালিকা শক্তির প্রভাবে উপন্যাসের কাহিনী ধারা পরিণাম সুখী হয়েছে বলা যায়। নিয়তিবাদের ক্রিয়াশীলতায় জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার জগৎ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে— জীবনের উত্থান পতন নির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছে— অলৌকিকতার তত্ত্ব জীবনাতীত ব্যাপার হলেও প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় তার সক্রিয়তা বঙ্কিম শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গীতে জীবন জিজ্ঞাসায় প্রকাশ করেছেন।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে বঙ্কিমের জীবন-জিজ্ঞাসা পুরুষ বা মানবাত্মা এবং প্রকৃতি-শক্তি এই দুই প্রসঙ্গে, প্রশ্ন থেকে সমাধানে উত্তীর্ণ হয়েছে। বাল্যকাল থেকে অরণ্যে লালিত-পালিত ও কাপালিক প্রভাবে প্রতিপালিত হলে বিবাহোত্তর জীবনে কোন ষোড়শী সংসারী হতে পারে কিনা, বঙ্কিম এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলেন। অগ্রজ ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্রের উত্তর তাঁকে সন্তুষ্ট করেনি। পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য সাহিত্যের জীবন-সমস্যা ও জিজ্ঞাসা তাঁর মেধা ও ভাবুকতাকে উৎসারিত করে থাকবে। এবিষয়ে সমালোচক মোহিতলালের অভিমত— "সেই য়ুরোপীয় সাহিত্যের জীবন-চিত্রপটে তিনি একটি বর্ণকে অগ্নির মত জ্বলিতে দেখিয়াছিলেন—তাহা সেই প্রকৃতি শক্তি ; উহাকেই মানব জীবনের সাক্ষাৎ ও দুর্দ্ধর্ষ নিয়ন্তারূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই দৃষ্টিই তাঁহার কবিশক্তিকে কুণ্ডলিনীশক্তির মতই সহসা উদ্বুদ্ধ কয়িছিল, উহাই তাঁহার জীবন-জিজ্ঞাসাকে কাব্যসৃষ্টির পথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল" / **(বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস)**। অন্যত্র, কথাটিকে আরও একটু স্পষ্ট করে সমালোচক বলেন— "পুরুষের জীবন রহস্য বা নিয়তির কঠিন বন্ধন— পুরুষেণ উপরে প্রকৃতির সেই দুর্লঙ্ঘ্য শাসর—সৃষ্টির একটা অমোঘ নীতি বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র মানিয়া লইয়াছিলেন ; এই প্রকৃতিবাদই জীবনবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ)। পাশ্চাত্ত্যের রহস্য-চেতনা, যা মিষ্টিক বলে পরিচিত, বঙ্কিম সেই ভাব-প্রেরণাকে গ্রহণ করে থাকলেও প্রাচ্যের Asiatic Fatalism কেও গ্রহণ করেছেন নির্দ্বিধায়। প্রকৃতির নিয়ামক শক্তি ও তান্ত্রিকতার সাংখ্যদর্শনখ্যাত পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব উপন্যাসে ভাববস্তু বলে গৃহীত হয়েছে। কপালকুণ্ডলা, কাপালিক, অধিকারী সকলেই এই তত্ত্বের অধীন। নবকুমার সেই পুরুষরূপে প্রকৃতি শক্তির অনুগামী—তার জীবন-সাধনা শেষ পর্যন্ত সফল নয়। সুতরাং জীবন জিজ্ঞাসার রোমান্টিক ভাবনা প্রকৃতিমুগ্ধতায় অবসিত নয়— প্রকৃতি শক্তিতত্ত্বের মধ্যে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনাই এই উপন্যাসে প্রকটিত। প্রকৃতি-তত্ত্বের মিষ্টিক ভাবনায় অদৃষ্টবাদের প্রাধান্য স্বীকৃত বলে মানব-লীলার তুচ্ছতা অনিবার্য পরিণামে দেখানো হয়েছে। নিয়তি-তত্ত্বের অঙ্গীভূত মহাশক্তির লীলা মৃন্ময়ী—নবকুমারের অন্তর্ধান রহস্যে ঘনীভূত হয়েছে।

উপন্যাসে ব্যক্তিক্রমধর্মী চরিত্ররূপে মতিবিবির সাক্ষাৎকার। উপন্যাস-অংশের নায়িকা সে। ইতিহাসের দূরাগত কল্পনায় তার কায়া নির্মিত হলেও, মতিবিবির চরিত্রে বাস্তবজীবন-ভিত্তিক মানবীয় ভাবগুলির সমন্বয় লক্ষ্য করি। তার বিচিত্র ভোগৈশ্বর্যময় জীবনে কামনা বাসনার প্রশ্রয়, রিরংসাবৃত্তির তীব্র আসক্তি, প্রেমবোধ ও নিষ্ফল হাহাকারের মধ্যে শূন্যতার অভিব্যক্তি উপন্যাসের উপযুক্ত যথার্থ চরিত্র বলেই গণ্য হবে। কিন্তু তার সমগ্র জীবন কাহিনীতে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়া, মুসলমান ধর্মগ্রহণ ও মোগল রাজ-অন্তঃপুরের বর্ণময় ঐশ্বর্যের অন্তরালে ইন্দ্রিয়সর্বস্বতায় এক অনির্দেশ্য অদৃষ্ট পীড়নের সাক্ষ্য পাওয়া যাবে। এছাড়া নবকুমারের সঙ্গে হঠাৎ চটিতে সাক্ষাতে, প্রেমবোধের জাগরণে, নবকুমারলাভের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতার মধ্যে দৈব-লাঞ্ছিত এক নারীর রূপই অঙ্কিত হয়েছে। কপালকুণ্ডলা চরিত্রে নিয়তি প্রভাব প্রকৃতি তত্ত্ব প্রসূত ; কিন্তু মতিবিবির

বৈচিত্র্যময় জীবন-পরিণামে নিষ্ঠুর দৈবশক্তিরই প্রভাব। আবার উভয় চরিত্রের রস পরিণাম একই সূত্রে বিধৃত।

ঘটনা সংস্থানের দিক থেকে যেসমস্ত অলৌকিকতা, আকস্মিকতা ও ইঙ্গিতময়তা আছে— তার অন্তরালে অদৃষ্টবাদের দুর্নিরীক্ষ্য প্রভাব আবিষ্কৃত হতে পারে। ঔপন্যাসিকের ভাবনা জীবনাশ্রিত হলেও তা অনিবার্য ঘটনাপরম্পরায় নিয়তিবাদের অধীন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে উপন্যাসে তত্ত্বভাবনার প্রাসঙ্গিকতা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। মনে হয়, বঙ্কিমের জীবন-জিজ্ঞাসার প্রশ্ন শেষপর্যন্ত স্থিরসত্যের অভিমুখী হয়ে প্রজ্ঞায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। মানুষের জীবন, তাঁর দৃষ্টিতে, প্রকৃতি-শক্তি শাসিত— তা ইচ্ছাধীন নয়— আমাদের আয়ত্তাতীত অদৃষ্ট-নির্দেশে তার পরিণাম সূচিত হয়। নানান সঙ্কেত, ইঙ্গিতময়তায় অথবা আকস্মিকতায় মানবজীবন নিয়ন্ত্রিত হয়— আপন মনীষায় বঙ্কিম উপলব্ধি করেছেন অদৃষ্টই এই কার্য কারণ সূত্রের পরিচালিকাশক্তি। অরণ্যবাসিনী নারী চরিত্রকে নিয়ে ঔপন্যাসিকের প্রশ্ন, আপন প্রজ্ঞার আলোয় শেষপর্যন্ত অদৃষ্টবাদের সীমাহীন প্রভাবে নির্বিশেষ জীবন-সত্য বলে গণ্য হয়েছে। এই অধ্যাত্মরসের ব্যঞ্জনাই 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের ভাববস্তু। আর এখানেই এই উপন্যাসের মৌলিকত্ব।

কপালকুণ্ডলা : রোমান্স-প্রসঙ্গ

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে রোমান্সনির্ভর উপন্যাসের সৃষ্টি। অদ্বিতীয় এই কথাশিল্পী কাব্যিক কল্পনায় উপন্যাসের কায়া গঠন করেছেন। উপন্যাসের বাস্তব-প্রেক্ষাপটকে কবি-কল্পনার মায়াঞ্জনে সজ্জিত করে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের নতুন পথরেখা সৃজন করেছেন। 'কপালকুণ্ডলা' বাংলা উপন্যাস শিল্পে এক অনন্য প্রয়োগ কুশলতার নজির হয়ে থাকবে। উপন্যাস ও রোমান্সের অন্তর-রহস্য অনুধাবন করে সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন "Novel অবিমিশ্রভাবে বাস্তব, ইহার মধ্যে কল্পনার ইন্দ্রধনুরাগসমাবেশের অবসর অত্যন্ত অল্প। ইহার প্রধান কাজ সমসাময়িক সমাজ ও পারিবারিক জীবন-চিত্রণ ; সত্য পর্যবেক্ষণ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণই ইহার প্রধান গুণ। .....Romance -এর বাস্তবতা অপেক্ষাকৃত মিশ্র ধরণের ; ইহা জীবনের সহজ প্রবাহ অপেক্ষা তাহার অসাধারণ উচ্ছ্বাস বা গৌরবময় মুহূর্তগুলির উপরেই অধিক নির্ভর করে।" সুতরাং রোমান্স রসাশ্রিত উপন্যাসে কল্পনার প্রাধান্য— জীবনের প্রত্যক্ষ বাস্তবতা এখানে অলভ্য— ভাবের আধিক্যে কাহিনী ও চরিত্র নিয়ন্ত্রিত— সর্বত্রই "কল্পনার ইন্দ্রধনুরাগের সমাবেশ"। চরিত্র-সৃষ্টির বাস্তবতার তুলনায় কবিদৃষ্টির স্নিগ্ধ-মধুরতা যেমন এখানে সহজ লভ্য, তেমনই কাহিনীবৃত্তের বাস্তবমুখী অনুবর্তন অপেক্ষা কবিত্বময় জীবন দর্শনের পরে লেখকের সর্বাত্মক অনুরাগও প্রতিফলিত। রোমান্টিক রচনারীতিতে কবি-স্বভাবের আবেগস্পন্দিত জীবনের এক অখণ্ড রূপের প্রকাশ ঘটে। উপন্যাস-শিল্পে বাস্তবজীবনের নিবিড় নৈকট্য এবং রোমান্সে কবিত্বময়তার অশেষ প্রভাব থাকলেও, আধুনিক কালে কাব্যধর্মী বা রোমান্সরসনির্ভর উপন্যাসের সাক্ষাৎ দুর্লভ নয়। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম এই জাতীয় উপন্যাস সৃষ্টির সফল স্রষ্টা।

একদিকে, **কপালকুণ্ডলা** উপন্যাসের রোমান্টিক রাজ্য, অন্যদিকে বাস্তবরসপুষ্ট জীবনানুরাগ— রোমান্স ও উপন্যাসের দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে কবি-সমালোচক মোহিতলাল বলেছিলেন—"উপন্যাস হইলেও এই রচনা একটি সম্পূর্ণ নূতন ছাঁদের গদ্যকাব্যই বটে।" রোমান্সের উপাদানগুলি অর্থাৎ ইতিহাস, প্রকৃতিলোক, অতি-প্রাকৃত ঘটনাবস্তু, রাত্রির প্রভাব, কাব্যধর্মিতা ও সৌন্দর্যপ্রীতি, ভাব-কল্পনার সৃষ্টি করে রস-পরিণামের মাধুর্য এনেছে। আবার জীবনের দিকে তাকিয়ে উপন্যাসের বাস্তবতা আবিষ্কৃত হয়েছে সমকালীন সংসার সমাজের চিত্র চরিত্রে, মতিবিবির প্রবৃত্তিময়তায় ও প্রেমাবেগে কিংবা নবকুমারের জীবন-যাত্রার গতি-প্রকৃতিতে ও শ্যামাসুন্দরীর স্বভাবে। সুতরাং রোমান্স ও উপন্যাস উভয় লক্ষণ বৈশিষ্ট্যে 'কপালকুণ্ডলা' কাব্যধর্মী উপন্যাস বলেই গণ্য হবে। উপন্যাসের বৈচিত্র্যময় রূপসৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র বরেণ্য কথাশিল্পী। তাঁর দৃপ্ত কল্পনা ও কবিত্বশক্তির সূক্ষ্ম কারুকার্যে সৌন্দর্যলোকের সন্ধান পাওয়া যায়— 'কপালকুণ্ডলা' সেই ভাব-সৌন্দর্যের এক অনুপম সৃষ্টি।

কাব্যধর্মী উপন্যাস হিসেবে 'কপালকুণ্ডলা'র পর্যালোচনায় প্রকৃতির দুর্নিবার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মৃন্ময়ীচরিত্র আদ্যন্ত প্রকৃতি কেন্দ্রিক—প্রকৃতির দ্বারা তার চরিত্র পূর্বাপর নিয়ন্ত্রিত। কাপালিকের তান্ত্রিক সাধনা রহস্যময়তায় আবৃত। নবকুমার সংসারী হয়েও অরণ্যপ্রভাবে যেন বিমুগ্ধ ও বিহ্বল, তার চোখে মায়াবীলোকের ইন্দ্রধনু। প্রকৃতিপরিবেশ রচনাতেও কাব্যধর্মিতার ইঙ্গিত। উপন্যাসের সমগ্র কাহিনীতে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ শক্তি বিশেষভাবে অনুভূত হয়। যে 'সাগর-সঙ্গমে' রাত্রিশেষে

ঘোরতর কুজ্ঝটিকায় নৌকাযাত্রীদের দিক্‌ভ্রম হয়েছিল, তারই পথ ধরে নবকুমারের অরণ্যময় জীবনে প্রবেশ,— কল্লোলিত সমুদ্রের গর্জন ; জনহীন অন্ধকারে আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্রের নীরবতা তার নাগরিক অভ্যস্ত জীবনের পরে ছায়াপাত ঘটিয়েছে। 'সমুদ্রতটে' অপূর্ব মূর্তির সাক্ষাৎ —"সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাড়াইয়া অপূর্ব্বরমণীমূর্ত্তি।"— সন্ধ্যালোকে তার মোহিনী শক্তি, নবকুমারের রূপমুগ্ধ চিত্তে যে আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল, কপালের প্রকৃতিময়তার সেই তীব্র আকর্ষণী শক্তিতে তার পরিণাম নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে। রোমান্টিক প্রকৃতিপ্রেম ও সৌন্দর্যপ্রীতিতে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তায় যেন আবৃত। সমালোচক মোহিতলাল তাই মন্তব্য করেছেন— "কপালকুণ্ডলাও কাব্য, এমন কাব্য জগতের কথাসাহিত্যে অল্পই আছে। এই উপন্যাসে বঙ্কিমের কবি দৃষ্টি সৃষ্টির তলদেশে একটা মিষ্টিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া মনুষ্য নিয়তির দুর্জ্ঞেয়তাকেই ঘনাইয়া তুলিয়াছে।" **(বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস)**

কাপালিক ও অরণ্যানীর প্রভাবপুষ্ট কপালকুণ্ডলা প্রকৃতি-শক্তির দ্বারা পূর্বাপর পরিচালিত— এখানকার অদৃষ্টবাদ বা নিয়তিবাদ সেই প্রকৃতি শক্তিরই যেন অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। নবকুমারের সঙ্গে পরিচয়ে তার করুণাময় স্বভাবের প্রকাশ সত্ত্বেও সংসার-জীবনে মৃন্ময়ীর ঔদাসীন্য ও আত্মনির্লিপ্ততা— রহস্যময়ী প্রকৃতির নিরন্তর আকর্ষণ, বঙ্কিমের কল্পনাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। আবাল্য অরণ্য লালিত ষোড়শী নারীর সংসার জীবন সার্থক হয় কিনা— এ প্রশ্নের সমাধানে ঔপন্যাসিক কবি জনোচিত কল্পনার রহস্যময়তায় বাস্তবাতীত জীবনকে যেন প্রত্যক্ষ করেছেন। বঙ্কিমের ভাব-কল্পনায় এ নারী-চরিত্রের জন্ম—তার সৃষ্টি স্থিতি ও লয় সেই ভাবেরই অনুবর্তী। মৃন্ময়ীর চতুর্দিকের পরিমণ্ডলটিও কল্পনার ইন্দ্রধনুতে বিচিত্র বর্ণাভ যুক্ত। সুদূর এক ভেসে আসা রাগিণীর সুর-মূর্চ্ছণায় এ চরিত্র রূপ পায়, কিন্তু সে রূপ বাস্তব=জীবন-রসপুষ্ট নয় বলেই তা ব্যাখ্যাতীত। কেবল ভাব কল্পনার উপলব্ধিতে সে চরিত্রের অস্তিত্ব। কপালকে তাই রাত্রির ঘনান্ধকারে স্বচ্ছন্দ হতে দেখি— নিবিড় বনমধ্যে নিঃসঙ্গ একাকিনী নারীকে সুদূর নীহারিকার মতো রহস্যময়ী মনে হয়। অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে তার আবির্ভাব/বনান্ধকারে নবকুমারের সঙ্গে নতুন জীবনে প্রবেশ— সংসারে অবস্থান করেও তার প্রাত্যহিক জীবন-বৃত্তান্ত রহস্যময়তায় আবৃত— শেষে প্রকৃতির আহ্বানে বা দুর্জ্ঞেয় নিয়তিবাদে "অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে" তার অন্তর্ধান। কাব্যধর্মিতার এ হেন দৃষ্টান্ত উপন্যাস সাহিত্যে বিরল।

প্রকৃতিলোকই এ উপন্যাসের আশ্রয়। যে "রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্‌ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল"— সেই অন্ধকারের অস্পষ্ট মায়াবীলোকে যাত্রার প্রসঙ্গ দিয়ে উপন্যাসের কাহিনী-বৃত্তের সূত্রপাত এবং আগাগোড়া প্রকৃতির প্রভাব ও রূপচিত্রে তার অনুধ্যান। "সেই অমাবস্যার ঘোরান্ধকার যামিনীতে" নবকুমার—কপালকুণ্ডলার অধিকারীর 'আশ্রয়' শিবিরে গমন, ভবানীর অনুগ্রহলাভ ও অভিন্ন বিশ্বপত্রের স্থানচ্যুতি —প্রকৃতি আশ্রিত এ ঘটনাবৃত্ত কল্পনার রঙে রঙীন। 'রাজপথে' মতিবিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ কপালকুণ্ডলার জীবন-পরিণামের কারণ হলেও তা অনিবার্য ছিল না। ঔদাসীন্য ও অনাশক্তির প্রবলতায় এ চরিত্র কাঠামো বঙ্কিমের পরিকল্পনায় সমাপ্তির একই ব্যঞ্জনায় আভাসিত হোত। মতিবিবি তার জীবনে কেবল 'সামান্য কারণ' হিসেবেই আবির্ভূত হয়েছিল। ইতিহাস-বিশ্রুত কাহিনীধারাকে যুক্ত করবার 'কল্পনা', লেখকের ইতিহাস-পাঠের অনুরাগ থেকেই উৎসারিত। যাইহোক্, সংসার জীবনের একাধিক দৃশ্যচিত্র না থাকলেও সামান্য দু-একটি ইঙ্গিতে কপালকুণ্ডলার অরণ্যময় জীবন-প্রীতির নিদর্শন আছে। শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে আপাত উচ্ছ্বাসহীন

কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি দর্শন— "সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। .....নিকটে, এক দিকে নিবিড় বন; তন্মধ্যে অসংখ্য পক্ষী কলরব করিতেছে। অন্যদিকে, ক্ষুদ্র খাল, রূপার সূতার ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। .....অনেক দূরে নৌকাভরণা ভাগীরথীর বিশাল বক্ষে সন্ধ্যাতিমির ক্ষণে ক্ষণে গাঢ়তর হইতে।" (দ্বিতীয় খণ্ড / ৬-ষ্ঠ পরিঃ)—কাব্যময়তায় সম্পৃক্ত।

শ্যামার সঙ্গে কথোপকথনে কপালকুণ্ডলার জীবনে প্রকৃতির অনিবার্য ভূমিকা প্রকাশ পায়— "বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।" তারপর "কপালকুণ্ডলা একাকিনী এক সঙ্কীর্ণ বন্য পথে ঔষধির সন্ধানে চলিলেন। যামিনী মধুরা, একান্ত শব্দমাত্র-বিহীনা। ....পশুপক্ষী নীরব। .....একান্ত নিঃশব্দ বায়ুমাত্র। .....কেবলমাত্র তদ্রূপ বায়ুসংসর্গে সম্ভুক্ত পূর্ব্বসুখের অস্পষ্ট স্মৃতি হৃদয়ে অল্প জাগরিত হইতেছিল।" ব্রাহ্মণবেশী মতিবিবির সঙ্গে সাক্ষাতের পর উদ্‌ভ্রান্ত মৃন্ময়ীর গৃহ-প্রত্যাগমন এবং দ্বার রুদ্ধ করার সময়— "একবার বিদ্যুৎ চমকিল। একবারে বিদ্যুতেই তাহাকে চিনিতে পারিলেন। সে সাগর তীর প্রবাসী সেই কাপালিক।" (৪র্থ / ২য়)। কপালের স্বপ্নদর্শনেও প্রকৃতির একচ্ছত্র অধিপত্য— অস্তগামী সূর্যের স্বর্ণধারা, আকাশমণ্ডলে মেঘেদের স্বর্ণবৃষ্টিতে ছোটাছুটি— অতঃপর নিবিড়নীল কাদম্বিনীর আকাশব্যাপ্ত রূপের মাঝে তাৎপর্যপূর্ণ স্বপ্নদর্শন— প্রকৃতিময়তায় কল্পলোকের প্রাধান্য। যে প্রেমবোধের প্রাবল্যে নারী সংসারী হয়, কপালকুণ্ডলার সে বন্ধন ছিল না। "আকাশমণ্ডলে নবনীরদানিন্দিত" মূর্তি ভৈরবী যেন কপালকুণ্ডলাকে "এক দীর্ঘ ত্রিশূল করে ধরিয়া কাপালিকগত পথপ্রতি সঙ্কেত" করেছে। আর এরই অনিবার্য পরিণামে "অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে" কপালকুণ্ডলার আত্মহুতি। প্রকৃতি, আকাশপথে ভৈরবী, কাপালিক— একই ভাবনার বৈচিত্র্যময় উপস্থাপনা— বঙ্কিমের কবিত্বময় উপলব্ধির বিচিত্র প্রকাশ। মোটকথা, 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ কাহিনী ও চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। ভাব-পরিমণ্ডল রচনাতেও প্রকৃতির একচ্ছত্র প্রাধান্য॥

একদিকে প্রকৃতির নিঃসীম নির্জনতা, তার অপরিমিত সৌন্দর্যের জগৎ, অন্যদিকে ইতিহাসের সুদূর বিশ্রুত জীবনকাহিনীর অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি— কল্পনার এই দুই ভাবকে ঘিরে কপালকুণ্ডলার কাব্য-জগৎ। ঐতিহাসিক সত্য-তথ্য কবিত্বের ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত। ইতিহাসের সত্যানুসন্ধান যদি এ উপন্যাসের একটি দিক হয়, তাহ'লে অন্য দিক। কবি-কল্পনায় ইতিহাসের অনুবর্তন। আর, এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের কবিত্বের ঐশ্বর্য খুঁজে পাওয়া যাবে। 'কপালকুণ্ডলার' রোমান্টিক ঘটনাবস্তুর সঙ্গে পদ্মাবতীর বাস্তব-জীবনকাহিনীর মেলবন্ধনে উপন্যাসের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে নি। রোমান্টিক মানসপ্রবণতার চিহ্ন এখানেও বর্তমান। নবকুমারে পূর্বপত্নী পদ্মাবতীর মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ সূত্রে দিল্লী-আগ্রার প্রসঙ্গ, পথিমধ্যে আকস্মিক সাক্ষাতের পরিপ্রেক্ষিতে কপালকুণ্ডলা-নবকুমারের জীবনে তার প্রবেশ, কপালের ট্রাজিক পরিণামের কারণ হিসেবে তার উপস্থিতি— উপন্যাসের কল্পনা-বৃত্তের পূর্ণতা ঘটিয়েছে। মতিবিবির উপকাহিনী চিত্তাকর্ষক— রোমাঞ্চকর। তার প্রবৃত্তির বাধাহীন প্রশ্রয়, জীবন-উল্লাস, মোগল হারেমের অদেখা জীবন-ধারা 'কল্পনার পরিমণ্ডল' গড়তে সাহায্য করেছে। এই সূত্রে জাহাঙ্গীর মেহের-উন্নিসার প্রণয় কথা, খসরুকে নিয়ে ষড়যন্ত্র, আমীর ওমরাহদের উচ্ছৃঙ্খলতা, অপরিমিত ঐশ্বর্যের চিত্রলেখায় সমগ্র দৃশ্যচিত্র অতীত কল্পনাকে পুষ্ট করেছে। 'তৃতীয় খণ্ডে' ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের অবতারণা হলেও জীবনের এক ভিন্ন রূপ সেখানে স্পষ্ট— কাব্যবৃত্তের অন্যতম লক্ষ্য যদি বনচারিণী কপালকুণ্ডলা হয়, তাহ'লে এই বৃত্তের অন্যপিঠ হ'ল মতিবিবি। মতিবিবির ভোগসর্বস্বতা, মৃন্ময়ীর ঔদাসীন্য ও বৈরাগ্য—ইতিহাস ও কল্পনার এই দুই দিক শেষ

পর্যন্ত বিস্ময়কর রোমান্টিক কল্পনা ও ভাবের প্রসারতায় সম্মিলিত হয়েছে।

বঙ্কিমের রোমান্টিক কবি-মন প্রকৃতির দুর্নিরীক্ষ্য প্রভাবের অনুষঙ্গ হিসেবে অদৃষ্টবাদ বা অতিপ্রাকৃত বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা ঘটিয়েছে। আধুনিক উপন্যাসের বাস্তবতা নয়, অসাধারণ বা অপ্রাকৃত দৃশ্য-ঘটনার অবশ্যম্ভাবী প্রভাবে উপন্যাসের নায়িকা মৃন্ময়ী চরিত্র নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। রোমান্টিক কবি-প্রবৃত্তির অনিবার্য ফলশ্রুতিতে বিশ্বমাতা ভবানীর প্রাধান্য, ভৈরবী মূর্তি-দর্শন, কপালকুণ্ডলা ও কাপালিকের স্বপ্ন পরিকল্পিত। কপালকুণ্ডলার জীবন-কাহিনী এই অদৃশ্য শক্তির দ্বারা পরিণাম মুখী হয়েছে। প্রকৃতি ও অদৃশ্য অনৈসর্গিক শক্তি এই দ্বিবিধ আকর্ষণে মৃন্ময়ীর জীবন-লীলার ক্রম পরিণতি। উপন্যাসের রোমান্টিক ভাবমণ্ডল সৃজনে দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তিবাদের অপরিসীম ভূমিকাআছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক মোহিতলালের বক্তব্য "কপালকুণ্ডলার ভাববস্তু সম্বন্ধে আর একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে এই কাব্যে একপ্রকার অদৃষ্ট বা অখণ্ডনীয় নিয়তির ক্রিয়া যেন অতিশয় প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।...'কপালকুণ্ডলার এই 'অদৃষ্ট' সাধারণ মানবীয় সংস্কারের 'অদৃষ্ট' নয়,— উহা সেই দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় শক্তিরই লীলা।" (বঙ্কিম-বরণ)/ ভাব কল্পনায় বঙ্কিমের এই অদৃষ্টবাদ ইঙ্গিতময়তা ও সাংকেতিকতায় উপন্যাসের গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং অপ্রাকৃত শক্তির দুর্নিবার লীলার মধ্যে রোমান্টিক মনোবৃত্তি প্রশ্রয় পেয়েছে।

কবিত্বের কল্পনাচরিতায় 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস রাত্রির কাব্য বলে চিহ্নিত হতে পারে। একাধিক দৃশ্য-চিত্রে রাত্রির অপরূপ রূপসজ্জার আয়োজন আখ্যানে দেখা যায়। (১) 'সাগরসঙ্গমে' নবকুমারের প্রকৃতি-সৌন্দর্য দর্শন— "অনন্ত জলরাশি চঞ্চল রবিরশ্মিমালা প্রদীপ্ত হইয়া গগন প্রান্তে গগন সহিত মিশিয়াছে। ..... দূরস্থ বারিরাশি নীলপ্রভ।" অথবা "বিজনে"--- মনের চাঞ্চল্যহেতু ইতস্ততঃও ভ্রমণকালে— "অন্ধকারে সর্বত্র জনহীন— আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র, সর্বত্র নীরব, কেবল অবিরল কল্লোলিত সমুদ্রগর্জ্জন আর কদাচিৎ বন্য পশুর রব।" (২) কাপালিকের সঙ্গে নবকুমারের সাক্ষাৎ দৃশ্যটি গভীর রাত্রিতেই ঘটেছিল,— সমুদ্র ও অরণ্যানী এবং রাত্রিকালীন গম্ভীর পরিবেশে নবকুমারের নতুন জীবনে প্রবেশ ঘটে। নিবিড় বনমধ্যে সাগর—গর্জ্জন ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র—অস্তগামী সূর্যের কিরণে রক্তিমাভ সাগর-তরঙ্গ এমন এক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় বিচিত্র অনুভূতির গভীরতায় কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ— 'সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্ত্তি"— "সেই গম্ভীরনদী সাগরকূলে সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।" রাত্রির গহন গভীর রহস্যমতায় কপালকুণ্ডলার চরিত্রও যেন আলোআঁধারি ভাব-ব্যঞ্জনায় আভাসিত। সমস্ত আখ্যায়িকায় এই অবগুণ্ঠিতা নারীরই প্রাধান্য, নবকুমারের সঙ্গে সংসার জীবনে প্রবেশ করেও রহস্যময়ী এই নারী ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। আর এখানেই রোমান্টিক মানসিকতার প্রশ্রয়— "সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী, রমণী সুন্দরী ; ধ্বনিও সুন্দর ; হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্যের লয় মিলিতে লাগিল।" (১ম / ৫ম) (৩) কাপালিকের সঙ্গে বধ্য-ভূমিতে যাওয়ার কালও সন্ধ্যালোক। মৃন্ময়ীর করুণার্দ্র উপস্থিতিও এই অন্ধকারের রহস্যময়তায়। কাপালিকের শিখরচ্যুত হওয়া এবং কপাল-নবকুমারের বিবাহ বন্ধনের আয়োজনও "অমাবস্যার ঘোরান্ধকার যামিনী"তে। "শীতকালের অনিবিড় মেঘে আকাশ" যখন আচ্ছন্ন তখন মতিবিবির সঙ্গে সাক্ষাৎকার— কাহিনীবৃত্তের নতুন গতি-সঞ্চার ঘটিয়েছে।

(৪) 'অবরোধে' (১ম / ৬ষ্ঠ পরিঃ) শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে কথোপকথনের সময়কাল সন্ধ্যা। বনদেবী মৃন্ময়ীর সংসার অনাসক্তি ও ঔদাসীন্য এবং অরণ্যপ্রীতির পরিচয় এই অংশে আছে—

"বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।" এই সংসার-অনাসক্তি কপালকুণ্ডলার জীবন-পরিণামের আগাম ইঙ্গিতও বটে। (৫) লুৎফ-উন্নিসার ব্রাহ্মণকুমারের ছদ্মবেশ-গ্রহণ ও কপালকুণ্ডলার অনিষ্ট-সাধনে কাপালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ—গভীর রাত্রিতে, নির্জন বনমধ্যে। (৬) শ্যামার জন্য বনৌষধি সংগ্রহে রাত্রিতে মৃন্ময়ীর বনমধ্যে গমন-ব্রাহ্মণকুমারের সাক্ষাৎ কিংবা "অপ্রগাঢ় নিদ্রায়" কপালকুণ্ডলার স্বপ্নদর্শন সমস্তই রাত্রিকালীন ঘটনা। কাপালিকের স্বপ্নদর্শনও রাত্রিতে। (৭) লুৎফউন্নিসাকে— "আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব,"— মৃন্ময়ীর এই সিদ্ধান্ত-গ্রহণ রাত্রিকালীন ঘটনা। "আকাশমণ্ডলে নবনীরদমূর্ত্তি" ভৈরবীর আহ্বান— শ্মশানের নিস্তব্ধতা, আসন্ন বিপদসঙ্কেতকে রাত্রির ব্যঞ্জনায় গভীরতা দিয়ে কপালকুণ্ডলার 'গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে' আত্মবিসর্জন ও নবকুমারের অনুগমন— সর্বত্র অন্ধকারের প্রাধান্য।

কপালকুণ্ডলার জীবনকে কেন্দ্র করে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বঙ্কিম এ উপন্যাসে করেছেন, তার বাস্তব-ভিত্তি সম্পর্কে যে তাঁর সংশয় ছিল, তার প্রমাণ, উপন্যাসের মূল কাহিনীধারা, মৃন্ময়ীর জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনায় রাত্রির অন্ধকারকে আশ্রয় করা। কল্পনার প্রবলতায় কপালকুণ্ডলার জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক, তার পরিণামও দেখিয়েছেন এবং নবকুমার ও মতিবিবিকে সেই কল্পিত জীবনপথে অনুগমন করতে যেন বাধ্য করেছেন। রাত্রির অন্ধকার ও তার রহস্যময়তায় মৃন্ময়ীর জীবন আগাগোড়া আবৃত তার অবগুণ্ঠন শেষ পর্যন্ত উন্মোচিত হয়নি। তাই তার সংসার-জীবন দিনের আলোয় উজ্জ্বল হ'ল না— কাপালিক ও প্রকৃতি, প্রকৃতি ও ভবানী তার জীবনকে দুরধিগম্য অনির্বচনীয়তায় ভরিয়ে তুলল। রোমান্টিক আবেষ্টনের, এমনই প্রভাব। সুতরাং কাব্যিক ব্যঞ্জনায় 'কপালকুণ্ডলা' যে রাত্রির কাব্য, এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করা চলে না।

এক অর্থে, 'কপালকুণ্ডলা'র কাব্যধর্মিতা উপন্যাসের বাস্তব পথরেখা ধরে বিবর্তিত নয় বলে উপন্যাসের চিত্র-চরিত্রে কবিত্বের মাধুর্য। "কপালকুণ্ডলা প্রতিভার আনন্দ-স্ফূর্তি। ..... কপালকুণ্ডলা tale নহে, উপন্যাস নহে, উহা গদ্যরীতির কাব্যনাটক, গ্রীক নাটক।" (শশাঙ্ক মোহন সেন)। "কাব্যাংশে কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমের চরম সৃষ্টি—উৎকৃষ্ট কাব্যের উৎকৃষ্টতর সৃষ্টি। এ সৃষ্টির পার্শ্বে বঙ্কিমের অন্যান্য সৃষ্টি ধরিলে ম্লান ও মলিন হইয়া যায়।" (হারাণচন্দ্র রক্ষিত)। উপন্যাস হিসেবে 'কপালকুণ্ডলা' একক কবিত্বময়তায় উপস্থাপিত স্বীকার্য। সাহিত্য-শিল্পের সমস্ত শাখা-প্রশাখায় সৌন্দর্যের অস্তিত্ব বর্তমান থাকলেও, রোমান্স-রস-নির্ভর উপন্যাসে তার প্রাধান্য কাব্যের মতই গুরুত্বপূর্ণ। 'কপালকুণ্ডলা' রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর অনিন্দ্যসুন্দর ফসল— তার শব্দ-ধ্বনি, অর্থ-ধ্বনি, শ্রুতি ধ্বনি যেমন মোহময় জগৎ রচনা করে, তেমনি প্রকৃতির চিত্রলিপিতে, সাঙ্গীতিক সৌন্দর্যময়তায়, মানব-মানবীর রূপ-সৌন্দর্যে, চিত্র-সৌন্দর্যে, আনুভাষ্য সৌন্দর্যে এ উপন্যাস কাব্যের মতো আস্বাদনীয় হয়ে উঠেছে।

মতিবিবি, নবকুমার ইত্যাদি চরিত্রের বাস্তব ভিত্তি হয়ত আছে। উপন্যাস অংশের এরাই প্রধান চরিত্র কিন্তু লেখকের রোমান্টিক কল্পনার প্রবল স্রোতধারায় 'মৃন্ময়ীক্ষ অন্য সব চরিত্রকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। নবকুমার আপন ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে তার অনুগমন করেছে— এমনকি তার ব্যক্তিত্ব প্রথম দিকে প্রকাশ পেলেও 'বনদেবীর' সাক্ষাতের পর তা অদৃশ্য হয়েছে। মতিবিবি কৃতসঙ্কল্প হয়ে মৃন্ময়ীর অনিষ্ট করতে চাইলেও, "আমি বনচর হইব" সিদ্ধান্তে কিছুটা হতবাক্ ও বিভ্রান্ত। নবকুমারকে লাভ করার প্রসঙ্গ অনুক্ত থেকে গিয়েছে। মতিবিবির চরিত্রে ট্রাজেডির যে সম্ভাবনা ছিল,— তা পরিত্যক্ত হয়েছে এই পর্বে। অন্য প্রসঙ্গগুলি উপন্যাসের বাহ্য ঘটনা।

লেখকের অন্তঃপ্রেরণায় যে কবিত্বময় ভাবের উজ্জীবন ঘটেছিল, দক্ষ শিল্পীর মত রূপে, রঙে ও বিচিত্র ঐশ্বর্যে তাকে ভরিয়ে তুলেছেন তিনি।

বঙ্কিমের রোমান্টিক মনোবৃত্তির অন্যতম গুণ হ'ল— ঘটনাবস্তুর কার্য-কারণ সূত্র বা প্রাসঙ্গিকতায় কল্পিত চিত্র-চরিত্রের তাৎপর্য নিরূপণ করা। এজন্য, কপালকুণ্ডলা চরিত্র তাঁর কল্পনার আধার হলেও নবকুমার, মতিবিবি, কাপালিক ইত্যাদি চরিত্রগুলি সঙ্গতি সূত্রে কেন্দ্রীয় চরিত্রের সঙ্গেই ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। স্থান-কাল-ঘটনাগত ঐক্যের বিশিষ্ট ব্যঞ্জনা সমগ্রতায় রসোত্তীর্ণ—Herbert Grierson এর মত বলা যায়— "It is a harmony of all the elements sensuous, intellectual, imaginative, none of which would be what it is apart from the others— diction, thought, imagery, rhythm, all are interdependent" 'কপালকুণ্ডলা উপন্যাস ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের একক, অনন্য সৃষ্টি। কেবল বাংলা সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও এ উপন্যাসের সমগোত্রীয় কোন রচনারীতির নিদর্শন নেই বলে R.W Fraser তাঁর Literary History of India গ্রন্থে অভিমত দিয়েছেন—"Outside the Marriage de Loti there is nothing comparable to the Kapal Kundala in the history of Western fiction।" (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রকাশিত কপালকুণ্ডলারভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

তান্ত্রিক কাপালিকের সাধনায় নিষ্ঠুরতা ও কাঠিন্য; বন্য-প্রকৃতির গহন-গভীর অন্ধকার ও রহস্য, সৈকতভূমি, পুরানো মন্দির, দুর্গম পথ ও দস্যুভয়, মোগল রাজ অন্তঃপুর— রোমান্সলোকের এসব উপকরণ নিয়ে পরিমিত বর্ণনায়, অপরিমিত রস-সৌন্দর্য্যের যে জগৎ রচনা করেছেন বঙ্কিম, তাতে আখ্যায়িকার ভাবমণ্ডলটি রোমান্টিক হতে পেরেছে। অলঙ্করণে ও অঙ্গ-বিন্যাসে প্রকৃতিপ্রেম, ও দুর্জ্ঞেয় রহস্য একাত্ম হয়েছে; আর সমস্ত কিছু অতিক্রম করে স্থায়ী হয়েছে সৌন্দর্যপ্রীতির অনুপম রূপ-নির্যাস— উপন্যাসের অন্যতম প্রাপ্তি সেই সৌন্দর্য-সুষমা। এই অর্থে 'কপালকুণ্ডলা' গদ্য-কাব্য কিংবা রোমান্টিক উপন্যাস।

উপন্যাসের কাব্যধর্ম

উপন্যাস সাহিত্য-শিল্প অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের সৃষ্টি। গঠনকৌশল বা আঙ্গিকে নাটকের সঙ্গেই এর মিল বেশী। উপন্যাসের বর্ণনারীতি নাটকে প্রত্যাশিত নয়— কারণ নাটক একান্তই নৈর্ব্যক্তিক সৃষ্টি। সুতরাং উপন্যাস-শিল্পে কবিত্ব বা কাব্যধর্মের প্রয়োগ ঘটতে পারে, রোমান্সধর্মী উপন্যাসই তার প্রমাণ। নাটকে কবিত্বধর্মী ভাব-ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হলেও ইংরেজ-সমালোচক কবি টি.এস. এলিয়ট তার মধ্যে কাব্যের ভাষা প্রয়োগ বাঞ্ছিত বলে মনে করেছেন "It will appear that prose, on the stage, is as artificial as verse; or alternatively, that verse can be as natual as prose." উপন্যাসে কাব্যধর্মিতার অবকাশ নাটকের তুলনায় বহুলাংশে বেশী। বিবিধ প্রবন্ধের অন্তর্গত "বিদ্যাপতি ও জয়দেব" প্রবন্ধে গীতিকাব্যের স্বরূপ ব্যাখ্যাকালে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন— "কাব্যের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে এবং মনের অবস্থাবিশেষে বাহ্য দৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়— উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়াসমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন তিনিই সুকবি।" উপন্যাসে প্রকৃতি ও মানব উভয়কে কেন্দ্র করে, জীবনের অন্তরঙ্গ ও নিবিড় রূপ, প্রকাশ পায়। জীবনরহস্য আবিষ্কারে একনিষ্ঠতায় ঔপন্যাসিক ধূলি-ধূসরিত বাস্তব-জীবনের প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে ভাবরাজ্যে আরোহণ করেন। নৈসর্গিক বস্তুসমূহ অনৈসর্গিক কাব্যব্যঞ্জনায় বাস্তব জীবনকে কিছুটা ছাড়িয়ে গেলেও, তা একঅর্থে জীবন-ব্যতিরিক্ত কোন ভাব নয়। কারণ, সাহিত্য-শিল্পের কাব্যধর্ম সৌন্দর্যের অন্তর্গত এবং সে সৌন্দর্য "চিরনূতন এবং চিরপ্রীতিকর।" কাব্যে আবেগের প্রাধান্য— উপন্যাসে বস্তুনিষ্ঠা। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে কবিত্বের যোগ আছে— যেহেতু জীবন কেবল নিছক সুখ-দুঃখের আবর্তে আবদ্ধ ঘটনাবৃত্ত নয়। মনের যে সংযোগ-ভাব থেকে সাহিত্যের সৃষ্টি, সেই ভাবই কবিত্বের জন্ম দেয়। সুতরাং কবিত্ব ও উপন্যাস পরস্পরের পরিপূরক। বঙ্কিম সেই অর্থে 'সুকবি'। 'কপালকুণ্ডলা' তার উজ্জ্বল নিদর্শন।

জীবনের সঙ্গে সৌন্দর্যবোধের নিবিড় যোগ থেকে কবিত্বের জন্ম। কল্পনা ও জীবন— অচ্ছেদ্যবন্ধনে জড়িত। শ্রেষ্ঠ কবি-কল্পনা জীবনকে নতুন স্বাদে দীক্ষিত করে জীবনের পরিধিকে বাড়িয়ে দেয়। সীমাবদ্ধ বাস্তবজীবন প্রসারতা লাভ করে। কাব্যব্যঞ্জনা জীবনের ভিন্নতর তাৎপর্যকে ফুটিয়ে তোলে। এদিক থেকে, বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা'-উপন্যাসের কাব্যধর্ম সংক্ষিপ্ত ও সামান্য ঘটনাবস্তুকে অবলম্বন করে জীবনের গভীরতর ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। উপন্যাসটি কাব্যময় ছন্দে যেন পরিকল্পিত— অস্পষ্ট সন্ধ্যালোক, সমুদ্র তটভূমি, আলো-আঁধারি প্রকৃতি ও অরণ্যের সৌন্দর্য-সুষমা, মোহিনী মূর্তি কপালকুণ্ডলা, বধ্যভূমি, নবকুমারের রূপ-মুগ্ধতা, কাপালিকের বীভৎস তান্ত্রিক আচারসর্বস্বতা, মতিবিবি-কেন্দ্রিক মোগল জীবনধারার ভোগৈশ্বর্যময় ইতিহাসের রহস্যময় জগৎ এবং প্রেতভূমির কুহেলিকা ইত্যাদি রোমান্টিক উপাদানের মধ্যে বাস্তব ও বাস্তবাতীত জীবনকে তুলে ধরেছেন লেখক। এখানে আখ্যানবস্তু সরল— জীবন-ভাবনা কাব্যিক

ব্যঞ্জনায় যেন জটিলতামুক্ত। চরিত্রগুলি আপন স্বভাবের পথে পদচারণা করেছে। কপালকুণ্ডলার সাবল্য সর্বাধিক হলেও নবকুমার, কাপালিক, মতিবিবি চরিত্রে একটা সহজ-সুন্দর ভঙ্গিমা আছে। তাদের জীবন-যাত্রা প্রণালী সরলরেখায় চিত্রিত। কাপালিক চরিত্রে ভয়ঙ্কর মূর্তি অঙ্কিত হলেও তা ভীষণ-সুন্দর। নবকুমারের রূপমুগ্ধতা ও মতিবিবির প্রবৃত্তিকেন্দ্রিক জীবন থেকে উত্তরণের বিবরণটি মনোরম। একমাত্র অদৃষ্টবাদে বা ভবানী চরিত্রে কিছুটা অস্বাভাবিকতা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু কপালকুণ্ডলা চরিত্রের সঙ্গে তার অভিন্ন সম্পর্ক কাব্যগুণকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। চরিত্র ও ঘটনাবৃত্তের মেলবন্ধনে যেমন স্বাভাবিকত্ব ও সাবলীলতা দেখা যায়, তেমনই উপন্যাসের ভাবনালোকে রয়েছে কল্পনার ঐশ্বর্য। "কপালকুণ্ডলা tale নহে, উপন্যাস নহে, উহা গদ্যরীতির কাব্য-নাটক, গ্রীক নাটক"— এই মন্তব্যকে তাই শিরোধার্য করে নিতে হয়। "বস্তুতঃ কপালকুণ্ডলাকে উপন্যাস এমন কি, রোমান্সও না বলিয়া, কাব্য বলাই যুক্তিযুক্ত। কাব্যধর্ম্ম ইহার পত্রে পত্রে পরিস্ফুট; পড়িতে পাড়িতে ইহার মাধুর্য্যে ও কমনীয়তায় পাঠকের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে"— (বঙ্কিমচন্দ্র: অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত)। এ উপন্যাসের কাব্যগুণ এত প্রবল যে উপন্যাস-শিল্পের কলা-কৌশলের সঙ্গে কবিত্বকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' তাই বাতিক্রমধর্মী উপন্যাস সন্দেহ নেই।

"যদি শিশুকাল হইতে ষোলবৎসর পর্যন্ত কোনও স্ত্রীলোকে সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক দ্বারা প্রতিপালিতা হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ না দেখিতে পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে যদি কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজ-সংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে ও তাহার উপর কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে?"— বঙ্কিমমানসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কপালকুণ্ডলা চরিত্রের প্রকৃতিময়তা দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে নিয়ন্ত্রিত হতে দেখা যায়— (১) প্রকৃতির বাহ্যিক রূপময়তা ও (২) তার অন্তর্লীন প্রভাব। বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্যে উপন্যাসের আখ্যানবস্তু তো আগাগোড়া নিয়ন্ত্রিত— 'সাগরসঙ্গমে', 'সমুদ্রতটে,' 'বিজনে,' 'উপকূলে', 'স্তূপশিখরে'। এখানে 'সিকতাময় সৈকতভূমি, সাগরগর্জ্জন বা জলকল্লোল, গাঢ় কুজ্ঝটিকার মতো অরণ্যানীর গহন-গভীর রহস্য, অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকের শ্রী ও সৌন্দর্য— দিগন্ত বিস্তৃত নিসর্গের সৌন্দর্যশোভা অপূর্ব চিত্রপটে যেন অঙ্কিত। চতুর্থখণ্ডে ঘটনাস্রোতও প্রকৃতির অনুষঙ্গে চিত্রিত— 'কাননতলে' শ্বেত কুসুমদল, পক্ষীর পক্ষস্পন্দনশব্দ, মধুমাসের দেহস্নিগ্ধকর বায়ুর সঙ্গে অমল নীলনান্ত গগন অথবা বালিয়াড়ি শিখরে সাগরবারিবিন্দু সংস্পৃষ্ট মলয়ানিল কিংবা ঘনঘটায় মসীময় আকাশমণ্ডল ও ঘন ঘন গম্ভীর মেঘশব্দ এবং অশনিসম্পাতশব্দ ইত্যাদি তার প্রমাণ। 'প্রেতভূমে' অস্পষ্ট শ্মশানভূমির ভীষণ রূপ দর্শনেও বাহ্য প্রকৃতির রূপ-চিত্রণ—চৈত্র মাসের অপ্রতিহত বায়ুবেগ, অন্ধকারে বিস্তৃত বিশাল তরঙ্গিণীহৃদয়— তরঙ্গাভিঘাতজনিত কলকল রবে গগন ব্যাপ্ত হওয়া, শবভুক পশুগণের কর্কশ ধ্বনি ইত্যাদি চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচি মালায় আন্দোলিত হতে হতে নবকুমার-কপালকুণ্ডলার অন্তর্ধান দৃশ্য যেন কবিত্বময় ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত। প্রকৃতির অন্তর্লীন প্রভাবে কপাল চরিত্র নিয়ন্ত্রিত— প্রকৃতিই তার নিয়ামক শক্তি। সন্ধ্যালোকে তার 'মোহিনী শক্তি' যেমন প্রকৃতিময়তায় দীক্ষিত তেমনি অপূর্ব মূর্তিকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে দেখার— উদাহরণ "সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব

রমণীমূর্ত্তি।" দিনের আলোয় নয়, অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে মায়াবী মূর্তিতে যে চরিত্র আবির্ভূতা, সংসার জীবনের প্রত্যক্ষ প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার স্পষ্টালোকে তাকে দেখা যায়নি কখনো। নবকুমারের রূপমুগ্ধ প্রেম, নারীস্বভাবজাত সংসার প্রীতি, তাকে আকর্ষণ করেনি। প্রকৃতির স্নিগ্ধ, গম্ভীর, জ্যোতির্ময়ী রূপে মৃন্ময়ীকে দেখা গেলেও নিসর্গলোকের রহস্যময়তা ও আশ্চর্য ঔদাসীন্যের ভাব-গভীরতায় এ চরিত্র রূপায়িত। প্রকৃতির মায়াময় রূপৈশ্বর্যের আসক্তি ও ঔদাসীন্যের আসক্তিহীনতা এই দুই ভাবনায় কপালকুণ্ডলর চরিত্র নির্মিত। তার একটি রূপে আকৃষ্ট হতে হয়, রূপমুগ্ধতার ভাব আসে— আর একটা রূপে নিঃসীম ঔদাসীন্য। তার সংসার জীবনে প্রবেশের মধ্যে আলো-আঁধারির অস্পষ্টতা— প্রবেশের ক্ষণে প্রস্থানের প্রস্তুতি। তাই সংসারী হয়েও তার অন্তরে নিবিড় অরণ্যানীর নিরন্তর আকর্ষণ এবং নবকুমারের প্রতি করুণার্দ্র হয়েও মৃত্যুকে বরণ করে নেবার কৃতসঙ্কল্পতায় অটলতা। এমনই আশ্চর্য সীমাহীন ঔদাসীন্যের গভীরতায় এ চরিত্র আশ্লিষ্ট। সুতরাং প্রকৃতিই এই চরিত্রের নিয়ামক শক্তি।

উপন্যাসের কথাবস্তু, ভাব-ভাবনায় এ আখ্যায়িকা কঠিন বাস্তবতার পথ ধরে পরিণামমুখী হয়নি। ঔপন্যাসিকের কবিত্বময় অনুভূতির রূপ-চিত্রণে এ উপন্যাস স্বতন্ত্র-শ্রেণীর। তাই এখানে পরিবেশ-রচনায় কবিত্ব আছে—চরিত্র-চিত্র অঙ্কনে রোমান্টিক মনোভাবের পরিচয় বড় হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র অরণ্যময় প্রকৃতিলোক সৃজনে যেমন কল্প-সৌন্দর্যের প্রাধান্য দিয়েছে, তেমনি ইতিহাসের সুদূর ঘটনাবৃত্তকে অতীত-কল্পনা-ঐশ্বর্যে ব্যক্ত করেছেন। ঐতিহাসিক সত্যঘটনা কালের দীর্ঘ ব্যবধানে ভাব-কল্পনার অঙ্গীভূত হয়েছে। 'রাজপথে' সন্ধ্যালোকে 'শীতকালের অনিবিড় মেঘে আকাশ যখন আচ্ছন্ন, মতিবিবির সঙ্গে নবকুমারের সাক্ষাৎ। মতিবিবি সূত্রে দিল্লী আগ্রার ভোগৈশ্বর্যময় জীবন, কাহিনীতে অনুপ্রবেশ করে। কপালকুণ্ডলা কেন্দ্রিক প্রকৃতি-চিত্র এবং ইতিহাস আশ্রিত রোমান্সরস— আখ্যানবস্তুর এই দু'টি দিকেই রোমান্টিক কবি-প্রকৃতির পরিচয়। জীবনের দুই প্রান্তে দুই রূপ— প্রকৃতিচেনায় নিঃসীম ঔদাসীন্য এবং জীবনাসক্তি। এই ভাব-ভাবনা যেন জীবন-ঐশ্বর্যেরই দুই দিক।

'কপালকুণ্ডলা'কে এক অর্থে রাত্রির কাব্য' বলা যায়। 'রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকায়' ব্যাপ্ত দিগন্তে 'দিঙ্‌নিরূপণ' করতে না পারায় ঘটনাচক্রে বিসর্জিত নবকুমারের 'সৈকতভূমি'তে অবতরণ এবং কল্পিত-স্বপ্নরাজ্যে পদচারণা দিয়ে উপন্যাসের যাত্রারম্ভ। "অন্ধকারে সর্বত্র জনহীন ;— আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র, সর্বত্র নীরব, কেবল অবিরল কল্লোলিত সমুদ্রগর্জ্জন আর কদাচিৎ বন্য পশুর রব"— এবং একাকী 'বিজনে' নবকুমার। 'স্তূপশিখরে' নবকুমারের নিদ্রাভঙ্গের কালটিও 'গভীরা রজনী'। কাপালিকের ভীষণমূর্তি-দর্শন ক্ষণটিকে অন্ধকারের গভীরতায় তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। 'সমুদ্রতটে' নবকুমার 'অস্তগামী দিনমনির' সৌন্দর্য শোভা দেখেছিলেন এবং এই সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে 'অপূর্ব রমণীমূর্ত্তি' মৃন্ময়ীর 'মোহিনী শক্তি' অনুভব করেছিলেন। 'বধ্যভূমিতে' সন্ধ্যালোকে আবার সেই বনদেবীমূর্তির সাক্ষাৎলাভ— অন্তরের মধ্যে রমণীকণ্ঠের অপূর্ব ধ্বনির— 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?'— গুঞ্জরণ কবিত্বের স্পর্শে প্রকাশিত—"সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী, রমণী সুন্দরী ; ধ্বনিও সুন্দর ; হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্যের লয় মিলিতে লাগিল।" কাপালিকের স্তূপশিখর থেকে পতিত হওয়ার প্রসঙ্গও অন্ধকারবশতঃ দৃষ্টিবিভ্রমের ফল। "অমাবস্যার ঘোরান্ধকার যামিনীতে" যখন "অন্ধকারে কিছুই লক্ষ্য হয় না ; কেবল কখন কোথাও নক্ষত্রালোকে কোন বালুকাস্তূপের

শুভ্র শিকর অস্পষ্ট দেখা যায়— কোথাও খদ্যোতমালাসংবৃত বৃক্ষের অবয়ব জ্ঞানগোচর হয় তখন নবকুমার কপাল অধিকারীর গৃহে উপনীত হয় এবং উভয়ের বিবাহের দ্বারা অন্ধকারময় অস্পষ্ট জীবনে প্রবেশ ঘটে। উপন্যাসের প্রধান কাহিনী রাত্রির এই আলো-আঁধারি রূপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত।

শাখা-কাহিনীতেও অন্ধকারের রূপক নতুন ব্যঞ্জনা পেয়েছে। অন্ধকারময়ী পৃথিবীর 'শীতকালের অনিবিড় মেঘে' আকাশ যখন আচ্ছন্ন, তখনই মতিবিবির সঙ্গে নবকুমারের সাক্ষাৎ হয়েছিল। চটিতে গৃহস্বামী আনীত প্রদীপের আলোয় মনে হয়, এ রমণী যেন 'সুন্দরীপ্রধানা'— "যেন সে নয়ন মন্মথের স্বপ্নশয্যা।" 'নবকুমারের আত্মপরিচয়দানে 'প্রদীপ নিবিয়া গেল'— তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত। উপন্যাসের সর্বত্রই এই অন্ধকারের ব্যঞ্জনা। ইতিহাসের সুদূর জীবন-প্রেক্ষাপটও রহস্যের অন্ধকারময় রূপকে ব্যক্ত। মেহের উন্নিসারর গোপন ইচ্ছা, জাহাঙ্গীর ওমরাহদের প্রবৃত্তিমুখীন জীবনধারা, খসরুকে নিয়ে ষড়যন্ত্র অথবা মতিবিবির অন্তর্লোকের চিত্র-দৃশ্যে অন্ধকারলোকের ব্যঞ্জনা। গঠন-কৌশলের একটা অন্যতম দিক হল—এই অন্ধকার—ভাব-মূর্চ্ছনায় জীবন ও জীবনের বিচিত্র ঘটনাকে যেন কবিত্বের ছোঁওয়ায় রূপায়িত করা।

সংসার-জীবনে প্রবেশের পরও কপালকুণ্ডলার প্রকৃতির নিরন্তর আকর্ষণের মুহূর্তটি সন্ধ্যালোকের গাঢ়তায় অঙ্কিত হয়েছে— তার সমস্ত জীবন পরিধিতে অস্পষ্ট সন্ধ্যাতিমিরের দুর্নিবার প্রভাব। "সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে"— এই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শ্যামাসুন্দরীর মঙ্গলের জন্য মৃন্ময়ীর রাত্রিকালীন বন-বিহার। 'রাত্রি প্রহরাতীত' হবার পর ঔষধ সংগ্রহের জন্য প্রস্তুতি-পর্বে নবকুমারের সন্দেহ এবং কপালের 'অবিশ্বাসিনী কিনা স্বচক্ষে দেখিয়া যাও'— মানসিক বিরোধ ও পরিণামের ইঙ্গিতবাহী ঘটনা সীমাহীন ঔদাসীন্য এবং ঘনান্ধকারের নিবিড় রহস্যময়তায় আচ্ছন্ন। 'কাননতলে' পরিচ্ছেদে (৪-র্থ খণ্ড) যামিনী মধুরা, একান্ত শব্দমাত্রবিহীনা— নীরব রাত্রির গভীর ব্যঞ্জনা অরণ্যময় জীবনের স্মৃতি ও আকর্ষণ ও ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে কাপালিকের 'মৃত্যু-পরিকল্পনা' শ্রবণ ইত্যাদি কপালকুণ্ডলার অনিবার্য জীবন-পরিণতির দৃশ্য। "কাননতলে যে সামান্য আলো ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইতে লাগিল"—মৃন্ময়ীর 'হৃদয়সমুদ্রের তরঙ্গমালা' স্বপ্নদর্শনেও প্রতিফলিত—হয়েছে নিয়তির আদেশও রাত্রিকালীন দুঃস্বপ্নে চিত্রিত। নৈশভ্রমণবিলাসিনী সন্ন্যাসিপালিতার শেষপ্রহরের ঘণ্টা বেজে উঠল—নবকুমারের ব্রাহ্মণবেশীর চিঠি-পাঠ ও সন্দেহ-সংশয় এবং কাপালিকের আগমন ঘটল সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে। কাপালিকের স্বপ্নদর্শন প্রভাতের 'অব্যবহিত পূর্বে' এবং ভবানীর আদেশে কাপালিকের মৃন্ময়ী বধের আয়োজন। অন্ধকারে সপত্নীসম্ভাষে মতিবিবির কাছে মৃন্ময়ীর অঙ্গীকার— 'আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব' এবং গৃহে প্রত্যাগমনকালে অন্ধকার আকাশ থেকে ভৈরবীর আদেশ— অরণ্য ও অন্ধকারের মেলবন্ধনে রচিত। প্রেতভূমে দৃশ্যটি ভয়ংকর ও চিত্তাকর্ষক— "চন্দ্রমা অস্তমিত হইল। বিশ্বমণ্ডল অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল"— দৃশ্যচিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে শ্মশানে কপাল-বধের আয়োজন এবং গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে কপালকুণ্ডলা—নবকুমারের অদৃশ্য হবার ব্যঞ্জনা রাত্রির গভীরতায় পরিকল্পিত। সুতরাং ঘটনার ক্রম পরিণতির দিক থেকে ও চরিত্র রূপায়ণে অন্ধকার প্রকৃতির সীমাহীন প্রভাব আছে। মনুষ্য নিয়তির দুর্জ্ঞেয়তা প্রকাশের প্রেরণায় লেখক 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসকে 'রাত্রির কাব্য' এই অভিধায় যেন ভূষিত করেছেন— তাই ভাববস্তুতেও অনন্যসদৃশ কাব্য হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টিতেও কবি-কল্পনা। কপালকুণ্ডলা প্রকৃতির সৃষ্টি, প্রকৃতিলোকে তার স্বচ্ছন্দ বিচরণ,—স্নিগ্ধতা ও ঔদাসীন্য তার স্বভাবজাত। নিসর্গের রুদ্র রূপের মতো— "কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণ সম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান"— দেবী ভবানীর প্রসাদ আকাঙ্ক্ষায় আত্ম-বিসর্জনেও কৃতসঙ্কল্পা। তার সংসারজীবনের অনাসক্তি ও অরণ্য-প্রীতি তাকে কল্পনা সুন্দরী বলে চিহ্নিত করেছে। তার আবির্ভাব ও লয়-প্রাপ্তি স্বপ্নময় মায়াবী কল্পনা বলেই মনে হয়। মৃন্ময়ী চরিত্রের আবর্তে নবকুমারও বাস্তব জীবন পরিত্যাগ করে রূপমুগ্ধতায় স্বপ্নলোকের অনুবর্তী। আলো আঁধারি অস্পষ্টতায় এ চরিত্র শেষ পর্যন্ত অনুজ্জ্বল থেকে গিয়েছে। দিনের আলোয় তার জীবন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেনি।কেবল মৃন্ময়ীর রূপ-ধ্যানে তার জীবন-ভাবনা রূপায়িত বলে, নবকুমারের স্বপ্নালু দৃষ্টিভঙ্গী অস্পষ্টতার প্রতীকী ব্যঞ্জনায় কবিত্বময় বলে মনে হয়। আপাতদৃষ্টিতে মতিবিবি চরিত্রের প্রবৃত্তিমুখীন জীবন-চেতনা বাস্তবানুগ বলে মনে হলেও ইতিহাসের দূরাগত কল্পনার সমন্বয়ে এ চরিত্রও বাস্তবাতিরিক্ত রহস্যময়তার ইঙ্গিত দিয়েছে। তার সমগ্র-জীবন অতীত-কথার স্মৃতি চিত্রণে আভাসিত এবং আখ্যান অংশে নবকুমারের প্রতি আকর্ষণ ফলপ্রসূ কোন সমাধান সূত্রে তাকে উপনীত করায়নি— বরং অর্ধ পথে মতিবিবির সঙ্কল্প পরিত্যক্ত। এক অস্পষ্ট কুহেলিকায় এ চরিত্র যেন আচ্ছন্ন। প্রকৃতিলোকের রূপৈশ্বর্যময় স্নিগ্ধ-মাধুর্য্যের পাশাপাশি কাপালিকের নির্মম তান্ত্রিক সাধনা এক আশ্চর্য বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে। তার অমানবিক সাধন-প্রক্রিয়া শেষপর্যন্ত কোন ফলপ্রসূ সমাধান সূত্রে বিধৃত হয়নি। কাপালিক চরিত্র পাঠকের বিস্ময়ের কারণ হয়েছে জাহাঙ্গীর-মেহের-উন্নিসার প্রণয়বৃত্তান্ত সত্যাশ্রয়ী ইতিহাস হলেও, কল্পনার সুদূর প্রাঙ্গণে তার অবস্থিতি। বঙ্কিমের কবি-কল্পনা এখানেও মানব-জীবনের প্রেমময় রোমান্টিক ভাবনায় পরিচালিত হয়েছে। অদৃশ্য অথচ অমোঘ শক্তিরূপিণী দেবী ভবানী উপন্যাসের পরিচালিকা শক্তি হ'য়েও উপন্যাসে প্রকৃতি-চিত্রের সঙ্গে তার অভিন্নতা রহস্যময় কাব্যিক পরিবেশ রচনা করেছে। সুতরাং ভবানীকেও বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না— উপন্যাসের বিচিত্র কাব্য-সম্ভারের মধ্যে ভবানীও একটি অন্যতম উপাদান।

কল্পনা, ভাব, ভাষা সমস্ত দিক থেকে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসকে কাব্যধর্মী উপন্যাস বলতে হয়। এখানকার কাহিনীবৃত্তের উৎস-স্থলে কবি-কল্পনা। সূচনাপর্ব থেকে পরিণতি পর্যন্ত কবি-কল্পনারই প্রাধান্য। কাহিনীর গতিপ্রকৃতিতেও কল্পনার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ, পরিণতিও সেই একই ব্যঞ্জনাধর্মী। বধ্যভূমিতে নবকুমার এবং প্রেতভূমে মৃন্ময়ী—স্বপ্নময় কল্পনার জগৎ। চরিত্র চিত্রণেও বাস্তবজীবন-ধর্মিতা পরিত্যক্ত—কল্পনার মায়াঞ্জন দৃষ্টিতে চরিত্রের রূপ-নির্মাণ। কাহিনীবৃত্তের কবিত্বময় ভাব ছাড়াও চরিত্রগুলিও ভাবের এক-একটি অনুপম মূর্ত্তি। কপালকুণ্ডলার মোহিনীময় মানবী মূর্ত্তি, মতিবিবির নয়নে 'মন্মথের স্বপ্নশয্যা, 'লোলাপাঙ্গে ক্রূর কটাক্ষ,' 'পূর্ণযৌবনভরে সর্ব্বশরীর সতত ঈষচ্চঞ্চল', কাপালিকের কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষমালামধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড এবং নয়ন মুদ্রিত ধ্যানমূর্তি ; 'ভবানী যেন আকাশমণ্ডলে নবনীরদ নিন্দিত মূর্ত্তি'—চরিত্র নির্মিতিতে এক একটি ভাবের পরিপূর্ণ রসমূর্তি। কাহিনী, চরিত্র, পরিবেশ, ও প্রকৃতি-চিত্রণে ভাবেরই আতিশয্য। আর ভাবকে রসরূপে ব্যক্ত করার উপায় হ'ল ভাষা। উপন্যাসের ভাষা অলঙ্কৃত—উপমা-রূপক উৎপ্রেক্ষার সহায়তায় আবেগোচ্ছল ভাষা বঙ্কিম প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু সর্বত্রই একটা পরিমিতি বোধের স্বাক্ষর আছে। এই ভাষার নাট্যধর্মিতাও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভাব-ভাষার সঙ্গে সৌন্দর্যবোধের নিবিড় যোগ আছে— "সাগর বাসনা পৃথিবী সুন্দরী, রমণী সুন্দরী,ধ্বনিও সুন্দর ; হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্য্যের লয় মিলিতে লাগিল।" ভাষার ছন্দ-সুষমা ও ধ্বনি-মাধুর্য্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যঞ্জনা।

উপন্যাসের সামগ্রিক, ব্যঞ্জনার কথা বাদ দিলেও স্বতন্ত্রভাবে এই ব্যঞ্জনা তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বহু জায়গায়— (ক) পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ? (খ) তাঁহার করে খড়্গ দুলিতেছে। (গ) পত্রটি পড়িয়া গেল। (ঘ) প্রদীপ নিবিয়া গেল। (ঙ) মেরা সৌহর। (চ) কবরের মাটিতে মুখের আদর্শ থাকিবে। (ছ) পাষাণমধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল। পাষাণ দ্রব হইতেছিল। (জ) সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?— এমন অজস্র উদাহরণের অভাব নেই এ উপন্যাসে।

কাব্যসৃষ্টির প্রেরণার নেপথ্যে জীবন-জিজ্ঞাসা থাকলেও প্রকৃতি-শক্তির অনিবার্য প্রভাব দেখাতে গিয়ে বঙ্কিম যে সৌন্দর্যলোক গড়ে তুলেছিলেন— "ঐ সৌন্দর্য্যও শুধু আর্ট বা রস-রূপের সৌন্দর্য্য নয়; উহাতে মানব-হৃদয়ের অসীম সৌন্দর্য কোথাও বিষ-নীল, কোথাও অমৃত অরুণ হইয়া উঠিয়াছে।" (বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস— মোহিতলাল মজুমদার)। 'কপালকুণ্ডলা' কাব্যধর্মী উপন্যাস কবিত্বের স্ফুরণ এর সর্বাঙ্গে। উপন্যাস-শিল্পের অভিনব সৃষ্টি-কুশলতায় এ রচনা বিশিষ্ট। মোহিতলালের একটি মন্তব্য আলোচনার উপসংহার করবার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে হয়— "কপালকুণ্ডলাও" কাব্য, এমন কাব্য জগতের কথাসাহিত্যে অল্পই আছে। এই উপন্যাসে বঙ্কিমের কবিদৃষ্টি সৃষ্টির তলদেশে একটা মিষ্টিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া মনুষ্য-নিয়তির দুর্জ্ঞেয়তাকেই ঘনাইয়া তুলিয়াছে।"

[বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস]

উপন্যাসের নাট্যলক্ষণ

অন্যান্য অনেক বিষয়ে নাটকের সঙ্গে উপন্যাসের মিল দেখা গেলেও কিছু বিষয়ে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য গুরুতর। নাটকে নৈর্ব্যক্তিকতা কাম্য —চরিত্র বা কাহিনীর ভাব-পরিস্ফুটনে নাট্যকারের শিল্প-কুশলী হাত থাকলেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে নাটকের ঘটনাবস্তু বা চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করতে পারেন না। সুতরাং নাটক ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সৃষ্টি এখানে detachment —ই প্রধান। কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্র যথেষ্ট বিস্তৃত—লেখকের বর্ণনারীতির গুণে কাহিনী, চরিত্র ও পরিবেশের তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে—In the novel, ...the author has a canvas as large as he may will it. .....The novelist may expand; the dramatist has always the inexorable necessity of condensing. (Nicoll) সুতরাং বহুবিধ বর্ণনা—চরিত্র, কাহিনী, পরিবেশ, ভাব-ভাবনার পর্যালোচনা—ঔপন্যাসিকের শিল্প-প্রতিভার পরিচায়ক হতে পারে। নাটকের সময়-সীমা সংক্ষিপ্ত, নির্দিষ্ট সময়ে মঞ্চে উপস্থাপিত করার জন্যই নাটক-সৃষ্টি। তাই এখানে কাহিনীবৃত্ত সংক্ষিপ্ত, সংলাপ কেবল চরিত্রাশ্রয়ী; জীবন-দর্শন, দ্বন্দ্ব-সংঘাত চরিত্র কেন্দ্রিক। বিচ্ছিন্নভাবে মতামত ব্যক্ত করার স্বাধীনতা নাট্যকারের থাকে না। নাটক প্রধানতঃ সংলাপ-নির্ভর—চরিত্র বা কাহিনী সংলাপকে ঘিরে পূর্ণতা পায়—নাট্য রচনারীতির এটাই শর্ত।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস একই সঙ্গে কাব্যগুণ ও নাট্যগুণ সমৃদ্ধ রচনা। ভাব-কল্পনায় এ রচনা কাব্যধর্মীতে জীবনদর্শনে, চরিত্র-চিত্রণে, কাহিনী বর্ণনায়, পরিবেশ ও ব্যঞ্জনাময় ভাষাশৈলী কাব্যগুণেরই পরিচয়। কিন্তু ঔপন্যাসিক এই আখ্যায়িকাকে নাট্যগুণ-সমন্বিত করে প্রকাশ করেছেন বেশ কয়েকটি দিক থেকে— (১) বাহুল্যহীন ঘটনার একমুখীন গতিপ্রবাহে; (২) স্থান-কাল-ঐক্যের সংহতির গুণে; (৩) দ্বান্দ্বিক বিষয়বস্তুর উপস্থাপনে; (৪) সাংকেতিকতা, আকস্মিকতা ও অদৃষ্টবাদের প্রসঙ্গে; (৫) চরিত্র-সংলাপে ও বর্ণনার ক্ষেত্রে নাটকীয় সংলাপ আশ্রিত ব্যঞ্জনায় এবং (৬) জীবনদর্শনে।

'কপালকুণ্ডলা'র কাহিনীবৃত্ত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, জটিলতাহীন, গাঢ়পিনদ্ধ। সূচনাপর্ব থেকে পরিণতি পর্যন্ত একটা দূরন্ত গতিপ্রবাহ এখানে লক্ষ্য করা যায়। দিক্‌ভ্রান্ত নৌকারোহীদের দ্বারা অরণ্য ও সমুদ্র-সৈকতে বিসর্জিত নবকুমার দ্রুত কাহিনীর অন্তঃস্থলে প্রবেশ করেন— কাপালিক সংসর্গ, বধ্যভূমিতে আনয়ন, কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ ও নবকুমারকে রক্ষা, অধিকারীর নিকট গমন ও উভয়ের বিবাহ— সপ্তগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা, পথিমধ্যে মতিবিবির সাক্ষাৎ এবং মতিবিবি সূত্রে মোগল রাজ-পরিবারের ভোগৈশ্বর্যময় জীবনকাহিনী—নবকুমারের প্রতি আকর্ষণ, সপ্তগ্রামে আশ্রয়লাভ ও কপালকুণ্ডলার অনিষ্টসাধনে কাপালিকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র, মৃন্ময়ীর প্রতি নবকুমারের প্রণয়মুগ্ধতা—শ্যামার জন্য মৃন্ময়ীর ঔষধি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বন-গমন এবং 'প্রেতভূমে' কপাল-নবকুমারের অন্তর্ধান—কাহিনী সরলরেখায় অনিবার্য গতিশীলতায় পরিণামমুখী হয়েছে। কাহিনীর জটিলতা কোথাও দেখা যায়নি, দ্রুত গতিপ্রবাহ এর সর্বাঙ্গে। মতিবিবি-প্রসঙ্গে মোগলরাজ বৃত্তান্ত মূল ঘটনাবস্তুর অনিবার্য আকর্ষণে কেন্দ্রাভিমুখী হয়েছে। নাট্যরীতির 'কৌতূহল'-এ উপন্যাসের সর্বাঙ্গে দেখা যায়—কাহিনীর ক্রম-পরিণতি এই কৌতূহল সৃজন-কৌশলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ঘটনাস্রোতে নাট্যগুণ সর্বত্রই রক্ষিত বলে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের রচনা-রীতি অনবদ্য বলে

গণ্য হয়েছে। মাত্র চারটি খণ্ডে, একত্রিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই উপন্যাসের আদি-মধ্য-অন্ত্য-কাহিনীবৃত্তের একটা পূর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায় লেখকের রচনা-নৈপুণ্যে। ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বর্ণনারীতিতে কাহিনীকে অতিদ্রুত উপস্থাপিত করেছেন ঔপন্যাসিক।

নাটকের ত্রি-ঐক্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আখ্যানটি নির্মিত হয়েছে। কালগত ঐক্যের দিক থেকে উপন্যাসের ঘটনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। সপ্তগ্রাম ও দিল্লী আগ্রার সমকালীন জীবন-ধারা কালগত ঐক্যসূত্রে বিধৃত। স্থানগত ঐক্য প্রসঙ্গে আপাত বিরোধভাব দেখা গেলেও সামগ্রিক বিচারে সপ্তগ্রাম ও আগ্রা, একই জীবন-পরিণামমুখী বলে অনৌচিত্য দোষ-দুষ্ট হয়নি। স্থানগত বৈপরীত্য রসহানি ঘটায় নি। কালগত ভাবনা স্থানগত ঐক্যে বিধৃত বলে Aristole মনে করেছিলেন—(Unity of place) is clearly demanded as corollary by the unity of time. (Nicoll). ঘটনাগত ঐক্য পর্যালোচনায় অন্যতম বাধা জাহাঙ্গীর ও মেহের-উন্নিসার প্রণয়বৃত্তান্ত, খসরুকে কেন্দ্র করে রাজসিংহাসন লাভের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি প্রসঙ্গ। উপন্যাসের মূল ঘটনা হ'ল—কপালকুণ্ডলার জীবনপরিণতি দেখানো—সে জীবন অবশ্যই প্রকৃতি-শাসিত ও নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং ঐ জাতীয় ঘটনা-সন্নিবেশে উপন্যাসের সাক্ষাৎ কোন প্রয়োজনসিদ্ধ না হলেও নবকুমারের রূপমুগ্ধতা, কপালের স্নিগ্ধ, কোমল স্বভাবের সঙ্গে প্রেমবোধের অনাসক্তি ও ঔদাসীন্য চমৎকার বৈসাদৃশ্য রচনা করে ঘটনার গভীরতা এনেছে।তাছাড়া, মতিবিবির নবকুমার-লাভের সংকল্প অর্ধপথে পরিত্যক্ত হওয়াতে তার ট্রাজেডি কপাল-নবকুমারে মূল ট্রাজেডির অনুবর্তী হয়েছে। সুতরাং ঘটনাগত দিক থেকে উপন্যাসের ঐক্য-ভাব সর্বত্র রক্ষিত হয়েছে। একানকার সংহতি, সংক্ষিপ্ততায় ভাবগত-ঐক্যে প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে করা যায়। এবিষয়ে নাট্য-তত্ত্বের সমালোচক Nicoll বলেন 'Drama, ...must be excessively concentrated, and this very concentration demands the securing of a unity of impression.' *(The Theory of Drama)*.কাল-স্থান-ঘটনাগত ত্রি-ঐক্যের সঙ্গে ভাবগত-ঐক্য-সংহতি উপন্যাসটিকে নাট্য লক্ষণাক্রান্ত করেছে সন্দেহ নেই।

উপন্যাসের দ্বান্দ্বিক বিষয়বস্তুতে নাটকের লক্ষণ সুপরিস্ফুট দুটি পর্বে। প্রথম পর্বে, 'বন্যদেবীমূর্ত্তি কপালকুণ্ডলার' প্রতি নবকুমারের আকর্ষণ ও রূপমুগ্ধতা এবং কাপালিকের ভয়ঙ্কর তান্ত্রিকসাধনা ও নবকুমার-বধের কৃতসঙ্কল্পতা—বৈপরীত্যময় ভাব-দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয় পর্বে, মতিবিবির নবকুমারের উদ্দেশে "তুমি আমারই হইবে"— সিদ্ধান্তের অনুসারী ষড়যন্ত্র এবং নবকুমারের মৃন্ময়ীর প্রতি তীব্র প্রণয়াকৃতি। এই পর্বে নিয়তির অনিবার্য প্রভাব ও নির্দেশ আখ্যানবস্তুর দ্বান্দ্বিক চিত্রকে যেন পরিস্ফুট করে। শাখাকাহিনীর নায়িকা মতিবিবির ভোগ-বাসনার সঙ্গে কপালকুণ্ডলার স্নেহার্দ্র হৃদয়, সংসার জীবনের অনাসক্তি ও প্রকৃতি-প্রভাবের ঔদাসীন্য— চমৎকার বৈপরীত্যময় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। অদৃষ্টরূপিনী ভবানীর পরিচালিকা শক্তিটিও এই দ্বন্দ্বের মধ্যে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। দ্বন্দ্ব (Conflict) যদি নাটকের প্রাণ হয়, তাহলে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে সেই নাট্যগুণের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।

সাংকেতিকতা, আকস্মিকতা ও অদৃষ্টবাদ নাট্যশিল্পরীতিরই কলাকৌশল। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে এই নাট্যলক্ষণও বর্তমান। রহস্যময় প্রকৃতি ও সমুদ্র,—উপন্যাসের কেবল প্রেক্ষাপট নয়— তার অসামান্য প্রভাব সাংকেতিকতায়, আভাসে-ইঙ্গিতে পরিস্ফুট হয়েছে। 'সমুদ্রতটে' নবকুমার সাগরগর্জন শুনেছিলেন, অস্তগামী সূর্যের রক্তিম-আভায় নীলজলকে সোনালি রঙের মনে

হয়েছিল—আশঙ্কা-আশায় তাঁর ভাবনা যখন দোদুল্যমান— তখনই "একেবারে প্রদোষতিমির আসিয়া কাল জলের উপর বসিল"। আসন্ন জীবন যে অস্পষ্টতায়, রহস্যময়তায় পরিপূর্ণ হবে, এ যেন তারই ইঙ্গিত। তারপর সন্ধ্যালোকে সেই অপূর্ব নারীমূর্ত্তির মোহিনীশক্তি—" সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি। .....অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল।" সমগ্র উপন্যাসে অবগুণ্ঠনবতী কপালকুণ্ডলাকেই আমরা পেয়েছি— এ চরিত্র আলোকিত বাস্তব-জীবনরেখায় স্পষ্ট নয়—রহস্যময়তার অবগুণ্ঠনে ঢাকা অথচ চিত্তাকর্ষক চরিত্র। সংসার জীবনেও এই স্থির, স্নিগ্ধ, জ্যোতির্ময় মোহিনী শক্তি নারীর পরিচয় রহস্যের আড়ালেই থেকে গিয়েছে। প্রথম খণ্ডে এ ইঙ্গিত উপন্যাসে সক্রিয়রূপে প্রকাশ পেতে দেখি। কাপালিক চরিত্র প্রকৃতির রূদ্র রূপের এক ভিন্ন অভিব্যক্তি। গভীর রজনীতে নবকুমারের কাপালিক-সাক্ষাৎ আগামী দিনে কাপালিকের দুরভিসন্ধির যথার্থ ইঙ্গিতময় ঘটনা। বিবাহের পর কপালকুণ্ডলা কালিকার পাদপদ্মে 'অভিন্ন বিল্বপত্র' দিলে—"পত্রটি পড়িয়া গেল"— সাংকেতিক ব্যঞ্জনায় আসন্ন জীবনের পূর্বাভাস দিয়েছে। নবকুমার-মতিবিবি সাক্ষাৎকারে— "প্রদীপ নিবিয়া গেল"— অথবা মতিবিবির ভোগৈশ্বর্যময় জীবনে 'মেরা সৌহর' এর সাক্ষাতে "পাষাণ দ্রব হইতেছিল"—সংকেতপূর্ণ ইঙ্গিত। এছাড়া কপালকুণ্ডলাব জীবন-পরিণাম চিত্রিত করার অবকাশে উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র নাট্য-রীতি অনুসারী পরিবেশ রচনা করেছেন। প্রকৃতি ও কাপালিক প্রভাবে কপালকুণ্ডলা ঔদাসীন ও জীবন-বিসর্জনে কৃতসংকল্প ছিল— প্রাকৃতিক রূপ-চিত্রে মৃন্ময়ীর অন্তর্বেদনা, অরণ্য প্রীতি, ভবানীর নির্দেশ চমৎকারভাবে একাত্ম করে দেখিয়েছেন শিল্পী। কেবল সংলাপ নয়, নাট্যশিল্পে পরিবেশ রচনার গুরুত্ব অপরিসীম। সাংকেতিক ব্যঞ্জনায়—আরণ্যক জীবনের আকর্ষণে, প্রকৃতির রূদ্র রূপে—'গম্ভীর মেঘশব্দ ও অশনিসম্পাতে'— কপালের জীবন-ট্রাজেডি অঙ্কিত হয়েছে চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। কপালকুণ্ডলার হৃদয়-সমুদ্রের তরঙ্গমালা এমনই প্রকৃতিময়তায় আভাসিত।

উপন্যাসের নাট্যস্বভাবে আকস্মিকতার উদাহরণ আছে যথেষ্ট। কুজ্ঝটিকায় দিক্‌ভ্রান্ত নৌকারোহীদের সমুদ্রসৈকতে উপনীত হওয়া অপরের কল্যাণার্থে নবকুমারের কাষ্ঠসংগ্রহ করতে যাওয়া ও জোয়ার আসার কারণে অরণ্যে পরিত্যক্ত হওয়ার মধ্যে আকস্মিকতা রয়েছে। নির্জন বনে, গভীর রাত্রিতে হঠাৎ কাপালিক দর্শন, সমুদ্রতীরে বিষণ্ণতায় মলিন নবকুমারের মোহিনী মূর্তি কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ, বধ্যভূমিতে কাপালিকের খড়্গ অন্বেষণ ও মৃন্ময়ীর "করে খড়্গ দুলিতেছে" চিত্রে, স্তূপশিখর থেকে কাপালিকে পতন এবং অভিন্ন বিল্বপত্র কালিকার পাদপদ্ম থেকে পড়ে যাওয়ার মধ্যে আকস্মিকতার নাট্যগুণ পাওয়া যেতে পারে। রচনা কৌশলের গুণে উপন্যাসে প্রথমাবধি একটা কৌতূহল পাঠকের মনে সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা অক্ষুণ্ণ রয়েছে দেখা যায়। মতিবিবির সঙ্গে সাক্ষাৎদৃশ্যটি অথবা পান্থনিবাসে নবকুমারই যে তাঁর পূর্বস্বামী আবিষ্কারের মধ্যেও আকস্মিকতা। সংসার জীবনে, কপালকুণ্ডলার শ্যামার জন্য ঔষধি সংগ্রহের প্রচেষ্টা— অরণ্য জীবনে প্রবেশ, ব্রাহ্মণবেশী মতিবিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ, নবকুমারের সংশয় ও কাপালিক-দর্শন, ভবানীর আদেশ এবং 'প্রেতভূমে' পরিচ্ছেদে মৃন্ময়ী ও নবকুমারের আত্মবিসর্জন দেওয়ার মধ্যে এই আকস্মিকতা লক্ষ্য করা যাবে। এছাড়া শেক্সপীয়ারের নাট্যরীতির প্রভাবে বঙ্কিম হয়ত অদৃষ্টবাদকে উপন্যাসের মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন। তাতে উপন্যাসের নাট্যগুণও বৃদ্ধি পেয়েছে। 'জুলিয়াস সীজার' নাটকের অন্যতম চরিত্র ব্রুটাস যেমন সীজারের প্রেতাত্মা দর্শন করেছিলেন এবং আসন্ন মৃত্যুর

পূর্বাভাস দেখেছিলেন তেমনই কপালকুণ্ডলা ভবানীর আদেশ আকাশপথে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। মৃন্ময়ীর জীবন-পরিণাম এই দৃশ্য পরিকল্পনায় উপস্থাপিত হয়েছে অপূর্ব নাট্য কৌশলে, ইঙ্গিতময়তা বা সাংকেতিকতায়।

সংলাপই নাটকের কাহিনী বা চরিত্র বিকাশের অন্যতম উপায়—এজন্য বর্ণনারীতি, যা উপন্যাসে থাকতে পারে, তা এখানে পরিত্যজ্য হয়। সুতরাং চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে সংলাপের ব্যবহার আবশ্যিক। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে দুই ধরণের সংলাপ লক্ষ্য করা যায়— (১) চরিত্রের সংলাপ—যার সাহায্যে চরিত্রের মানসিকতা ও কার্যকলাপের প্রতিফলন ঘটে এবং (২) বর্ণনারীতিতে কবিত্বময় ব্যঞ্জনার সঙ্গে নাটকীয় ভঙ্গিতে সংলাপ। চরিত্রকে ঘিরে সংলাপের গুরুত্ব সম্পর্কে Nicoll বলেন—The dramatist, we may say, is given the task of providing the actors with such dialogue as will enable them adequately to interpret their parts. (The Theory of Drama) নবকুমারের সংলাপে তার রূপমুগ্ধতার পরিচয় পাই। মৃন্ময়ীর জিজ্ঞাসা— 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ? —তাঁর অন্তরে প্রতিধ্বনিত হয়ে যে ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছিল, চতুর্থ খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদে— 'তুমি ত কখন রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই' অথবা, 'একবার বল যে, তুমি অবিশ্বাসিনী নও—একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই'—তারই চরিত্র-ভিত্তিক আন্তঃস্বভাবের বিবরণ। কপালকুণ্ডলার সংলাপে এই চরিত্রের অরণ্যপ্রীতি, স্নেহার্দ্র স্বভাব, নিদারুণ ঔদাসীন্যের ভাব প্রকাশ পেয়েছে। এই জাতীয় কয়েকটি স্মরণীয় উদ্ধৃতি— (ক) বোধকরি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব। (খ) পলায়ন কর: আমার পশ্চাৎ আইস, পথ দেখাইয়া দিতেছি। কিন্তু তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে আমার মন সরিতেছে না। তিনি যে আমাকে এতদিন প্রতিপালন করিয়াছেন। (গ) ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব। তুমি গৃহে যাও। আমি মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না। নবকুমার কপালকুণ্ডলা ছাড়াও মতিবিবি, মেহের-উন্নিসা, জাহাঙ্গীর, অধিকারী, কাপালিক, পেষমন ও শ্যামাসুন্দরীর সংলাপে চরিত্রের অন্তর্নিহিত স্বভাব-প্রকৃতি স্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং নাট্য সংলাপ রীতির গুরুত্ব আলোচ্য উপন্যাসে যেন স্বীকৃতি পেয়েছে।

চরিত্র ছাড়াও বর্ণনারীতিতে নাট্যভঙ্গিমা অক্ষুণ্ণ আছে। লেখকের বলার বিশেষ রীতিটিই তো নাটকীয়। উপন্যাসের বর্ণনা অতীত ও বর্তমান ঘটনাবৃত্ত-অনুসারী হলেও (স্মরণীয়— a novelist may elaborate as fully as he likes both antecedent events and the situations with which he is dealing in particular— Nicoll) লেখকের মন্তব্য বাক্য ও ঘটনাগত নাটকীয়তা বৃদ্ধি করেছে। সামান্য কয়েকটি উদাহরণ— (ক) তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন? (খ) পত্রটি পড়িয়া গেল। (গ) প্রদীপ নিবিয়া গেল। (ঘ) কিন্তু এইবার পাষাণমধ্যে কীট প্রবেশ করিয়াছিল। (ঙ) পাষাণ দ্রব হইতেছিল। (চ) সংসার রচনা অপূর্ব কৌশলময়। (ছ) সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?— ঔপন্যাসিকের বর্ণনারীতির ভঙ্গিমা ও ভাষা প্রয়োগের তির্যকতা নাট্যগুণান্বিত। বঙ্কিমের এই নাটকীয় ভাষা-রীতি অন্য উপন্যাসেও দেখা যায়। তবে 'কপালকুণ্ডলা'-র কাব্যগুণ ও নাট্যগুণ একই সঙ্গে চিত্তাকর্ষক ও বিস্ময়কর হয়েছে। লেখকের বিশেষ 'স্টাইল' বা রচনা-শৈলীতে নাট্যধর্ম ছিল অক্ষুণ্ণ—চরিত্র, ঘটনা পরিবেশে, এমনকি পরিচ্ছেদের নামকরণের

মধ্যেও (কাপালিক সাঙ্গে, বিজনে, রাজপথে, অবরোধে, প্রতিযোগিনী গৃহে, স্বপ্নে, প্রেতভূমে) এই নাটকীয় সংলাপ-রীতির ভাব আছে। সুতরাং নানান দিক থেকে বিচার করে বলা যায়, 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের নাট্যলক্ষণ রোমান্টিক কবিধর্মের তুলনায় কোন অংশেই কম নয়।

'কপালকুণ্ডলা'র নাট্যলক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক মোহিতলাল তাঁর 'বঙ্কিম-বরণ' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন— "উপন্যাস হিসাবে কপালকুণ্ডলা বিশেষ নৈপুণ্য দাবী করিতে পারে না। মাত্র একটি কালানুক্রম সূত্রে কতকগুলি ঘটনা গ্রথিত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে এমন কয়েকটি সংস্থিতির (Situation) সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাতে ঐ রোমান্টিক কাব্য কল্পনা একপ্রকার নাটকীয় রস-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। নাটক হিসাবে দেখিলে, ইহার ঘটনাচক্র (plot বা action) যে চারিটি খণ্ডে বা অঙ্কে নিঃশেষ হইয়াছে, তাহার প্রথমটিতেই নাটকের Crisis বা নায়কভাগ্যের সেই সঙ্কট-মুহূর্তে দেখা দিয়াছে—যাহাকে তাহার জীবনের একটা গুরুতর সন্ধিক্ষণ বলা যাইতে পারে। নবকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার বিবাহই সেই Crisis; তাহাতে নায়ক জয়লাভ করিয়া যেন সৌভাগ্যের পথে পদার্পণ করিল; কিন্তু তাহার পরেই ভিন্নমুখে অবতরণ এবং Catastrophe বা পূর্ণ-পতনের সূচনা। উপন্যাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে সেই Catastrophe (পতন)-র বীজ দেখা দিয়াছে ও দ্রুত অঙ্কুরিত হইয়াছে। মধ্যে গতি নিবারণের একটু সম্ভাবনা জাগিয়াছিল হয়ত নবকুমার বাঁচিয়া গেল, কারণ মতিবিবি তখনও একটা অতিশয় উচ্চাশা পোষণ করিতেছিল; কিন্তু শীঘ্র তাহা ধূলিসাৎ হওয়ায়, এই ক্ষণরুদ্ধ পতন-বেগ শেষ খণ্ডে দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে। Crisis ও Catastriphe -র মধ্যে ঐ যে গতিবেগের একটু বিশ্রাম এবং তজ্জনিত একটা আশা বা সংশয়ের অবকাশ, উহাও একটা নাটকীয় কৌশল; এই উপন্যাসেও গ্রন্থকার সেই কৌশল করিয়াছেন— আগ্রার রাজ অন্তঃপুরের ষড়যন্ত্র এবং মেহেরুন্নিসাকেও এই জন্য আবশ্যক হইয়াছে। অতএব, 'কপালকুণ্ডলা'র ঐ নাটকীয় প্রকৃতিই লক্ষণীয়— 'কপালকুণ্ডলা tale নহে, উপন্যাস নহে, উহা গদ্যরীতির কাব্য-নাটক, গ্রীক নাটক—এ উক্তি যথার্থ। আখ্যানের জটিলতা থাকিলে গ্রীক নাটক হইতে পারিত না। তথাপি নাটক হিসাবেও ইহার গঠনে একটু অসামান্যতা আছে, কারণ ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, প্রথম অঙ্কেই ইহার Crisis শেষ হইয়াছে —বাকি সমগ্র ঘটনাধারা একটা বিলম্বিত Catastrophe মাত্র।"

মোটকথা, 'কপালকুণ্ডলা'র আখ্যানে দ্রুত ঘটনা-পরিণাম মাত্র চারটি খণ্ডে, অনেকটা চতুর্থ অঙ্কের নাটকের মত, একত্রিশটি পরিচ্ছেদে অথবা দৃশ্য পরিকল্পনায়, দেখানো হয়েছে। নাটকের উপস্থাপনারীতির অন্তঃপ্রকৃতি সৃজন-কৌশলে বর্ণিত হয়েছে। দ্রুত গতিময়তায় নবকুমার মূল কাহিনীতে প্রবেশ করেছে— কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ ও রূপমুগ্ধতায় তার প্রতি আকর্ষণ শেষ পর্যন্ত বিবাহে কিছুটা পূর্ণতা পেলেও কাপালিকের বিরূপতা ও কপালকুণ্ডলার অন্তর্লোকের সীমাহীন ঔদাসীন্যের টানাপোড়েনে সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে মতিবিবির প্রণয়াকাঙ্ক্ষা ও ষড়যন্ত্র। নিয়তিরূপিনী ভবানীর নির্দেশ মৃন্ময়ী ট্রাজিক পরিণামকে ত্বরান্বিত করলেও নবকুমারের সন্দেহ, কাপালিকের মৃন্ময়ী বধের পরিকল্পনা ও মতিবিবির ষড়যন্ত্র নেপথ্যে কাজ করেছে। উপন্যাসের ট্রাজিক পরিণাম নাট্য-শিল্পের আঙ্গিক-বিন্যাসরীতিতে, অন্তঃপ্রেরণায় চমৎকারভাবে রূপায়িত হয়েছে— এখানেই নাট্যধর্মের সার্থকতা।

শিল্প-কাহিনীর গঠন-কৌশল

উপন্যাসের উপকরণ-উপাদানের প্রয়োগ-কৌশলের পরে নির্ভর করে তার শিল্প-সৃষ্টির বৈচিত্র্যময় রূপ প্রকাশ পায়। কাহিনী বা চরিত্র নির্মাণ কেবল নয়, উপন্যাস-শিল্পের সঙ্গে জড়িত থাকে একাধিক বিষয়, ঔপন্যাসিকের নির্মাণ কুশলতায় তার একক স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কৃত হলেও সামগ্রিক সমন্বয়-সূত্রে একটা নিটোল ভাব-সঙ্গতির অভাব সেখানে দেখা যায় না। খণ্ডিত ভাবনায় চিত্র-চরিত্র, কাহিনী-পরিবেশ, প্রকৃতিপ্রাণতা বা কল্পনাচারিতা, ঔদাসীন্য বা প্রেমাসক্তি, বাস্তবতা বা রোমান্সপ্রিয়তা কিংবা অন্তর্লীন সৌন্দর্য-সুষমা ইত্যাদি বিষয়-ভাবের স্বতন্ত্র মূল্যায়ন সম্ভব, কিন্তু উপন্যাসের অখণ্ড শিল্পনৈপুণ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সফল শিল্পায়নেই তার সার্থকতা। শিল্প হিসেবে 'উপন্যাস' মানবজীবনের সামগ্রিক রূপ-পর্যবেক্ষণ করার অবাধ স্বাধীনতার কথা স্বীকার করে। তাই E. M. Foster বলেছিলেন— 'Human beings have their great chance in the novel. ..... The novelist's problem, as we have seen all along, is to give them a good run and achieve something else at the same time. (*Aspects of the Novel*) । উপন্যাসের গঠন-কৌশল কেবল বাহ্য-দৃশ্যাত্মক ঘটনা বস্তু নয়, অন্তঃস্থিত ভাব-সমূহের উজ্জীবন ঘটানোও তার আবশ্যিক কর্তব্য। সমগ্র মানবজীবনের বহু বিস্তৃত রূপ-প্রকাশ উপন্যাসের স্বল্প আয়তনে ব্যক্ত হতে পারে না—তাই সাংকেতিকতা / ব্যঞ্জনাধর্মিতা প্রায় অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। আভাসিত হয়, মানব স্বভাব-চেতনার নানা দিক্। সুতরাং উপন্যাসের কাজ— ["Not completion—Not rounding off—but opening out."]

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' নানান্ দিক থেকে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের অদ্বিতীয় গ্রন্থ। মাত্র চারটি খণ্ডে বিভক্ত ও একত্রিশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এ উপন্যাসটির কাহিনীবৃত্ত অত্যন্ত তীব্র গতিতে পরিণামমুখী হয়েছে। মৃন্ময়ীর জীবন-কাহিনীর সঙ্গে মতিবিবির জীবনালেখ্য আশ্চর্যভাবে যুক্ত। কপালকুণ্ডলাকে কেন্দ্র করে লেখকের রোমান্সপ্রিয়তা মতিবিবির বাস্তবচারিতায় যেন শিল্পের স্বরূপকে আবিষ্কার করেছে। কাব্য ও জীবন অপূর্ব মেলবন্ধনে অনিবার্য গতিপ্রবাহে পরিণামমুখী হয়েছে। গঙ্গাসাগর থেকে প্রত্যাবর্তনের কালে সহযাত্রীদের নির্মমতায় বনবাসে বিসর্জিত নবকুমার কাহিনীর মূল ঘটনাধারায় প্রবেশ করেছে। তারপর কাপালিক (৪র্থ পরিচ্ছেদ) ও কপালকুণ্ডলার (পঞ্চম পরিচ্ছেদ) সাক্ষাৎ, নবকুমারের সঙ্গে বিবাহ ও মেদিনীপুরের উদ্দেশ্যে গমন—প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তু দ্রুত গতিপ্রবাহে লেখকের শিল্পকৌশলে পূর্ণতা পেয়েছে। উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলি সংক্ষিপ্ত এবং খণ্ডগুলি সংক্ষিপ্ততম। প্রথম খণ্ডের আখ্যানবস্তু বহুলাংশে বাস্তবানুগ। দ্বিতীয় খণ্ডে মতিবিবির সঙ্গে সাক্ষাৎকার (প্রথম পরিচ্ছেদ) ও নবকুমারের জীবন-পরিধির মধ্যে তার উপস্থিতি, সংকট ও সমস্যার ইঙ্গিতবাহী বাস্তব ঘটনাবৃত্ত। কপালকুণ্ডলার সৌন্দর্যময়ী রূপ ও স্বভাব বর্ণনায় কবিত্বের ভাব বা কল্পনার প্রাধান্যের সঙ্গে উপন্যাস-অংশের নায়িকা মতিবিবির বাস্তবরসপুষ্ট চরিত্র-সৃজন শিল্প-কৌশলের অন্যতম দিক।

কাহিনীবৃত্তে তৃতীয় খণ্ড অনিবার্য কিনা এ প্রসঙ্গ বার বার উত্থাপিত হয়েছে। কপালকুণ্ডলা-কেন্দ্রিক আখ্যানে অরণ্য-জীবন ও সপ্তগ্রামের নিরুদ্বিগ্ন পল্লীজীবনের নিস্তরঙ্গ জীবনধারার পাশাপাশি আগ্রা-দিল্লীর মোগল রাজ-অন্তঃপুরের ষড়যন্ত্র, প্রবৃত্তির অবাধ প্রশ্রয়জনিত লালসা-স্থূলতার বিচিত্র

দৃশ্যচিত্র কাহিনীর বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। কপাল-মতিবিবির চরিত্রকে ঘিরে বিরুদ্ধ দুই জীবন-ভাবনার পরিচয় একই সূত্রে কাহিনীতে স্থান পেয়েছে। মেহের-উন্নিসা, জাহাঙ্গীর, ইত্যাদি চরিত্র মতিবিবি সূত্রে উপন্যাসের মূল আবর্তের মধ্যে এসে গিয়েছে। লালসাময় যে জীবনধারায় মতিবিবি অভ্যস্ত ছিল, নবকুমারের জন্য তা ত্যাগ করলেও মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিহিংসা, স্বার্থান্ধতাকে সে বিসর্জন দিতে পারে নি বলে কপালের অনিষ্টসাধনে ব্রতী হয়েছিল। (সপ্তম পরিচ্ছেদ)। চতুর্থ খণ্ডে কাহিনী আবার কপালকুণ্ডলার ইতিবৃত্তে সন্নিবিষ্ট। তার জীবন পরিণামের সঙ্গে নবকুমারেরভাগ্যও জড়িত হয়ে পড়েছে অনিবার্য গতিপ্রবাহে। সুতরাং উপন্যাসের মূল ঘটনাবস্তুর সঙ্গে মতিবিবির কাহিনী এত সুন্দরভাবে অন্বিত হয়েছে যে তাকে বিশ্লিষ্ট করে দেখার উপায় নেই।

উপন্যাসের গঠন-কৌশলের অন্যতম উপাদান মতিবিবি চরিত্র হলেও লেখকের গ্রন্থি-রচনা নৈপুণ্যে মূল কাহিনীর সঙ্গে অনিবার্য সমন্বয় সূত্রে এ চরিত্র যেন গ্রথিত। স্থান কাল ও ঘটনাগত ঐক্য সংস্থাপনে 'কপালকুণ্ডলা' অসাধারণ গ্রন্থ বলে গণ্য হয়েছে। আখ্যানের বৈচিত্র্যময়তায় জাহাঙ্গীর, খসরু, মেহের-উন্নিসা—মোগল রাজ-অন্তঃপুরের দৃশ্যচিত্র, রাজ অনুগৃহীত আমীর-ওমরাহদের জীবনযাত্রার লিপিচিত্রে, মূল কাহিনীর পাশাপাশি ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সাক্ষাৎভাবে এসব চরিত্র ও তাদের জীবনালেখ্য উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। কিন্তু নবকুমারের প্রথমা পত্নী পদ্মাবতী সূত্রে এই উপকাহিনী বৃত্তান্ত উপন্যাসের ঘটনাবৃত্তের কেন্দ্রস্থলে উপনীত হয়েছে। উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শনেব একটা সামগ্রিক রূপ বিধৃত থাকে—তাই মূল কাহিনীধারার পাশে সমান্তরালভাবে অন্য চরিত্র বা কাহিনীর স্থান হতেই পারে, কিন্তু তাতে মূলের ঐক্য বিঘ্নিত না হওয়াই আকাঙ্ক্ষিত। বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা'র দ্রুত পরিণামমুখী কাহিনী-বিন্যাসে অত্যন্ত দক্ষতায় মতিবিবিকে সংস্থাপিত কবেছেন। সুতবাং এই চরিত্র ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ উপন্যাসের ঘটনাবস্তুর ঐক্য রচনা করে গতিপ্রবাহে কপালকুণ্ডলা চরিত্রেরই যেন অনুগমন করেছে।

স্থানগত ঐক্য রচনায় আপাতদৃষ্টিতে ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় বর্ধমান ও দিল্লী-আগ্রার সংযুক্তিকরণে। কপালকুণ্ডলা ও সমুদ্রবেষ্টিত অরণ্য, নবকুমার ও সপ্তগ্রাম, সমুদ্র-সৈকত ও প্রেতভূমি উপন্যাসের প্রধান কাহিনী-স্থল। মতিবিবি—সূত্রে বর্ধমানে মেহের-উন্নিসা ও দিল্লী আগ্রার জাহাঙ্গীর আমীরওমরাহের প্রসঙ্গের সঙ্গে সপ্তগ্রামেরও নিবিড় যোগাযোগ রচিত হয়েছে। পতি-দর্শনে জাগ্রত নব-প্রেমবোধে ঐশ্বর্যের অট্টালিকা ত্যাগ করে মতিবিবি আত্মকৃচ্ছতার পথে নবকুমারকে লাভ করার জন্যে 'সপ্তগ্রামে'র ঔপনগরিক অংশে উপস্থিত হয়েছে। তার পিতার মুসলমান ধর্মগ্রহণ ও রাজকার্যের জন্য দিল্লী-আগ্রায় বসবাস, মতিবিবির অতীত জীবনের ইন্দ্রিয়-লালসার পরিচয়, তারই সূত্রে জাহাঙ্গীর-নূরজাহান প্রসঙ্গ স্থানান্তরের চিত্রপটে সংক্ষিপ্তভাবে অঙ্কিত করতে হয়েছে লেখককে। বর্ধমান-দিল্লী আগ্রার অপ্রশস্ত পথরেখা সপ্তগ্রামের গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী আবর্তের মধ্যে উপনীত হয়ে পূর্ণতা পেয়েছে। সপ্তগ্রামের প্রবল ঘটনাধারায় স্থানগত পার্থক্য গৌণ হয়ে, মূলের সঙ্গে আচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে। এই অভ্যন্তরীণ ভাবের দিক থেকে উপন্যাসের সাফল্য তুলনারহিত বলা যায়—এজন্য স্থানগত পার্থক্য উপন্যাসের কাহিনী-গ্রন্থনে বিপর্যয় ঘটায় নি।

কালগত সময়-সীমার ঐক্য উপন্যাসে আগাগোড়া রক্ষিত হয়েছে। কাহিনীর সূত্রপাতে "প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে"র (কপালকুণ্ডলার রচনা-কাল ১৮৬৬-২৫০ বৎসর= ১৬১৬ সাল) সপ্তগ্রাম ও জাহাঙ্গীর-নূরজাহানের কাহিনীবৃত্ত মোটামুটি একই সময়ের। মোগল পাঠানের সংঘাত,

হতশ্রী সপ্তগ্রামের রূপচিত্রে সপ্তদশ শতাব্দীর কাল-চেতনার গভীর স্বাক্ষর বর্তমান। সমাজজীবনের সামান্য ইঙ্গিতে এই শতাব্দীর প্রাণ-প্রবাহটি আবিষ্কার করা যায়। অত্যন্ত সফলভাবে বঙ্কিম নির্দিষ্ট কালসীমায় সমগ্র উপন্যাসের বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছেন এবং দ্রুত লয়ে সপ্তগ্রামের সঙ্গে আগ্রা-দিল্লীর সংযোগ ঘটিয়েছেন এবং এতে কোথাও কোন কালানৌচিত্য দোষ ঘটেনি শিল্প-কুশলতার অত্যাশ্চর্য সিদ্ধি বঙ্কিমের এই দ্বিতীয় উপন্যাসে লভ্য।

উপন্যাসে 'কপালকুণ্ডলা' নামক নারী চরিত্রেরই প্রাধান্য, কপালকুণ্ডলাই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা প্রকৃতিময়তায় অপূর্ব নির্মাণ কৌশলে চরিত্রটির কায়া-সৃজন করেছে। কাপালিকের সান্নিধ্যে অরণ্য জীবনের নিবিড়তায় এ চরিত্রকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে লেখক প্রকাশ করেছেন— 'অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি!" (১ম খণ্ড / পঞ্চম পরিচ্ছেদ)। প্রকৃতির রহস্যময়তায়, গভীর-ঘন ভাবোপলব্ধির ব্যঞ্জনায়, ঔদাসীন্যে এই মৃন্ময়ী নারী চরিত্র বঙ্কিমের অনন্য শিল্পকুশলী সৃষ্টি। নাগরিক জীবনধারার প্রতিনিধি নবকুমারের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর্ব থেকে এই প্রকৃতি দুহিতার চরিত্রগত বাবধান চোখে পড়ে। নারীসুলভ মমতায় সে নবকুমারকে উদ্ধার করে—অথচ আশ্চর্য ঔদাসীন্যে সমস্ত জীবনকে ভরিয়ে তোলে। প্রকৃতির রূপরাশির মতোই তার সৌন্দর্য, চেতনার গভীরে আত্মনির্লিপ্ত উদাসীনতার প্রলেপ। অধিকারীর নির্দেশে ও ভবানীর সম্মতিতে তার সংসারজীবনে প্রবেশেও স্বভাব-ভাবনার পরিবর্তন হয়নি। অরণ্যানীর দুর্গম রহস্যময়তায় মৃন্ময়ীর জীবন ঘেরা—সেখানে সংসারী নারীর প্রকৃতি দুর্নিরীক্ষ্য। নবকুমারের সঙ্গে দাম্পত্য জীবন-যাপনে সে আত্মতৃপ্ত নয়—অন্তরে প্রতিনিয়ত রহস্যময় প্রকৃতির আহ্বান সে অনুভব করে বলে প্রকৃতিলোকেই তার অবলুপ্তি। প্রকৃতির প্রাঙ্গণে জন্ম যাব, অপরিমিত প্রাকৃতিক স্বাধীনতায় যে বিবর্ধিতা, সংসারবন্ধনে তাকে ধরে রাখা যায় না। মুক্ত জীবনের সহজ, স্বাভাবিক ছন্দে তাই কপালকুণ্ডলার জীবন আগাগোড়াই নিয়ন্ত্রিত। মতিবিবির ষড়যন্ত্র বা মৃন্ময়ীকে নবকুমারের জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ একান্তই বাহ্যিক ব্যাপার। কপাল চরিত্রের গভীরে যে নির্লিপ্ততা ও ঔদাসীন্যের ভাব ঔপন্যাসিক সংযুক্ত করেছিলেন, তার জীবন-পরিণাম তারই দ্বারা সূচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। কপালের প্রকৃতিই তার পরিণামের কারণ। আর এই স্বভাব-প্রকৃতির মর্মমূলে আছে প্রকৃতিলোকের দুর্নিবার প্রভাব। অরণ্যানী, গম্ভীরনাদী বারিধিতীর— সৈকতভূমি, অস্পষ্ট সন্ধ্যালোক, প্রকৃতির শান্ত, স্নিগ্ধ, ভয়াল কিংবা রুদ্র রূপ বা রহস্যময়, উদাসীন, আত্মনির্লিপ্ত ভাব—কপালকুণ্ডলার চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। উপন্যাসের প্রধান কাহিনীধারা এরই দ্বারা আবর্তিত। "চৈত্রবায়ুতাড়িত এক বিশাল তরঙ্গ আসিয়া, তীরে যথায় কপালকুণ্ডলা দাঁড়াইয়া, তথায় তটাধোভাগে প্রহত হইল ; অমনি তটমৃত্তিকাখণ্ড কপালকুণ্ডলা সহিত ঘোররবে নদীপ্রবাহমধ্যে ভগ্ন হইয়া পড়িল"—অনিবার্য প্রকৃতির আকর্ষণে মৃন্ময়ীর জীবন-পরিণাম স্বাভাবিক সমাপ্তি সূত্র বলে গৃহীত হবে। আর এই কেন্দ্রীয় চরিত্রের প্রবল আকর্ষণে নবকুমারেরও আত্মবিসর্জন সংঘটিত হয়েছে।

উপন্যাস-শিল্পের আঙ্গিক ও ভাব বিন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা'য় রোমান্স রসের সঙ্গে অদৃষ্টবাদকে অপূর্ব সাংকেতিকতায় যুক্ত করেছেন। কল্পনাচারিতায় কপালকুণ্ডলা চরিত্র নির্মাণ করে তার জীবনকে অতিপ্রাকৃত স্বপ্নদর্শন ও ভবানীর নির্দেশে সম্ভাব্য পরিণামের পথে পরিচালিত করেছেন। কাপালিক-সদৃশ "ভীমকান্তশ্রীময় ব্রাহ্মণবেশধারী" কপালকে—"তোমায় রাখি, কি নিমগ্ন করি?"— প্রশ্নের উত্তরে "নিমগ্ন কর"—মৃন্ময়ীর এই উত্তর সাংকেতিকতাময় ব্যঞ্জনাধর্মী ও

পরিণামের ইঙ্গিতবাহী ঘটনা (৪র্থ খণ্ড / তৃতীয় পরিচ্ছেদ)। ব্রাহ্মণবেশী মতিবিবির সঙ্গে নির্জন অরণ্যে সাক্ষাৎকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার নেপথ্যে এই দৈববাণীর প্রভাব ছিল (৪র্থ / ৫ম)। এই অংশে, কপাল "যেমন কক্ষ হইতে বাহির হইলেন, অমনি গৃহের প্রদীপ নিবিয়া গেল"—সাংকেতিকতাপূর্ণ ঘটনা। উত্তরপর্বে মতিবিবির অনুরোধে মৃন্ময়ীর সিদ্ধান্ত এই ঘটনারই অনুষঙ্গ—"তোমার মানস সিদ্ধ হউক—কালি হইতে বিঘ্নকারিণীর, কোন সংবাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।" (৪র্থ / সপ্তম পরিচ্ছেদ) এছাড়া, অদৃষ্টবাদ ভাবনাকে বঙ্কিম এ নারীর জীবন-বৃত্তের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেছেন। নবকুমারের সঙ্গে বিবাহ ও মেদিনীপুর যাত্রার প্রাক্-লগ্নে ভবানীর চরণে "অভিন্ন বিল্বপত্র" দান ও পত্র-পতিত হওয়ার প্রসঙ্গে অশুভ ইঙ্গিত আছে। নিয়তির অমোঘ প্রভাবে কপালকুণ্ডলার জীবন ট্রাজিক পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। কাপালিকের স্বপ্নদর্শনে "তুই এ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় লালসায় বদ্ধ হইয়া এই কুমারীর শোণিতে এতদিন আমার পূজা করিস্ নাই"— (৪র্থ খণ্ড/ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) ভবানীর আদেশ, মতিবিবির নবকুমার লাভের প্রতিজ্ঞা—সমস্ত ঘটনা মৃন্ময়ীর নিয়তির দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কপালকুণ্ডলার, "যাহার বন্ধন নাই, তাহারই অপ্রতিহত বেগ," বন্ধনহীন ঔদাসীন্য পঞ্চভূতাত্মক শরীরটিকে জগদীশ্বরীর চরণে সমর্পণ করবার জন্য কৃত-সংকল্প হয়েছে। কার্য-কারণ সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনী, চরিত্র ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন কুশলী বিন্যাসরীতিতে।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের অনবদ্য গঠনকৌশলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন "উপন্যাসখানি ঠিক একটি গ্রীক ট্রাজেডির মত সরল রেখায়, অবিসর্পিতগতিতে, সর্বপ্রকার বাহুল্য-বর্জিত হইয়া অবশ্যম্ভাবী বিষাদময় পরিণতির দিকে অনিবার্যবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায় এক নিগূঢ় কলাকৌশল—নিয়ন্ত্রিত হইয়া কেন্দ্রাভিমুখী হইয়াছে। এমন কি সুদূর মোগল রাজধানীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও অন্তঃপুরিকাদেরও ঈর্ষাদ্বন্দ্ব পর্যন্ত বনবাসিনী কপালকুণ্ডলার নিয়তির পর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, যে অগ্নিতে সে আত্মবিসর্জন করিয়াছে তাহার ইন্ধন যোগাইয়াছে। চারিদিকের সমস্ত শক্তি যেন দৈববলে সংহত হইয়া কপালকুণ্ডলার অদৃষ্টরথকে এক অন্তহীন অতলের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে—তাহার সংসারাসক্তি, স্বামিপ্রণয়বঞ্চিতা শ্যামার প্রতি সমবেদনা, কাপালিকের অতন্দ্র প্রতিহিংসা, নবকুমারের আশঙ্কা-দুর্বল, গভীর প্রেম, পদ্মাবতীর পাষাণ প্রাণে প্রেমমন্দাকিনী ধারার অতর্কিত আবির্ভাব, সর্বোপরি এক ক্রুদ্ধ দৈবশক্তির সুস্পষ্ট অঙ্গুলিসংকেত—এই সমস্ত শক্তি, মানুষ এবং দৈব, সৎ ও অসৎ একসঙ্গে ভিড় করিয়া যেন রথ-রজ্জুর আকর্ষণে হাত দিয়াছে।" (বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা)। বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনীর সমগ্র গতিধারাকে সুকৌশলে পরিমিতিবোধের সৌন্দর্য-সুষমায় বিন্যস্ত করেছেন। এই পরিমিতিবোধের ফলে দিল্লী আগ্রার কাহিনীবৃত্ত মতিবিবির মাধ্যমে স্বচ্ছন্দে মূল স্রোতধারার অঙ্গীভূত হয়, মতির প্রবৃত্তিতাড়িত লালসার স্বল্প-দৈর্ঘ্যের চিত্র পরিবর্তিত প্রেমবোধে জাগ্রত হয়, কাপালিকের রহস্যময় দুরন্ত স্বভাব, কপাল শ্যামা মতিবিবি পেষমন ও নবকুমারের প্রসঙ্গ ইঙ্গিতে, ব্যঞ্জনায় আভাসিত হয়। কপালকুণ্ডলা চরিত্রে প্রকৃতি, ভবানী, অদৃষ্টবাদ, কাপালিক-প্রভাব—সামঞ্জস্যে, পরিমিত বর্ণনায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

গঠন-কৌশলে নাট্যধর্মিতা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। উপন্যাসে বর্ণনারীতি ও সংলাপ উভয়ই গ্রাহ্য। কিন্তু বঙ্কিম বর্ণনায় সৌন্দর্যের, বীভৎসতার, প্রবৃত্তির বা সংযমবোধের ছবি ফুটিয়ে তুলতে অথবা চরিত্রের মানসিকতা, ভাব-ভঙ্গিমা ব্যক্ত করতে সংলাপের আশ্রয় নিয়েছেন। সংলাপের সংযত

ও সংক্ষিপ্ত প্রয়োগকুশলতায় চরিত্রের অন্তর্লীন ভাবনার সঙ্গে সমগ্র চরিত্রের এক পূর্ণায়ত মূর্তির প্রকাশ ঘটেছে পাঠকের হৃদয়ে। কাপালিকের বীভৎস তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতির অনুষঙ্গ হিসেবে তার নির্মম স্বভাবের আভাস আছে সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থপূর্ণ সংলাপে— যেমন (১) কস্তুং ? মামনুসর। ভৈরবীপ্রেরিতোঽসি ; মামনুসর ; পরিতোষঃ তে ভবিষ্যতি। (১ম খণ্ড / চতুর্থ পরিচ্ছেদ) (২) কাপালিক কেবলমাত্র কহিল—আমার সঙ্গে আগমন কর। ..... নবকুমার পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছেন ?" কাপালিক কহিল,— "পূজার স্থানে।" নবকুমার কহিলেন— 'কেন ?' কাপালিক কহিল, 'বধার্থ।" (১ম খণ্ড / ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) এ উপন্যাসে সংলাপের পরিমিতিবোধ প্রায় সমস্ত চবিত্রেই উদ্ভাসিত। মতিবিবি, নবকুমার, মেহের-উন্নিসা, পেষমন্, জাহাঙ্গীর, শ্যামাসুন্দরী কিংবা কপালকুণ্ডলা প্রতিটি চরিত্র নির্মাণ-কৌশলের অন্যতম উপায় হিসেবে বর্ণনার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সংলাপের মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। স্বল্প সংলাপে বিষয়বস্তু ও চরিত্র আপন স্বভাবে ও স্বরূপে মূর্ত হয়ে উঠে—ইঙ্গিতময়তা বা সাংকেতিকতাপূর্ণ সংলাপ বিশেষ অর্থপূর্ণ ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। কপালকুণ্ডলা চরিত্রে দেখি— (১) শ্যামাসুন্দরী তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কহিলেন— ..... 'তোমার সুখ কি ?' মৃন্ময়ী কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, 'বলিতে পারি না। বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।' (২য় খণ্ড / ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) (২) 'যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।' (৪র্থ /১ম)। (৩) 'আমি অবিশ্বাসিনী নহি। ..... কিন্তু আমি আর গৃহে যাইব না। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি— নিশ্চিত তাহা করিব।" (৪র্থ / নবম পরিচ্ছেদ) এখানে সংলাপ যথাযথ, পরিমিতিবোধসম্পন্ন ও নাট্যগুণান্বিত। উপন্যাসের পাতায় পাতায় এমন উদাহরণের অভাব নেই। নাটকের মত এ উপন্যাসে গতিপ্রবাহ, কৌতূহল-সৃষ্টি, দ্বন্দ্ব, আকস্মিকতা, সাংকেতিকতাব লক্ষণ স্পষ্ট হয়েছে। লেখকেব সজ্ঞান সৃজন-কৌশল ট্রাজিক নাট্য-পরিণাম দেখানোতেও যে ক্রিয়াশীল ছিল এ তারই প্রমাণ।

ভাবগত বৈপরীত্য সৃজনে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাগ্রসর শিল্পী। কাপালিকের তান্ত্রিক সাধনার কাঠিন্য ও নিষ্ঠুরতা, কপালেব স্নেহময়ী করুণার্দ্র মন ; নবকুমারের কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা ও রূপমুগ্ধতা, মতিবিবির প্রবৃত্তিকেন্দ্রিক জীবনাচরণ বা মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিদের কামনা-বাসনা, হীন ষড়যন্ত্র এবং অরণ্য প্রতিপালিতা মৃন্ময়ীর ঔদাসীন্য, সংসার অনাসক্তি অপূর্ব বিরুদ্ধ ভাবচেতনার অঙ্গীভূত হয়েছে। আর এই বিরোধের অবকাশে কপালকুণ্ডলা চরিত্রকে ঘিরে লেখকের রোমান্সপ্রিয়তা, কপালের প্রকৃতি দুহিতা স্বভাবের ইতিবৃত্ত বর্ণনা গভীর ব্যঞ্জনায় আভাসিত হয়েছে। সুতরাং উপন্যাসের গঠন-কৌশলে ভাবগত এই বৈচিত্র্য সৃষ্টির স্বতন্ত্র মূল্য স্বীকৃত হবে।

আঙ্গিক বিন্যাস-রীতিতে পরিচ্ছেদের শিরোনামের তাৎপর্য বিশেষ অর্থপূর্ণ। কাহিনী, চরিত্র, ভাব সৃষ্টিতে এই নামকরণের মূল্য অশেষ। কাহিনী ও চরিত্রের ধারাবাহিকতা ও স্বরূপ বিশ্লেষণে শিরোনাম—সাগরসঙ্গমে, সমুদ্রতটে, আশ্রমে, প্রেতভূমে এবং কাপালিকসঙ্গে, সুন্দরী সন্দর্শনে, প্রতিযোগিনী-গৃহে, আত্মমন্দিরে, চরণতলে, শয়নাগারে, স্বপ্নে, কৃতসঙ্কেতে, সপত্নীসম্ভাষে, গৃহাভিমুখে ইত্যাদি। প্রতিটি খণ্ডের প্রতি পরিচ্ছেদের এই সব নামকরণের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক চরিত্রের স্বভাব-প্রকৃতিকে আবিষ্কার এবং কাহিনী বর্ণনায় অভিনব রীতির প্রবর্তন করেছেন।

আখ্যানবস্তুর কায়া-নির্মাণ ও ভাব-সৃজনে ভাষা-শৈলীর গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। বর্ণনাকৌশলে কাহিনী ও চরিত্র মূর্ত হয়ে ওঠে। মৃন্ময়ীর চরিত্র গঠনে প্রকৃতি ও কল্পনার প্রাধান্য, মতিবিবি

নবকুমারের জীবনের বাস্তবানুগ-জীবনধারার অনুবর্তন, ভাষা প্রয়োগের অর্থপূর্ণ সংক্ষিপ্ত সাংকেতিকতা আগাগোড়া লক্ষ্য করা যায়। ভাষার ধ্বনিমাধুর্যে মৃন্ময়ীর চরিত্রে ভাবের একটি অপূর্ব ছবি যেমন ভেসে ওঠে, তেমনই মতিবিবি বা নবকুমারের চরিত্র স্বরূপ পাঠকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। এছাড়া, ভাষার কারুকার্যে উপন্যাসের একটা সৌন্দর্য-পরিমণ্ডলও যেন গড়ে ওঠে। মতিবিবির প্রবৃত্তি ও প্রেমবোধ, নবকুমারের রূপ-মুগ্ধতা ও কপালকে ঘিরে ভাব-কল্পনা এবং সর্বোপরি মৃন্ময়ীর আলো-আঁধারি জীবনে স্বল্প বাক্‌রীতির প্রয়োগ কুশলতায় একক চরিত্রের রূপ-সৌন্দর্য ও ভাব-সৌন্দর্যের জন্ম হয়েছে। চরিত্র প্রসঙ্গ ছাড়াও উপন্যাসের সমগ্র কাহিনীবৃত্তেরও একটা ভাবগত সৌন্দর্য আছে। তাই মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র ভাষা-সৃষ্টির মধ্যে যে ছন্দ-স্পন্দনটি আবিষ্কার করেছিলেন, কাহিনী ও চরিত্র-নির্মাণে তা বিশেষ সহায়ক হয়ে ছিল। কপালের উপযোগী কোমল স্নিগ্ধ রহস্যময় ভাষা-প্রয়োগ, কাপালিকের রূঢ়তা ও নিষ্ঠুরতা বা মতিবিবির প্রবৃত্তির প্রশ্রয় জনিত প্রগল্‌ভতা, ও প্রেমার্তি—উদ্দেশ্য সাধনেব একাগ্রতা এবং নবকুমারের প্রতি অবশ-করা প্রাণের রূপারতি—অপূর্ব ভাষা প্রয়োগেই মূর্ত হয়ে উঠেছে। শিল্প কৌশলের এ-ও এক অন্যতম দিক। চরিত্র-সংলাপ-ভাষা, ভাষার অন্তঃসৌন্দর্য এবং কাহিনীর ভাবানুযায়ী ভাষার কারুকার্য, সংক্ষিপ্ততা, অর্থপূর্ণ ব্যঞ্জনা, কার্য-কারণসূত্রে তার উপস্থাপন-রীতির স্টাইল এই উপন্যাসের গঠন-শৈলীর অন্তর-প্রেরণা।

উপন্যাসেব বর্ণনারীতি বাহুল্যহীন—শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এর আখ্যানবস্তু অত্যন্ত দ্রুত লয়ে পরিণতির দিকে এগিয়ে গিয়েছে—কোথাও কোন বাহুল্য নেই। প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের মূল ঘটনাস্রোতের সঙ্গে তৃতীয়খণ্ড চমৎকারভাবে সমন্বিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র গঠন-কৌশলে সংশয়ের অবকাশ রাখেন নি। পাঠকের কৌতূহল ও আগ্রহকে পূর্বাপর ধরে রাখতে পেরেছেন তিনি। প্রাকৃতিক শক্তি-প্রভাবে কপালকুণ্ডলার জীবন বৃত্তান্ত এজন্যই চিত্তাকর্ষক হয়েছে। সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার তাই বঙ্কিমের সৃষ্টি-ধর্মী কল্পনার মধ্যে এক সমগ্র-দৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ কবে বলেছেন—"চরিত্র, প্লট—সকলই একটি কেন্দ্রগত রহস্যে এমনই অঙ্গাঙ্গীভাবে সুসম্বদ্ধ হইয়া সেই কল্পনায় ধরা দেয় যে, কবিকে যেন কোন চিন্তাই করিতে হয় না, যতকিছু কার্য কারণ জিজ্ঞাসা, যতকিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সেই সৃষ্টিকর্মের অন্তর্নিহিত হইয়াই আছে। এইজন্যে এরূপ কাবোর নির্ম্মাণ কৌশল প্রাকৃতিক নির্ম্মাণ কৌশলের মতই সমালোচকের বিস্ময় উৎপাদন করে।" (বঙ্কিম-বরণ) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমের শিল্পসিদ্ধি করায়ত্ত হয়েছিল, উপন্যাসের কাহিনী চরিত্র ভাব রচনায় তার প্রমাণ আছে॥

কাহিনীর ঘটনা, সময় ও স্থান ঐক্য

অ্যারিস্টটল প্রদত্ত সংজ্ঞার ভিত্তিতে দেখা যায় নাটকে (উপন্যাসেও বটে) ত্রি-ঐক্য সূত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কাহিনীর মধ্যে একক ঘটনার উপস্থাপন-রীতিকেই ঘটনাগত বা বিষয়-ঐক্য (Unity of plot) বলা হয়। একক ঘটনার সঙ্গে অনিবার্য অথবা সম্ভাব্য ঘটনার সংযুক্তিকরণে বাধা নেই। তবে কোন অবস্থাতেই, যে সমস্ত ঘটনার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ মূল কাহিনীর সঙ্গে থাকে না—তাকে কাহিনী ঐক্যের মধ্যে আনা যায় না বলে তা পরিত্যক্ত হতে বাধ্য। সময় ঐক্য বা কাল ঐক্য (Unity of time) বলতে নির্দিষ্ট সময়ের পরিধিতে কাহিনীবৃত্ত সংঘটিত হওয়া চাই—এরকম একটি শর্ত আরোপিত হয়। অর্থাৎ যে কালকে ভিত্তি করে ঔপন্যাসিক বা নাট্যকার কাহিনীকে সাজিয়ে তোলেন, তার মধ্যে কালগত মাত্রাবোধ থাকবে— কোন অবস্থাতেই কালগত অনৈক্যবোধের পরিচয় দিলে হবে না। স্থানগত ঐক্যকে অ্যারিস্টটল তৃতীয় ঐক্য বলে গণ্য করেছেন। ঘটনাবস্তু একই স্থানে সংঘটিত হবে, এমন ব্যঞ্জনা এই ঐক্যের মধ্যে আছে। আধুনিককালে কাল ও স্থান ঐক্য তেমন গুরুত্ব না পেলেও চতুর্থ আর একটি, ভাবগত ঐক্যের (Unity of impression) কথা বলা হয়। ঘটনা, কাল ও স্থান ঐক্যের মধ্যে এই ভাবগত ঐক্য দুর্নিরীক্ষ্য নয়, তথাপি ভাবের সামঞ্জস্য ছাড়া ত্রি-ঐক্যের অবস্থিতিও সম্ভব নয়। সুতরাং কোন কোন সমালোচক ভাব ঐক্যকে স্বতন্ত্রভাবে দেখেন নি। যাইহোক, 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে ঐক্য সংস্থাপন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের কাহিনীগত বিষয় ঐক্য আগাগোড়া লক্ষ্য করা যায়। "উপন্যাসখানি ঠিক একটি গ্রীক ট্রাজেডির মত সরল রেখায়, অবিসর্পিত গতিতে, সর্বপ্রকার বাহুল্য বর্জিত হইয়া অবশ্যম্ভাবী বিষাদময় পরিণতির দিকে অনিবার্যবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। .....চারিদিকের সমস্ত শক্তি যেন দৈববলে সংহত হইয়া কপালকুণ্ডলার অদৃষ্টরথকে এক অন্তহীন অতলের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। **প্রথম খণ্ডের** নয়টি পরিচ্ছেদে কাহিনীবৃত্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে গিয়েছে—এক মুহূর্তও কাল-বিলম্ব ঘটে নি। সমুদ্রতটে বিসর্জিত নবকুমার কাপালিকের দর্শন পায়—কপালের সঙ্গে পরিচয়, নবকুমার বধের আয়োজন, কপালিনী কর্তৃক উদ্ধার, অধিকারীর সাহায্যে নবকুমার কপালকুণ্ডলার বিবাহ— অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হয়েছে। গঠন প্রক্রিয়ার সূত্রানুযায়ী সূচনাপর্ব, (Exposition), ঘটনার ক্রমোন্নতি (Rising of action), চূড়ান্ত মুহূর্ত (Climax) ও সমাধান (Catastrophe) চমৎকার কার্যকারণসূত্রে সংহতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিষয় ঐক্যের ঠাস-বুনুনি সর্বত্রই দেখা যায়। বনচারিণী কপালের সঙ্গে নগর-জীবনের প্রতীক নবকুমারের বিবাহ প্রথম খণ্ডের মূল বিষয়বস্তু। এই বিবাহ শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয় কিনা পরীক্ষার পূর্ব-প্রস্তুতি হিসেবে বঙ্কিম দ্রুততার সঙ্গে এই প্রাককথন সেরে নিয়েছেন। কপালের জীবনে অদৃষ্ট শক্তির লীলা এবং নবকুমার ও কাপালিকের জীবনে অদৃষ্টলিখনের যেন সূত্রপাত ঘটাল। **দ্বিতীয় খণ্ডে** পথিমধ্যে মতিবিবির সাক্ষাৎ, নবকুমার যে তার পূর্ব-স্বামী এই পরিচয় লাভ, সংসার জীবনে অবরুদ্ধা কপালিনীর অন্তর্মানসে দেবী ভবানীর বিশ্বপত্র প্রত্যাখ্যান জনিত ভয় ও সমুদ্রতীরে বনে বিচরণ করার আনন্দ অনুভব ও তজ্জনিত দুঃখ প্রাধান্য পেয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডেই মতিবিবির উপকাহিনী উপন্যাসের মধ্যে স্থান পেয়েছে এবং নবকুমার কপালকুণ্ডলার জীবন-নাট্যে মতিবিবির অনুপ্রবেশ

ঘটেছে। পার্শ্ব-নায়িকা মতিবিবির ভূমিকা উপন্যাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—(১) প্রকৃতিগত দিক থেকে মতিবিবি প্রগল্‌ভা, প্রবৃত্তিরূপিণী—নায়িকা কপালের মধ্যে প্রকৃতি ও ধর্ম বিশ্বাসের প্রভাব ; বিপরীত স্বভাব বৈশিষ্ট্যে কপালের সঙ্গে মতিবিবিও উজ্জ্বলতর চরিত্র হয়েছে। (২) কপালের সংসার অনাসক্তির অনিবার্য পরিণাম সমাধানহীন মৃত্যু হলেও, উপন্যাসের যুক্তিনিষ্ঠায় মতিবিবির ষড়যন্ত্র বিশেষ উপযোগী বিষয়। (৩) বৈচিত্র্যময় চরিত্র সৃষ্টি হিসেবে মতির গুরুত্ব, তার জীবনের বিচিত্র গতি-প্রকৃতির এক অপূর্ব আলেখ্য উপন্যাসের চিত্তাকর্ষক চরিত্র-দৃশ্য। তৃতীয় খণ্ড সংক্ষিপ্ত সাতটি পরিচ্ছেদে বিস্তৃত। আপাতদৃষ্টিতে এই খণ্ড সংযুক্তিকরণের দ্বারা কাহিনীর গতিধারাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে বলে মনে হলেও, এই অংশের একটা ভিন্ন তাৎপর্য আছে। বঙ্কিমের রোমান্টিক কবি মনে কপালকুণ্ডলার জন্ম—তার জীবনকাহিনী আলো আঁধারের অন্তরালশায়ী এক অনুভবগম্য স্বতন্ত্র রোমান্টিক জীবন-বৃত্তান্ত। অথচ আগ্রার রাজৈশ্বর্যের প্রবৃত্তিমুখী জীবনাচরণে মতিবিবি লুৎফ-উন্নিসা—নবকুমার দর্শনে আবার সে প্রেম-অনুরাগিণী। আত্মকৃচ্ছতায় ভিন্ন মূর্তির এক নারী। নবকুমার লাভের জন্য ঐশ্বর্যের স্বর্গভূমি ছেড়ে সপ্তগ্রামের মাটির কাছাকাছি মতিবিবি—প্রত্যাখ্যাত নারী ষড়যন্ত্রের সাহায্যে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য কৃতসঙ্কল্প। কপালকুণ্ডলার নিয়তির উপর মতিবিবির ষড়যন্ত্র এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। সুতরাং কপালকুণ্ডলা জীবন-পরিণামে নবকুমার সূত্রে আগতা নারী মতিবিবিরও ভূমিকা আছে। তাছাড়া, আখ্যায়িকার কাব্য অংশের নায়িকা কপালকুণ্ডলা আর উপন্যাস অংশের নায়িকা মতিবিবি। মতিবিবি চরিত্রের প্রেক্ষাপট রচনা এজন্যই প্রাসঙ্গিক এবং উপন্যাসের বিষয় ঐক্যের মধ্যে অনৌচিত্য দোষ না ঘটিয়ে চরিত্রটি স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে ও কাহিনীর মূল স্রোতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে আখ্যানের বৈচিত্র্য এনেছে।

চতুর্থ খণ্ডে কপাল-বৃত্তান্তের সম্পূর্ণতা। শ্যামাসুন্দরীর জন্য বনৌষধি সংগ্রহার্থে কপালের বন-গমন, কাপালিক ও ব্রাহ্মণবেশী মতিবিবির ষড়যন্ত্র, নবকুমারের সন্দেহ, কপালকুণ্ডলা স্বপ্নদর্শন ও ভৈরবীর নির্দেশ, কাপালিকের কপাল বধের আয়োজন এবং কপালকুণ্ডলার আত্ম-বিসর্জন—ইত্যাদি বিষয়ে চতুর্থ খণ্ডের কাহিনী গ্রন্থনে বঙ্কিম অসাধারণ শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের প্রাসঙ্গিকতা শেষ খণ্ডে খুব বেশী করে চোখে পড়ে। কাপালিক, নবকুমার, মতিবিবি এই তিনচরিত্রের ত্রিমুখী কর্ম প্রয়াস যেন কপালকুণ্ডলার পরিণতিতে সাহায্য করেছে। কপালিনীকে ঘিরে তিন চরিত্রের প্রতিহিংসা, সন্দেহপ্রবণতা ও প্রণয়-ভিখারিণীর প্রতিযোগিনীকে সরানোর উদ্যোগ-ষড়যন্ত্র কপাল-জীবনের গভীরে কার্যকরী না হলেও, উপন্যাস-অংশে এদের ভূমিকা আছে। কপালের জীবন ঐশী শক্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত তাই সেখানে বাহ্যিক ষড়যন্ত্র, প্রতিহিংসার কার্য্যকরিতা বঙ্কিম দেখান নি। কিন্তু উপন্যাস তো কাব্য নয়—তাই বাস্তব-জীবনের পরিচয়কে অনিবার্যভাবে যুক্ত করতে হয়েছে কাহিনীর মধ্যে। কাপালিক, নবকুমার ও মতিবিবি উপন্যাসের সেই বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপে উপন্যাসের ভাববস্তু পরিপুষ্ট। রোমান্সের অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক জগৎ কপালকুণ্ডলার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করলেও কাপালিক, মতিবিবি এবং নবকুমারের ভূমিকাকে তাই ছোট করে দেখা যায় না। সুতরাং বিষয় ঐক্যের দিক থেকে সংক্ষিপ্ত এই আখ্যায়িকার একমুখীন গতি-প্রবাহ বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ শিল্পকৃতির পরিচায়ক বলে গণ্য হবে।

উপন্যাসের সময় ঐক্য (Unity of time) প্রসঙ্গে বলা যায়, আখ্যায়িকার অধিকাংশ ঘটনা রাত্রিকালীন পরিবেশেই সংঘটিত হয়েছে। কাপালিক ও কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের সাক্ষাৎকার

রাত্রিতে, বিবাহের সিদ্ধান্ত রাত্রিতে, মতিবিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে, দু'টি স্বপ্নদর্শনও রাত্রিতে, কাপালিক-মতির ষড়যন্ত্র ও কপালিনীর আত্মবিসর্জন সমস্তই রাত্রিকালীন পরিবেশের ঘটনা। রাত্রির অন্ধকারে এই উপন্যাসের প্রধান ঘটনাগুলো কার্যকারণসূত্রে অত্যন্ত ঐক্যবদ্ধ—তাই সময়গত ঐক্যের দিক থেকে এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। রাত্রির ঘনান্ধকারে নবকুমারের রূপমুগ্ধতা, কাপালিকের তান্ত্রিক সাধনার পৈশাচিক ক্রিয়াকর্ম ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা, মতিবিবির ষড়যন্ত্র, এবং নবকুমারের অনুগমন—ঘটনাবস্তুর ক্রমিক পরিণতিতে সময়-ক্ষণের অনিবার্য প্রভাব দেখা যায়। যাইহোক্, মোট এগার দিনের ঘটনা নিয়ে উপন্যাসের কাহিনীবৃত্ত রচিত হয়েছে। সমুদ্রতটে নবকুমারের আগমন থেকে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে তার বিবাহ ও সপ্তগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা পর্যন্ত সাতদিনের ঘটনা এবং নবকুমার-মতি সাক্ষাৎ, তার প্রেমবোধ, কাপালিকের সঙ্গে মতিবিবির ষড়যন্ত্র, কপাল-নবকুমারের জীবন-পরিণাম—মোট চারদিনে সমাপ্ত হয়েছে। সমস্ত কাহিনীর কাল-পরিধি মোটামুটি একবৎসর।

প্রথম দিনের ঘটনা প্রথম খণ্ডের চারটি পরিচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে— 'সাগরসঙ্গমে' নবকুমারে বিসর্জন থেকে কাপালিকের সঙ্গে পরিচয় এক দিনের ঘটনা। **দ্বিতীয় দিনে** নবকুমারের অপূর্ব মোহিনী মূর্তি কপালকুণ্ডলা দর্শন ও তার সহায়তায় পর্ণকুটীরে প্রবেশ। **তৃতীয় দিন** কাপালিক কর্তৃক বধ্যভূমিতে নবকুমারের আনয়ন ও কপাল কর্তৃক রক্ষা ও পলায়ন, অন্ধকারে অনুসরণকারী কাপালিকের স্তূপশিখর থেকে পতন ও ভগ্নবাহু হওয়া, অধিকারীর গৃহে উপনীত হলে কপালকে বিবাহের অনুরোধ। **চতুর্থ দিনে** কপাল-নবকুমারের বিবাহ (৯-ম পরিচ্ছেদ) এবং **পঞ্চম দিনে** কপালসহ নবকুমারের সপ্তগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা এবং যাত্রার প্রাক্কালে দেবী ভবানীর চরণ থেকে অভিন্ন বিল্বপত্র পড়ে যাওয়ার ঘটনা। একই দিনে মতিবিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ, স্বামীরূপে চিনতে পারা ও কপালকুণ্ডলা দর্শন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। **ষষ্ঠ দিনে** নবকুমারের গৃহে কপালকুণ্ডলা এবং **সপ্তম দিনে** কপালকুণ্ডলার সংসার অনাসক্তির চিত্র-দৃশ্য।

পরবর্তী ঘটনাকে বঙ্কিম "এক বৎসরের অধিককালের" ব্যবধান রেখেছেন। এখানকার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা চারটি দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যে অবশ্য মতিবিবি চরিত্রের উপযুক্ত প্রেক্ষাপট রচনার জন্য বঙ্কিম ইতিহাসের দ্বারস্থ হয়েছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে জাহাঙ্গীর মেহেব-উন্নিসার চরিত্র-আভাস ছাড়াও মতিবিবির বিচিত্র কর্মতৎপরতার পরিচয় দিয়েছেন। **প্রথম দিনে** (চরণতলে ৩য় খণ্ড/ ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ) সপ্তগ্রামে মতিবিবির নবকুমারে কাছে প্রার্থনা— "কেবল তোমার দাসী হইতে চাহি" এবং প্রত্যাখ্যাতা নারীর স্বামীর কাছে পদ্মাবতীর পরিচয় দান। **দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের** ঘটনা (৩য়/ ৭ম) মতিবিবি-কেন্দ্রিক—কপালকুণ্ডলার সঙ্গে স্বামী-বিচ্ছেদের জন্য ব্রাহ্মণবেশীর ছদ্মবেশ ধারণ এবং কাপালিকের সাক্ষাৎ। **তৃতীয় দিনের** অন্য একটি ঘটনাও এর সাথে যুক্ত হয়েছে। কপালিনীর শ্যামার জন্য স্বামী বশীকরণে বনৌষধি সংগ্রহের জন্য বনে গমন ও ব্রাহ্মণবেশীর সাক্ষাৎ প্রত্যাগমন কালে গৃহপ্রাঙ্গণে কাপালিকের দর্শন পায়। ঐ দিন রাত্রিতে কপালকুণ্ডলর স্বপ্নদর্শন ঘটে (৪র্থ/ ৩য় পরিঃ)। **চতুর্থ দিনের** ঘটনা ৪-র্থ খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদ থেকে নবম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এই অংশে কপালের পুনরায় বন-গমন, ব্রহ্মণবেশীর পত্র কবরীচ্যুত হলে নবকুমারেরপত্র-প্রাপ্তি ও সন্দেহ, মতিবিবির সঙ্গে সাক্ষাতে 'বনচারী ছিলাম, বনচারী হইব' কপালের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কাপালিক-মতিবিবি নবকুমারের ষড়যন্ত্র এবং গভীর রাত্রিতে কাপালিকের কপালবধের আয়োজন, নবকুমারের দৃঢ়মুষ্টিতে কপালের বালিয়াড়ির স্তূপ ভেঙ্গে

গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে পড়ে যাওয়া এবং নবকুমারের অনুগমন—বিস্তৃত এই অংশের ঘটনা কাল রাত্রির অন্ধকার এবং একই দিনে তা সমাপ্ত হয়েছে।

কোথাও কোন কালক্ষেপ না করে বঙ্কিম অত্যন্ত কুশলী হাতে অপূর্ব দ্রুততায় কাহিনীকে সূচনাপর্ব থেকে পরিণতিতে নিয়ে গিয়েছেন। মাত্র এগারো দিনের সময় সীমায় উপন্যাসের কাহিনীবৃত্তের পূর্ণতা। সময়গত ব্যবধান এক বছরের হলেও তা আখ্যানের বিশেষ প্রয়োজনেই দেখানো হয়েছে। সময়-ঐক্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাত্রিকালীন পরিবেশের সমন্বয়সূত্র—কাহিনীবৃত্ত দিনের আলোর পরিবর্তে রাত্রির ঘনান্ধকারের রহস্যময়তায় পরিব্যাপ্ত। কপালকুণ্ডলার জীবনে প্রকৃতি-প্রভাব ও দৈব শক্তির লীলাময় রূপ অস্পষ্ট আলো-আঁধারি পরিবেশে উপযুক্ত হয়েছে। এছাড়া, কাপালিকের অতন্দ্র প্রতিহিংসা, মতিবিবির স্বামী-প্রাপ্তির ঐকান্তিকতায় ষড়যন্ত্র এবং নবকুমারের রূপমুগ্ধতা ও সন্দেহ-সংশয় রাত্রিকালীন পরিবেশেই সুচিত্রিত হয়েছে। কারণ, এই চরিত্রগুলির অন্তর্মানসের অন্ধকারময় কামনা বাসনা দিনের আলোয় প্রকাশ পেতে পারে না। এগারো দিনের সময় ঐক্যের মধ্যে অন্ধকার-পরিবেশের গুরুত্বও অসামান্য। বঙ্কিম দক্ষ শিল্পীর মতো উভয়ক্ষেত্রেই ঐক্য-সংহতির পরিচয় রেখেছেন।

উপন্যাসের, স্থানগত ঐক্য-সংস্থাপনও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে 'কপালকুণ্ডলা' আখ্যায়িকায়। ঘটনাস্থান—অরণ্যবেষ্টিত সমুদ্র সৈকত, রাজপথ, বর্ধমান, আগ্রা ও সপ্তগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে উপন্যাসের প্রধান ঘটনাস্থল সমুদ্রতট ও অরণ্য এবং সপ্তগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রথম পর্বের কাপালিক কপালকুণ্ডলার আবাসস্থল অরণ্যভূমি ও সমুদ্রতটের গুরুত্ব এবং তারই মধ্যে নবকুমারের আগমন, সংকট এবং উদ্ধার ও কপাল-নবকুমার বিবাহ প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে। উত্তর পর্বে সপ্তগ্রামের নবকুমারের গৃহ-সন্নিকটস্থ অরণ্যভূমি ঘটনার কেন্দ্রস্থল। প্রথম পর্বের সমুদ্রতীরস্থ বধ্যভূমি থেকে শেষ পর্বে প্রেতভূমের সমুদ্র-সৈকতের মধ্যে চমৎকার সাদৃশ্য আছে। আবার, প্রথম পর্বের অরণ্যবেষ্টিত সমুদ্রতটে নবকুমার-কপাল সাক্ষাতের পরিণতিতে বিবাহ, কাপালিকের পৈশাচিক সাধন-ক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে নবকুমার-বধের আয়োজন ও ব্যর্থতা, তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদগ্র বাসনা এবং উত্তরপর্বে, কপালকুণ্ডলার অরণ্যপ্রীতি, ও দৈবী নির্ভরতা, নবকুমারের সংশয়-সন্দেহ, মতিবিবির ষড়যন্ত্র এবং কাপালিকের কপাল বধের আয়োজন স্থানগত সৌসাদৃশ্যে অপূর্ব ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ হয়েছে। রহস্যময় পরিবেশ রচনায় প্রকৃতিলোকের সমুদ্র ও অরণ্য বিশেষ কাজ করেছে। আখ্যায়িকার এই প্রধান প্রেক্ষাপটে রোমাঞ্চকর কাহিনীর উত্থান-পতনের দৃশ্য সংযোজিত হয়েছে। পরিবেশ পরিস্থিতির রূপ নির্মাণে বঙ্কিমের রোমান্টিক মানসিকতার পরিচয় পাওয়া গেলেও এই স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষ শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যাবে।

আপাতদৃষ্টিতে বর্ধমান ও আগ্রার দৃশ্য-সংস্থাপন স্থানগত অনৈক্যের নিদর্শন বলে মনে হলেও, এই ভিন্ন স্থানান্তরের সংযোজনা উপন্যাসের বৈচিত্র্যময় দিককে আভাসিত করে। মতিবিবির পদ্মাবতী থেকে লুৎফ-উন্নিসায় পরিবর্তিত হওয়ার কাহিনীসূত্রে বর্ধমান ও দিল্লী-আগ্রার প্রসঙ্গ চরিত্রের উপযুক্ত প্রেক্ষাপট রচনার উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। মতিবিবি চরিত্রের পূর্ণরূপ উদ্ঘাটনের জন্য বর্ধমান ও আগ্রা-দৃশ্যের প্রয়োজন ছিল। বর্ধমানে মেহের-উন্নিসার জাহাঙ্গীর সম্পর্কে মনোভাব জানার জন্য গমন নবকুমার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযুক্ত কারণ বলে গণ্য হবে। প্রবৃত্তিরূপিণী নারীর ঐশ্বর্যের-ভোগলিপ্সার চিত্র-দৃশ্য আছে আগ্রার ইচ্ছাধীন জীবন-লালসার মধ্যে। মতিবিবির চরিত্র-নির্মাণে এসবের ভূমিকা অনিবার্য ছিল। তাছাড়া, কপালকুণ্ডলার জীবন-অনাসক্তির পাশে মতিবিবির প্রবৃত্তিমুখীন জীবনাসক্তির চিত্র-দৃশ্য অপূর্ব বৈসাদৃশ্যে উপস্থাপিত হয়েছে। সুতরাং বর্ধমান

আগ্রা দৃশ্যের সংস্থাপনায় স্থান-ঐক্যের বিঘ্ন ঘটেনি—আখ্যায়িকার অনিবার্য প্রয়োজনে এই দৃশ্য-চিত্রের গুরুত্ব অনুভব করা যায়।

মোটকথা, 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের আখ্যায়িকা রচনায় বঙ্কিমের শিল্প-দক্ষতা নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কাহিনী বৃত্ত বা বিষয় ঐক্যের মধ্যে যেমন সঙ্গতি ও সমন্বয়ের ভাব পরিলক্ষিত হয়, তেমনই সময় এবং স্থান ঐক্যে উপন্যাসের আঙ্গিক বিন্যাসরীতি জমাট গ্রন্থনে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই দ্বিতীয় উপন্যাস সৃষ্টিতে (সময় কাল ১৮৬৬) বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক প্রতিভা যে পূর্ণতায় উপনীত হয়েছে, আলোচ্য ত্রি-ঐক্য সূত্রে তা প্রমাণিত হয়। ভাবগত-ঐক্য-প্রসঙ্গ কাহিনী ও চরিত্র নির্মাণে যে কাজ করেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। চরিত্রগুলি আপন-স্বভাবকে অক্ষুন্ন রেখে পরিণামমুখী হয়েছে। কপালকুণ্ডলা, কাপালিক, নবকুমার, অধিকারী, মতিবিবি, শ্যামাসুন্দরী এক একটি ভাবের ব্যঞ্জনা দিয়ে উপন্যাসের প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে। একদিকে ত্রি-ঐক্য অন্যদিকে এই ভাব-সংহতি 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের ঐশ্বর্য। আর এখানেই উপন্যাসের মৌলিক সাফল্য।

কপালকুণ্ডলা : ট্রাজেডি ভাবনা

উপন্যাসে নাটকের শিল্পরূপ কখনও কখনও প্রাধান্য পায়। সাহিত্যের এই দুই শাখা জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত বলে সাহিত্য-শিল্পে নাটকের সঙ্গে উপন্যাসের শিল্প-প্রকরণে সাধর্ম্য দেখা যায়। নাটক ও উপন্যাসের শ্রেণী-বিন্যাস কেবল এক নয়, ভাব-ভাবনা ও পরিণতিও একই সূত্রে অনেক সময় বিধৃত। ট্রাজেডি-ভাবনা এ ধরনেরই একটি বিষয়। চরিত্রের কোন একমুখীন প্রবণতায়, দৈব-বিরূপতায় অথবা অন্তর্মুখীন প্রবৃত্তির টানাপোড়েনে মানুষের জীবনে যে নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসে, তাকেই আমরা এক কথায় ট্রাজেডি বলতে পারি। মনীষী অ্যারিস্টটলের ট্রাজেডির সংজ্ঞাকে (Tragedy then is an imitation of an action that is serious, complete and of certain magnitude, in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play; in the form of action not of narrative, through pity and fear effecting proper purgation of these emotions) এইভাবে বিশ্লেষণ করা যায়— (১) বাস্তব-জীবনের অনুকরণসমৃদ্ধ এক গুরুতর ঘটনা (২) ভাষাগত ছন্দ-সুষমায় বিন্যস্ত (৩) বর্ণনাত্মক নয়, এমন ঘটনাবৃত্ত (৪) করুণা ও ভয় সঞ্চারকারী ভাব-বিমোক্ষণ। দার্শনিক হেগেল ট্রাজেডির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও দুঃখের অস্তিত্ব খুঁজে পেলেও সমাধানের মধ্যে আনন্দকে প্রত্যক্ষ করেছেন। দার্শনিক শোপেনহাওয়ার ট্রাজেডির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন আত্মসমর্পণ প্রবৃত্তিকে এবং রস-পরিণামের ক্ষেত্রে, মানবিক প্রয়াসকে অর্থহীন বলে প্রতীতি হবার কথা বলেছেন (The outcome of it is to show the vanity of all human effort)। আধুনিক কালের সমালোচক নিকল ট্রাজেডি সম্পর্কে তাঁর সুনির্দিষ্ট মতামত দিয়েছেন এইভাবে—The very vastness of the theme, as in all true tragedy, presupposes an emotion richer, profounder, stronger than is provided in the sentimental play of tears. Tragedy, then, we may say, has for its aim not the arousing of pity, but the conjuring up of a feeling of awe allied to lofty grandeur. ট্রাজেডির বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য, প্রেরণাগত দিক থেকে গভীরতর ও শক্তিশালী ভাব শেষ পর্যন্ত করুণায় অবসিত হয় না—বিস্ময়ভাব উন্নত মহত্ত্বে প্রকাশ পায়। এখানেই বিয়োগান্তক নাটক / উপন্যাসের বিশেষত্ব।

বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ট্রাজেডি-তত্ত্বের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন। এমন-কি এর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিতও হয়েছিলেন। শেক্সপীয়ারের শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডিগুলো তাঁর কল্পনাকে উজ্জীবিত করে থাকবে। শেক্সপীয়ারের জীবন-দর্শনের অঙ্গীভূত ট্রাজেডি-ভাবনাকে জীবনের অপরিহার্য পরিণামের ইঙ্গিত বলে তাঁর মনে হয়েছিল। জীবন-জিজ্ঞাসার যে প্রবল আকূতি তাঁর শিল্প-মানসে প্রথমাবধি ঔৎসুক্য নিবিড় অনুধ্যানে সর্বদা অন্বিষ্ট ছিল, তারই প্রভাবে মানব-জীবনের সীমাহীন অসহায়তাকে দুর্জ্ঞেয় রহস্যে তিনি আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন এবং একটা সিদ্ধান্তেও উপনীত হয়েছিলেন— "জ্ঞান-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নি, রূপ-বহ্নি, ধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়-বহ্নি—সংসার বহ্নিময়। রূপবহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে—আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি।" (কমলাকান্ত) এদিক

থেকে 'কপালকুণ্ডলা' এক অভিনব সৃষ্টি। নিয়তির অমোঘ বিধানে কপালকুণ্ডলার পরিণতি যেমন ট্রাজেডির অন্তর্নিহিত অসহায় ভাবকে শিল্পসম্মতরূপে বিন্যস্ত করেছে, তেমনি অন্যান্য দিক থেকেও এ উপন্যাসের তুলনা প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে মিলবে না। সুবোধ সেনগুপ্ত একারণে বলেছেন— "কপালকুণ্ডলা' অপূর্ব্ব সৃষ্টি। চরিত্রসৃষ্টি, গঠনকৌশল, ভাষার ওজস্বিতা ও সাবলীলতা— যে দিক্ দিয়াই বিচার করা যাক, ইহার গুণের অবধি নাই। শেক্সপীয়রের কোন নাটকও এত নিখুঁত নহে।" (বঙ্কিমচন্দ্র)

বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প-সৃষ্টির প্রেরণার নেপথ্যে শেক্সপীয়ারের যে অসামান্য প্রভাব ছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। পুরুষ ও নারীর প্রেমের "দুরূহ তপস্যাকে", তার "প্রেমবোধের বিকার ও বিমূঢ়তাকে" তিনি ব্যর্থতার কারণ বলে দেখেছিলেন। "এইজন্যই তাঁহার উপন্যাস রোমান্সও নয়, নভেলও নয়; তাহা উপন্যাসের আকারে শেক্সপীরীয় আদর্শের নাটক।" ("বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস"— মোহিতলাল মজুমদার)। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে ট্রাজেডির কার্য-কারণ সূত্র শেক্সপীরীয় নাটকের অনুরূপ নয়। ম্যাক্‌বেথ, কিং লিয়ার বা হ্যামলেটের অন্তর্দ্বন্দ্ব 'কপালকুণ্ডলায় পাওয়া যাবে না— রহস্যময় নিয়তি লীলায় কাহিনীবৃত্ত ও চরিত্র বাহ্য প্রভাবে পরিণামমুখী। এখানে অদৃষ্টবাদের প্রাধান্য। তবে বিয়োগান্ত পরিণতির নেপথ্যে ঔপন্যাসিকের জীবন-জিজ্ঞাসা ও জীবন সম্পর্কে একটা প্রত্যয় যে জন্ম নিয়েছিল, তার প্রমাণ আছে। নবকুমারের পুরুষচরিত্রের রূপমুগ্ধতা, কপালকুণ্ডলার জন্য তীব্র প্রেমবোধ,—ও অনিবার্য মৃত্যু-পরিণাম বঙ্কিমের জীবন সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তের এক দিক। আবার কপালকুণ্ডলার প্রকৃতিময়তা, ঔদাসীন্য, নির্মমতা ও কারুণ্য, ভবানী-ভক্তি ও কাপালিক প্রভাব শেষ পর্যন্ত অদৃষ্টের নিয়তি-শাসিত ট্রাজিক পরিণতিতে রূপান্তরিত। কাহিনী ও চরিত্রের রূপ-নির্মিতিতে বঙ্কিমের বিশেষ ধারণাবই প্রাধান্য। শেক্সপীয়ারের ট্রাজেডি-লক্ষণাক্রান্ত নাটকের নব-মূল্যায়নে বিখ্যাত সমালোচক Wilson Knight কবি-কল্পনার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন— "If we are to attain a true interpretation of Shakespeare, we must work from a centre of consciousness near that of the creative instinct of the poet. We must think less in terms of causality and more in terms of imaginative impact. (The Wheel of Fire). কপালকুণ্ডলা চরিত্র তো বটেই, নবকুমার চরিত্রে বঙ্কিমের জীবন-জিজ্ঞাসার কবিত্বময় প্রভাব এক অপূর্ব শিল্প-সৌন্দর্যের অভিমুখী হয়ে ট্রাজেডির অনুবর্তী হয়েছে। এখানেই এ উপন্যাসের বিশিষ্টতা।

অদৃশ্য-শক্তির একচ্ছত্র আধিপত্য উপন্যাসের সর্বাঙ্গে। কপালকুণ্ডলা চরিত্রে কেবল নয়— অন্যান্য চরিত্রেও সেই একই ব্যঞ্জনার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যাবে। সাগরসঙ্গম থেকে প্রত্যাবর্তনকালে সৈকতভূমিতে, নিবিড় অরণ্যে বিসর্জিত নবকুমার ভাগ্য-তাড়িত সন্দেহ নেই। ভাগ্য তার জীবনপথকে নিয়ন্ত্রিত করেছে—কাপালিক দর্শন, বধ্যভূমিতে গমন ও কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ ও উদ্ধার সেই ভাবেরই অনুষঙ্গ। অধিকারীর দ্বারা কপাল নবকুমারের বিবাহ ভাগ্যান্বেষণের পরিণাম। মেদিনীপুর বা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে মতিবিবির সাক্ষাৎ-লাভ দৈব-চক্রের অনিবার্য প্রভাবজাত ঘটনা। সংসার জীবনে কপালকুণ্ডলার 'কবরী-চ্যুত ব্রাহ্মণবেশী পুরুষের পত্র ও নৈশ-ভ্রমণে হঠ তার চিত্তে সন্দেহের বীজ রোপিত হওয়ার ঘটনাটিও জীবন-রহস্যেরই এক দিক। কপালের সাথে নবকুমারের গঙ্গাবক্ষে আত্মবিসর্জন দেওয়া অদৃশ্য-শক্তির অনিবার্য প্রভাবপ্রসূত পরিণাম। প্রকৃতপক্ষে, নবকুমার চরিত্রে যে বৃত্তটি বঙ্কিম রচনা করেছিলেন, তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তিই হ'ল

এই অদৃশ্য অদৃষ্টবাদ। এরই আকর্ষণ-বিকর্ষণ লীলায় তার জীবন-ট্রাজেডি নিয়ন্ত্রিত! অবশ্য এর সাথে যুক্ত হয়েছে পুরুষের রূপমুগ্ধতার অপ্রতিরোধ্য পরিণাম—যে তত্ত্ব ভাবনার সাথে বঙ্কিমের জীবন-দর্শনের যোগসূত্র অত্যন্ত প্রবল সুতরাং নায়ক-চরিত্র নবকুমার নিয়তি-শাসিত জীবনেরই এক দিক।

মতিবিবি চরিত্রে অদৃষ্টবাদের প্রভাবও সুদূরপ্রসারী বলে মনে হয়। নবকুমারের সঙ্গে বিবাহ ও পরিত্যক্ত হওয়া, তার পিতার মুসলমান ধর্মগ্রহণ ও কর্মোপলক্ষ্যে আগ্রা-দিল্লী গমন, মতিবিবির ভোগৈশ্বর্যময় জীবন—দুর্দমনীয় প্রবৃত্তির প্রশ্রয় ইত্যাদি জীবন চক্রের নেপথ্যে অদৃশ্য শক্তির লীলা। তারপর ওড়িষ্যা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে নবকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং 'নবকুমার শর্ম্মা' পরিচয় জ্ঞাপনের পর পূর্ব-স্বামীর প্রতি অনুরক্ত হওয়া— অতুল রাজৈশ্বর্যের ভোগবিলাসের স্বর্গভূমি ত্যাগ করে কেবল প্রেমবোধের একনিষ্ঠ তপস্যায় সপ্তগ্রামের ঔপনগরিক অংশে আশ্রয়-গ্রহণের মধ্যে দৈবের অনুশাসনকে ক্রিয়াশীল দেখি। তারপর দৈব-চক্রের পূর্ণতায় তার জীবনকথার শেষাংশ যেন চিত্রিত হয়েছে। নবকুমারের প্রত্যাখ্যান— "তুমি, আবার আগ্রাতে ফিরিয়া যাও, আমার আশা ত্যাগ কর" (৩য় / ৬ষ্ঠ)—নবকুমারলাভে কৃতসঙ্কল্পতা—ব্রাহ্মণবেশী ছদ্মবেশে কাপালিক ও মৃন্ময়ীর সাক্ষাৎ এবং পরিণামে নিষ্ফল শূন্যতায় মতিবিবির চিত্ত বিদীর্ণ ব্যর্থতার হাহাকার উপন্যাসে ধ্বনিত। মতিবিবির কামনা-বাসনার বিকৃতি, প্রেমবোধের জাগরণ, প্রত্যাখ্যান ও ষড়যন্ত্রের সাহায্যে ফললাভের আশা কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির অঙ্গুলি-হেলনে যেন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হোল। অদৃষ্টবাদের এমনই শক্তিশালী প্রভাব বঙ্কিম মানব-জীবনের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। প্রতিনায়িকা মতিবিবির মধ্যে সেই অদৃশ্যশক্তির প্রভাবজাত জীবন-ট্রাজেডির শিল্পসম্মত রূপায়ণই দেখা যাবে।

কাপালিকের চরিত্র-চিত্রণেও সেই অদৃশ্য-শক্তির লীলা। তন্ত্র-মন্ত্রের বাহ্যিক আরাধনায় রত কাপালিক দৈব অনুগ্রহে নবকুমারের সাক্ষাৎ লাভ করেছিল। বধের আয়োজন ও ব্যর্থতা, কপাল-নবকুমারের অনুসরণকালে গভীর অন্ধকারে "বালিয়াড়ির শিখর" থেকে পড়ে গিয়ে হাত-ভাঙ্গা, তার জীবনবৃত্তের প্রথমার্ধের ঘটনা। জীবন-কাহিনীর দ্বিতীয় অংশে ভবানীর নির্দেশ—কপালকুণ্ডলার বধের আয়োজন, নবকুমার ও মতিবিবির সাহায্যলাভ এবং শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতা—এই চরিত্রের ট্রাজিক-সৃষ্টির পূর্ণতা দিয়েছে অনির্দেশ্য অলৌকিক শক্তি। আসলে, এই চরিত্রও বঙ্কিমের নিয়তিবাদ-সূত্রের অনুবর্তী এক বিশিষ্ট চরিত্র। ভয়ঙ্কর, রুদ্র রূপের প্রতীক চরিত্র কাপালিক অদৃষ্টের পীড়নে শক্তিহীন ও নিরুপায় অবস্থায় ট্রাজিক সংবিদকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সুতরাং কাপালিকও অদৃশ্য-শক্তির দুর্বোধ্য লীলার অধীন এক অপূর্ব চরিত্র।

উপন্যাসের আরও দু'একটি অপ্রধান চরিত্রে মানব-ভাগ্যের দৃশ্য-চিত্র আছে। শ্যামাসুন্দরী ও মেহের-উন্নিসার মধ্যে ভাগ্যহত জীবনের রূপচিত্রণ পাই। শ্যামা সুন্দরী কুলীনপত্নী সামাজিক কুপ্রথার পরিণতিতে সে নিঃসঙ্গ, একাকী—স্বামীকে 'বশ' করার জন্য তার 'ঔষধি' সংগ্রহের চেষ্টা কোন ফলপ্রসূ পরিণামকে ডেকে আনেনি। শ্যামার অপূর্ণ জীবনের বিবহবেদনা সহজ-হাস্য পরিহাসেও যেন উঁকি দিয়েছে। সামান্য দু'-একটি চিত্রে বঙ্কিম এই রমণীর ব্যর্থতাময় জীবন-কাহিনীর ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং সেই জীবন-বৃত্তের নেপথ্যে প্রবল ভাবে কাজ করেছে সামাজিক কৌলীন্য প্রথা ও দৈব-নির্দেশ। মেহের-উন্নিসার জাহাঙ্গীর অনুরাগ তীব্র হওয়া সত্ত্বেও সে আফগান-স্ত্রী এবং সেজন্য গর্বিত। সহধর্মিণী হওয়ার অহঙ্কার ও জাহাঙ্গীরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ দুই বিপরীত প্রবৃত্তির টানাপোড়েনে মেহেরুন্নিসা ক্ষত-বিক্ষত হ'লেও তার পরিণাম উপন্যাসে চিত্রিত নয়—বঙ্কিমের

লক্ষ্যও তা ছিল না। কিন্তু একটি পরিচ্ছেদে সীমাবদ্ধ এই চরিত্রে দ্বন্দ্বের অন্তরালে আশাহত মানবীর দীর্ঘনিঃশ্বাস যেন অনুভূত হয়। জাহাঙ্গীরের প্রতি অনুরক্ত হয়েও শের আফগানকে তার বিবাহ করতে হয় এবং এই বেদনা বুকে নিয়েই তার উপন্যাসে উপস্থিতি।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কপাল তো আগাগোড়াই অদৃষ্ট-শক্তি প্রভাবে পরিচালিত হয়েছে। "এই কাব্যে এক প্রকার অদৃষ্ট বা অখণ্ডনীয় নিয়তির ক্রিয়া যেন অতিশয় প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ঐ কাহিনীর মূলে যে মহাশক্তির লীলা আছে বলিয়াছি অথবা যে শক্তির মহিমাই এ কাব্যের কল্পনাবস্তু হইয়াছে, তাহাকেই যদি অদৃষ্ট বা সর্ব্বজয়ী নিয়তি বলা হয়, তবে কপালকুণ্ডলা'র অদৃষ্টবাদকে একটু ভিন্ন বা বিশেষ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে।" (বঙ্কিম-বরণ—মোহিতলাল মজুমদার)। সমালোচক মোহিতলাল কপালকুণ্ডলা চরিত্রে অদৃষ্টবাদের সুদূর প্রসারী প্রভাব দেখলেও উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে মানব-প্রকৃতি বা বহিঃপ্রকৃতিকে নৈসর্গিক নিয়মের অন্তর্গত দৈব-লীলা বলেই তাদের জীবন-পরিণামকে গ্রহণ করেছেন। নিয়তি বা অদৃষ্টবাদের ভাবনায় কপালকুণ্ডলার জীবন-স্বভাবের পরিচয় উপন্যাসের কেন্দ্রীয় আকর্ষণ। বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীস্টান কর্তৃক অপহৃত হবার সময় যানভঙ্গের কারণে সমুদ্রতীরে পরিত্যক্তা কপালকুণ্ডলা প্রকৃতির কোলে ও কাপালিকের দ্বারা প্রতিপালিত হয়েছিল। প্রকৃতি-শক্তির অসীম প্রভাবে কপালচরিত্র দীক্ষিত হলেও এই শক্তির সঙ্গে অদৃষ্টবাদের নিগূঢ় যোগসূত্র দেখা যায় মৃন্ময়ীর জীবনের প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ে। ভবানীর সে অনুরক্তাই কেবল নয়, ভবানীর ইচ্ছাধীনে তার জীবনের পথ চলা। ভবানীর পাদ-পদ্মে বিল্বপত্র দান ও নবকুমারের সঙ্গে বিবাহ; নবকুমারের সঙ্গে শ্বশুরালয় গমনের প্রাক্‌কালে বিল্বপত্রের পড়ে যাওয়ার ঘটনা অশুভ-সংকেত সূচক। এই ঘটনা কপালজীবনের সঠিক পূর্বাভাস। কপাল নিজেও ভবানীর অনুরক্ত—সুতরাং ভবানীর নির্দেশ তার মানসিক চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে গভীর বিশ্বাসে। আর উপন্যাসের কাহিনীবৃত্তে কপালকুণ্ডলার অদৃষ্ট-নির্ভর জীবনকাহিনীই আমাদের আকর্ষণের কেন্দ্রীয় চরিত্র।

সংসার জীবনে মৃন্ময়ীর নিরাসক্ত ভাব, সীমাহীন ঔদাসীন্য তার জীবনে প্রকৃতি-শক্তির প্রভাব-প্রসূত হলেও, সেই শক্তি অদৃষ্টবাদেরই দুর্নিবার লীলা। শ্যামার জন্য ঔষধ সংগ্রহের লক্ষ্যে রাত্রিকালীন অরণ্য-বিহার, ব্রাহ্মণবেশীর সাক্ষাৎ, নবকুমারের সংশয় সন্দেহ এবং ভবানীর নির্দেশ তার জীবনকে দ্রুত পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়েছে। ভবিতব্যের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে মৃন্ময়ীর জীবন পরিণামমুখী হয়েছে—তার স্বপ্নদর্শন অথবা অরণ্যপথে ভৈরবী-মূর্ত্তি-দর্শন ও ভৈরবীর দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করে কপালকে আহ্বান নিয়তি-নির্দিষ্ট পথ পরিক্রমার অন্তিম-দৃশ্য। নবকুমারের কাতর ক্রন্দন তার গতিপথকে রুদ্ধ করে না, বনচারী হবার বাসনায় সে যেমন সংসার ত্যাগে আগ্রহী হয়েছিল, তেমনই ভৈরবীর ইচ্ছাশক্তির কাছে আত্মসমর্পণে সে দ্বিধাগ্রস্ত নয়—বরং কৃতসকল্প। তাই পরম নির্ভরতায়, অকম্পিতচিত্তে ও আনন্দের সঙ্গে সে ভবানীর নির্দেশ পালন করবার জন্য প্রস্তুত হয়—"ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব।" সংসার জীবনে যার আসক্তিহীনতা সীমাহীন, প্রকৃতিরকোলে যে স্বচ্ছন্দ, প্রকৃতিশক্তির প্রভাবে যার জীবন গঠিত,—সেই মৃন্ময়ীর নবকুমারের কাতর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান ও ভবানী-নির্ভরশীলতা চূড়ান্তভাবে দেখা গেল শেষদৃশ্যে। "তাহার নিকটে সেই অদৃষ্ট বা ভবিতব্য আর কিছু নয়—সেও যেন এক মহাশক্তির মঙ্গলময় বিধান, তাহাতে সৃষ্টির সত্য আছে; ঐ ভবিতব্যের অবার্থতা একটা অন্ধ নিষ্ঠুর কিছু নয়, উহাতেই গূঢ়তর ও মহত্তর কল্যাণ নিহিত আছে। অতএব, কপালকুণ্ডলার

ঐ অদৃষ্ট সাধারণ মানবীয় সংস্কারের 'অদৃষ্ট' নয়—উহা সেই দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় শক্তিরই লীলা।" (বঙ্কিম-বরণ)।

কপালকুণ্ডলার ট্রাজেডির মধ্যে গভীর বেদনার ভাব তেমন লক্ষ্য করা যায় না অনুভব করে সমালোচক মোহিতলাল উপন্যাসের মধ্যে নতুন ট্রাজেডি-রসের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর বিচারে, ওথেলো ম্যাকবেথের ট্রাজেডি নয়—বরং হ্যামলেট লীয়রের ট্রাজেডির রস-পরিণামের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার মিল আছে। মানবজীবনে নির্মম বা অন্ধশক্তির লীলা নিষ্ফল সংগ্রামে দীর্ঘশ্বাস ফেলে—ট্রাজেডির এই বিশেষ দিকের সঙ্গে আলোচ্য উপন্যাসের মিল থাকলেও কপাল-নবকুমারের আত্মবিসর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে মোহিতলাল যথার্থভাবে বলেছেন "সেই ভাবাকুলতার মধ্যেও একটি অনির্ব্বচনীয় বৈরাগ্য বা শান্ত রসের উদ্রেক হয়—ঠিক এই রস য়ুরোপীয় ট্রাজেডির রস নয়।" (বঙ্কিম-বরণ)। শেক্সপীয়ারের বিয়োগান্ত নাটকের পরিণামের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার যথেষ্ট মিল আছে সত্য—ম্যাক্‌বেথ ও লেভি ম্যাক্‌বেথ, হ্যামলেট ও ওফেলিয়া, ওথেলো ও দেসদিমোনা, ব্রুটাস ও পোর্সিয়া, কিং লিয়ার ও কর্ডেলিয়ার মৃত্যুর সঙ্গে কপাল-নবকুমারের মৃত্যু-দৃশ্যের তুলনা হলেও শেক্সপীয়ারেব ট্রাজেডি বাহ্য-সংঘাত ও অন্তর-সংঘাতের দ্বাবা প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রিত। কপালকুণ্ডলার অন্তর্দ্বন্দ্ব অনুপস্থিত—বাহ্য-সংঘাত অথবা নির্দেশেই যেন ট্রাজেডির রস-পরিণাম সংঘটিত হয়েছে। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ত এজন্য উপন্যাসে গ্রীক ট্রাজেডির সরলরেখার সাথে বিষাদময় পরিণতিকে লক্ষ্য করেছিলেন। আবার গ্রীক ট্রাজেডির মত ভীতিকর সহানুভূতি উপন্যাসের পরিণামে জেগে ওঠে না। মোহিতলাল যথার্থই বলেছেন যে, উপন্যাসের মৃত্যু-সমাধানসূত্রে "অনৈর্বচনীয় বৈরাগ্য বা শান্ত রসের" উদ্রেক হয়। অদৃষ্টবাদের আকর্ষণে কপালকুণ্ডলার জীবন-বিসর্জন তার প্রবল সংসার অনাসক্তির অনিবার্য পরিণাম এবং রূপমুগ্ধ নবকুমার কামনা-বহ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েছে,—কপালের অনুসরণ করে, এই মাত্র রস-ব্যঞ্জনা। সুতরাং কপালকুণ্ডলার আত্মবিসর্জন, চরিত্রের মৌল প্রেরণার দিক থেকে "একটা পরম সিদ্ধিলাভ" সন্দেহ নেই। ভবানী অনুরক্তা নারীর এই আত্মত্যাগে গভীর হতাশার পরিবর্তে দুঃখহীন এক অনির্বচনীয় অভিব্যক্তিতে আমাদের অন্তর পূর্ণ হয়ে ওঠে। আমরা বিস্ময়ে কপালচরিত্রে অদৃষ্টবাদের প্রভাব দেখি।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের ট্রাজেডি মূলতঃ নায়িকা চরিত্র কপাল-আশ্রিত হলেও সামগ্রিকভাবে বিয়োগান্ত ভাব-ব্যঞ্জনায় অন্যান্য চরিত্রগুলিও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। নবকুমার, মতিবিবি, কাপালিক, মেহের-উন্নিসা ও শ্যামাসুন্দরীর জীবনে ব্যর্থতা, দুঃখ-বেদনা উপন্যাসের সামগ্রিক ভাবস্তর পূর্ণতা এনেছে। উপন্যাসের কথাবস্তুতে ট্রাজেডির উপাদান চরিত্র-কেন্দ্রিক ও ভাব-ভিত্তিক। তাই, প্রধান হলেও, কপালকুণ্ডলার জীবন-বিসর্জনের ঘটনা উপন্যাসের একমাত্র ট্রাজিক বিষয় নয়। "অদৃষ্টই কপালকুণ্ডলার অস্থি-মজ্জায় ও দেহে-প্রাণে সর্বত্র জড়িত"—তাই তা গ্রীক নিয়তিবাদের লক্ষণযুক্ত। আবার, শেক্সপীয়ারের চরিত্র-নির্ভর নিয়তির ভাব কপালের জীবনে তেমন কার্যকরী নয়— তার জীবনে অদৃষ্টপ্রভাব যেন পূর্ব নির্দিষ্ট বলে মনে হয়। শেক্সপীরীয় ট্রাজেডি লক্ষণ নির্ভর নাট্যরীতি এবং গ্রীক নিয়তিবাদ—এই দুইয়ের প্রভাবে বঙ্কিম প্রতিভা এক স্বতন্ত্র পথ-অন্বেষণে নিযুক্ত ছিল—'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস তারই ফলশ্রুতি।

পাশ্চাত্ত্য নয়—ভারতীয় ভাবদৃষ্টির প্রেরণায় বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস রচনা করেছিলেন। আর এখানেই তাঁর প্রতিভার মৌলিকত্ব প্রকাশ পেয়েছে বলে সঙ্গত অভিমত দিয়েচেন সমালোচক

মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'বঙ্কিম বরণ' গ্রন্থে—"কপালকুণ্ডলা ট্রাজেডি হইলেও একটা নূতন রসের ট্রাজেডি—ইহার প্রেরণাই স্বতন্ত্র। ..... খাঁটি য়ুরোপীয় ট্রাজেডির উপযুক্ত নায়ক-নায়িকা ইহাতে নাই; একমাত্র কপালকুণ্ডলার চরিত্রই ট্রাজেডির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবার উপযুক্ত বটে; কিন্তু সে চরিত্র সাধারণ মানব-চরিত্র নয়, তাই সে তাহার নিয়তিকে অনায়াসে, বিনা সংগ্রামে পরাস্ত করিয়াছে—তাহার পক্ষে কোন ট্রাজেডিই সম্ভব নয়। অপরগুলির মধ্যে কোনও কঠিন প্রবৃত্তি-বিরোধ বা দুর্জ্জয় প্রবৃত্তি-বেগ নাই, মতিবিবির মধ্যে যাহা ছিল, তাহা অর্দ্ধপথেই প্রায় নিরস্ত হইয়াছে, কপালকুণ্ডলার সহিত পুনরায় সাক্ষাতের পরে সে দ্বিধাগ্রস্ত ও নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছে। যেন সেই এক শক্তিই আর সকলকে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিয়া ফেলে। ..... শেষে ভাঙন-ধরা নদীর কূলে, অপর এক শ্মশানে সে তাহার প্রাপ্য বলি আদায় করিয়া লইয়াছে। সেই বলিও নবকুমার নয়—কপালকুণ্ডলা, অর্থাৎ তাহার বলি সে নিজেই। নবকুমার সামান্য মানুষ মাত্র— বড় ক্ষুদ্র; তাই অন্তিমকালে সে সেই মহাশক্তিরূপিনীর নিকটে উন্মাদের মত প্রেম ভিক্ষা করিল, পাইল কেবল করুণা—সুমহতী ক্ষমা। অতএব, এই ট্রাজেডিতে মানুষের প্রতি কৃপা আছে, সেই কৃপার মধ্যেই করুণ রস আছে। কিন্তু মানুষ যে কত ক্ষুদ্র—তাহার সমাজ, তাহার সংসার, তাহার সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ, তাহার ন্যায়-অন্যায়, তাহার সদসৎ, তাহার চরিত্র নীতির অভিমান এবং প্রেমনামক তাহার সেই পিপাসার যতকিছু বিকার—সকলই যে কিরূপ মূঢ়তা, দুর্ব্বলতা ও স্বার্থপরতার নিদর্শন, এই কাব্যে তাহাই নির্মমভাবে প্রকটিত হইয়াছে। সেই ঝড়ের ঝাপটে যে নীড় ধ্বংস হইয়া গেল, তাহাও আকারে বা আয়তনে বড় নয়। কবির দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ। ইংরেজীতে যাহাকে Sublime বলে তাহারই রুদ্রকান্ত রূপের ধ্যানে কবি তন্ময়—সেই Epic Sublimity-ই এ কাব্যের প্রধান রস। তাই, ইহাতে মানুষের বিদ্রোহী আত্মার মহিমা ঘোষণা নাই; তাহাকেও অতিক্রম করিয়া একটা বিরাট—বিশালের স্তুতি এ কাব্যের মূল প্রেরণা হইয়াছে।"

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য প্রভাব : মৌলিকত্ব

বঙ্কিম-প্রতিভায় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্য-দর্শনের অনুশীলন ও পর্যালোচনা। জীবন-জিজ্ঞাসার আন্তরিক তাগিদে তিনি লেখনী ধরেছিলেন। প্রকৃতি ও জীবনের রূপ-বীক্ষণে তাঁর নিরন্তর অনুসন্ধিৎসা একটা সুস্থিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল সন্দেহ নেই। সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক বঙ্কিম দর্শন রাজ্যের অন্তঃপুরেও পদচারণা করেছিলেন— তার প্রমাণ আছে প্রবন্ধগুলিতে, অভিনিবেশ সহকারে পর্যালোচনার রীতি-বৈচিত্র্যে। উপন্যাসের মৌলিক গঠন-বিন্যাসে, ভাব-কল্পনায় আপাত সাদৃশ্যমূলক কিছু ঘটনার মিল থাকায়, বঙ্কিম-সাহিত্যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের কথা উঠেছে। সেই সূত্রে, বিভিন্ন সাহিত্যদর্শন পাঠের ফলাফলে তাঁর জীবনদর্শনের প্রকৃত রূপটি অন্বেষণ করাই আলোচ্য নিবন্ধের লক্ষ্য এবং বিচার করে দেখা প্রয়োজন, মৌলিক প্রতিভার কতটা পরিচয় তিনি দিতে পেরেছেন। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসকে ঘিরে এই অন্বেষণের ফলাফল দেখা যাক্।

সংস্কৃতে প্রথাসিদ্ধ পাঠ না নিলেও বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট পণ্ডিত ছিলেন—সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য ছাড়াও ধর্ম-দর্শনের মর্ম-ব্যাখ্যায় তিনি সেই জ্ঞানের পরিচয় রেখেছেন। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস রচনার (১৮৬৬) পূর্ববর্তী সময়ে ভারতীয় কাব্য-দর্শনের জগৎ পরিক্রমার সুযোগ ঘটেছিল। অনিবার্যভাবে, 'কপালকুণ্ডলায়' তার কিছু প্রভাব পড়ে থাকবে। ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটকের কপালকুণ্ডলা নামটি তিনি গ্রহণ করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু ভবভূতির ঐ নাটকের সঙ্গে বঙ্কিমের রচনার অমিলই বেশী। সেখানে তান্ত্রিক সাধক কাপালিক অঘোরঘণ্টের উত্তরসাধিকা কপালকুণ্ডলা। বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলার সঙ্গে ভবভূতির কপালকুণ্ডলার প্রকৃতিগত ব্যবধান দুস্তর। স্বভাব-ধর্মে সে প্রতিহিংসাপরায়ণা, ক্রূর-আক্রোশে সে যে-কোন হীনকর্মেও দ্বিধাগ্রস্ত নয়। কিন্তু বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা স্নেহ-করুণার প্রতিমূর্তি—সীমাহীন জীবন-ঔদাসীন্য থাকলেও সে এই একটি ব্যাপারে স্নিগ্ধতার কোমল ছায়ায় আচ্ছাদিতা এক অপূর্ব রমণী চরিত্র। মতিবিবির ষড়যন্ত্র বা অনিষ্টকারী সিদ্ধান্ত জানা সত্ত্বেও সংযত ও আত্মনির্লিপ্ত— নবকুমারের প্রতি তার অনুকম্পা অন্তর থেকে স্বতোৎসারিত। সুতরাং বঙ্কিমের এই অসামান্যা নারীর সঙ্গে ভবভূতির সৃষ্টি উৎকট বেশধারিণী নারী চরিত্রের তুলনা চলে না। তবে, কাপালিক চরিত্র ও অরণ্য প্রকৃতির কিছু প্রভাব / সাদৃশ্য বঙ্কিমের উপন্যাসে দেখা যায়। কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্রের নেঁগুয়া বসবাসকালে কাপালিক দর্শন লাভ ঘটনার ব্যক্তি অভিজ্ঞতার ছাপও এই চরিত্র-সৃষ্টিতে কাজ করে থাকবে। সুতরাং ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটকের প্রভাব কপালকুণ্ডলায় অতি সামান্য, একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

এবার কালিদাসের অমর সাহিত্য-সৃষ্টি "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্"নাটকের শকুন্তলা চরিত্রের প্রভাব-প্রসঙ্গ। কণ্ব মুনির আশ্রম তপোবনে শকুন্তলার প্রকৃতি-প্রাণতায় মুগ্ধ হতে হয়। প্রকৃতির গাছ গাছালির পরে ভ্রাতৃস্নেহ, নবমল্লিকাকে বনজ্যোৎস্না বলে সম্ভাষনের আন্তরিকতা, গর্ভবতী মৃগবধূর নিশ্চিন্ত প্রসবের প্রসঙ্গে দুশ্চিন্তা এবং পতিগৃহ যাত্রার প্রাক্কালে বিচ্ছেদ-বেদনায় কাতরা শকুন্তলাকে তপোবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। তপোবনের প্রকৃতি যেন বলতে চেয়েছে— 'শকুন্তলা যে শরীরভূতা'। মোটকথা, শকুন্তলাকে তপোবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা না গেলেও

প্রকৃতি যে এক স্বতন্ত্র চরিত্ররূপে এ নাটকে উপস্থাপিত রবীন্দ্রনাথের কথাতেই তার প্রতিধ্বনি পাই— "অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্যন্ত যেমন, তপোবন প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। .....প্রকৃতিকে প্রকৃতি রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা পাঠকের এত কার্য সাধন করিয়া লওয়া, এতো অন্যত্র দেখি নাই।" শকুন্তলা চরিত্রে প্রকৃতির প্রতি নিবিড় প্রীতি-স্নেহ আছে, কিন্তু কপালকুণ্ডলার মতো প্রকৃতিময়তা নেই। শকুন্তলা প্রকৃতির সৃষ্টি নয়— প্রকৃতির মাঝে তাকে স্থাপন করা হয়েছে, প্রকৃতি তার প্রাণ। কিন্তু কপালচরিত্রে প্রকৃতি এমন বহিরঙ্গে সংস্থাপিত নয়—তার জন্ম, বিবর্ধন ও জীবন-চক্রের পরিণতি প্রকৃতির দ্বারাই নির্দিষ্ট। এখানে প্রকৃতি স্বতন্ত্র চরিত্র নয়—কপালকুণ্ডলা চরিত্র থেকে প্রকৃতিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। শকুন্তলার সাথে এখানেই তার মৌলিক পার্থক্য।

অন্যদিকে থেকেও বৈসাদৃশ্য আছে। তপোবনে শকুন্তলা পিতৃতুল্য মহার্ষি কণ্ব, গৌতমী, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা প্রভৃতির নিত্য সাহচর্যে ও সহযোগিতায় বড় হয়েছিল। সংসার সম্পর্কে তার শিক্ষা ছিল। কিন্তু, এ বিষয়ে কপালকুণ্ডলা একান্তই নিঃসঙ্গ, একমাত্র কাপালিক ছাড়া মানব-সম্পর্ক লাভ তার জীবনে ঘটেনি। তাও কাপালিকের সঙ্গলাভ মহর্ষি কণ্বের সমগোত্রীয় নয়। এছাড়া কপালের সংসার-অভিজ্ঞতা কিছুমাত্র ছিল না—সংসার সম্পর্কে তীব্র অনাসক্তি ও ঔদাসীন্য তার জীবন-ভাবনার সহচর হয়েছে। শকুন্তলা দুষ্মন্তের সংসার জীবনে প্রবেশের জন্য কৃতসঙ্কল্প— তার সাধনা ও তপস্যা দুষ্যন্ত লাভের সাধনা। কিন্তু কপালের অনুরাগ ছিল অরণ্যজীবনকে আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করা (আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব—সংলাপটি স্মরণযোগ্য), তাই সংসার জীবনে থেকেও এক নিঃসীম অন্তর্বেদনায় অরণ্য-জীবনের দিকে তাকিয়ে তাকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে হয়েছে। এমনকি তার জীবন-পরিণামও প্রকৃতি-শক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সুতরাং শকুন্তলার সঙ্গে কপালকুণ্ডলার তুলনা চলে না।

মহর্ষি কণ্বের সঙ্গে কাপালিক ও অধিকারীর তুলনা অর্থহীন। কণ্বমুনির আশ্রম পালিতা শকুন্তলা পিতৃস্নেহ লাভে বঞ্চিত নয় এবং শকুন্তলা কর্ণের সতর্ক দৃষ্টির অধীন ছিল। কাপালিক তান্ত্রিকসাধনার অঙ্গ হিসেবে এই নারীকে হয়ত লালন-পালন করেছিল কণ্বের স্নেহ-মমতার কোন পরিচয় কাপালিকের ছিল না। এক অর্থে, কাপালিক নির্মম, নিষ্ঠুর—ভবানীর নির্দেশে কপালকে বলি দেওয়ার জন্য তার প্রচেষ্টা হৃদয়হীনতারই পরিচয়ক। কণ্বের করুণার্দ্র চিত্তের অশ্রুসজল অভিব্যক্তি কাপালিকের কাছে প্রত্যাশা করাই অন্যায়। অধিকারীকেও কণ্বের সমগোত্রীয় বলে মনে হয় না। উপন্যাসে এই কালিকা সাধকের ভূমিকা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। শকুন্তলার পরে কণ্বের স্নেহচ্ছায়া পূর্বাপর বর্তমান ছিল। কিন্তু অধিকারী কপালকুণ্ডলার পরে কন্যাস্নেহ দেখালেও তাঁর মঙ্গলচিন্তা বিবাহদানেই সীমাবদ্ধ ছিল—কপালের সমগ্র জীবনের পরে তাঁর কোন সুদূরপ্রসারী প্রভাব দেখা যায় না।

সাংখ্য দর্শনের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বের প্রভাবে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার চরিত্র নির্মিত বলে মনে হলেও এই চরিত্রগুলিতে এবং কাহিনীর ভাববস্তুতে মৌলিকতাও আছে যথেষ্ট। "প্রকৃতির সহিত সংযোগই পুরুষের দুঃখের কারণ"—সাংখ্য দর্শনের এ ভাব নবকুমার চরিত্রে গ্রহণ করলেও বঙ্কিম পুরুষের রূপবহ্নিতে আত্মাহুতি দেবার দুঃখময় পরিণাম দেখেছেন, জীবন-জিজ্ঞাসার শৈল্পিক দৃষ্টিতে। প্রকৃতির প্রতি রূপমুগ্ধতার বা আসক্তির অবসান ঘটলে দুঃখনিবৃত্তি সম্ভব, সাংখ্য-দর্শনের এই মৌলভাবকে নিয়ে বঙ্কিমের চিন্তা পরিচালিত হয়নি। প্রকৃতির বুকে জীবনকে দেখেছেন—

তার স্বরূপের মধ্যে নিদারুণ দুঃখের অস্তিত্ব দেখেছেন, এই মাত্র। তাত্ত্বিক বা দার্শনিকের দৃষ্টিতে নয়, তাঁর জীবন দর্শন কবি-দৃষ্টি প্রসূত। সুখ-দুঃখের নিত্য বহমান গতি জীবনকে ঘিরে আবর্তিত হয় এ যেন তারই রূপ-দর্শন। অন্যদিকে প্রকৃতি শক্তির ভাবনা থেকে কপালকুণ্ডলা চরিত্রকে গড়ে নিয়েছেন নতুন ভাবে। তান্ত্রিক ভাবনার সঙ্গে পুরুষ প্রকৃতি তত্ত্বের মিল থাকলেও প্রকৃতির সৃষ্টিকারিণী ও সর্বসংহারকারিণী মূর্তিটির আশ্চর্য শিল্পরূপ আছে কপালকুণ্ডলা চরিত্রে। নবকুমারের রূপমুগ্ধতার কারণ সে, বন্ধন তারই রূপময়তার দুর্নিবার আকর্ষণে এবং পরিণাম ঔদাসীন্যের সর্বসংহারকারিণী রূপে। কেবল সাংখ্য-দর্শনের প্রভাব নয়— বঙ্কিমচন্দ্রের মানবজীবনের রূপদর্শনের নেপথ্যে কাজ করেছে রোমান্স-রসসিক্ত কবিত্বের কল্পনা ও মানব-জীবনের ভাগ্য নিয়ন্তারূপে প্রকৃতিশক্তির অদৃশ্য প্রভাব। তাঁর দৃষ্টিতে, জীবনের উত্থান-পতনের নেপথ্যে এই অলৌকিক শক্তির প্রচ্ছন্ন প্রভাব বর্তমান। সুতরাং সাংখ্য দর্শন, তন্ত্র-মন্ত্র, বঙ্কিমের শিল্পী-মানসে পরোক্ষে কাজ করলেও তাঁর কবি-দৃষ্টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল, এই সিদ্ধান্তকেই মেনে নিতে হয়।

এবার, পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের প্রসঙ্গ। ইংরেজী সাহিত্য দর্শনের অনুরাগী পাঠক বঙ্কিম গভীরভাবে পাশ্চাত্ত্য জীবন-জিজ্ঞাসার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছিলেন একথা সত্য। "কপালকুণ্ডলা লেখার সময় শেক্সপীয়র বেশী পড়িতাম"— নিজের স্বীকারোক্তিতে অনুরাগের কথাটি স্পষ্ট হয়। তিনটি দিক থেকে শেক্সপীয়ারের প্রভাব পর্যালোচনা করা যায়। প্রথমতঃ দৈব প্রভাব বা বাহ্যিক প্রভাব। অদৃষ্টবাদের সূত্র সন্ধানে শেক্সপীয়রের কাছে তিনি ঋণী হলেও এবিষয়ে ভরতীয় সাংখ্য-দর্শন বা তন্ত্রমতের প্রভাবকেও অস্বীকার করা যায় না। অশান্ত, অস্থির চিত্ত হ্যামলেট পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প—তাঁর প্রিয়া ওফেলিয়ার অকালমৃত্যুর পর, রাজাকে হত্যা করে তিনি আত্মঘাতী হন। ওথেলোর মনে দুর্বৃত্ত ইয়াগোর সন্দেহের বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া শ্বেতাঙ্গিনী দেসদিমোনাকে অবিশ্বাসের চোখে দেখা তারপর স্ত্রীকে হত্যা করে নিজেও আত্মঘাতী হওয়া এই ট্রাজেডি নাটকের অন্যতম বিষয়বস্তু। অহংবোধ, সন্দেহ প্রবণতা, দ্বন্দ্ব ওথেলোর জীবন-পরিণামের কারণ। কিং লীয়ার নাটকে বৃদ্ধ লীয়ার কন্যাদের স্নেহে অন্ধ হয়ে রাজ্য ভাগ করে দিয়েছিলেন— কিন্তু পরিণামে তাদের দুর্ব্যবহার ও ছোটকন্যা কর্ডেলিয়ার মৃত্যু রাজা লীয়ারের অন্তিম মৃত্যু-পরিণামকে ত্বরান্বিত করল। ম্যাকবেথের ক্ষমতালিপ্সা ও উচ্চাভিলাষ, তার নিঃসঙ্গতা, নিষ্ঠুরতা প্রকৃতির প্রতিশোধে করুণ পরিণতিতে স্তব্ধ হয়। সাধারণ ভাবে এই চারটি বিয়োগান্ত নাটক চরিত্র-ভিত্তিক বা **Tragedy of Character** বলে চিহ্নিত হলেও, তাদের জীবন-ভাগ্যের নেপথ্যে অদৃশ্য দৈব প্রভাব দেখা যাবে। কিন্তু কেবল **Tragic irony** অথবা দৈব শক্তির লীলা নয়, শেক্সপীয়রের বিয়োগান্ত নাটকে চরিত্রকেন্দ্রিক অন্তর্দ্বন্দ্বেরই প্রাধান্য। কপালকুণ্ডলায় অদৃশ্য শক্তির প্রভাব থাকলেও চরিত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কোন পরিচয় নেই। প্রকৃতপক্ষে কপালকুণ্ডলা চরিত্রের পরিণাম গ্রীক ট্রাজেডির মত সরল গতিপ্রবাহে মৃত্যু অভিমুখী হয়েছে এবং সে মৃত্যু দৈবী শক্তিরই ইচ্ছার ফল। ওথেলো তার সতী সাধ্বী স্ত্রী দেসদিমোনাকে সন্দেহ করেছিল, নবকুমারও কপালকুণ্ডলার পরে সংশয়-সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান—এমন সাদৃশ্যের মানদণ্ড অযৌক্তিক ও অর্থহীন। চরিত্রদৃশ্যের সংগতি অনেক সময় থাকলেও বৃহৎ মানবজীবন দর্শনের মধ্যে বাহ্য-সাদৃশ্য দেখা যেতে পারে। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে শেক্সপীয়ারের সঙ্গে বঙ্কিমের পার্থক্য গভীর। নাট্যকার দৈব ও পুরুষকারের সংঘাতকে বড় করে দেখিয়েছেন—অন্তর্দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত বিয়োগান্ত পরিণতিতে অবসিত হয়েছে।

ঔপন্যাসিক দৈব-প্রভাব বা নিয়তিবাদকে অদৃশ্য-শক্তির প্রধানরূপে জীবনের সুখ-দুঃখের লীলা দেখেছেন।

দ্বিতীয়তঃ কপালকুণ্ডলা চরিত্রের প্রকৃতিময়তা শেক্সপীয়ারের শেষ নাটক 'দি টেম্পেষ্ট' এর মিরান্দার প্রভাবজাত কিনা বিচারের প্রসঙ্গ। মিরান্দা চরিত্রে বঙ্কিম নবীনত্ব ও মাধুর্যের সঙ্গে পরদুঃখকাতরা, স্নেহশালিনী, পবিত্র রমণী মূর্তির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। নির্জন দ্বীপে নির্বাসিতা মিরান্দা, পিতা প্রস্পেরো ও তার যাদুমন্ত্র, ফার্দিনান্দের আগমন ও শুভদৃষ্টির সঙ্গে এই উপন্যাসের কাহিনীগত কিছু মিল আছে। কাপালিকের মত প্রস্পেরো তন্ত্র-মন্ত্রের সাধক— উভয়ের সাহচর্যে কপাল ও মিরান্দা বড় হয়েছে। তবে কাপালিকের নির্মমতা, নিষ্ঠুরতার সঙ্গে প্রস্পেরোর স্নেহশীল পিতৃহৃদয়ের তুলনা চলে না। কপালচরিত্রের সঙ্গে মিরান্দার প্রকৃতিগত পার্থক্যও আছে। কপালকুণ্ডলা সামাজিক নিয়ম সম্পর্কে অনভিজ্ঞা, ভবানীর পরে তার সীমাহীন ভক্তি এবং সে পরদুঃখে কাতরা। কিন্তু মিরান্দার মধ্যে প্রথম দু'টি গুণ অনুপস্থিত তবে সে-ও অপরের দুঃখে উদ্বিগ্না। মিরান্দার ফার্দিনান্দের জন্য প্রেমাসক্তি প্রণয়-নিবেদনে ও মিলনে পূর্ণতা পেয়েছে। কপাল প্রেম সম্পর্কে উদাসীন—বিবাহ সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই। অধিকারীর নির্দেশে সে নবকুমারকে গ্রহণ করে। প্রকৃতিময়তায় এতটাই সে দীক্ষিত যে অনাসক্তি ও ঔদাসীন্যের এবং অদৃষ্টবাদকে মেনে নিয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে পরম শান্তিতে ও ঈশ্বর বিশ্বাসে আত্মোৎসর্গের ঐকান্তিক ত্যাগিদে। মিরান্দা চরিত্রের ভাবগত প্রভাব বঙ্কিমের কল্পনাকে উৎসারিত করে থাকবে কিন্তু কপালকুণ্ডলা চরিত্র-কাহিনী টেম্পেষ্ট নাটকের অনুরূপ নয়।

তৃতীয়তঃ রস-নিষ্পত্তিতে ট্রাজেডি প্রসঙ্গ। শেক্সপীয়রের ট্রাজেডি লক্ষণযুক্ত নাটক বঙ্কিমের প্রিয় ছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু সেখানে বিয়োগান্ত পরিণতির কার্য-কারণ সূত্রের মধ্যে দৈব ও পুরুষকারের সংঘাত কপালকুণ্ডলায় অনুপস্থিত। শেক্সপীয়রের ট্রাজিক চরিত্র-গভীরের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিয়োগান্ত পরিণতির কারণ হলেও বঙ্কিম তাকে গ্রহণ করেন নি। শেক্সপীয়ারের দৈব এবং গ্রীক-ট্রাজেডির নিয়তিবাদ এই দুই ভাবনার মিলিত রূপই কপালকুণ্ডলার বিয়োগান্ত পরিণতিতে চিত্রিত হয়েছে। অদৃষ্টবাদের অদৃশ্য-শক্তির লীলার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের স্বরূপ আবিষ্কার করেছেন বঙ্কিম।

রোমান্টিক যুগের কবি-গোষ্ঠীরা বঙ্কিমের প্রিয় ছিল এবং সম্ভবতঃ তাঁর কবি-স্বভাবের গভীরে এঁদের প্রভাব পড়ে থাকবে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের চিন্ময়ী প্রকৃতি, দার্শনিক তত্ত্ব-ভাবনা, প্রকৃতির লীলায় ঈশ্বর, মানুষ ও নিসর্গের ভূমিকা— তাঁর আত্মিক তৃপ্তির ক্ষেত্র ছিল সন্দেহ নেই। লুসিতে প্রকৃতির সহজ, সরল রূপ তাকে আকৃষ্ট করেছে, ধরে নেওয়া যায়। এমনভাবেই কোলরিজ, বায়রন, শেলী, কীটস্ ইত্যাদি কবিদের কাব্যগ্রন্থ এবং ঔপন্যাসিক ওয়াল্টার স্কটের রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। দর্শনের জগতে জেরিমি বেন্থাম অগুয়েস্ত কোঁৎ, ও মিল তাঁর ভাবনাকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত করেছিল। তবে, এ প্রভাব উত্তরকালের সাহিত্য সমালোচনায় বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। এ ছাড়া, হোমারের নাসিয়া অথবা মিল্টনের ঈভ্ চরিত্র-প্রসঙ্গ কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কপালকুণ্ডলার সঙ্গে এই চরিত্রগুলির প্রকৃতিগত অমিলই বেশী। যাইহোক, 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্রভাব থাকলেও ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্রভাবে চরিত্র ও কাহিনী নির্মাণে কাজ করেছে। সূক্ষ্মভাবে কাব্যসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র-ঘটনা তাঁর মানস-লোকের অন্তরালে হয়ত ক্রিয়াশীল ছিল, এটুকুই বলা যায়।

চতুর্থ খণ্ডের পরিত্যক্ত প্রথম পরিচ্ছেদে বঙ্কিম নিয়তিবাদের প্রসঙ্গ টেনেছিলেন। জন স্টুয়ার্ট মিলের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি নিয়তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন—"Whatever our wishes may be, a superior power, or an abstract Destiny, will overrule them and compel us to act, not as we desire, but in the manner predestined"। অদৃষ্টবাদের গভীরতায় আস্থাশীল বঙ্কিম লিখেছেন— "ফেট ও নেসেসিটি নাম ধারণ করিয়া ইহা ইউরোপীয় দার্শনিকদের মধ্যে প্রধান মতভেদের কারণ হইয়াছে।.... সাংসারিক ঘটনা পরম্পরা ভৌতিক নিয়ম ও মনুষ্যচরিত্রের অনিবার্য ফল ; মনুষ্যচরিত্র মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল ; সুতরাং অদৃষ্ট মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল ; কিন্তু সেই সকল নিয়ম মনুষ্যের জ্ঞানাতীত বলিয়া অদৃষ্ট নাম ধারণ করিয়াছে।" বঙ্কিমের নিয়তিবাদ পাশ্চাত্ত্য অদৃষ্টবাদের অবিকল অনুসরণ নয়—তার মধ্যে প্রাচ্য ভাবনাও যুক্ত হয়েছে। বঙ্কিম প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সংমিশ্রণে যে অদৃশ্য শক্তির লীলা 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে লক্ষ্য করেছেন, তারই সুদূর প্রসারী প্রভাবে কাহিনীবৃত্ত, চরিত্র ও ঔপন্যাসিকের জীবনদৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। চরিত্র-সৃষ্টির অভিনবত্বে ও আখ্যায়িকা-নির্মাণে তিনি মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, এ কথা স্বীকার করতে হবে। ঘটনা-সংস্থানে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে, আকস্মিক ঘটনাধারার গঠনকৌশলে এবং ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শনের অঙ্গীভূত (There's a divinity that shapes our ends—Hamlet) অদৃষ্টবাদের মধ্যে প্রভাবের পরিবর্তে মৌলিকতার স্বাদ পাওয়া যাবে। 'কপালকুণ্ডলা' সম্পর্কে R. W. Fraser এজন্যই বলেছেন— The force that moves the whole with emotion and gives to it its subtle spell, in the mystic form of Eastern thought that clearly shows the new forms that lie ready for inspiring a new school of fiction with fresh life. (Literary History of India.)

নামকরণ

ঔপন্যাসিকের জীবন-জিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিত্ব উপন্যাসের আখ্যায়িকায় চরিত্র-আশ্রয়ে প্রকাশ পায়। জীবনের অন্তরালশায়ী নিগূঢ় সত্যটিকে (Novelist's interpretation of life) তিনি উদঘাটন করেন। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব কেবল ঘটনাবৃত্ত বা চরিত্র-অভিমুখী হয় না, অনেক সময় নামকরণের মধ্যে শিল্পী-ব্যক্তিত্ব জীবনের এক নিটোল সামগ্রিক রূপ আবিষ্কার করে। নাটক বা উপন্যাসের নামকরণ পদ্ধতির তিনটি পথ শিল্পীরা গ্রহণ করে থাকেন— (ক) প্রধান চরিত্র বা নায়ক / নায়িকার নামানুসারে নামকরণ; (খ) বিষয় বা ভাব-কেন্দ্রিক নামকরণ; (গ) কোন আদর্শভিত্তিক ইঙ্গিতপূর্ণ নামকরণ। এ ছাড়া, ঐতিহাসিক ঘটনা কেন্দ্রিক নামকরণও প্রচলিত আছে। মোটকথা, নামকরণের মধ্যে উপন্যাস বা নাটকের এক অন্তর্নিহিত ভাবসত্যের দিকে অঙ্গুলিসংকেত করা হয়। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস কেবল নাম-ভিত্তিক উপন্যাস নয়—কপালিনীর চরিত্রের সঙ্গে বঙ্কিমের জীবন-জিজ্ঞাসার গভীর যোগ, তার জীবনের মধ্যে প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় রহস্য, তন্ত্র-প্রভাব ও দেবী ভবানীর ইচ্ছাধীন নিয়তিবাদের ক্রিয়াশীলতা আবিষ্কৃত হতে পারে। সুতরাং প্রধান চরিত্র বা নায়ক / নায়িকার নামানুসরণে নামকরণের তাৎপর্যের দিক থেকে কেবল নয়— কপালকুণ্ডলাকে কেন্দ্র করে ঔপন্যাসিকের জীবন-দর্শন সামগ্রিকভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে অসামান্য ব্যঞ্জনায়, এদিক থেকেও নামকরণ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নাট্যকার শেক্সপীয়ারও সীমাহীন— ব্যঞ্জনায় নায়ক / প্রধান চরিত্রকে নাটকের নামকরণে ব্যবহার করেছেন—হ্যামলেট, ওথেলো, লীয়ার বা ম্যাক্‌বেথ-প্রত্যেকটি চরিত্র নাট্যকারের জীবন-জিজ্ঞাসার শিল্পিত রূপ। চরিত্রগুলির সঙ্গে অভিন্নভাবে যুক্ত আছে বিশেষ বিশেষ কিছু ভাব। নিকলের দৃষ্টিতে এর সুন্দর ব্যাখ্যা আছে— So in Hamlet it is a struggle between the emotion of revenge and perhaps also of love, warring against a certain quality which Hamlet himself names as 'religion' and which we might call moral scruple; in Othelo it is passionate love warring against jealousy; in Lear, it is petty pride warring against a tenderer sympathy; in Macbeth, it is Kingly ambition warring against the emotions that have arisen out of conscience. কপালকুণ্ডলার নামকরণের মধ্যে জীবন -জিজ্ঞাসার নির্বিশেষ ব্যঞ্জনা আছে যা বিশেষ চরিত্র বা ঘটনাবস্তুকে অতিক্রম করেই ব্যাপ্ত। আর এখানেই নামকরণের শৈল্পিক সাফল্য।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কপালকুণ্ডলা। প্রকৃতিপালিত এক মানব-কন্যার জীবনে সমুদ্র, আকাশ ও অরণ্যের গভীর প্রভাব কতটা কার্যকরী হয়—সংসার-জীবনে প্রবেশ ঘটিয়ে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন উপন্যাসিক। তার জীবন-বীক্ষণই উপন্যাসের লক্ষ্য। এর সাথে যুক্ত হয়েছে তান্ত্রিক কাপালিকের প্রভাব ও নিয়তিবাদ। সুতরাং কপালকুণ্ডলা চরিত্রই কবি-প্রেরণার উৎস। তাকে ঘিরেই উপন্যাসের কথাবস্তু আবর্তিত—অন্যান্য চরিত্রগুলিও সংঘাত অথবা সাদৃশ্য রচনায় প্রধান চরিত্রের অনুগামী। মতিবিবি চরিত্রে চমক থাকলেও কাহিনীর ভাববস্তু কপাল-আশ্রিত। এক্ষেত্রে, কপালকুণ্ডলা মুক্ত ও স্বাধীন—কোন চরিত্রের প্রভাব তার জীবনে স্থায়ী রূপ পায়নি। ম্যাক্‌বেথ চরিত্রেও এই বিশেষ দিকটি দেখা যায়—Macbeth is the motive force in Shakespeare's play. Here almost everything that happens on the stage arises out of the thoughts

and the emotions of the hero himself. Hardly any other character may be said to influence the development of the plot Nicoll. কপালেব নিরুদ্বিগ্ন আরণ্যক জীবনে অকস্মাৎ নদীতে জোয়ার আসার সূত্রে নবকুমাররূপী এক সংসারী মানুষের পদার্পণ জনিত সমস্যার আলেখ্য উপন্যাসের কাহিনীবৃত্ত। কালিদাসের শকুন্তলা অথবা শেক্সপীয়ারের 'দি টেম্পেস্ট' নাটকেব মিরান্দা চরিত্রের সঙ্গে কিছুটা সঙ্গতি থাকলেও প্রকৃতিগত দিক থেকে কপাল চরিত্র লেখকের অসাধারণ শিল্পকুশলী সৃষ্টি। যাইহোক, বধ্যভূমিতে কাপালিকের নিষ্ঠুর নরবলির হাত থেকে কপালকুণ্ডলা করুণার্দ্র চিত্তে রক্ষা করেছে নবকুমারকে। 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?' অথবা, 'পলায়ন কর; আমার পশ্চাৎ আইস, পথ দেখাইয়া দিতেছি'— অরণ্যের সীমাহীন নিস্তব্ধতা ও ঔদাসীন্যের মাঝখানে মনুষ্যের পদধ্বনি নিস্তরঙ্গ কপালের জীবনে সংসার প্রবেশের দ্বারকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। কপালকুণ্ডলা চৈতন্যের গভীরে কিন্তু নবকুমারের প্রতি প্রেম, অথবা সংসার-আসক্তি কাজ করেনি। তার বহিরঙ্গের জীবনধারা কতকাংশে নিয়ন্ত্রিত হলেও, কপালের আত্মনির্লিপ্ততা, মগ্ন-চৈতন্যে ঔদাসীন্য ও অনাসক্তি, প্রকৃতির স্বাধীন, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের দুর্বাব আকর্ষণ ও দৈব-বাণী, তার জীবনগতিপ্রবাহকে পরিণামমুখী করে তুলেছিল। কপালিনী চরিত্রের অন্তর্লীন স্বভাবকে আবিষ্কার করার জীবন-জিজ্ঞাসা থেকে এই চরিত্রের সৃষ্টি এবং উপন্যাসের শিল্পসম্মত রূপ দেওয়ার অভিপ্রায়ে কেন্দ্রীয় ভাব-প্রধান চরিত্রকে বঙ্কিম নামকরণের উপযুক্ত চরিত্র বলে গ্রহণ করেছিলেন অনিবার্যভাবে।

আরণ্যক জীবনে কপালকুণ্ডলা চিন্ময়ী রূপে আবির্ভূতা—প্রকৃতিলোক ও শুদ্ধ চৈতন্যে ভবানীর সঙ্গে যেন অভিন্ন বলেই তাকে মনে হয়। এই দুই জগতের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার সূত্রে সংসারী জীবনে 'মৃন্ময়ী' রূপে তার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু মৃন্ময়ী সত্তা চিন্ময়ী সত্তার নিত্য আকর্ষণে দ্বিধাযুক্ত—ঔদাসীন্যের গভীরতায় দৈবী নির্দেশে তার জীবন-পরিণাম। মনে হয়, অবণ্যানীর নিস্তব্ধ গভীরতায়, কল্লোলিত সাগরগর্জ্জনের পটভূমিকায় কপালকুণ্ডলার পবিত্রতা শুদ্ধ চৈতন্যের মূর্ত প্রতীক হয়েই ছিল—দেবী ভবানী, যাঁকে নরমুণ্ডমালিনী বা কপালমালিনী বলে অভিহিত করা হয়, তাঁর সাথে কপালকুণ্ডলাব অভিন্নতা তার চিন্ময়ী রূপেরই পরিচায়ক। সমস্যা, সংকটহীন জীবনের অপূর্ব ব্যঞ্জনা কপালকুণ্ডলার চিন্ময়ী সত্তার মধ্যে আবিষ্কার কবা যাবে। কিন্তু অধিকাবীর আগ্রহে নবকুমারের সঙ্গে সংসার-জীবনে প্রবেশের প্রাক্কালে দৈবী-প্রত্যাখ্যান থেকে শুরু তার অনিশ্চিত জীবন-পরিক্রমা। মাত্র এক-বৎসরের সংসারজীবনে 'যোগিনী এখন গৃহিণী' হয়েছে বলা হলেও কপালের জীবন-পথ পরিক্রমার দীর্ঘশ্বাস অরণ্য-আকর্ষণে ধ্বনিত হয়েছে। অতৃপ্তির গভীরতর ব্যঞ্জনায় মৃন্ময়ী 'মাটির পৃথিবী পানে' তাকিয়ে দেখে নি। নবকুমারের প্রতি তার পূর্ববৎ করুণা বজায় থাকলেও ভবানীর নির্দেশে কপাল আত্মবিসর্জনে কৃতসংকল্প। গল্পের রস-পরিণামের ইঙ্গিত প্রমাণ করে, চিন্ময়ী মৃন্ময়ীতে রূপান্তরিত হলেও অপূর্ণতা ও দৈব নির্দেশে সে পুনরায় চিন্ময়ী সত্তার সঙ্গে একাত্ম হয়েছে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। সুতরাং উপন্যাসের নামকরণ যে কেন্দ্রীয় চরিত্র-আশ্রিত, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

উপন্যাসের সূচনা পর্ব থেকে পরিণাম পর্যন্ত কপালকুণ্ডলারই একচ্ছত্র প্রাধান্য। কপালকে ঘিরে আখ্যায়িকায় নবকুমার, কাপালিক, শ্যামাসুন্দরী, অধিকারীর প্রবেশ ঘটেছে অনিবার্যভাবে। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ভূমিকার একটা মূল্যায়ন করা গেলেও সামগ্রিক ঐক্যসূত্রে তা শেষ পর্যন্ত কপাল অভিমুখী। একমাত্র মতিবিবি উপাখ্যানে স্বতন্ত্র কিছু ভূমিকা আছে। রাজপথে বা পান্থনিবাসে

হঠাৎ পূর্ব-স্বামী নবকুমারের সঙ্গে তার সাক্ষাৎলাভ, মোগল রাজৈশ্বর্যের অনুগামী প্রবৃত্তিময় জীবন-কাহিনীর ইতিকথা ও নবকুমার-লাভের ঐকান্তিক বাসনায় সপ্তগ্রামের জীবনে আত্মকৃচ্ছতা চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই এবং উপন্যাসের নামকরণের প্রাসঙ্গিক চরিত্রও বটে। বিশেষতঃ, "মতিবিবি চিরন্তনী নারী—পুরুষের ভোগ-সহচরী, তাহার সুখদুঃখবিধায়িনী, বাসনাকামনাময়ী, মোহিনী, নায়িকারূপিণী নারী।" সুতরাং এই চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য ও বাস্তবমুখীনতা উপন্যাস-শিল্পের উপযুক্ত বিষয়। অন্ততঃ নামকরণের ক্ষেত্রে এ চরিত্র উপেক্ষিতা হতে পারে না। কিন্তু আখ্যায়িকায় মতিবিবি চরিত্র, নবকুমার-প্রাপ্তির সংকল্পে কাপালিকেব সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে—তপস্বিনীর অনিষ্ট সাধনই তার অভীষ্ট। এভাবে মতিবিবি কপালকুণ্ডলার ভৈরবী নির্দেশিত মৃত্যু-পথের কারণ হয়েছে এবং কপালের জীবন-পরিণামের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কাব্যাংশের নায়িকা কপালিনী, আর উপন্যাস অংশের নায়িকা মতিবিবি। উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়, রস-পরিণাম অথবা জীবন-জিজ্ঞাসা কপালকুণ্ডলাকে আশ্রয় করেই শিল্প-সম্মত রূপ পেয়েছে—সুতরাং ভাবগত তাৎপর্য অর্থপূর্ণ হয়েছে কপালকুণ্ডলা নামকরণে। বৈচিত্র্যময় জীবন-দর্শনের অনুষঙ্গ হিসেবে মতিবিবি চরিত্র চিত্রিত। তার জীবন গভীরতর ও ব্যাপকতর ব্যঞ্জনাধর্মী জীবন নয়—কপালকুণ্ডলাব মতো তো নয়ই। তার পরিণতিও যেন মাঝপথে বাহুল্য-বিবেচনায় পরিত্যক্ত। মতিবিবি কেন্দ্রীয় চরিত্রও নয়। সুতরাং যথার্থ নায়িকা হওয়ার অনুপযুক্ত চরিত্র মতিবিবির নামে উপন্যাসের নামকরণ হতে পারে না।

নবকুমার চরিত্র উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নয়। আখ্যায়িকার ভাববস্তু, জীবন-জিজ্ঞাসা এই চরিত্রের আশ্রয়ে প্রকাশিত নয়। এ বিষয়ে সুধী সমালোচক অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্তের অভিমত— "নবকুমারের প্রত্যেকটি গুণ বিশেষতঃ তাঁহার সুগভীর প্রেম এবং তাঁহার ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য ও আত্মত্যাগ—সকলই কপালকুণ্ডলার বৈশিষ্ট্যবিকাশের জন্য একান্তরূপে প্রয়োজনীয়। তাঁহার প্রতি পাঠকের যে সহানুভূতি জন্মে, তাহা গভীর হইলেও গৌণ। পাঠকের মুখ্য সহানুভূতি কপালকুণ্ডলাতেই নিবদ্ধ।" (বঙ্কিমচন্দ্র)। উপন্যাসে কপালকুণ্ডলারই প্রাধান্য—তার জীবন-বৃত্তে নবকুমার এক উল্লেখযোগ্য পুরুষমাত্র। অন্যান্য চরিত্রের মতো এই পুরুষ চরিত্র কপালিনীর সান্নিধ্যে আপন কর্তব্য ও কৃতকর্মে আত্মনিয়োজিত। তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যাবতীয় বিষয় একক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল নয়—কপালকে ঘিরে তার রূপমুগ্ধতা বিবাহে পূর্ণতা পেলেও তার সংশয়, সন্দেহ, ষড়যন্ত্রের অংশ-গ্রহণ, শেষ পর্যন্ত মৃত্যু অভিমুখী হয়েছে। তার আত্মপীড়ন ও আত্মবিসর্জনের কৃতসঙ্কল্পতা কপালকুণ্ডলার জীবন-আবর্তের সামান্যতম অংশ মাত্র। সংসার-জীবনে মৃন্ময়ীর হৃদয়-পরশলাভের আকূতি আরণ্যক পটভূমিকায়, নৈঃশব্দের গভীরতায় যেন গুমরে ওঠে— তার অন্তঃকরণে পুঞ্জীভূত জমাট অবরুদ্ধ বেদনা 'প্রেতভূমে' নিঃসীম আর্তিতে কপালের উদ্দেশে নিবেদিত হয়। কপালের হৃদয় তার প্রার্থিত হ'লেও মৃন্ময়ীর চতুর্দিকের আবৃত রহস্যময়তার বেষ্টনী অতিক্রম করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। নবকুমারের চরিত্রে এই ভাব শেষপর্যন্ত মৃন্ময়ীর সঙ্গে আত্মবিসর্জনে সমাপ্ত হয়েছে। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য কপালকুণ্ডলা চরিত্র, তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসার পূর্ণরূপ এই চরিত্রে পাওয়া যাবে। উপন্যাসের তত্ত্ব বা ভাববস্তু মৃন্ময়ী চরিত্রকে ঘিরেই আবর্তিত—নবকুমার সেই বৃত্তের পূর্ণতা ঘটাবার সহায়ক চরিত্র মাত্র—অবশ্যই অনুষঙ্গ চরিত্র। কপালকুণ্ডলার রহস্যময় আরণ্যক জীবনে নবকুমারকে প্রক্ষিপ্ত চরিত্র বলেই মনে হয়। নবকুমার চরিত্র উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য কপালকুণ্ডলা। নবকুমারের প্রেমের পরিবর্তে রূপমোহের অত্যধিক প্রাধান্য-হেতু আত্মগ্লানির ভাবনাটি উপন্যাসের পার্শ্বিক ভাবনা।

তার স্বতন্ত্র মূল্যায়ন সম্ভব হলেও, এ উপন্যাসের লক্ষ্য তা নয় বলে, লেখক নবকুমারের পরিবর্তে কপালকুণ্ডলাকেই জীবন-দর্শনের প্রতীক চরিত্র রূপে উপস্থাপিত করেছেন।

উপন্যাসের রোমান্টিক ভাবমণ্ডল, প্রকৃতিশক্তিব অবণ্য, সমুদ্র, আকাশের মুক্ত স্বাধীন জীবনানুরাগ ও ঐশী শক্তির লীলায় জীবনের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যের প্রত্যক্ষরূপ কপালকুণ্ডলা চরিত্রে পাওয়া সম্ভব। "গ্রন্থেব নাম কপালকুণ্ডলা। কপাল (অর্থাৎ করোটি বা মাথার খুলি) যিনি কুণ্ডলরূপে কর্ণে ধারণ করেন, তিনিই কপালকুণ্ডলা। এই অর্থে দেবী কালিকার অপর নাম কপালকুণ্ডলা, কারণ, তাঁহারই কর্ণভূষণ শবরূপী দুই শিশু। ..... মহাপ্রকৃতি ভবানীই কপালকুণ্ডলা।" (অধ্যাপক জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী)। উপন্যাসের প্রধানা নায়িকা কপালকুণ্ডলা চরিত্র একটা মূল সূত্রে যেন ঘটনার কার্য-কারণে চরিত্রগুলির পরে তার ক্রিয়াকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত করেছে। নায়িকা চরিত্রের প্রয়োজনেই আখ্যান ও চরিত্রগুলি উপন্যাসে স্থান লাভ করলেও ঔপন্যাসিক দেখেছেন, নিরাসক্ত কপালকুণ্ডলা কাপালিক-মতিবিবির ষড়যন্ত্রকে ম্লান করে দিয়ে ভবানীর নির্দেশে আত্মবিসর্জন দিয়েছে। নবকুমারও তার নাগাল পায়নি। প্রত্যক্ষ বাস্তব দৃশ্যমান জীবন ও জগৎ নয়, ঐশী প্রেরণা ও প্রকৃতি-প্রেমের দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তায় কপালচরিত্র আচ্ছাদিত। তাব অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে এই চরিত্রের যতটুকু দর্শনীয়, বঙ্কিম তারই শিল্পসম্মত রূপ দিয়েছেন এই চরিত্রে। ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন কপালকুণ্ডলা চরিত্র ভিত্তিক বলে, উপন্যাসের নামকরণের মধ্যে ভাব-সংহতি লক্ষ্য করা যাবে। সুতরাং 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের নামকরণ যথার্থই হয়েছে বলতে হবে।

পরিচ্ছেদের শিরোনাম

গ্রন্থনামের সঙ্গে পরিচ্ছেদের শিরোনামেরও গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্র অন্যান্য উপন্যাসের মত এখানেও পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন কয়েকটি প্রসঙ্গের কথা মনে রেখে— (১) প্রকৃতি ও মানব চরিত্রের দৃশ্য-চিত্রে শিরোনাম অনেকটাই ভাব-সৃষ্টিতে সক্ষম; (২) চরিত্রের অন্তর্নিহিত স্বভাব প্রকাশের সংক্ষিপ্ততম মাধ্যম; (৩) সংশয়, সংঘাত, প্রতিহিংসা বা স্বপ্নদর্শনের নেপথ্য ভাবনার সংকেত; (৪) স্থান-কাল-পাত্রের ইঙ্গিত; (৫) উপন্যাসের দ্রুত ঘটনাধারার পটপরিবর্তনের চিত্রদৃশ্য রূপে ঘটনার ঘন-রূপ বন্ধনের প্রয়োজনে শিরোনামের ব্যবহার। উপন্যাসের আখ্যায়িকার দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনা-চিত্রে শিরোনাম একটি অপরিহার্য শিল্প কৌশল। চরিত্র-বিশ্লেষণে বা অন্তর্লোকের রহস্য আবিষ্কারে এই পদ্ধতির অতিরিক্ত সুবিধা আছে। বর্ণনা প্রধান রচনারীতিতে দীর্ঘ বিস্তৃত কাহিনী ও চরিত্র, সংহত ঘনপিনদ্ধ হয় সাঙ্কেতিক ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ শিরোনামে। বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে উপন্যাসে প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদে একটি করে শিরোনাম দিয়েছেন। প্রত্যেক পরিচ্ছেদে একটি করে কবি-বচন উদ্ধৃত করেছেন। একদিকে পরিচ্ছেদের শিরোনাম ও অন্যদিকে শীর্ষ-উদ্ধৃতি—দুইয়ের সম্মিলনে দৃশ্য-চিত্রগুলি, চরিত্রের ভাব-ব্যঞ্জনা অর্থপূর্ণ হয়েছে। শীর্ষ উদ্ধৃতিগুলো শিরোনামের অর্থ প্রকাশে সহায়ক হয়েছে। এর প্রাসঙ্গিকতা অনুভব করে সমালোচক মোহিতলাল চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়ে লিখেছেন— "উপন্যাসের প্রতি পরিচ্ছেদের শিরোদেশে যে একটি করিয়া কবি-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, এ কাব্যের রসপুষ্টির পক্ষে তাহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হইবে। এই কলা-কৌশলটি বঙ্কিমচন্দ্র স্কটের (Sir Walter Scott) উপন্যাস হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। উহার দ্বারা প্রত্যেক পরিচ্ছেদের ঘটনা যেন একটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে—যেন এইরূপ ঘটনা একটা শাশ্বত নিয়মেই ঘটিয়া থাকে, অন্যত্রও এমনই ঘটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আর কোন উপন্যাসে এই কৌশল অবলম্বন করেন নাই, তাহাতে মনে হয়, তিনি ঐ কৌশলটিকে একমাত্র এই কাব্যের বড়ই উপযোগী মনে করিয়াছিলেন। উহাও এই কাব্যের রোমান্স রসকে গাঢ়তর করিয়াছে। এই উদ্ধৃত বচনগুলি যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনই সুপ্রযুক্ত হইয়াছে; তাহাদের প্রাসঙ্গিক ভাবে-সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।" (বঙ্কিম-বরণ)।

এই উপন্যাসের বর্তমান সংস্করণে সর্বমোট একত্রিশটি পরিচ্ছেদ আছে (পূর্ববর্তী সংস্করণের একটি মাত্র পরিচ্ছেদ পরিত্যক্ত হয়েছে)। চারটি খণ্ডের অন্তর্গত একত্রিশটি পরিচ্ছেদ এইভাবে বিন্যাস—প্রথম খণ্ডে নয়টি, দ্বিতীয় খণ্ডে ছয়টি, তৃতীয় খণ্ডে সাতটি, এবং চতুর্থ-খণ্ডে নয়টি পরিচ্ছেদ। পরিচ্ছেদগুলির শিরোনাম ও তার তাৎপর্য অনুধাবন করা যেতে পারে।

প্রথম খণ্ডের শিরোনাম 'সাগর সঙ্গমে'। গঙ্গাসাগর থেকে প্রত্যাগমনকালে গাঢ় কুজ্ঝটিকায় দিঙ্‌ভ্রান্ত নৌকারোহীদের অসহায় চিত্র এবং নবকুমারের মতো যুবকের আবির্ভাব, সমুদ্রবেষ্টিত অরণ্যভূমিতে পদার্পণ এবং পরের উপকারের জন্য কাষ্ঠাহরণে গেলে সঙ্গীদের দ্বারা পরিত্যক্ত নবকুমার "উপকূলে" (২য় পরিচ্ছেদ)। অবশেষে সঙ্গীদের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা— অন্ধকারময় "বিজনে" (৩য় পরিচ্ছেদ) নিঃসঙ্গ একাকী নবকুমার। চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'স্তূপশিখরে' গভীর রাত্রিতে নবকুমারের কাপালিক দর্শন এবং কাপালিকের পর্ণকুটীরে আশ্রয়লাভ। পরের দিন প্রাতে "সমুদ্রতটে" (পঞ্চম পরিচ্ছেদ) কাপালিকের চিন্তায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণরত নবকুমার—শেষে অপরাহ্ণের "প্রদোষতিমিরে" কপালকুণ্ডলার অপূর্ব মূর্তি দর্শন, রূপানুরাগ এবং কপাল কর্তৃক পথভ্রষ্ট

নবকুমারের পুনরায় কাপালিকের পর্ণকুটীরে উপনীত হওয়ার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত অংশে সমুদ্রতট, অরণ্য, কাপালিক-কপালদর্শনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। পরিচ্ছেদের নামকরণ সরল ঘটনাবৃত্তের অনুসরণ করেছে এবং বালিয়াড়ি, সমুদ্রতট ও অরণ্যানীর নির্জনতা আভাসে-ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ থেকে কাহিনীর সংকট, সমস্যা ও সমাধানের চিত্র-দৃশ্য নবম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রসারিত। 'কাপালিকসঙ্গে' (৬-ষ্ঠ পরিঃ) নবকুমার বধ্যভূমিতে, কাপালিকের নির্মম-নিষ্ঠুর রূপ, ভৈরবী পূজার আয়োজন ও বধ্যভূমি থেকে করুণার্দ্র চিত্তে কপালের নবকুমার উদ্ধার এই অংশে বর্ণিত। বিজনমধ্যে পলাতকেদের অনুসরণে 'অন্বেষণে'র (৭-ম পরিঃ) পরিকল্পনা। অন্ধকারবশত অন্বেষণকালে স্তূপশিখর থেকে পড়ে গিয়ে কাপালিকের হাত-ভাঙ্গা চরিত্রের ভাবসংহতির পূর্ণতা। কাপালিকের তন্ত্র সাধনা, বলির আয়োজন ও ব্যর্থতা এবং অন্বেষণে হাত ভেঙ্গে যাওয়ার মধ্যে চরিত্রে-বৃত্তের পূর্ণতার আভাস। কপাল-নবকুমার অধিকারীর 'আশ্রয়ে' (৮-ম পরিঃ)— ভবানীর অনুমোদন লাভ এবং অধিকারীর দ্বারা নবকুমার-কপালের বিবাহের আয়োজন। নবম পরিচ্ছেদ 'দেব-নিকেতনে'। নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার বিবাহ এবং দেবী কালিকা কর্তৃক অভিন্ন বিল্বপত্র প্রত্যাখ্যান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বনবাসিনী কপালকুণ্ডলার সংসার-জীবন সুখের হবে না, এমন ইঙ্গিতের অশুভ জীবন-পরিণামের প্রতিধ্বনি / সংকেত।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ 'রাজপথে'। মেদিনীপুরের পথে দস্যু-পীড়িতা এক নারীর সাক্ষাৎলাভ এবং চটিতে আনয়ন। নবকুমারের আগামী জীবন-পথ যে মসৃণ নয়, এ পরিচয় যেন তারই ইঙ্গিত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ— 'পান্থনিবাসে' এই নারীর অপূর্ব রূপমূর্তি দর্শন— নবকুমারের দানেব পর "প্রদীপ নিবিয়া গেল" অর্থপূর্ণ সংকেত। তৃতীয় পরিচ্ছেদের 'সুন্দরী সন্দর্শনে' মতিবিবির কপাল-দর্শন ও অলঙ্কার দান। পেষমনের প্রশ্নোত্তরে মতিবিবির "মেরা শৌহর" বলে নবকুমারের পরিচয় দান। 'শিবিকারোহণে' (৪-র্থ পরিঃ) কপালকুণ্ডলার ভিক্ষুককে সমস্ত অলঙ্কার দান বিষয়-অনাসক্তি ও সরলতার ইঙ্গিত। 'স্বদেশে' (৫-ম পরিঃ) তপস্বিনীর নবকুমারের সংসারে স্থানলাভ এবং নবকুমারেব রূপমুগ্ধতার পরিতৃপ্তি। 'অবরোধে' (৬-ষ্ঠ পরিচ্ছেদ) কপালিনীর। সপ্তগ্রামের গৃহ সন্নিকটস্থ অরণ্য দর্শনে সমুদ্রতীরের পূর্ব স্মৃতিজাগরণ এবং প্রবল সংসার অনাসক্তির ভাব ব্যক্ত। ভবানীর বিল্বপত্র গ্রহণ করার প্রসঙ্গে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত।

তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের নাম—'ভূতপূর্ব্বে'। মতিবিবির চরিত্রের উপযুক্ত প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে এই দৃশ্যে। তার প্রবৃত্তিরূপিণী চরিত্র, ঐশ্বর্যময় জীবন আগ্রার জীবনস্রোতের অনুকূল। মেহের-জাহাঙ্গীর প্রসঙ্গ, খসরুকে কেন্দ্র করে সিংহাসনের জন্য ষড়যন্ত্র—ইতিহাসের সত্য-ঘটনা মতিবিবির মাধ্যমে উপস্থাপিত এবং তার জীবনযাপনের ইঙ্গিত দানই 'ভূতপূর্ব্বে'র উদ্দিষ্ট লক্ষ্য। 'পথান্তরে' (২য় পরিঃ) আকবরের মৃত্যু ও জাহাঙ্গীরের সিংহাসনলাভ ঘটনা শ্রবণে মতিবিবির প্রতিক্রিয়া—মেহের উন্নিসার মন জানার ইচ্ছা ও নতুন ভাবনার উদয়। 'প্রতিযোগিনী গৃহে' (৩য় প রিঃ) বর্ধমানে শের আফগানের পত্নী মেহের উন্নিসার যুবরাজ জাহাঙ্গীর-প্রীতি প্রসঙ্গ সুকৌশলে মতিবিবি জেনে নিয়েছে এবং তার চিত্তে 'ঈষৎ সুখানুভবে'র সৃষ্টি। চতুর্থ পরিচ্ছেদ— 'রাজনিকেতনে' জাহাঙ্গীরের সঙ্গে মতিবিবির কথোপকথন এবং মেহের উন্নিসা সম্পর্কে বাদশাহের—চিত্ত দৌর্বল্যের পরিচয় লাভ এবং লুৎফ-উন্নিসার 'আত্মমন্দিরে' (৫-ম পরিঃ) প্রস্থান। পেষমনের সঙ্গে আলাপে মতিবিবির আগ্রা পরিত্যাগের বাসনা, 'ললাট-লিখনে'র অনিবার্য প্রবাহে তার অন্তরে নবকুমারের জন্য প্রেমবোধ জাগরণের ইঙ্গিত। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে, 'চরণতলে,' সপ্তগ্রামে মতির গৃহে নবকুমারকে— "কেবল তোমার দাসী হইতে চাহি" প্রার্থনা এবং নবকুমার কর্তৃক

প্রত্যাখ্যান। "উন্মাদিনী যবনীব" "কুপিতফণিনীমূর্তি" দর্শনে, নবকুমারের প্রশ্নোত্তরে মতিবিবিই যে পদ্মাবতী, সেই পরিচয় দান। চরণতলে মতিবিবির প্রেমময় প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হলে মতিবিবির ভিন্ন মূর্তিটি দলিত ফণিনীর রূপ ধারণ করেছে। 'উপনগর প্রান্তে' (৭-ম পরিঃ) মতি বিবির ব্রাহ্মণবেশীর ছদ্মবেশ-ধারণ, নিবিড় বনমধ্যে গমন এবং কাপালিকের সাক্ষাৎ।

চতুর্থ খণ্ডের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আখ্যানবস্তুর দ্রুত পটপরিবর্তনের ইঙ্গিত এবং চরিত্রগুলির মানসলোকের বৈশিষ্ট্য ও রহস্যময়তা শিরোনামের নামকরণে চিহ্নিত। প্রথম পরিচ্ছেদ— 'শয়নাগারে' কপালের সঙ্গে শ্যামার কথোপকথন। ঔৎসুক্য সংগ্রহের জন্য কপালের রাত্রিকালে অরণ্য গমনের প্রেক্ষাপটে এই দুই নারীর সংলাপ-বিনিময় অত্যন্ত সাঙ্কেতিক ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ। নির্জন অরণ্যে ভ্রমণ "আমার ছেলেবেলা হইতে অভ্যাস" এবং তীব্র সংসার-অনাসক্তি জনিত— "যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।"— অভিব্যক্তি কপালের আসন্ন জীবন-পরিণতিকে যেন সুনিশ্চিত করে। 'কাননতলে,' (২-য় পরিঃ) বনমধ্যে কাপালিক-ব্রহ্মণবেশীর সাক্ষাৎ ও ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে কপালের কথোপকথন। তৃতীয় পরিচ্ছেদ— 'স্বপ্নে' দেবী পরাশক্তির অভিপ্রায় এবং কপালের চিত্তবৃত্তির প্রবল অনীহাতে সমুদ্রমধ্যে 'নিমগ্ন কর' ভাব-ব্যঞ্জনার প্রকাশ। কৃতসঙ্কেতে (৪-র্থ পরিঃ) ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য— 'যেমন কক্ষ হইতে বাহির হইলেন, অমনি গৃহের প্রদীপ নিবিয়া গেল।' অশুভ সংকেত। 'গৃহদ্বারে' (৫-ম পরিঃ) এবং 'পুনরালাপে' (৬-ষ্ঠ পরিঃ)— নবকুমারের ব্রাহ্মণবেশীর পত্র-প্রাপ্তি ও কপালের প্রতি সন্দেহ এবং কাপালিকের 'স্বপ্নদর্শন' বৃত্তান্ত শ্রবণ ও কাপালিক কর্তৃক বধযোগ্যা কাপালিনীর অনিষ্টসাধনে বিভ্রান্ত নবকুমারের সাহায্য। 'সপত্নীসম্ভাষে' (৭-ম পরিঃ)— মতিবিবির "স্বামী ত্যাগ কর" অভিব্যক্তির পরিপ্রেক্ষিতে কপালের "আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব" স্থির সিদ্ধান্তের পরিচায়ক ঘটনা। গৃহাভিমুখে (৮-ম পরিঃ) আকাশে রণরঙ্গিনী কালিকা-ভৈরবী মূর্তি দর্শন এবং কপালের অন্তরে তার গভীর প্রতিক্রিয়া। ভৈরবীর দীর্ঘ ত্রিশূল দিয়ে "কাপালিকগত পথ প্রতি" সঙ্কেত এই অংশের তাৎপর্যপূর্ণ ভাববস্তু। শেষ পরিচ্ছেদে— "প্রেতভূমে" কাপালিকের তপস্বিনী-বধের আয়োজন, নবকুমারের পুনর্বার প্রেমভাবের জাগরণ এবং মৃন্ময়ীকে গৃহে নিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও ভবানীর চরণে আত্মবিসর্জনে কৃতসঙ্কল্প কপালের তটমৃত্তিকাখণ্ডের সঙ্গে গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে পড়াল এবং নবকুমারের তার অনুগমন করা দৃশ্য-চিত্র দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি।

বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পচেতনার সংযমবোধ ও ঘটনা-চরিত্রের ঐক্য ভাবনার সঙ্গে কপালকুণ্ডলার অতি সংক্ষিপ্ত কাহিনীর শিরোনামগুলো এক একটি ভাবের দ্যোতকরূপে প্রকাশ পেয়েছে। আশ্চর্য পরিমিতি বোধের পরিচয় পাওয়া যাবে সর্বত্র। মাত্র চারটি খণ্ডে বিভক্ত এই ক্ষুদ্র উপন্যাসের কাহিনীবৃত্ত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, প্রত্যেক চরিত্রই একটা ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে স্বাধীনভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্ত চরিত্র, পরিবেশ পরিস্থিতি রচনায় স্বল্প পরিসরে অসামান্য ইঙ্গিত, নাটকীয়তা ও কাব্যধর্মিতা, চরিত্রের অন্তর্লোক বিশ্লেষণে বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত সৃষ্টি— একাধিক বৈশিষ্ট্যের ব্যঞ্জনাধর্মী শিরোনাম বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত রচনার কৌশলের পরিচয় দেয়।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে বিধৃত পরিচ্ছেদের শিরেনামগুলিকে এইভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়:

(ক) স্থানগত দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ শিরোনাম— সাগরসঙ্গমে (১ম / ১ম) উপকূলে (১ম / ২য়), বিজনে (১ম / ৩য়), স্তূপাশিখরে (১ম / ৪র্থ), সমুদ্রতটে (১ম / ৫ম) আশ্রয়ে (১ম / ৮ম), দেবনিকেতনে (১ম / ৫ম) রাজপথে (২য় / ১ম), পান্থনিবাসে (২য় / ২য়), স্বদেশে (২য় / ৫ম), পথান্তরে (৩য় / ২য়), প্রতিযোগিনী-গৃহে (৩য় / ৩য়), রাজনিকেতনে

(৩য় / ৪র্থ), উপনগরপ্রান্তে (৩য় / ৭ম) কাননতলে (৪র্থ / ২য়), গৃহদ্বারে (৪র্থ / ৫ম) গৃহাভিমুখে (৪র্থ / ৮ম), প্রেতভূমে (৪র্থ / ৯ম)। উপন্যাসে কাহিনী-বৃত্তের প্রাধান্য থাকায় আখ্যায়িকার একত্রিশটি পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রায় আঠারোটির নামকরণ স্থান ভিত্তিক হয়েছে। সমুদ্রতট ও অরণ্য প্রকৃতি, রাজপথ, পান্থনিবাস, রাজনিকেতন এবং সপ্তগ্রামের সন্নিকটস্থ বনভূমি ও প্রেতভূমে— উপন্যাসের কাহিনীবৃত্তের ঘটনা সমূহ সূচনা থেকে পরিণতি পর্যন্ত চিত্রিত হয়েছে। রাত্রিকালীন পরিবেশে বেশীর ভাগ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্থানগত প্রভাবে চরিত্রের ভাব-সংহতি ও অন্তর্লোকের রহস্য উদ্ঘাটনে সহায়ক হয়েছে। আখ্যানের সূচনা সমুদ্রতটে এবং পরিণতি প্রেতভূমে— এই স্থানগত মিল অহেতুক নয় গভীর তাৎপর্যপূর্ণও বটে।

(খ) কাপালিক সঙ্গে (১ম / ৬ষ্ঠ) সুন্দরী সন্দর্শনে (২য় / ৩য়) চরণতলে (৩য় / ৬ষ্ঠ) পুনরালাপে (৪র্থ / ৬ষ্ঠ), সপত্নীসম্ভাষে (৪র্থ / ৭ম)— সর্বমোট পাঁচটি পরিচ্ছেদের নামকরণ ঘটনা-ভিত্তিক। কাপালিকের সঙ্গে বধ্যভূমিতে নবকুমার ও কপালকর্তৃক উদ্ধার, মতিবিবির সপত্নী কপালকুণ্ডলা-দর্শন, নবকুমাররের চরণতলে মতিবিবি ও প্রত্যাখ্যান, পুনরালাপে কাপালিক-নবকুমার পরামর্শ ও ষড়যন্ত্র এবং মতিবিবির কপালকুণ্ডলাকে "স্বামী ত্যাগ কর" প্রসঙ্গ— প্রায় প্রতিটি ঘটনা উপন্যাসের turning point—আখ্যায়িকার গতি-পরিবর্তনে এই পরিচ্ছেদগুলির গুরুত্ব অসামান্য। নামকরণও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

(গ) চরিত্রের মর্মকথা বা অন্তরের রহস্য উদ্ঘাটনে বা চরিত্রের ভাবগত প্রকৃতি-বিশ্লেষণে কয়েকটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম অর্থপূর্ণ হয়েছে—অন্বেষণে (১ম/ ৭ম), শিবিকারোহণে (২য় / ৪র্থ), অবরোধে (২য় / ৬ষ্ঠ), ভূতপূর্ব্বে (৩য় / ১ম) আত্মমন্দিরে (৩য় / ৫ম), শয়নাগারে (৪র্থ / ১ম), স্বপ্নে (৪র্থ / ৩য়), কৃতসঙ্কেতে (৪র্থ / ৪র্থ পরিঃ)। মোট এই আটটি পরিচ্ছেদে কাপালিক, কপালকুণ্ডলা, মতিবিবির চরিত্রের মনোগত অভিব্যক্তি, তাদের মানসিক রূপান্তরের চিত্র শিরোনামে আভাসিত হয়েছে। এখানে কাপালিকের প্রতিহিংসাগ্রহণের মানসিকতার সঙ্গে, মতিবিবির চরিত্র পরিবর্তনের ইঙ্গিত, তার প্রেমবোধ ও সপত্নীর অনিষ্টসাধনের ইচ্ছা যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি কপালকুণ্ডলার সংসার-জীবনের তীব্র অনাসক্তির রূপরেখাটি, তার ঔদাসীন্য ও প্রকৃতির নিত্য আকর্ষণবোধের মাঝখানে স্বপ্নে ভৈরবী নির্দেশে তার মানসিক প্রতিক্রিয়া, ও ঐশী শক্তির লীলায় তার আত্মবিসর্জনের কৃতসংকল্পতা পরিচ্ছেদের ইঙ্গিতপূর্ণ নামকরণে চমৎকারভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে। সুতরাং ঘটনা, চরিত্র, পরিবেশ, বিশেষ মুহূর্ত সৃষ্টিতে অথবা কাহিনীর নাটকীয় দ্রুত গতিশীলতায় পরিচ্ছেদগুলির নামকরণ অত্যন্ত সার্থক হয়ে উঠেছে বলতে হবে।

উপন্যাসের খণ্ডগুলির কোন স্বতন্ত্র নামকরণ বঙ্কিমচন্দ্র করেন নি। পরিচ্ছেদের নামকরণের মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিক কাহিনী ও চরিত্রের গতি-প্রকৃতিকে বিস্তৃত সংক্ষিপ্ত ও সংহত ব্যঞ্জনায় সংগ্রথিত করেছেন। নামকরণেই বিষয়বস্তু অনেকটা আলোকিত হয়েছে। তাছাড়া, এর মধ্যে একটা নাটকীয় ব্যঞ্জনা দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে। একদিকে পরিচ্ছেদের শিরোনাম ও অন্যদিকে শীর্ষ-উদ্ধৃতি চরিত্র ও কাহিনী বৃত্তের যেন পরিপূর্ণ এক অলোকবর্তিকা। অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যে সংক্ষিপ্ত উপন্যাসের কায়াগঠন পরিচ্ছেদের নামকরণে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পরিচ্ছেদের শিরোনামে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দে বঙ্কিম একজাতীয় তির্যক-কারকের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। বিষয়বস্তুর আভাস দানে পরিচ্ছেদগুলির নামকরণের ভূমিকা অনিবার্যভাবে অনুভূত হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য শিল্পকুশলী দৃষ্টিভঙ্গী উপন্যাসের নির্মাণ কৌশলে যে যথার্থভাবে প্রযুক্ত হয়েছে, পরিচ্ছেদের শিরোনাম তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

উপন্যাসে প্রকৃতির ভূমিকা

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রকে কবি-প্রেরণায় উজ্জীবিত হতে দেখি। তাঁর কবিত্বময় কল্পনার অন্যতম উপাদানই হ'ল প্রকৃতি। কাব্য-সাহিত্যে প্রকৃতির গুরুত্ব স্বীকৃত এবং মানবজীবনের সঙ্গে তার গভীর সংযোগ কবি-চৈতন্যের নিয়ামক শক্তি। জীবদ্দশায় বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলার মতো কোন দ্বিতীয় উপন্যাসও লেখেন নি। একক সৃষ্টির এই নজিরবিহীন রচনায় প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা কবিত্বে, উপন্যাসের কলা-কৌশলে বা চরিত্র-চিত্রণে বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। কপালকুণ্ডলা চরিত্র তো আগাগোড়াই প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত—প্রকৃতির স্বভাব-বৈচিত্র্যে এ চরিত্র যেন দীক্ষিত। সুতরাং এই উপন্যাসে প্রকৃতির ভূমিকা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

ইউরোপীয় কাব্য-সাহিত্যের প্রকৃতি প্রীতির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতি-প্রেমের পার্থক্য আছে। সমালোচক মোহিতলাল ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'নব-প্রকৃতিবাদ' (Nature-cult, Return to Nature), ও 'শেক্সপীরিয়ন ট্রাজেডির প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব ও দুর্জ্ঞেয় নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য শাসনের সুনিশ্চিত প্রভাব লক্ষ্য করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প-মানসে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতিবাদের স্বরূপ আলোচনায় বলা হয়—"The central doctrine of Wordsworth's philosophy accepted a belief in an intelligent life in nature. Our emotions are affected by naure. Nature was intelligent, meaningful and profound. He called the source of these emotions stirred up by nature, ... Contemplation of Nature stimulates one's moral impulses and makes one realise the existence of a 'Universal Benevolence', ruling the world. If such ideas are mystical, then wordsworth was a mystic. (Wordsworth's Poetry—Coles)" বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক কবিদের প্রকৃতি-চিন্তার সার-নির্যাস গ্রহণ করেছিলেন হয়ত—(ক) প্রকৃতির রূপময়তার সৌন্দর্য এবং (খ) প্রকৃতির অন্তরালে দুর্জ্ঞেয় শক্তির পরিচয়ের মধ্যে সে প্রভাবের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়, এটাই তার প্রমাণ। কিন্তু বঙ্কিম মানসে প্রাচ্যভাবের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। ভারতীয় ঐতিহ্যসূত্রে কালিদাসের কাব্য-নাটকে মানবজীবন ও প্রকৃতির অভিন্ন ও অবিভাজ্য রূপ বঙ্কিম গ্রহণ করেছিলেন। কপালকুণ্ডলার জীবন ও প্রকৃতি একই ভাবনার অদ্বৈত রূপ। আবার, প্রাচীন তান্ত্রিকতার সূত্রে কাপালিক চরিত্র-নির্মাণে ঔপন্যাসিক ভারতীয় সাধন-প্রক্রিয়ার প্রভাবে প্রভাবিত। যাইহোক, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য প্রকৃতি-প্রেমের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 'কপালকুণ্ডলার অঙ্গসজ্জা এবং ভাব-ভাষার রূপনির্মিতি সম্ভব হয়েছে, এমন অনুমানই সঙ্গত।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের ভাববস্তুটিও প্রকৃতিকেন্দ্রিক। এখানকার কাহিনীবৃত্ত প্রকৃতির স্বভাবকে যেন অনুবর্তন করেছে। অপার সৌন্দর্যময়তা ছাড়াও প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় রহস্য, কাহিনী ও চরিত্রের গতি এনেছে। সমস্ত উপন্যাসে বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য আপন রূপে, স্বভাবে অভিব্যক্ত। উপন্যাসের দ্রুত গতিপ্রবাহে কাহিনী ও চরিত্রের ক্রম-পরিবর্তনের চিত্র-অঙ্কনের অবকাশে রোমান্টিক দৃষ্টি-নন্দন কবিত্বের প্রকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছে প্রায় সর্বত্র। "বস্তুতঃ কপালকুণ্ডলাকে উপন্যাস এমন কি, রোমান্সও না বলিয়া, কাব্য বলাই যুক্তিযুক্ত" (অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত)—এমন, অভিধা অনিবার্যভাবে ধ্বনিত হতে শুনি। এক অর্থে, 'রাত্রির কাব্য' কপালকুণ্ডলায় প্রকৃতির অনন্ত রহস্য ও সৌন্দর্যের

অনুপম চিত্ররাজি বৃত্ত-পরম্পরায় উপস্থাপিত। বৃত্তের প্রথম ভাগে—(ক) "চতুর্দ্দিক অতি গাঢ় কুজ্ঝটিকায় ব্যাপ্ত হইয়াছে; আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, উপকূল কোন দিকে কিছুই দেখা যাইতেছে না। (সাগরসঙ্গমে)। (খ) অন্ধকারে সর্বত্র জনহীন;— আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র, সর্বত্র নীরব, কেবল অবিরল কল্লোলিত সমুদ্রগর্জ্জন আর কদাচিৎ বন্য পশুর রব। (বিজনে)— ইত্যাদি দৃশ্যচিত্রে প্রকৃতির অনন্ত রূপ, তার রহস্যময়তার সঙ্গে নবকুমারের নির্জন বনমধ্যে মনস্তত্ত্বসম্মত 'অসহায়' রূপটি স্পষ্ট হয়েছে। তথাপি মনে হয়, বৃত্তের প্রথম ভাগে প্রকৃতি কেবল প্রেক্ষাপট হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে, তার গভীরতর ব্যঞ্জনা বৃত্তের পরবর্তী পর্যায়ে পাওয়া যাবে।

বৃত্তের দ্বিতীয় পর্বে, যখন 'রজনী গভীরা,' তখন গভীর অরণ্যের 'স্তূপশিখরে' কাপালিক-দর্শন "শিখরাসীন মনুষ্যমূর্ত্তি আকাশপটস্থ চিত্রের ন্যায় দেখা যাইতেছে।" প্রকৃতির রহস্যময় রূপের আভাস কাপালিকে বর্তমান—সে রূপ অবশ্যই "ভীষণ দর্শন মূর্ত্তি"। তান্ত্রিক সাধকের রুদ্র মূর্ত্তিটি মনে হয় প্রকৃতিরই এক অজানা রূপ। আবার, 'সমুদ্রতটে' কপালকুণ্ডলার সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে— প্রকৃতির অনন্ত রূপ-সৌন্দর্যের জগৎ ও রহস্যময়তার ইঙ্গিত— "সিকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন। ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র! উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা; ..... কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। নীলজলমণ্ডলমধ্যে সহস্র স্থানেও সফেন তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। ..... এই সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল।" স্নিগ্ধ-মাধুর্যে পরিপূর্ণ এই পরিবেশে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে সাক্ষাৎকার— "অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! ..... অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না— তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল।" মধুময় প্রকৃতি-প্রাঙ্গণ ও অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে অপূর্ব রমণী মূর্ত্তির রহস্যে-ঘেরা রূপের আকর্ষণ—নবকুমারের রূপমুগ্ধতার জগৎ। ভীষণ ও রুদ্র ভাবের প্রতীক কাপালিক ও সন্ধ্যালোকের অপূর্ব রমণী মূর্ত্তি— এই দ্বিবিধ প্রভাব ও আসক্তির টানাপোড়নে কাহিনীবৃত্তের রস-পরিণাম নির্দিষ্ট হয়েছে এবং কাপালিক ও কপালকুণ্ডলা—প্রকৃতির অনন্ত রহস্যময় রূপের স্বরূপ আবিষ্কারে ঔপন্যাসিকের শিল্পরচনার লক্ষ্য হয়েছে।

বৃত্তের তৃতীয় পর্বে নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার বিবাহ এবং সংসার জীবনে প্রবেশ। "অমাবস্যার ঘোরান্ধকার যামিনী"তে উভয়ের অধিকারীর নিকট গমন ও নতুন জীবনের অস্পষ্টতা প্রকৃতি-চিত্রণে আকারে-ইঙ্গিতে যেন প্রকাশ করেছেন লেখক— "অন্ধকারে কিছুই লক্ষ্য হয় না; কেবল কখন কোথাও নক্ষত্রালোকে কোন বালুকাস্তূপের শুভ্র শিখর অস্পষ্ট দেখা যায়— কোথাও খদ্যোতমালাসংবৃত বৃক্ষের অবয়ব জ্ঞানগোচর হয়।" (আশ্রয়ে)। কাহিনীবৃত্তের এই অংশে, নবকুমার-কপালকুণ্ডলার জীবন যখন একটা নিশ্চিত আপাত শান্তির অভিমুখী, তখন "শীতকালের অনিবিড় মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন", সন্ধ্যা অতীত—পৃথিবী অন্ধকারময়ী—এই বিশেষ মুহূর্তে মতিবিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ—মূল ঘটনাবৃত্তে শাখাকাহিনীর প্রবেশ। পার্শ্ব-চরিত্রটির রূপদর্শনেও প্রকৃতিময়তা ও স্বভাব-বর্ণনায় প্রকৃতির উপমা— "বসন্তপ্রসূত নবচূতদলরাজির শোভা এই শ্যামার বর্ণের অনুরূপ বলা যাইতে পারে। ..... সে নয়ন মন্মথের স্বপ্নশয্যা। কখনও বা লালসাবিস্ফারিত, মদন রসে টলটলায় মান। আবার কখনও লোলাপাঙ্গে ক্রূর কটাক্ষ—যেন মেঘমধ্যে বিদ্যুদ্দাম।" তবু, মতিবিবি চরিত্রকে উপন্যাসের বাস্তবতার প্রাঙ্গণে দাঁড় করিয়ে ইতিহাস ও জীবনের পরে সঙ্গতি-বিধান করেছেন লেখক। তাই এ বৃত্তান্ত স্বতন্ত্র।

চতুর্থ পর্বে বৃত্তটির পূর্ণতা। কপালকুণ্ডলা সংসারীরূপে মৃন্ময়ী—কিন্তু সংসার-জীবনের অনাসক্তি ও ঔদাসীন্য, প্রকৃতির অনন্ত রহস্যময়তার হাতছানি তার অন্তরে অরণ্যময় জীবনে প্রবেশের আহ্বান জানায়— "সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। নিকটে, একদিকে নিবিড় বন; তন্মধ্যে অসংখ্য পক্ষী কলরব করিতেছে। অন্যদিকে ক্ষুদ্র খাল, রূপার সূতার ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। ..... অনেক দূরে নৌকাভরণা ভাগীরথীর বিশাল বক্ষে সন্ধ্যা তিমির ক্ষণে ক্ষণে গাঢ়তর হইতেছে।" দ্বিতীয় খণ্ডের ৬-ষ্ঠ পরিচ্ছেদের এই ইঙ্গিত আরও নিবিড় অনুভবে ব্যক্ত হতে দেখি—" বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।" মৃন্ময়ীর সংসার-জীবনের একটা সুনির্দ্দিষ্ট আভাস এখানে আছে— উত্তরকালের ঘটনাবৃত্ত যেন এই ভাবনারই অনুবর্তন করেছে। উপন্যাস-অংশের প্রয়োজনে মতিবিবি আবির্ভাবে মোগল রাজ-অন্তঃপুরের চালচিত্র অঙ্কিত হলেও নবকুমার-মৃন্ময়ীর জীবন-বিচ্ছেদে তার কিছু ভূমিকা অবশ্যই ছিল। তবে, সে-প্রসঙ্গ শাখাকাহিনীরই প্রসঙ্গ।

"স্পর্শমণির স্পর্শে যোগিনী গৃহিণী" হলেও চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে (শয়নাগারে) কপালকুণ্ডলার জীবনাকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা। রাত্রিকালে শ্যামার জন্য বন্য-ঔষধি সংগ্রহের লক্ষ্যে অরণ্যে পদচারণা— "শব্দমাত্রা-বিহীন" মধুরা যামিনী, প্রাকৃতিক পরিবেশে পূর্বস্মৃতি জাগরণ ও মতিবিবি সাক্ষাৎ এই অধ্যায়ের মূলকথা। ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর গৃহে প্রত্যাগমন-চিত্রে "ঘনঘন গম্ভীর মেঘশব্দ এবং অশনিসম্পাতশব্দ" তার জীবন-পরিণামের ইঙ্গিত। কপালকুণ্ডলার স্বপ্ন ও কাপালিকের স্বপ্নদর্শন, ভবানীর আদেশ, এবং মতিবিবির উদ্দেশে— "আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব," "আকাশ মণ্ডলে নবনীবদমূর্ত্তি" ইত্যাদি প্রসঙ্গে পূর্ববর্তীইঙ্গিতময়তারই যেন রস-পরিণাম। বৃত্তের শেষাংশে, "প্রেতভূমে" প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রূপ—"পূজাস্থানে দীপ নাই— কাষ্ঠখণ্ড মাত্রে অগ্নি জ্বলিতেছিল, তদালোকে অতি অস্পষ্টদৃষ্ট শ্মশানভূমি আরও ভীষণ দেখাইতেছিল। ..... চৈত্র মাসের বায়ু অপ্রতিহত বেগে গঙ্গাহৃদয়ে প্রধাবিত হইতেছিল। তাহার কারণে তরঙ্গাভিঘাতজনিত কলকলরব গগন ব্যাপ্ত করিতেছিল।" এই দৃশ্যচিত্রের অনুষঙ্গে "ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে" আসা এবং "চৈত্রবায়ুতাড়িত এক বিশাল তরঙ্গে" কপালকুণ্ডলা গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়া এবং নবকুমারেরও তার অনুবর্তী হওয়ার মধ্যে গভীর তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যাবে। কাহিনীবৃত্তের সূচনা হয়েছিল দিক্‌ভ্রান্ত নৌকা যাত্রীদের দ্বারা পরিত্যক্ত নবকুমারের অরণ্যময় জীবনে প্রবেশের মধ্যদিয়ে কাহিনীর আগ্রগতিও অরণ্যক প্রভাবে। কাপালিক ও মৃন্ময়ী প্রকৃতির রুদ্র ও রহস্যময়তার রূপ-ব্যঞ্জনা দিয়েছে, এবং পরিণামও সেই একই প্রকৃতিময়তায়। উপন্যাসের উৎসে প্রকৃতি, ক্রম-বিবর্তনেও প্রকৃতি এবং লয় প্রকৃতিময়তায়। এ যেন সৃষ্টি-স্থিতি ও বিনাশের এক অপূর্ব শিল্পকর্ম— বৃত্তের পরিপূর্ণতাও এখানে।

সুতরাং 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে কাহিনীবৃত্তে প্রকৃতি, ঘটনাস্রোতে প্রকৃতির প্রাধান্য—সূচনায় "ঘোরতর কুজ্ঝটিকায়" দিক্‌ভ্রান্ত নৌকা ও পরিত্যক্ত নবকুমার এবং পরিণামে গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে কপাল-নবকুমারের অন্তর্ধান—। আখ্যায়িকার তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তগুলো রাত্রিকালীন প্রাকৃতিক রহস্যে যেন আবৃত। উপযুক্ত পরিস্থিতি পরিবেশ রচনা করে নিসর্গ সৌন্দর্য লোক আবিষ্কার—রোমান্টিক মনোবৃত্তির এসব উদাহরণ একাধিকবার পাওয়া যায়। বহির্মুখী প্রকৃতিলোকের দৃশ্য-চিত্র ছাড়াও, অর্থাৎ কবিত্বময় সৌন্দর্যপ্রীতির প্রসঙ্গ বাদ দিলে, উপন্যাসের চরিত্র-নির্মিতিতে প্রকৃতির অন্তর্মুখীন স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের যেন পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রকৃতির সর্বময় কর্তৃত্ব কপালকুণ্ডলা চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। "কপালকুণ্ডলা আর কিছু নয়, একান্তভাবে প্রকৃতিপালিত এক মানব কন্যা। সমুদ্র, আকাশ ও নির্জন বনভূমির যে উদার, উদাস প্রকৃতি, সে যেন তাহারই একটি সাকার বিগ্রহ"—সমালোচক মোহিতলালে এই বিশ্লেষণ তথ্য ও যুক্তিনির্ভর। তবে, কাপালিক ও প্রকৃতি প্রভাব— এই দুইয়ের দ্বারাই কপালের জীবন নিয়ন্ত্রিত। আরণ্যকের রহস্য, ঔদাসীন্য, স্নিগ্ধতা ও মাধুর্য যেমন তার চরিত্র-গঠনের উপাদান, তেমনই "কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণ সম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান ; তান্ত্রিক যেরূপ কালিকা প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় পরপ্রাণ সংহারে সঙ্কোচশূন্য, কপালকুণ্ডলা সেই আকাঙ্ক্ষায় আত্মবিসর্জ্জনে তদ্রূপ।" মনে হয়, প্রকৃতিশক্তির দ্বিমুখী ভাব হ'ল কাপালিক ও কপালকুণ্ডলা। কাপালিক রুদ্র-ভাবের প্রতীক, কপাল স্নিগ্ধতা ও ঔদাসীন্যের। আবার, এই দুই ভাবের রুদ্র ও ঔদাসীন্য-স্নিগ্ধতার সমন্বয় হয়েছে মৃন্ময়ী চরিত্রে। ভবানীর মধ্যেও প্রকৃতির করাল ভীষণ রূপ-মূর্তির পরিচয় আছে। প্রকৃতি ও ভবানী অভিন্ন ও একাত্ম— তাকে স্বতন্ত্রভাবেও দেখা যায় না। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের অভিমত— "ভৈরী এবং কপালকুণ্ডলা বিশ্বের রহস্যময় বীজভূতা মূল প্রকৃতিরই দুইটি বিভিন্ন প্রকাশমাত্র— ভৈরবীর মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি প্রকৃতির দৈবীরূপ আর কপালকুণ্ডলায় মানবীরূপ।" (বঙ্কিম-মনীষা)। সিদ্ধান্তকে আরও একটু বিস্তৃত করে বলা যায়, কাপালিকের তান্ত্রিক সাধনার রুদ্র রূপ এবং ভবানীর ভয়ঙ্করী রুদ্র-ভীষণা মূর্তি প্রকৃতিব একই ভাবের দ্যোতক—এ রূপের সঙ্গে প্রকৃতির রহস্যময় অন্তর্লীন রূপটি, তার স্নিগ্ধতা-কারুণ্য ও ঔদাসীন্যের ভাব মিশ্রিত হয়ে কপালকুণ্ডলার চরিত্র গঠিত হয়েছে, এমন সিদ্ধান্তই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। মৃন্ময়ীর অন্তঃপ্রকৃতিতে এই ভাবগুলির সমন্বয় হয়েছে।

কপালকুণ্ডলা চরিত্রে প্রকৃতিময়তার বৈশিষ্ট্য তুলনামূলকভাবে দেখানো যায়— প্রকৃতির রূপদর্শন ও মৃন্ময়ীর সৌন্দর্য বর্ণনা, আলোআঁধারি রূপ ও চরিত্রের রহস্যময়তা ; প্রকৃতিলোকের নিঃসীম প্রবহমানতা ও কপালের দ্বিধাহীন জীবন-পরিণাম। উপন্যাসের বিভিন্ন বৃত্তে প্রথম দু'টি রূপেব বৈচিত্র্যময় প্রকাশ আছে। আর তৃতীয় রূপটি ভাব-ব্যঞ্জনায় আভাসিত। 'দেহ বিসর্জন' দেওয়ার কৃতসঙ্কল্পতায় মৃন্ময়ী আবেগহীন, নিষ্কম্প—নবকুমারের আকর্ষণও সেখানে উপেক্ষিত—পূর্বের স্নেহ-মমতার মাধুর্যময় রূপ নয়, চিত্তের অনিবার্য গতিবেগে, তান্ত্রিক-সাধনার কঠোরতার মত, পরিণামমুখী। সুতরাং কপালকুণ্ডলা চরিত্রে প্রকৃতি-শক্তিরই প্রাধান্য।

নবকুমারের নাগরিক চরিত্র-সত্তা আরণ্যক পরিবেশে, রূপমুগ্ধতা প্রকৃতিলোকের অনুবর্তীয় রহস্যময়-রূপ অন্বেষণে আখ্যায়িকায় পদযাত্রা। মৃন্ময়ী দর্শন, বিবাহ ও বিবাহোত্তর জীবনে তার রহস্যসন্ধানে নবকুমারকে ব্যাপৃত দেখি। সুতরাং প্রকৃতির অবগুণ্ঠিত রূপ-রহস্যের মত মৃন্ময়ীর অন্তর-রহস্য আবিষ্কারে তার জীবন-পরিণাম নির্দিষ্ট হয়েছে এই অর্থে নবকুমার প্রকৃতি-বৃত্তেরই এক অনিবার্য চরিত্র। কাপালিক চরিত্র প্রকৃতির ভীষণ রুদ্ররূপের প্রতীক চরিত্র— মৃন্ময়ীর পরে এই চরিত্র-ভাবের গভীর প্রভাব দেখা যায়। প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ চরিত্রের ভাবরূপ নির্মিত হয়েছে। মৃন্ময়ীর মৃত্যু-ঘটনায় তার প্রভাব অশেষ। এমনকি মতিবিবির আবির্ভাব-লগ্নটিও প্রকৃতির রূপ সাদৃশ্যে উপস্থাপিত। উপন্যাসের অন্যান্য অপ্রধান চরিত্রগুলোও নিসর্গলোকের তীব্র আকর্ষণে ঘটনার অভিমুখী হয়েছে।

উপন্যাসের কবিত্বে বা কাব্যব্যঞ্জনায়, নাটকীয়তায়, আকস্মিকতা, ও অলৌকিকতায় প্রকৃতির ভাব-প্রাধান্য। আরণ্যক পরিবেশে নিসর্গের দুর্নিবার প্রভাবে সংশয়, সন্দেহ, ভয়-ভীতি, শঙ্কাহীন

দুঃসাহস ও শাস্তি—আশ্চর্য বৈপরীত্যে উপস্থাপিত। উপন্যাসের কাহিনী, চরিত্র, পরিবেশ, ভাব নিয়ন্ত্রণে প্রকৃতি কেবল নিয়ামক শক্তিই নয়—এ উপন্যাসে 'প্রকৃতি' আক্ষরিক অর্থে চরিত্র হয়েই উঠেছে। প্রকৃতি-চেতনা থেকে অলৌকিকতাকে ও এখানে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না— কারণ, ভবানী তো প্রকৃতিরই এক বিশিষ্ট রূপ। বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্র প্রকৃতির মধ্যে "সর্বময়ী, সর্বকর্ত্রী, সর্বনাশিনী, এবং সর্বশক্তিময়ী" রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে এই ভাবটিই গভীর ও উজ্জ্বল হয়েছে চরিত্র ও কাহিনী অংশে। সুতরাং উপন্যাসের ঘটনাক্রম প্রকৃতি-আশ্রিত এবং তারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সন্দেহ নেই।

ঔপন্যাসিকের গভীর প্রকৃতি-প্রেমের সঙ্গে যুক্ত আছে রোমান্টিক কবি-কল্পনা। এ-ভাবের অনিবার্য রস পরিণাম সৌন্দর্য-প্রীতি। প্রাকৃতিক দৃশ্য-সংস্থাপনে কেবল সৌন্দর্য নয়, চরিত্রের সঙ্গে অভিন্নতায় এবং একক চরিত্র-সৃষ্টি ও পরিণাম বৃত্তের মধ্যে চরিত্রের-ব্যঞ্জনাতেও সৌন্দর্যের অবস্থিতি। যাইহোক, উপন্যাসের ঘটনা, চরিত্র, পরিবেশ ও ভাব-ভাবনায় প্রকৃতির অনিবার্য প্রভাব লক্ষ্য করে সমালোচক মোহিতলাল প্রকৃতির রোমান্টিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ রূপ ও ভারতীয় প্রকৃতিতত্ত্বের অধ্যাত্ম-রস 'কপালকুণ্ডলার' প্রকৃতির দ্বিবিধ প্রেরণার কথা তুলেছিলেন। মৃন্ময়ী চরিত্রে প্রকৃতি কেবল নিয়ামক শক্তি নয়, তা একই সঙ্গে নিয়তি-শক্তি। বঙ্কিমচন্দ্র অপূর্ব শিল্প-কৌশলে উপন্যাসের মধ্যে প্রকৃতিশক্তির লীলা দেখিয়ে মানব-জীবনে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রসঙ্গ দেখিয়েছেন। কবিত্বে, সৌন্দর্য-দর্শনে, ভাব-ভাষায়, কাহিনী—পরিবেশ ও চরিত্রে 'প্রকৃতির'ই যেন একমাত্র অস্তিত্ব। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসকে প্রকৃতি-কেন্দ্রিক শিল্প-রচনা বলে গ্রহণ করতে হয়। প্রকৃতি-আশ্রিত এমন অসাধারণ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে অল্পই আছে। উপন্যাস পাঠের পর প্রকৃতির কবিত্বময় সুদূরপ্রসারী এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভব পাঠকের চিত্তলোককে যেন অবশ করে রাখে। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের এ এক অনবদ্য সৃষ্টি।

কপালকুণ্ডলা : রাত্রির কাব্য

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের রোমান্টিক পরিবেশ রচনায় রাত্রির অনিবার্য ভূমিকা আছে। যে কবিত্বের ভাবনায় এই আখ্যায়িকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তার অঙ্গ-বিন্যাস ও সামাধান বৈজ্ঞানিকের যুক্তিসিদ্ধ আলোয় প্রকাশ পেতে পারে না। জীবন-জিজ্ঞাসার অন্তহীন দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তাকে ব্যক্ত করতে গেলে যে শিল্প-কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়, বঙ্কিম তা গ্রহণ করেছিলেন। সেটি অবশ্যই রাত্রির ব্যঞ্জনা। কাহিনীবৃত্ত ও চরিত্রগুলি রাত্রির ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত। অস্পষ্ট কুহেলিকায় আচ্ছন্ন মানব-মানবীর সুখদুঃখের সীমাহীন রূপ-রহস্যকে নিশীথ রাত্রে সংস্থাপিত করে বঙ্কিম এক ধরনের জীবন-কাব্যের সূচনা করেছেন। রাত্রির প্রতীকী সত্তায় জীবনের সুখ-দুঃখ কবিত্বের স্পর্শে অনবদ্য হয়ে উঠেছে। চরিত্র-সৃষ্টিতে বা কাহিনী-নির্মাণে কেবল নয়—উপন্যাসের কাব্যময় পরিবেশ রচনায় রাত্রির ভূমিকা ছোট করে দেখা যায় না। জীবন-নাট্যের লীলা-ভূমি নিশীথিনীর রূপ-রহস্যে অঙ্কিত বলে, প্রখর বাস্তবতাবোধ এখানে অপ্রত্যাশিত। তাই উপন্যাস হলেও 'কপালকুণ্ডলা' নিশীথিনীর কাব্য

প্রথম খণ্ড— রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকায় দিক্‌ভ্রান্ত যাত্রী-নৌকা অবশেষে সমুদ্রের পশ্চিম তটে এসে উপনীত হ'ল। সমুদ্র সৈকতের নিকটস্থ বনে কাষ্ঠসংগ্রহের জন্য নবকুমারের যাত্রা ও রাত্রি আগত আশঙ্কায় জোয়ারের জলে নবকুমার ছাড়াই যাত্রীগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে— " নবকুমার সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে বনবাসে বিসর্জ্জিত হইলেন"। আসন্ন রাত্রির ভীতিবিহ্বল পটভূমিকায় নবকুমার সমুদ্র তটে, অরণ্যের নিঃসঙ্গতায় যেন রাত্রির গর্ভেই বিসর্জ্জিত হলেন। সহযাত্রীদের প্রত্যাবর্তন যখন অসম্ভব মনে হ'ল, তখন প্রকৃতিলোকে গাঢ় অন্ধকার—স্তব্ধ প্রকৃতির সৌন্দর্যময় রূপ-দর্শন— "অন্ধকারে সর্বত্র জনহীন, আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র, সর্বত্র নীরব, কেবল অবিরল কল্লোলিত সমুদ্রগর্জ্জন আর কদাচিৎ বন্য পশুর রব।" নবকুমার কাপালিককে দেখলেন গভীর রজনীতে—তান্ত্রিক সাধনার উপযুক্ত নৈশঅন্ধকারে এবং মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার পর্ণকুটীরে উপনীত হলেন। এরপর সমুদ্রতটে উপবিষ্ট নবকুমার সাগরগর্জ্জনের সঙ্গে প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্যের আবেশে আবিষ্ট হলেন অস্তগামী সূর্যের 'মৃদুল কিরণে'। গাত্রোত্থানকালে সেই 'প্রদোষ তিমিরে অপূর্ব মূর্তি-দর্শন— "সেই গম্ভীরানাদী, বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি। ..... অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ..... সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।" সন্ধ্যালোকের এই মোহিনীশক্তির রহস্যময়ীরূপ প্রকৃতির মতোই আকর্ষণ করে অথচ রহস্য-উন্মোচন করে কাছে আসতে দেয় না—এমনই তার অন্তহীন রহস্য। অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে—'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছে ?'— কণ্ঠধ্বনি আকৃষ্ট করে হৃদয়তন্ত্রীমধ্য সৌন্দর্যের লয়ের সঙ্গে রূপমুগ্ধতার আবেশ রচনা করে। অন্ধকারে পথ দেখিয়ে এই নারী নবকুমারকে পর্ণকুটীরের সমীপবর্তী করে—অন্ধকারেই নবকুমার-কপালের পথ চলা শুরু হয়। অপূর্ব পরিবেশের অনবদ্য ব্যঞ্জনা।

সায়াহ্নকালে কাপালিকের সঙ্গে বধ্যভূমিতে গমন এবং অন্ধকারের অন্তরাল থেকে বন্যদেবীমূর্তির সতর্ক বাণী—"ফিরিয়া যাও, —পলায়ন কর।" করুণারূপিণী রহস্যময়ী নারী এমন করেই অসহায়

নবকুমারকে রক্ষার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়েছিল। অন্যদিকে, নরবলি দেবার উপযুক্ত ভয়াল রাত্রির নিস্তব্ধতায় তান্ত্রিকের পূজার আয়োজন ও শুষ্ক লতার দ্বারা নবকুমারের বন্ধন, চ মৎকার দৃশ্য-চিত্র। কাপালিকের খড়্গ অনুসন্ধান ও কপালের খড়্গ দোলার চিত্রটিও নাটকীয় ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ। খড়্গের দ্বারা বন্ধনমোচন ও পথের সন্ধানে কপালের অনুসরণ করে অধিকারীর গৃহে উপনীত হওয়া—অন্ধকার নিবিড় বনপথ অতিক্রম করে যাওয়ার কাহিনী। অনুসন্ধানকারী কাপালিক অন্ধকারেই বালিয়াড়ির স্তূপ থেকে পড়ে গিয়ে হাত ভাঙ্গে—গভীর রজনীর তমসাচ্ছন্ন পরিবেশে ঘটনাগুলি নাটকের মতোই দ্রুত ঘটতে থাকে। তারপর, অন্ধকারেই নবকুমার-কপালের বিবাহ—এমনকি নবকুমারের কপালকে বিবাহ করার সিদ্ধান্তও রাত্রিকালীন ঘটনা। যাইহোক, যে গভীর অন্ধকারে উভয়ের মিলন হয়েছিল বিবাহের মধ্যে দিয়ে সেই রহস্যময় জীবনে প্রবেশ ঘটল অনিবার্য ঘটনার দ্রুততায়। সংসার জীবনের অস্পষ্টতা ঘনান্ধকারের গভীরতায় স্পষ্ট হয়েছিল। শুরু হ'ল সংসার জীবনের পথে পদচারণা।

দ্বিতীয় খণ্ড—রাজপথে শীতাকালের অনিবিড় মেঘে আকাশ যখন আচ্ছন্ন, সেই সন্ধ্যাকালের অন্ধকারে নবকুমারের পূর্ব-পত্নী মতিবিবির সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ। পান্থনিবাসে প্রদীপের আলোয় মতিবিবির নবকুমার-দর্শন এবং 'প্রদীপ নিবিয়া গেল' ব্যঞ্জনার মধ্যে মতিবিবির পূর্ব-স্বামীর পরিচয় লাভ ঘটেছিল। অন্ধকারের প্রেক্ষাপটে অতীত জীবনকথার ইতিবৃত্ত স্মরণ। কৌতূহলী মতিবিবি সন্দরী-সন্দর্শনে "ভাল করিয়া দেখিবার জন্য প্রদীপটি তুলিয়া কপালকুণ্ডলার মুখের নিকট আনিলেন"— রাত্রির অন্ধকারে সামান্য আলোর সাহায্যে অনুপম সুন্দরীর রূপ-দর্শন।

সপ্তগ্রামের সংসারজীবনে, কপালকুণ্ডলা-শ্যামাসুন্দরীর কথোপকথন সন্ধ্যাকালীন ঘটনা। কপালের সংসার অনাসক্ত ও অরণ্যপ্রীতির ভাব এখানেই ব্যক্ত হয়েছে। নবকুমারের গৃহ পার্শ্বে নিবিড় বন—তার হাতছানি মৃন্ময়ীকে উন্মনা করে তোলে— "সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।" অন্ধকারের মায়াবী রাজ্য কপালকুণ্ডলার মনের পরে গভীর প্রভাব বিস্তার করে অতীতের স্বাধীন বনচারী স্বভাবকে জাগিয়ে দেয়—সাংসারিক জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রবলতার হয়। অন্ধকারের নিবিড় অরণ্য-সমুদ্রের মতো এ নারীর হৃদয়রহস্যও বিচিত্র। বৈচিত্র্যময় জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করতে রাত্রির প্রতীকী ব্যঞ্জনা গ্রহণ করতে হয়েছে বঙ্কিমকে।

তৃতীয় খণ্ড—মতিবিবি বা লুৎফ-উন্নিসা বর্ধমান অভিমুখে গমন কালে চটিতে সন্ধ্যার সময় পেষমনের সঙ্গে কথোপকথনে আগ্রার সম্পদসুখ বিসর্জন দিয়ে নতুন জীবনে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হল। কারণ, "পাষাণমধ্যে কীট প্রবেশ" করেছিল। তারপর, 'আত্মমন্দিরে' মতি ভোগৈশ্বর্যময় জীবন পরিত্যাগ করে সপ্তগ্রামের ঔপনগরিক অংশে এসে বসবাস করতে লাগল। উদ্দেশ্য নবকুমারকে লাভ করে। যে সন্ধ্যালোকের অস্পষ্ট অন্ধকারে দস্যুপীড়িতা মতিবিবি নবকুমারের সাক্ষাৎ লাভ করল, সেই অন্ধকারেই তার জীবন অপূর্ণতায় ভরে যাবে, এমন ইঙ্গিত রাত্রির ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত। তাছাড়া, সদ্য বিবাহিত যুবক নবকুমারের জীবনাকাশে এই সাক্ষাৎ লাভে যেন দুর্যোগের ঘনঘটা। মধ্যবিত্ত জীবনধারার মাঝখানে সপ্তগ্রামের ঐশ্বর্যহীন পরিবেশে মতিবিবির ভোগময় কামনা-বাসনা থেকে সরে এসে এই আত্মকৃচ্ছতা দুর্লভ বলেই রাত্রির ব্যঞ্জনা এত সুদূরপ্রসারী। নবকুমার-দর্শন লাভের ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হ'ল প্রবল অনুরাগ—তারপর প্রত্যাখ্যান। প্রত্যাখ্যাতা দিনের আলোয় নবকুমারকে লাভ করতে চেয়েছিল—কিন্তু বিফলমনোরথ হয়ে অন্ধকারে ঘরের মধ্যে ষড়যন্ত্রের দ্বারা নবকুমারকে পাওয়ার জন্য ব্যগ্র হল। দিনের আলোয় প্রত্যাখ্যান আর রাত্রির অন্ধকারে

ষড়যন্ত্রের অঙ্গীকার। এই বৈপরীত্যও ভাব-ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ। কপালকুণ্ডলার সঙ্গে স্বামীর চিরবিচ্ছেদ ঘটাবার অভিপ্রায়ে নিকটস্থ বনের প্রান্তে উপনীত মতিবিবি ব্রাহ্মণবেশীর ছদ্মবেশে আলো দেখে কাপালিকের সম্মুখবর্তী হল। কাপালিকের উদ্দেশ্যের সঙ্গে মতিবিবির লক্ষ্যের মিলন ঘটল অন্ধকার পরিবেশে।

চতুর্থ খণ্ড—শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে কথোপকথনে মৃন্ময়ীর "রাত্রে বেড়ান আমার ছেলেবেলা হইতে অভ্যাস"— বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত। শ্যামার জন্য স্বামী-বশীকরণ ঔষধি সংগ্রহার্থে, প্রহরাতীত রাত্রিকালে, কপালকুণ্ডলর বনমধ্যে প্রবেশ। নবকুমারকে প্রতিনিবৃত্ত করে, তার এই ঘনান্ধকার রাত্রিতে পথ-পরিক্রমার সূত্রে পূর্বস্মৃতি-জাগরণ। মধুরা যামিনী, শব্দমাত্রহীনা— নিস্তব্ধ প্রকৃতিলোকের অনুপম সৌন্দর্য-শোভা। ভগ্নপ্রায় কুটীরের সম্মুখে দুই মনুষ্যকণ্ঠ—ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে মৃন্ময়ীর কথোপকথন— অজ্ঞাত আশঙ্কায় গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে প্রকৃতিলোকে দুযোর্গের ঘনঘটা— গম্ভীর মেঘশব্দ ও অশনিসম্পাত এবং প্রাঙ্গণ ভূমিতে বিদ্যুতের আলোয় কাপালিক-দর্শন। অন্ধকার রাত্রি, অরণ্য পথে দ্রুত পদচারণায় গৃহ-প্রত্যাগমনরতা নারী ও পশ্চাতে ভীষণদর্শন কাপালিক—আসন্ন বিপদ-সঙ্কেত-কে প্রতিধ্বনিত করে। অন্ধকার-পরিবেশে অরণ্যানী তাঁর পূর্বস্মৃতি জাগিয়েছিলেন, আর এই নিশীথিনী তার জীবনে কাপালিককে এনে উপনীত করল। রাত্রে শয়নকক্ষে একাকিনী কপাল কাপালিকের পৈশাচিক কার্যের কথা, ভৈরবীর কথা, নবকুমারের বন্ধনদশার কথা ভাবল। তারপর, অপ্রগাঢ় নিদ্রায় কপালকুণ্ডলার স্বপ্নদর্শন— নিবিড় ঘন কালো মেঘে আকাশ পরিপূর্ণ সমুদ্রবক্ষে ঝঞ্ঝারিক্ষুব্ধ তরঙ্গ ও জটাজুটধারী প্রকাণ্ডকায় পুরুষের দ্বারা কপালের নৌকা সমুদ্রে নিক্ষেপের চেষ্টা এবং ব্রাহ্মণবেশীর জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে কপালের— 'নিমগ্ন কর' অত্যন্ত ইঙ্গিতধর্মী ঘটনাবৃত্ত।

নৈশভ্রমণবিলাসিনী কপাল পুনরায় ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে দেখা করার জন্য বনের দিকে যাত্রা। যাত্রাকালে শয়নকক্ষের প্রদীপটি উজ্জ্বল করে যাওয়া ; কিন্তু গৃহের বাইরে পদার্পণ করা মাত্র— 'প্রদীপ নিবিয়া গেল'—রাত্রির আর এক জটিলতর ব্যঞ্জনা। কোন্‌স্থানে ছদ্মবেশীর সাক্ষাৎ হবে লিপিতে তা জানানো ছিল—কিন্তু সেই লিপি করবীবন্ধনচ্যুত হয়ে গৃহের মধ্যে পড়ে ছিল। পত্রপাঠে নবকুমারের বিষণ্ণতা, হতাশা ক্রমান্বয়ে সংশয়-সন্দেহে রূপান্তরিত হল—কপালের অনুসরণে প্রস্তুত নবকুমার, রাত্রিকালীন তান্ত্রিক আচারে অভ্যস্ত কাপালিকের দ্বারা নতুন এক সংকল্পের দিকে অগ্রসর হ'ল। নবকুমারকে কাপালিক স্বপ্নদর্শনের বিবরণ দিয়েছে, ভবানীর আদেশ যে কপালকে বধ করা, তাও জানিয়েছে এবং বাহুবলের অভাব হেতু নবকুমারের সাহায্যে মৃন্ময়ীকে বধ করতে চেয়েছে।

কাননের অভ্যন্তরে, ঘনান্ধকার রাত্রিতে, মতি-কপাল কথোপকথনে উপন্যাসের অনিবার্য পরিণাম ঘনিয়ে ওঠে। সপত্নী মতিবিবির কাছে কপালকুণ্ডলা শোনে কাপালিকের অভীষ্ট লক্ষ্যের কথা— "তোমার অমঙ্গলসাধনই হোমের প্রয়োজন। .... তোমার মৃত্যুই তাঁহার অভীষ্ট।" আর, মতিবিবি মৃন্ময়ীকে স্বামী ত্যাগের কথা বলায়, সেই বনমধ্যে, নির্জন পরিবেশের ঘনান্ধকারে কপালের সিদ্ধান্ত— "তোমার মানস সিদ্ধ হউক—কালি হইতে বিঘ্নকারিণীর, কোন সংবাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।" আর এই রাত্রির অন্ধকারের অস্পষ্টতায় ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে কপালের সাক্ষাৎ দৃশ্যকে দূর থেকে দেখে নবকুমার-কাপালিকের সন্দেহ-সংশয় দৃঢ় হয়।

কপালকুণ্ডলার গৃহে প্রত্যাবর্তন—আকাশে "নবনীরদনিন্দিত মূর্ত্তি" ভৈরবীর নির্দেশ-রণরঙ্গিণীর

খল খল হাসি—অদৃষ্টবিমূঢ়ার ন্যায় কাপালিক-নবকুমারের অনুসরণ সমস্তই রাত্রিকালীন ঘটনা। শেষদৃশ্য "প্রেতভূমে" অস্তমিত চন্দ্রমা ও বিশ্বপ্রকৃতিতে অন্ধকার। অস্পষ্টদৃষ্ট শ্মশানভূমিতে কাপালিকের পূজার আয়োজন কপাল বধের প্রস্তুতি পর্ব। দীপহীন পূজাস্থল, সামান্য কাঠের আগুনে সামান্য আলো— অন্ধকার প্রেতভূমের ভীতিবিহ্বল দৃশ্য। কপালকুণ্ডলার ভবানী-চরণে দেহবিসর্জনের কৃতসঙ্কল্পতা। নবকুমার সংশয়মুক্ত মন নিয়ে মৃন্ময়ীকে গৃহে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে কপালের উদ্ধত উক্তি এবং অন্ধকারে তটমৃত্তিকাখণ্ড থেকে নদীপ্রবাহমধ্যে পড়ে যাওয়া ও নবকুমারের অনুসরণ---- গঙ্গানদীবক্ষে কপাল-নবকুমারের অন্তর্ধান—এক একটি ঘটনা-সংস্থাপনে অন্ধকারের অসীম ব্যঞ্জনা।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কবিত্ব, নাটকীয়তা, তির্যকতা, শিল্প প্রকরণের বিষয়মূহ এবং পরিবেশ-সংস্থানের ভয়াল রূপ রচনায়, সাংকেতিকতা ও আকস্মিকতায় রাত্রির ঘনান্ধকারকে কাজে লাগিয়েছেন শিল্পী বঙ্কিম। আখ্যায়িকার রূপ নির্মাণে—তার সূচনা, বিবর্তন ও পরিণতিতে রাত্রির অশেষ ভূমিকা। কপালকুণ্ডলা চরিত্র তো আগাগোড়াই ঘনান্ধকারেব রহস্যময়তায় চিত্রিত ; নবকুমার অস্পষ্ট, আলো-আঁধারি ব্যঞ্জনায় আভাসিত, কপালের রূপ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ—কুহেলিকাময় জীবনের রূপমুগ্ধতায় আবিষ্ট। প্রথম দর্শন থেকে শেষাবধি অন্ধকারে আবরণে মৃন্ময়ীকে আবিষ্কার করতেও সে অক্ষম। এমনকি তার সংসার-জীবনও রাত্রির পটভূমিকায় দিনের আলো দেখেনি। কাপালিকের তন্ত্রসাধনা গোপনীয়, অমাবস্যার গভীর অন্ধকারেই তার রহস্যময়ী ভবানীর তপস্যা ও নরবলির আয়োজন। মতিবিবির আলোকিত ঐশ্বর্যময় জীবন নবকুমারের আকর্ষণে সপ্তগ্রামের নির্জন বনান্ধকারে যেন পথ খুঁজে ফেরে। শ্যামাসুন্দরীও কৌলিন্যে বলিপ্রদত্ত হয়ে স্বামী-বশীকরণ ঔষধির জন্য আগ্রহান্বিতা—তার জীবনেও দুঃখের নিঃসীম ঘনান্ধকার। সুতরাং উপন্যাসের চরিত্র নির্মাণে, কাহিনী গঠনে, ভাব-ব্যঞ্জনায়, ট্রাজিক পরিণামে সর্বত্রই রাত্রির অসামান্য ভূমিকা। 'কপালকুণ্ডলায়' যে দুর্জ্ঞেয় জীবন-রহস্য, প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় রূপ, অনুপম সৌন্দর্যচেতনার প্রকাশ ঘটেছে, তারও নেপথ্যে নিশীথিনীর প্রভাব। ঔপন্যাসিকের কবি-কল্পনায়, "রাত্রির" প্রয়োগ-নৈপুণ্যে এই উপন্যাস অনবদ্য। তাই স্বচ্ছন্দে, 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসকে রাত্রির কাব্য বলা যায়।

উপন্যাসে তন্ত্রাচার প্রসঙ্গ

বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষীয় বহুপ্রাচীন তান্ত্রিক মতাদর্শের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে তন্ত্রাচার-প্রসঙ্গে তা প্রমাণিত হয়। বাংলাদেশ যে তন্ত্র-মন্ত্রের দেশ, তার পরিচয় 'চর্যাপদ' সাহিত্যেও আছে। লোকশ্চক্ষুর অন্তরালে লোকালয়ের বাইরে এঁদের সাধন-প্রক্রিয়া চলত। তান্ত্রিক বিধি ও আচরণের মধ্যে যে উপাসনা পদ্ধতি ছিল, আপাতদৃষ্টিতে তার নির্মমতা ও ভয়াবহতা লক্ষ্য করেই হয়ত তান্ত্রিক সাধনা গুহ্য-সাধনা বলে গণ্য হয়েছিল। এই মতবাদের গভীরতা বা দুরূহ উপাসনা পদ্ধতি অধিকাংশ সময় স্থূল সাধকদের আয়ত্তাতীত ছিল বলে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাহ্য-আচার সর্বস্বতায় অনেক কাপালিকের সাধনা ব্যর্থ হয়ে পড়েছিল। যে কোন ধর্মীয় সাধনার মতো তান্ত্রিক-সাধনাও বহুক্ষেত্রে কেবলমাত্র বহিরঙ্গ আচার আচরণে, বাহ্যিক পূজা বিধিতে সঠিক অনুশাসনের অন্তরঙ্গ সাধনায় পরিণত হয়নি। যাইহোক, বঙ্কিম বাঙলা দেশের এই গুহ্য সাধনার প্রতীক চরিত্র হিসেবে (নেঁগুয়া বা কাঁথিতে) কাপালিকদের দেখেছিলেন, এবং তাদের বীভৎস ক্রিয়াকলাপের কথা জানতেন। মনে হয়, অভিজ্ঞতায় দেখা কাপালিকদের প্রতি তিনি তেমন প্রসন্ন ছিলেন না—তাদের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে নীতিহীনতা ও বীভৎসতার যোগসূত্র তিনি মেনে নিতে পারেন নি। অবশ্য, তার অর্থ এই নয় যে, তিনি তান্ত্রিক মতবাদের শুদ্ধতত্ত্বকে, অনুশাসনের অঙ্গীভূত দিব্যভাব বা সাত্ত্বিককতাকে অস্বীকার করেছেন। আসলে তন্ত্রাচারের শুদ্ধ-অশুদ্ধ দু'টো দিকই তিনি জানতেন এবং এই উপন্যাসে কপালিনীর মধ্যে কতকটা শুদ্ধ ভাব এবং কাপালিকের মধ্যে অশুদ্ধ ভাব দেখেছিলেন। মনে রাখা প্রয়োজন, তন্ত্র-মন্ত্রের বিশিষ্ট মতবাদ একান্ত ধর্মীয় কিন্তু বঙ্কিম উপন্যাস শিল্প রচনা করছেন। তাই তন্ত্র মন্ত্রের সীমিত ক্ষেত্রকে বঙ্কিমের বিশ্লেষণী শক্তিতে উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। উপন্যাসের আখ্যায়িকা ও চরিত্র-চিত্রণে এই তন্ত্রাচার যে গভীর প্রভাব ফেলেছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। মূলতঃ তাঁর কবি-স্বভাব-প্রেরণার নেপথ্যে বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত তান্ত্রিক মতবাদের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

তান্ত্রিক মতবাদের উৎস পর্যালোচনায় বঙ্কিম সাংখ্য দর্শনের পুরুষ প্রকৃতিতত্ত্বের দ্বৈতবাদের প্রসঙ্গ টেনেছেন। তাঁর মতে— "সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ লইয়া তন্ত্রের সৃষ্টি। সেই তান্ত্রিক কাণ্ডে দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে।" এ ছাড়া, পুরুষ-প্রকৃতির অখণ্ড সত্তাকে তিনি স্বীকার করেছেন। এবিষয়ে অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য তাঁর 'বঙ্কিম-মনীষা' গ্রন্থে লিখেছেন— "বঙ্কিমচন্দ্রকে সচেতনভাবে না বলিলেও, অচেতনভাবে বা অবচেতনভাবে তন্ত্রের শিবশক্তি তত্ত্ব বা প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বেরই সমর্থক বলিলে ভুল হইবে না। কেননা, প্রকৃতি-পুরুষের ভেদ স্বীকার করিয়াও তন্ত্র সাংখ্যের মতো পুরুষকে অসঙ্গ বলিয়া মনে করেন না, প্রকৃতি ও পুরুষ সর্বত্র পরস্পর সংযুক্ত এবং তাহাদের যে পরস্পর ভেদ, তাহাও আপাত ভেদ মাত্র, কেননা শেষ পর্যন্ত উভয়েরই সত্তা একই 'অখণ্ড' পরম সত্যের রূপভেদ মাত্র"। বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষের তন্ত্র-মন্ত্র যে সাংখ্য-দর্শন-তত্ত্বের অনিবার্য পরিণাম বঙ্কিম তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং 'প্রকৃতি' প্রধান তান্ত্রিক ধর্মকে ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে— "জড়জগৎ এবং জড়জগন্ময়ী শক্তিকে ইঁহারা 'প্রকৃতি' নাম দিয়াছেন। এই প্রকৃতিই সর্বসৃষ্টিকারিণী, সর্বসঞ্চারিণী, সর্বসঞ্চালিনী এবং সর্বসংহারিণী। এই প্রকৃতি পুরুষতত্ত্ব হইতে প্রকৃতি-প্রধান তান্ত্রিক ধর্মের উৎপত্তি। এই তান্ত্রিক ধর্মে, প্রকৃতিপুরুষের একত্ব অথবা অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সম্পাদিত হওয়াতে প্রকৃতিপ্রধান বলিয়া এই ধর্ম লোকরঞ্জন হইয়াছিল।" সুতরাং নিঃসন্দেহে

বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র তন্ত্র-মন্ত্রের উৎস-সূত্র সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন ধর্ম সম্পর্কে ঔৎসুক্য দেখিয়েছেন। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে শক্তি-তত্ত্ব একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

শাক্ত সাধকদের দৃষ্টিতে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঈশ্বরেরই লীলা—সর্বত্রই ইচ্ছাময়ী মায়ের ক্রিয়াশীলতা তাঁরা দেখেন। ব্রহ্ম অব্যক্ত, নিরাকার, নির্গুণ, চিন্ময় হলেও ব্রহ্মের অন্তর্গত চৈতন্যময়ী মহাশক্তিকে সাকার, ব্যক্ত ও মৃন্ময়ী মূর্তিতে উপাসনা করার তান্ত্রিক রীতি সাংখ্য-দর্শন প্রসূত দিব্য-চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হবার উপায় মাত্র। পরিণামে ঈশ্বরের সাযুজ্য বা শরণ নেবার ঐকান্তিকতায় সাধকরা অদ্বৈত তত্ত্বে বিশ্বাসী। তন্ত্রমতে জগজ্জননী অরূপা ব্রহ্মরূপিণী—সমস্ত বর্ণ তাঁতেই শেষ হয় বলে তিনি তিমিরবরণী, অসুরকে নাশ করেন বলে নৃমুণ্ডমালিনী। রূপময় জগতে সাকার মূর্তিতে সাধকরা তাঁর অসংখ্য গুণযুক্ত রূপ কল্পনা করেন—এক একটা রূপ এক একটি ভাবের প্রতীক। অধিকার-ভেদে অথবা ব্যক্তি-স্বভাবের অনুবর্তী ভাবযুক্ত রূপের উপাসনায় অধিকার অর্জন করেন সাধকেরা। জগৎ ও সমগ্র প্রাণীকে কলন করেন বলে জগদীশ্বরী মহাকালী। তন্ত্রমতে মানসপূজা শ্রেষ্ঠ পূজা হলেও সাধকরা ধ্যানলোকে ঈশ্বরের সাকার মূর্তির ভীষণ রুদ্র রূপের সঙ্গে কল্যাণময়ী বরাভয় মূর্তিকেও প্রত্যক্ষ করেন। তবে, বাংলাদেশে ব্রহ্মরূপিণী পরাশক্তিকে কালিকা মূর্তিতে উপাসনা করার রীতিটি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে। দেবী কালিকার মধ্যে ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের সমন্বয় হয়েছে। এই আদিভূতা, সনাতনী পরাশক্তিকে উপাসনাই তান্ত্রিক মতবাদের অন্যতম ভিত্তি। ইচ্ছাময়ী জগজ্জননীর ইচ্ছাতেই সমস্ত জগৎ চালিত হয়, এই বিশ্বাসে তান্ত্রিক সাধনার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ "জ্ঞানান্মুক্তিঃ"। ব্রহ্মসাধনার কথা বিস্তৃতভাবে মহানির্বাণতন্ত্রে বলা আছে—কর্মবন্ধন সূত্রে মানব-জীবনে যে দুর্গতি ও অশেষ দুঃখ দেখা যায়, অদ্বৈত উপলব্ধি বা সিদ্ধিতে তার মুক্তি ঘটে। তান্ত্রিক ঈশ্বর উপাসনার এটিই মর্মকথা। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনায় বলা হয়েছে যে তিনি নিত্য ও জ্ঞানস্বরূপ, নির্বিশেষ হয়েও যোগীদের ধ্যানগম্য চৈতন্যস্বরূপ ও বিশ্বের মূলীভূত বীজ। জীব ও আত্মার ঐক্য থেকে জন্ম নেয় যোগক্রিয়া, আর ঈশ্বর বা পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার একাত্মতা উপলব্ধির নাম পূজা। শক্তি সাধকদের এই পূজাতেই অদ্বৈত সিদ্ধি।

অষ্ট পাশে (ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, জুগুপ্সা, কুল, শীল ও জাতি) বদ্ধ জীব শোক দুঃখে, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনায় ষড়রিপু ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধীন। তমোগুণ বা তমসাচ্ছন্ন জীবনের সীমাহীন বেদনায় কাতর—তন্ত্রমতে এখানেই পশুভাব। বদ্ধ জীব দুঃখ-মুক্তির সাধনায় মুমুক্ষু জীবে পরিণত হয়—তখন রাজসিক ভাবে রজোগুণের সাধনা ঈশ্বর অভিমুখী এক কঠোর সাধনা। পঞ্চ-ম-কারের (মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন) বাহ্যিক আকর্ষণকে যিনি জয় করতে পারেন, তিনি দিব্যভাবে সত্ত্ব-গুণের সাধনার অধিকারী হন। এই অবস্থায় সাধকের সাধনায় সিদ্ধি লাভ ঘটে—তিনি মুক্ত জীবে পরিণত হন—দিব্যভাবে সদানন্দময় হন এবং অভেদ বুদ্ধি চেতনায় অভিষিক্ত হন। তাঁর দৃষ্টিতে ঈশ্বর ও জগৎ একাকার হয়ে যায়। সাধক নিবৃত্তির অধীন হন, কামনা বাসনাময় জগৎ তাঁকে আকর্ষণ করে না—শুদ্ধ চৈতন্যের অধিকারী হয়ে তাঁর জীবদেহে অহং বোধ থাকে না এবং তিনি মুক্তিলাভ করেন। এই মুক্তি অবশ্যই 'জ্ঞানান্মুক্তিঃ'। তাঁদের লক্ষ্য নির্বাণ লাভ নয়, স্বর্গলাভও নয়—একমাত্র আত্মজ্ঞানী হওয়া। কিন্তু এই দুরূহ সাধন প্রক্রিয়ায় অধিকার অর্জন করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বাহ্যিক আচারসর্বস্ব তান্ত্রিক ক্রিয়ায় বহু কাপালিকের সাধনা ব্যর্থ হয়েছে। প্রবৃত্তিমার্গের সাধনায়, বিশেষত পঞ্চ-ম-কারের, সাধকরা ভোগের মধ্য দিয়ে জ্ঞানের

জগতে বা নিবৃত্তির অভিমুখে চালিত না হয়ে বাহ্যিক প্রবৃত্তিময়তায় মগ্ন থাকেন বলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটে না। ভোগাসক্ত জীবনই যে দুঃখের কারণ, এই চেতনায় পঞ্চ 'ম'-কারের স্থূল আসক্তি থেকে উত্তীর্ণ হওয়াই তান্ত্রিক সাধনার মূল কথা হলেও, অসফল সাধকরা পঞ্চ 'ম' কার তত্ত্বের সূক্ষ্মরূপ অনুধাবনে অসমর্থ হন। শাক্ত সাধকরা দেহকে ভিত্তি করে সাধনার সূত্রপাত করেন। দেহস্থ কুল কুণ্ডলিনী আদ্যাশক্তিকে ষট্‌চক্র প্রক্রিয়ায় (মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র) সহস্রার বা শিবপুরে পরমাত্মা শিবের সঙ্গে মিলিত করার সাধনাই তান্ত্রিক সাধনা। ভক্ত সাধকদের পূজা তাই মানসপূজা বা অন্তর্যাগ—বাহ্যিক আচার কেবল মনঃসংযোগের উপযোগী পর্যায়মাত্র। দেহশুদ্ধির বিভিন্ন উপায়ের কথাও শাক্ত তন্ত্রে পাওয়া যায় তার লক্ষ্য মন্ত্রাদির দ্বারা শুদ্ধ দেহে দেবতাভাব লাভ করা। ষট্‌চক্র প্রক্রিয়ার সাধকরাও অনেকসময় সামান্য কিছু অধিকার অর্জন করে তার পরিচয় দিতে গিয়ে সাধনায় আর অগ্রসর হতে পারেন না। এ বিষয়ে ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী বলেছেন—"বহু তান্ত্রিক সাধক পথভ্রষ্ট হইয়া অর্জ্জিত শক্তির অপব্যবহার করিয়াছেন, অনেকে ষট্‌কর্ম্ম সাধনকেই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই ষট্‌কর্ম্ম বলিতে বোঝায় মারণ, স্তম্ভন, মোহন, উচাটন, বশীকরণ ও আকর্ষণ।" মোট কথা, যে ভক্তি জ্ঞান ও যোগের সমন্বয় সফল তান্ত্রিক সাধকদের জীবনে দেখা যায়, তা বহু কাপালিকের করায়ত্ত ছিল না।

শক্তি সাধকরা ঈশ্বর উপাসনার স্থান হিসেবে শ্মশানকে বেছে নেন—হৃদয়কে কামনা-বাসনাহীন করার প্রতীকী ব্যঞ্জনা হয়ত এখানে আছে। এছাড়া "ইহার পূজা পদ্ধতি, ক্রিয়াকলাপ, আচার-আচরণগুলিও পৃথক। আচারের দিক হইতে ইহাকে বলা হয় বামাচার অর্থাৎ সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধ আচার। ইহার সাধন স্থান নির্জন শ্মশান, ইহার আসন শবাসন, ইহার বলি রুধির বলি (ছাগরুধির বা নররক্ত), ইহার উপচার পঞ্চ 'ম'-কার (মদ্য, মংস, মৎস, মুদ্রা, মৈথুন)। বামাচারী সাধককে বলা হয় কাপালিক। তাঁহাদের আকৃতি, প্রকৃতি ও পরিধেয় অদ্ভুত ও ভয়াবহ। তাঁহারা অমিত শক্তিধর, নির্মম ও স্বল্পবাক্। তাঁহারা রক্তাম্বর বা শার্দূল চর্ম পরিধান করেন, গলায় রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ করেন, রুদ্রাক্ষ মালায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরাস্থি গ্রথিত থাকে। পূজাকালে নরকপালপাত্রে (মানুষের মাথার খুলি দিয় নির্মিত পানপাত্র) তাঁহারা মদ্য পান করেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁহারা আভিচারিক ক্রিয়া (মারণ উচাটন বশীকরণাদি) করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কাম্য করালা ভৈরবীর প্রসাদ।" (অধ্যাপক জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী)। ভক্তি দিয়ে তান্ত্রিক সাধকরা মাতৃ আরাধনা করেন। কারণ, "শক্তি সাধনার দ্বারাই মানুষ দিব্য জন্ম লাভ করেন, তাই সাধক শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। সাধক জানেন, মহাকাল ত্রিপুরারিও অন্তে শক্তিতেই লয় প্রাপ্ত হইবেন। শক্তি সাধনায় কালাকাল নাই, আর এই সাধনার দ্বারাই সাধকের সকল ভেদ বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়, তাঁহার নিকট শুচি অশুচিরও কোন পার্থক্য থাকে না।" (অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী)। সুতরাং আচার সর্বস্বতার ঊর্ধ্বে আরোহণ করা এই সাধনার লক্ষ্য—তবে, প্রাথমিক ভূমিতে এই সাধনা কতকগুলি আচার-প্রক্রিয়াকে গ্রহণ করে মাত্র। বিশ্বরূপিণীর করুণাভিক্ষা ও শরণাগতির জন্যই তান্ত্রিক সাধকদের ধ্যান ও জ্ঞান।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে শক্তিবাদের তন্ত্র-মন্ত্র অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছে। অন্তঃপ্রকৃতির দিক থেকে আখ্যায়িকা তান্ত্রিক মতবাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। কাপালিক ও অধিকারীর কথা বাদ দিলেও উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র কপালকুণ্ডলা আগাগোড়া পরাশক্তি কালিকা বা ভবানীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিতা। আখ্যায়িকার রস-পরিণামের মধ্যেও অনন্ত অব্যক্তরূপিণী কালিকার

প্রভাব—জীবনের রূপ দর্শনে বঙ্কিম এই আদ্যাশক্তির ঐশী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন—তাঁর জগৎ-জীবন ব্যাপ্ত লীলা দেখেছেন। নিঃসন্দেহে বলা যায়, উপন্যাসের অন্তঃপ্রেরণায় ঈশ্বরী লীলা অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়েছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা বাদ দিলেও তন্ত্র-মন্ত্রের সাধনা ও ঈশ্বর, উপন্যাসের মৌল প্রেরণা হওয়ায় 'কপালকুণ্ডলা' বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট উপন্যাস বলে গণ্য হয়েছে।

অধিকারী দেবালয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালিকার সেবক।

তাঁর অন্তরে শক্তিরূপিনী দেবীর প্রতি আস্থার ভাব আছে। মন্দিরের মধ্যে যে মানবী আকার-যুক্তা করাল কালীমূর্তি ছিল, অধিকারী সেই ঈশ্বরীর সাধনা করেন। দেবীর পরে অগাধ ভক্তি থেকে তিনি মনে করেন, এই ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই জগতের ভালোমন্দ সংঘটিত হয়। অচ্ছিন্ন বিল্বপত্র নিয়ে মন্ত্রপূত করে দেবতার পাদোপরে সংস্থাপিত করা এবং বিল্বপত্র গ্রহণে বিল্বপত্র না পড়া এবং প্রত্যাখ্যানে বিল্বপত্র পড়ে যাওয়া—উভয়কে শুভ ও অশুভের নির্দেশ বলে গ্রহণ করেন। কপাল-নবকুমারের বিবাহ বিষয়ে অনুমোদন লাভের জন্য অধিকারীর এই ঈশ্বরের আদেশ গ্রহণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। উপন্যাসে চিত্রিত অধিকারী গৃহী সাধক—বাংলাদেশের তন্ত্র সাধনায় সংসারী লোকেদেরও অধিকার জন্মেছিল। অধিকারী সেই জাতীয় ঈশ্বর-সাধক। সাধনায় যে তিনিই যথেষ্ট অধিকার অর্জন করেছিলেন, বঙ্কিম সামান্য চিত্র দৃশ্যে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তন্ত্রমতে আভিচারিক ক্রিয়ায় অভ্যস্ত কাপালিককে অধিকারী সঠিকভাবেই চেনেন—তন্ত্রের এই বাহ্যিক ক্রিয়া সম্পর্কে তিনি অভিজ্ঞ। মনে হয়, পরাশক্তি কালিকার নাম কীর্তন ও অন্তর্যাগ পূজাতেই তিনি সিদ্ধ—তাই তান্ত্রিক কাপালিকের মত নির্জন অরণ্যে বা শ্মশানে আভিচারিক ক্রিয়ার মধ্যে তাঁর দেবী আরাধনা নয়—মন্দিরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা দেবী মূর্তিকেই তিনি ধ্যান ও পূজা করেন। তথাপি কাপালিকের তন্ত্রাচার সম্পর্কে তাঁর ধারণা অস্পষ্ট নয়—তাই সেই মহাপুরুষের ভয়ঙ্কর স্বভাব থেকে কন্যাস্নেহে কপালকুণ্ডলাকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। মানুষের সংসারে থেকে ঈশ্বরের করুণাময় শুভ-বুদ্ধি কে তিনি আশ্রয় করেছেন। মানুষের কল্যাণে ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে সংযুক্ত করেছেন। নবকুমারের সঙ্গে কপালের বিবাহ প্রসঙ্গে দেবতার অনুমোদন যেমন তাঁকে আনন্দিত করে, তেমনই যাত্রাকালে কপালকুণ্ডলার অভিন্ন বিল্বপত্র পড়ে যাওয়ায় আন্তরিকভাবে দুঃখ পান। তবু, সমস্তই পরমেশ্বরীর ইচ্ছাধীন—এই জাতীয় এক বিশ্বাস নিয়ে অধিকারী যেন আত্মনির্লিপ্ত কালীসাধক। জগতের সুখ-দুঃখের একমাত্র কারণ রূপে জগজ্জননীকে দেখা, তাঁর সাধনার স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। তথাপি অধিকারী সংসারী সাধক—তাই কপালকুণ্ডলার বিদায় দৃশ্যে স্নেহ-মমতায় তাঁকে কাঁদতে দেখি। অধিকারীর মতো সামান্য চরিত্রে, তন্ত্র সাধনার এক পর্যায় যেন চিত্রিত হয়েছে। কালিকাশক্তির বরাভয়দায়িনী, মঙ্গলাময়ী মূর্তিতে তাঁর কাছে আবির্ভাব—নিষ্ঠাবান সাধকের ভাব ব্যঞ্জনায় অধিকারী যে দীক্ষিত, উপন্যাসের সামান্য দৃশ্যে তারই পরিচয় আছে। তান্ত্রিক সাধনায় পঞ্চ-ম-কার তত্ত্বের অঙ্গীভূত স্ত্রীলোকের কি সম্বন্ধ তা তিনি জানেন এবং সেইমতো কপালকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। প্রত্যহ মন্দিরে কালী সাধনায় তিনি নিযুক্ত রাখতে চান বলে, কপালের সঙ্গী হবার জন্য নবকুমারের আহ্বানকে অস্বীকার করেন। নৈষ্ঠিক কালী সাধক রূপেই অধিকারীর আবির্ভাব এবং এই চরিত্রের মাধ্যমে কালী সাধনা যেন কেবল ভয়ঙ্কর সাধনা নয়, লেখক তারও একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। গৃহী লোকের সাধনায় ঈশ্বর মঙ্গলময় ও করুণাময়; শুভ-অশুভ ঘটনা সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন—তাকে মান্য করাই তান্ত্রিক শিক্ষা। অধিকারী তারই মূর্ত প্রতীক।

কাপালিক চরিত্রের মধ্যে তান্ত্রিক-সাধন পদ্ধতির বাহ্যিক ক্রিয়ারূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। আপাতদৃষ্টিতে বামাচারী সাধক কাপালিক রজোগুণের অধিকারী। নির্জন অরণ্যে ঈশ্বর-আরাধনায় আত্মনিবিষ্ট— "তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর হইবে। পরিধানে কোন কার্পাসবস্ত্র আছে কি না, তাহা লক্ষ্য হইল না, কটিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত শার্দ্দূলচর্ম্মে আবৃত। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা; আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রু জটা পরিবেষ্টিত। সম্মুখে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিতেছিল। জটাধারী এক ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর বসিয়া আছেন। আরও সভয়ে দেখিলেন যে সম্মুখে নরকপাল রহিয়াছে, তন্মধ্যে রক্তবর্ণ দ্রব পদার্থ রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে—এমনকি যোগাসীনের কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষমালামধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড গ্রথিত রহিয়াছে।" তান্ত্রিকসাধনার উপযুক্ত পরিবেশ। আপাতদৃষ্টিতে কাপালিকের সাধনা নিবৃত্তিমুখীন—ইহজীবনের কামনা-বাসনা পরিত্যাগের চিহ্ন আছে পর্ণকুটীরে বসবাসের মধ্যে। কতটা কৃচ্ছ্রসাধনায় অধিকার-অর্জন করেও কাপালিক দেবী ভবানীর চরণে জীব-বলিদানে অভ্যস্ত বাহ্যিক আভিচারিক ক্রিয়ার অনুগামী। পূজাস্থানের পারিপাট্য তান্ত্রিক সাধনার অনুরূপ— "সৈকতের মধ্যস্থানে নীত হইয়া নবকুমার দেখিলেন, পূর্বদিনের ন্যায় তথায় বৃহৎ কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিতেছে। চতুঃপার্শ্বে তান্ত্রিক পূজার আয়োজন রহিয়াছে, তন্মধ্যে নরকপালপূর্ণ আসব রহিয়াছে— কিন্তু শব নাই। অনুমান করিলেন, তাঁহাকে শব হইতে হইবে।" ভৈরবী পূজায় নবকুমারের মাংসপিণ্ড দানের আয়োজন। বধের প্রাক্কালিক পূজাদি ক্রিয়াও তন্ত্রসম্মত। কাপালিকের ভৈরবী সাধনায় ভয়ঙ্কর ভাবকে বঙ্কিম প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু তার অন্তর্যাগ সাধনা সম্পর্কে কোন নির্দেশ না থাকায় কাপালিকের সাধনা বাহ্যিক ক্রিয়া কলাপের মধ্যে নিঃশেষিত হয়েছে—তান্ত্রিক সাধনায় অদ্বৈতসিদ্ধি লাভ তার হয়নি। তাই কাপালিকের ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়েছে হাতভাঙ্গার দৃশ্যে। দেবী ভবানী যে কাপালিকের সাধনায় সন্তুষ্ট গ্রন্থমধ্যে তার ইঙ্গিত নেই। তবে কেউ কেউ মনে করেন— " স্বয়ং ভৈরবীই নিজ তৃপ্তির ব্যবস্থা নিজে করিয়াছেন—অসম্ভাবিত উপায়ে একটা মানুষকে আনিয়া তাহার হস্তে স্থাপন করিয়াছেন। নবকুমারের বধ যে ভৈরবীর অভীপ্সিত, তদ্বিষয়ে কাপালিকের ধারণা এমনই দৃঢ় ছিল যে, সে বালিয়াড়ির শিখর হইতে স্খলিত ও ভগ্নবাহু হইয়া যখন নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়িয়াছিল, সেই সময়ে সে স্বপ্নে দেখিয়াছিল, যেন ভবানী তাহার প্রত্যক্ষীভূতা হইয়া 'ভ্রূকুটি করিয়া তাড়না করিতেছেন ও কহিতেছেন, রে দুরাচার! তোরই চিত্তাশুদ্ধি হেতু আমার পূজার বিঘ্ন জন্মাইয়াছে।' " (শ্রী অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত)।

কাপালিক ইন্দ্রিয় লালসায় চিত্ত-অশুদ্ধি হেতু কপালকুণ্ডলাকে বধ করেনি, ভৈরবীর স্বপ্ন-নির্দেশের এই মূল কথাটি কতকটা গ্রাহ্য হলেও, কপাল সম্পর্কে তার অন্তঃসলীলা স্নেহ-মমতা নৈঃশব্দের আড়ালে সুপ্ত ছিল—এই ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না। যদিও কাপালিক পূর্বাপর দেবী ভবানীর অনুরক্ত ও শাস্ত্রসম্মত তান্ত্রিক আচারে নৈষ্ঠিক সেবক, তবুও কুমারীর শোণিতে পূজা না করার কারণে "পূর্ব্বকৃত্যফল বিনষ্ট" হওয়ার প্রসঙ্গটি দেবীর সর্বময় কর্তৃত্বের এক ভিন্ন অভিব্যক্তি। আসলে, বঙ্কিমচন্দ্র তান্ত্রিক লোকাচারকে খুব একটা ভালো চোখে দেখেননি— কাপালিকের ভয়ঙ্কর সাধনপদ্ধতি অশুদ্ধিভাবের প্রতীক বলে মনে হওয়াতে দেবীর দ্বারা তাকে অভিযুক্ত করেছেন এবং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ঐশী শক্তির ইচ্ছাময়ী লীলাকে আভাসে-ইঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন।

কাপালিক রজোগুণের সাধক। তার দৈহিক বল ও প্রতিজ্ঞা তান্ত্রিক সাধকদেরই অনুরূপ। স্বপ্নে দেখা ভবানীর আদেশকে (৮ম / ৬ষ্ঠ) শিরোধার্য করে কপালকুণ্ডলা বধে কৃতসঙ্কল্প কাপালিক 'প্রায়শ্চিত্ত' করতে চায়। দেবীর নির্দেশ— "কপালকুণ্ডলাকে আমার নিকট বলি দিবে। যতদিন না পার, আমার পূজা করিও না।" — পালনের জন্য মতিবিবি ও নবকুমারের সাহায্য লাভ।

মতিবিবির দৃষ্টিতে কাপালিক মৃন্ময়ীর অমঙ্গলসাধনের জন্য হোমের আয়োজন করেছিল। মতিবিবিরকে ব্রাহ্মণবেশী পুরুষ মনে করায়, তার ও পরে নবকুমারের সাহায্য সে গ্রহণ করেছে ভগ্নবাহুজনিত অক্ষমতার কারণে। কাপালিকের ভৈরবী পূজা মূলতঃ ঈশ্বর-কৃপালাভের সাধনা—আভিচারিক ক্রিয়ায় সে সাধনা কখনও কখনও "কালিকা প্রসাদকক্ষায় পরপ্রাণ সংহারে সঙ্কোচশূন্য"। 'প্রেতভূমে' / শ্মশানভূমিতে পূজা ও হোমের আয়োজন, শবভুক্ পশুদের কর্কশ চিৎকার ধ্বনির মধ্যে নবকুমারের প্রতি কাপালিকের আদেশ— বধের পূর্বে কপালকে স্নান করিয়ে আনা—তান্ত্রিক আচার সম্মত ব্যাপার সন্দেহ নেই। শেষপর্যন্ত, দেবীর কাছে কপাল-বলি না দেবার অক্ষমতায় কাপালিকের ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়। আখ্যানের প্রথম ভাগে "ভৈরবীপ্রেরিতোহসি, মামনুসর, পরিতোষস্তে ভবিষ্যতি" বলে নবকুমারকে বধের আয়োজন করেছিল— কিন্তু কপালকুণ্ডলার জন্য সেখানে ব্যর্থতা ; আবার শেষদৃশ্য, কপাল— বধের আয়োজন সম্পূর্ণ হলেও কপালের আত্মবিসর্জনে বাহ্য-বীরাচারী ক্রিয়া সম্পূর্ণতা পায়নি। কাপালিকের অকৃত্রিম ভবানী প্রীতি, তার ভয়ঙ্কর-নির্মম সাধন-ক্রিয়া উপন্যাসের বিস্ময়কর উপাদান।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-জিজ্ঞাসার ফলশ্রুতিতে কপালকুণ্ডলা চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। বাহ্য-জীবনে প্রকৃতি ও কাপালিক প্রভাবে এই নারী চরিত্র গঠিত হলেও কপালের জীবনে ভবানী-প্রীতি এক ভিন্ন তাৎপর্যে আভাসিত হয়েছে। কাপালিকের আভিচারিক ক্রিয়ায় তার পূর্ণ আস্থা আছে এমন নয়, বিশেষতঃ "কালিকার পূজাভূমি যে নরশোণিতে প্লাবিত হয়, ইহা তাঁহার পরদুঃখিত হৃদয়ে সহিত না।" (৪র্থ / ৮ম)। 'কপালকুণ্ডলা' তথাপি কাপালিকের প্রতি-আকর্ষণ অনুভব করেছে, কারণ খ্রীষ্টান দস্যুদের দ্বারা অরণ্যে পরিত্যক্ত হলে, কাপালিকই তাকে 'যোগসিদ্ধমানসে' প্রতিপালন করে— "তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে আমার মন সরিতেছে না।"

"কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণ সম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান ; ..... কপালকুণ্ডলা যে কাপালিকের ন্যায় অনন্যচিত্ত হইয়া শক্তিপ্রসাদ প্রার্থিনী হইয়াছিলেন, তাহা নহে ; তথাপি অহর্নিশ শক্তিভক্তি শ্রবণ, দর্শন ও সাধনে তাঁহার মনে কালিকানুচরাগ বিশিষ্ট প্রকারে জন্মিয়াছিল। ভৈরবী ও সৃষ্টিশাসনকর্ত্রী মুক্তিদাত্রী, ইহা বিশেষ মতে প্রতীত হইয়াছিল। ..... আর কোন কার্য্যে ভক্তি প্রদর্শনের ত্রুটি ছিল না।" (৪র্থ / ৮ম) কপালকুণ্ডলার জীবন থেকে ভবানীপ্রভাব বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। কাপালিকের মত তার সাধনা ক্রিয়াভিত্তিক নয়, কিন্তু ভৈরবীকে বিশ্বশাসনকর্ত্রী, সুখদুঃখবিধায়িনী ও কৈবল্যদায়িনী বলে গ্রহণ করেছে কপালকুণ্ডলা আখ্যায়িকার সূচনা পর্ব থেকে। ভৈরবী প্রীতির নেপথ্যে কাপালিক ও অধিকারীর প্রভাব দেখা গেলেও কপালিনী ভক্তিপ্রাণতায় শুদ্ধ সাধিকার স্তরে উন্নীতা এক নারী চরিত্র। দিব্যভাবের সাধনায় কপালকুণ্ডলা আসক্তিহীন— সংসার ও জীবন, উভয় সম্পর্কেই আত্মনির্লিপ্ত, উদাসীন। কাপালিকের বীর-ভাবযুক্ত রজোগুণের সাধনা ঈশ্বর-লাভের সাধনা। কিন্তু কপাল যেন দিব্যভাবে আত্মস্থা এক অসাধারণ জ্যোতিময়ী নারী। তার করুণার্দ্র হৃদয়, সংস্কারমুক্ত স্বাধীনচিত্ততা, ঔদার্য, ঔদাসীন্য ও অনাসক্তি তান্ত্রিক সাধনার সর্বোত্তম অবস্থাকেই নির্দেশ করে।

কপালকুণ্ডলার জীবন-বৃত্তেও ঐশী লীলা। কেবল জগতের পরিচালিকা শক্তিরূপিণী বলে নয়, কালিকাশক্তি তার জীবন-গঠনে যেন অন্যতম উপাদান— জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত তারই নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত। নবকুমারের সঙ্গে যাত্রার প্রাক্কালে ভবানীর অভিন্ন বিল্বপত্র প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে কপালের 'অশুভসংকেত' পাওয়া এবং উত্তরকালে, সংসারজীবনে শ্যামার সঙ্গে কথোপথনে সেই আশঙ্কার ভাব ব্যক্ত করার মধ্যে ভবানীর সুদূর প্রসারী প্রভাব এই চরিত্রে অনুভূত হবে। একদিকে অরণ্যের

প্রতি তীব্র আকর্ষণ ও অন্যদিকে ভবানীর নির্দেশ এই দ্বিবিধ প্রভাবে কপালিনী সংসারজীবনে যেন উদাসীন। "এ সংসার বন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু। কপালকুণ্ডলার সে বন্ধন ছিল না— কোন বন্ধনই ছিল না"— উচ্চকোটীর তান্ত্রিক সাধকদের মত মৃন্ময়ী সংসারী হয়েও নিরাসক্ত, উদাসীন এবং ভক্তি-বিশ্বাসে ভবানী-গত-প্রাণা। স্বপ্নদর্শনে সেই পরাশক্তির নির্দেশ তাঁকে চালিত কজ্জেরজগৎ সংসার মায়াময় অসার বলে মনে হয়। কপালকুণ্ডলার জীবন-দর্শনে যেন পরমাত্মারূপিণী দেবী কালিকাই একমাত্র সত্য। তাই তাঁর দৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্ত্রীর নিত্য নবরূপ— 'স্বপ্নদর্শনে' জটাজুটধারী প্রকাণ্ডকায় পুরুষই কাপালিক, এবং ভীমকান্তশ্রীময় ব্রাহ্মণবেশ ধারী মতিবিবি— উভয়েই যেন ঈশ্বরের প্রেরিত দুই প্রতিনিধি মতিবিবির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গৃহে প্রত্যাগমনকালে দেবী ভবানীর "আকাশমণ্ডলে নবনীর দনিন্দিত মূর্ত্তি" দেখলেন। ঊর্ধ্বমুখী কপাল কালিকাকে তাঁর আগে আগে যেতে দেখেছেন— "কখনও কপালমালিনীর অবয়ব মেঘে লুক্কায়িত হয়, কখনও নয়নপথে স্পষ্ট বিকশিত হয়। কপালকুণ্ডলা তাঁহার প্রতি চাহিয়া চলিলেন"। ঈশ্বরী ভবানী কপালকুণ্ডলার চোখে কালিকারূপেই অভিব্যক্ত হয়েছেন— "গলবিলম্বিত নবকপালমালা হইতে শোণিতস্রুতি হইতেছে; কটিমণ্ডল বেড়িয়া নরকররাজি দুলিতেছে— বাম করে নরকপাল— অঙ্গে রুধিরা ধারা, ললাটে বিষমোজ্জ্বল জ্বালা বিভাসিতলোচনপ্রান্তে বালশশী সুশোভিত। যেন ভৈরবী দক্ষিণ হস্ত উত্তেলন করিয়া কপাল কুণ্ডলাকে ডাকিতেছেন।" কপালচরিত্রের গভীরে আছে জীবন সম্পর্কে তীব্র অনাসক্তি এবং অন্তরে গভীরতর কালিকানুরাগ। কপালকুণ্ডলা প্রকৃত বিচারে যোগিনী— তার নারীসুলভ রূপচর্চা ও রূপানুরাগের প্রতি আসক্তি অনুপস্থিত। কামনা-বাসনাময় জীবনের প্রতি তার অন্তরের প্রবল বিতৃষ্ণা, অনীহা এবং মুক্তিদাত্রী ভবানীর প্রতি সীমাহীন ভক্তি-বিশ্বাস, কপাল চরিত্রকে অদ্বিতীয় করেছে। গগনবিহারিণী ভয়ঙ্করীর নির্দেশে কপাল জীবন-বিসর্জনে প্রস্তুত হলেন— আকাশে তাকিয়ে দেখেন— "রণরঙ্গিনী খল খল হাসিতেছে; এক দীর্ঘ ত্রিশূল করে ধরিয়া কাপালিকগত পথপ্রতি সঙ্কেত করিতেছে।" অদৃষ্টবিমূঢ়া কপাল কাপালিকের অনুসরণ করলেন, আর নবকুমার পূর্ব্ববৎ দৃঢ় মুষ্টিতে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া চলিলেন।"

কপালকুণ্ডল চরিত্রে অরণ্যপ্রীতি ও ঈশ্বরানুরাগ তার জীবন সম্পর্কে ঔদাসীন্যের অন্যতম কারণ। অপরের দুঃখমুক্তিতে তার হৃদয় করুণার্দ্র হলেও সংসারজীবনের প্রতি তার ঘোর অনাসক্তি। অঙ্গসজ্জায় সে অনাগ্রহী— এমনকি বেণী বন্ধনেও তার বীতরাগ, শ্যামার—'দাদাকে কেন অসুখী করিবে' প্রশ্নোত্তরে কপালের উক্তি— "ইহাতে তিনি অসুখী হয়েন, আমি কি করিব?"— অনাসক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন। অথচ কপাল অপরের কল্যাণে আত্মকৃচ্ছ্রতায় বনৌষধি সংগ্রহের জন্য গভীর অরণ্যে রাত্রিতে ভ্রমণ করে। বনচারিণী হতে পারলেই তার সুখ— অন্তরের দিক থেকে সাধিকার মত সে স্বাধীন। ঈশ্বর অনুগ্রহ তার জীবনে প্রার্থিত কাম্যবস্তু হওয়াতে ঈশ্বরের নির্দেশেই তার জীবনাবসান। এজন্য অধ্যাপক জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী কাপালের জীবনে তন্ত্র প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন— "কপালিনী দিব্যভাবের উদাসিনী। সংসার নয়, তাঁহার শরণ্য পরমা-প্রকৃতি, জগন্মাতা ভবানী। সেই ভবানীই তাঁহাকে পথ দেখাইয়াছেন। সমাজের বুক হইতে নিজ কোলে টানিয়া লইয়াছেন। তন্ত্রসাধনার এই সুদিব্য ভাবই 'কপালকুণ্ডলা' তত্ত্বকে স্বতন্ত্র মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে।" তান্ত্রিক মতবাদের সর্বোত্তম পথ ধরে এই উপন্যাসের রস-পরিণাম নির্দিষ্ট হয়েছে।

শিল্প-সৃষ্টির মাধ্যম : ভাষা

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার মূল্যায়ন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— "শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত অনুরাগ সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সংকুচিতা বঙ্গভাষারচরণে সমর্পণ করিলেন। ..... তিনি আপনার শিক্ষাগর্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একোবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন / যতকিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্য প্রেম মহত্ত্ব ভক্তি স্বদেশানুরাগ, শিক্ষিত পরিণতবুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনরত্ন সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্য-গর্বে সেই অনাদর মলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।" (বঙ্কিমচন্দ্র)। গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধে শিল্পসৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, তাতে তাঁর প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের স্পষ্ট ছাপ আছে। ভাষা-ভঙ্গিমার মধ্যে যে ভাব-বা কল্পনা যুক্ত থাকে, তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে লেখকের নিজস্ব স্টাইল বা ভাষা-শৈলী। শব্দ-নির্বাচনে বা ধ্বনি-সুষমায়, অর্থপূর্ণ ভাব-ব্যঞ্জনায় বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত শব্দ / ভাষা বাচ্যার্থের প্রয়োজনীয় সীমায় কেবল আবদ্ধ থাকেনি, বাচ্যাতীত ব্যঞ্জনাও দিয়েছে। ভাষা ব্যবহারে পরিমিতিবোধ, শৃঙ্খলা, ঋজু ও বলিষ্ঠ ভাব-প্রকাশক্ষম রূপ-নির্মিতি, নাট্যগুণসম্পন্ন তীক্ষ্ণ ও তির্যকতা এবং কাব্যগুণবিশিষ্ট শব্দ-ধ্বনির লালিত্যময় ভাবদ্যুতি— বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত ভাষার অন্যতম লক্ষণ-বৈশিষ্ট্য। ভাষার অন্তর্নিহিত ধ্বনি সৌন্দর্য, তার অন্তরালশায়ী প্রাণছন্দটি বঙ্কিমচন্দ্র আপন প্রতিভার বলেই আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে তাঁর ভাষা-শৈলীতে। বাংলা ভাষাসাহিত্যে তাঁর অবদানের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন— "বঙ্কিম বঙ্গভাষার ক্ষমতা এবং বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দিয়েছেন, তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্যস্রোতস্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন।" (পূর্বোক্ত প্রবন্ধ)।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ব্যবহারের বিশিষ্টতায় ভাষা-শৈলীর চরমোৎকর্ষ দেখা গিয়েছে। বাংলাভাষার অন্তঃপ্রকৃতি আবিষ্কারে তাঁর প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব নিবেদিত ছিল। তাই তাঁর পক্ষে ভাষারএক নতুন রূপ-সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল। সমালোচক সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "সাহিত্যশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র" গ্রন্থে লিখেছেন— "শব্দচয়নের কৌশল, বৈচিত্র্যময় বাক্যের সমাবেশ, ছন্দোময়, ধ্বনিতরঙ্গময়, বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক সহিত্যিক গদ্যের জনক বঙ্কিমচন্দ্র; রসোত্তীর্ণ সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনে, দেশ, কাল ও পাত্রের উপযোগী করে বাংলা ভাষাকে তিনি নানা মনোরম ভঙ্গিতে সাজিয়েছেন। উদ্দেশ্য সাহিত্যের মাধ্যমে 'সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজন' এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রবন্ধ-উপন্যাসের বিষয়বস্তুকে প্রায়ই এমন নাটকীয় রীতিতে বিন্যস্ত করেছেন, গদ্যকে প্রশ্নসূচক, আশ্চর্যসূচক, অনুক্তক্রিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন রূপের বাক্যে এবং বাক্যকে নানা ঢঙে ও আকারে সাজিয়ে মাধুর্যময় করেছেন, তদ্ভব, দেশজ, বিদেশী শব্দের ব্যবহার ও তৎসম শব্দ এবং অলঙ্কারের পরিমিত, আধুনিক প্রয়োগ করে ভাষাকে সজীব, সুন্দর, গতিশীল করে তুলেছেন।"

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষারীতির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল— (১) তৎসম, তদ্ভব, দেশী ভাষা কখনও শব্দগত একক বৈশিষ্ট্যে, কখনও-বা সংমিশ্রণে গঠিত ভাষা;

(২) বাস্তব পরিবেশ, রহস্যময় ঘটনাবৃত্ত ফুটিয়ে তোলার উপযুক্ত ভাষা; (৩) বাস্তব অথবা রোমান্স-রসনির্ভর চরিত্রের উপযোগী ভাষা; (৪) ভাষার নাট্যধর্ম ও কাব্যধর্মযুক্ত আলঙ্কারিক ভাষা; (৫) বাক্যগঠনে পরিমিতিবোধ,— প্রবচনধর্মী ভাষা সৃজন, শিল্পসৃষ্টির প্রয়োজনানুসারে গম্ভীর, হাল্‌কা, রহস্যময়, কাব্যিক, নাটকীয় বা ঐশ্বর্যময় ভাষা; (৬) ভাষা বা শব্দের ধ্বনি সুষমা ও সৌন্দর্যবোধ এবং লেখকর ব্যক্তিত্বময় শৈল্পিক ভাষা।

উপন্যাসে তৎসম, তদ্ভব ও দেশী শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন বঙ্কিম অসামান্য দক্ষতায়। বর্ণনায় ভাষার সাধুরূপ বা তৎসম শব্দ-বাহুল্য যেমন দেখা যাবে, তেমনি সংলাপে তদ্ভব ও দেশী শব্দপ্রয়োগ বৈশিষ্ট্য বাস্তব প্রয়োজনেই গৃহীত হয়েছে। অথচ, সাধু-চলিতের মিশ্রণ শব্দের ধ্বনি-তরঙ্গে ব্যাঘাত ঘটায়নি। তৎসম শব্দের প্রভূত সাহায্য নিয়েছেন বঙ্কিম। কয়েকটি দৃষ্টান্ত—কুজ্‌ঝটিকা, সমভিব্যাহারিগণ, হিমবর্ষী আকাশতলে, কল্লোলিত সমুদ্রগর্জ্জন, তৎপ্রভায় শিখরাসীন, নীলস্থূমণ্ডল, উৎকটানন্দে, আগুল্‌ফলম্বিত নিবিড় কেশরাশি-ধারিণী, প্রাক্কালিক ক্রিয়া, সমাপনান্তে, ভূপতিত, মেঘগর্জ্জনবৎ, খদ্যোতমালাসংবৃত বৃক্ষের অবয়ব জ্ঞানগোচর, মানবাকার পরিমিতা, ঈষন্মাত্র, কালীপ্রণামার্থ, নবনীরদনিন্দিত মূর্ত্তি, অদৃষ্টবিমূঢ়া, প্রত্যক্ষীভূত, পূর্ব্বকৃত্যফল, অনবকাশ প্রযুক্ত, নৈশভ্রমণবিলাসিনী, স্বর্ণমেঘসকল, নিবিড়নীল কাদম্বিনী, গৃহসন্নিধানে, নীলাম্বরসঞ্চারী ক্ষুদ্র শ্বেতাম্বুদখণ্ডগুলি, মলয়ানিল, প্রণয় সম্ভাষণ, কর্ণগোচর, বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালা ইত্যাদি অজস্র তৎসম শব্দ বঙ্কিম ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসের কাহিনী বৃত্ত সংক্ষিপ্ত, চরিত্রগুলি আভাসে ইঙ্গিতে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ততায় এক-একটা পূর্ণমূর্তি লাভ করেছে, পরিবেশ-পরিস্থিতি, নিসর্গ প্রকৃতি বা মানবমনের ভাব-প্রকাশে তৎসম শব্দগুলি অত্যন্ত ব্যঞ্জনাধর্মী হয়েছে। এছাড়া, তদ্ভব শব্দ— কেনারায় (ফা, তদ্ভব), কিয়াপাতা, আট, হাত, কাহার, পাথার (পাথর), পরশ (স্পর্শ), পান, বউ, কাঁদ, সাধ, তৃষা (তৃষ্ণা), বাড়ে (বৃদ্ধি), এলো চুলে (এলা), বউঝি, বেড়িয়া (বেষ্টন), কাঁপিতেছে (কম্পমান), কুটীর (কুডিসৈ) ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ লক্ষণীয়। দেশী বাংলা শব্দও ব্যবহার করেছেন বঙ্কিম প্রধানতঃ শ্যামাসুন্দরী ও পেষমনের সংলাপে। যেমন, ডাঙ্গা, খুঙ্গী, চটি, চুয়া, গুয়া, ঝাঁটা, নাথি (বা লাথি), আছড়িয়া, অমনি ইত্যাদি। আসলে শব্দ-নির্বাচনে বঙ্কিম কাহিনী, চরিত্র, অবস্থা ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনানুসারে তৎসম, তদ্ভব ও দেশী বাংলা শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

উপন্যাসের বাস্তব পরিবেশ রচনায় বঙ্কিম-ব্যবহৃত ভাষার উপযোগিতা প্রকৃতিবর্ণনায়, কাহিনীতে বা চরিত্র-চিত্রণে বিশেষ ভাবে দেখা যায়—(ক) "প্রায় প্রভাত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক অতি গাঢ় কুজ্‌ঝটিকায় ব্যাপ্ত হইয়াছে; আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, উপকূল, কোন দিকে কিছুই দেখা যাইতেছে না।" (খ) "অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধি তীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি। ..... পরস্পর সন্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকসিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে, সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।" (গ) "কপালকুণ্ডলা প্রয়োজনীয় গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া ওষধির অনুসন্ধানে গৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন। তখন রাত্রি প্রহরাতীত হইয়াছিল। নিশা সজ্যোৎস্না।" (ঘ) "পূজাস্থানে দীপ নাই—কাষ্ঠখণ্ড মাত্রে অগ্নি জ্বলিতেছিল, তদালোকে অতি অস্পষ্টদৃষ্ট শ্মশানভূমি আরও ভীষণ দেখাইতেছিল। ..... শ্মশানভূমিতে শবভুক্ পশুগণ কর্কশ কণ্ঠে ক্বচিৎ ধ্বনি করিতেছিল"।—এই সমস্ত উদাহরণে এবং আখ্যায়িকার প্রায় সর্বত্র বঙ্কিম ভাষার সহায়তায় চিত্রকল্প

রচনা করেছেন—এক একটি দৃশ্যচিত্র বাক্-পরিমিতিবোধে প্রকাশিত হয়েছে এবং বাক্য বা বাক্যসমষ্টির দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবটি দ্যোতিত হয়েছে অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনায়। এমনকি, বিশেষণ পদগুলি ক্রমিক বিন্যাসরীতির কৌশলে ভাবের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ হয়েছে। রহস্যময় ঘটনাবৃত্ত ফুটিয়ে তুলতে এই ভাষা যে কতটা কার্যকরী হয়েছে, দু-একটি উদাহরণে তা স্পষ্ট হবে—(ক) "নবকুমার বাঁধন ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু শুষ্ক লতা অতি কঠিন— বন্ধন অতিদৃঢ়। মৃত্যু আসন্ন! নবকুমার ইষ্টদেবচরণে চিত্ত নিবিষ্ট করিলেন।" (খ) "বাস্তবিক কপালকুণ্ডলা কথোপকথন উত্তমরূপে শুনিবার জন্য কক্ষপ্রাচীরের অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। এবং তাঁহার আগ্রহাতিশয় ও শঙ্কার কারণে ঘন ঘন গুরুশ্বাস বহিতেছিল।" (গ) "কপালকুণ্ডলা অদৃষ্টবিমূঢ়ার ন্যায় বিনা বাক্যব্যয়ে কাপালিকের অনুসরণ করিলেন। নবকুমার পূর্ব্ববৎ দৃঢ় মুষ্টিতে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া চলিলেন।" প্রকৃতির রূপ-বর্ণনায় বা রহস্যময় চরিত্র / ঘটনা রূপায়ণে বঙ্কিম বিষয়-অনুসারী ভাষা প্রয়োগ করেছেন।

কপালকুণ্ডলার রহস্যময় জীবনে প্রকৃতিশক্তির লীলা ও দৈব-নির্ভরতা, তার আলো-আঁধারি রূপের উপযুক্ত ভাষা বঙ্কিম আবিষ্কার করেছেন। অনির্বচনীয় ভাষা-ব্যঞ্জনায় যোগিনী ও আংশিক গৃহিণীর অবগুণ্ঠন রহস্যময়তায় ঢাকা থেকে গিয়েছে। ভাষার এমনই দ্যুতি। (ক) "অলকাবলীর প্রাচুর্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না— তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল।" একটি চমৎকার উপমা অলঙ্কারের উদাহরণ। (খ) "তোমার মানস সিদ্ধ হউক— কালি হইতে বিঘ্নকারিণীর, কোন সংবাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।" (গ) "আমি অবিশ্বাসিনী নহি। এ কথা স্বরূপ বলিলাম। কিন্তু আমি আর গৃহে যাইব না। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব।" কপালকুণ্ডলার হৃদয় তলদেশের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, কেবল আকারে ইঙ্গিতে রহস্যময়তায় তার ঔদাসীন্য, প্রকৃতি-প্রীতি ও দৈব-প্রভাব অনুভব করা গেল। ভাষা ভাব-প্রকাশের বাহন সত্য, কিন্তু ভাষা যে কখন কখন ভাব-সংগোপনেও কার্যকরী, বঙ্কিম তা দেখিয়েছেন। নবকুমারের রূপমুগ্ধতা কপাল ও মতিবিবি দর্শনে বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বন্যদেবীমূর্ত্তি দর্শনে "মোহিনী শক্তি" অনুভব ও মোহের আকর্ষণ, তার চিত্তবৃত্তির ভাব-প্রকাশের উপযুক্ত বাহন হয়েছে। মতিবিবির উদ্দেশ্যে— "আমি স্ত্রীলোক দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ সুন্দরী দেখি নাই" —নবকুমারের রূপানুরাগের সাক্ষ্য বহন করে। শেষদৃশ্যে, মৃন্ময়ীর প্রতি কাতর অনুরোধে তার এই মনোভঙ্গী অক্ষুণ্ণ আছে। মতিবিবি 'কপালকুণ্ডলা' আখ্যায়িকার উপন্যাস অংশের নায়িকা। তাই বাস্তব-জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত এই নারীর ভাষাভঙ্গিমা তার বাস্তবমুখী জীবনচারিতার উপযুক্ত ভাষা বলে গণ্য হয়েছে। তার হাস্য চটুল ভঙ্গিমা, ঐশ্বর্যের পঙ্কিল কামনা-বাসনা, প্রেমবোধ এবং ষড়যন্ত্রের উপযোগী ভাষার সহায়তায় বঙ্কিম তার অন্তর্লোকের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যটি উদ্ঘাটন করেছেন। বাচনভঙ্গীর দু'একটি উদাহরণ— (১) আপনি কখনও কি স্ত্রীলোক দেখেন নাই, না আপনি আমাকে বড় সুন্দরী মনে করিতেছেন? (২) লুৎফ-উন্নিসা হাসিয়া কহিলেন, স্ত্রীলোকের অনেক সাধ। বাদ—আবার কি সাধ হইয়াছে?..... লু—'সাধ হইয়াছে একটি বিবাহ করিব'।" —রহস্যালাপের উপযোগী প্রাণবন্ত ভাষা। (৩) "কেবল তোমার দাসী হইতে চাহি। তোমার যে পত্নী হইব, এ গৌরব চাহি না, কেবল দাসী।"— ভাবের উত্থানপতনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এ ভাষা সত্যই বিস্ময়কর। ভাষার স্পষ্টতা, রহস্যালাপের মেজাজ, আত্মনিবেদনের ঐকান্তিকতা বা ষড়যন্ত্রের উপযোগী গোপনীয়

ভাবের প্রকাশক্ষমতা সত্যই অসাধারণ। কাপালিকের তান্ত্রিক সাধনার ভয়াবহতা কেবল বর্ণনায় নয়, বঙ্কিম তার সংলাপেও সে গুণ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। কপাল-নবকুমারের সঙ্গে সংলাপে তা একাধিকবার প্রমাণিত হয়েছে। আবার চরিত্রোপযোগী ভাষা ব্যবহারে বঙ্কিম কতটা সচেতনশিল্পী, শ্যামাসুন্দরী বা পেষমনের সংলাপে তা দেখা যায়। এখানে বাক্যগঠনরীতি বা শব্দ ব্যবহার সাধারণ মানুষের মতোই বাস্তব জীবন থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

চরিত্র, পরিবেশ, কাহিনীবৃত্ত—সর্বত্রই বঙ্কিম যথোপযুক্ত ভাষা প্রয়োগ করেছেন। কপালকুণ্ডলার জীবনরহস্য, মতিবিবির হাস্যোজ্জ্বল ও করুণ আর্তি, নবকুমারে রূপান্ধতা, কাপালিকের তান্ত্রিক-সাধন প্রক্রিয়ার উপযুক্ত ভাষা-রূপের আবিষ্কার করেছেন অবলীলায়। ভাষার ক্ষিপ্রতা, অর্থগূঢ় সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, দীর্ঘায়ত বাক্যের পরিবর্তে ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষা ব্যবহার ভাবের সংহতি এনেছে। কখনও কাব্যময় ভাষা, কখনও নাটকীয় গতিশীল ভাষা, কখনও-বা করুণার্দ্র বা প্রেমবোধের চিত্ত-ভাবের ভাষা বঙ্কিম অসামান্য দক্ষতায় প্রকাশ করেছেন। দু'একটি উদাহরণে বক্তব্য স্পষ্ট হবে। কাব্যময় ছন্দিত / ছন্দোবদ্ধ ভাষা—

(ক) সাগরবসনা পৃথিবী / সুন্দরী, / রমণী সুন্দরী; / ধ্বনিও সুন্দর; / হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে / সৌন্দর্যের লয় / মিলিতে লাগিল।

(খ) শুষ্ক লতা / অতি কঠিন / বন্ধন অতিদৃঢ়।

(গ) যেন সে নয়ন / মন্মথের স্বপ্নশয্যা। / কখনও বা লালসাবিস্ফারিত, / মদনরসে টলটলায়মান। / আবার কখনও লোপাঙ্গে / ক্রূর কটাক্ষ / যেন মেঘমধ্যে / বিদ্যুদ্দাম।

এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া সম্ভব। উপন্যাসের ভাষা যেন কাব্যময় গদ্যাত্মক ছন্দে পল্লবিত—ব্যঞ্জনাধর্মীও বটে। তাছাড়া ভাষা-ভঙ্গিমার মধ্যে একটা তির্যকতার ভাবও দেখা যাবে। ঘটনা ও চরিত্র নাটকীয় গতিশীলতায় অপূর্ব দ্রুততায় পরিণামমুখী। নাট্যোপযোগী সংলাপের মতো এ ভাষা পরিমিতিবোধে রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য-চিত্রকে যেন উপস্থাপিত করেছে। একটি দৃশ্য—"নব। তুমি যবনী-পরস্ত্রী তোমার সহিত এরূপ আলাপেও দোষ। তোমার সহিত আর আমার সাক্ষাৎ হইবে না।"..... "নির্দয়! আমি তোমার জন্য আগ্রার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তুমি আমায় ত্যাগ করিও না।" নবকুমার কহিলেন, "তুমি আবার আগ্রাতে ফিরিয়া যাও, আমার আশা ত্যাগ কর।"

"এ জন্মে নহে।"— প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কপালকর্তৃক খড়্গ চুরি এবং আকস্মিক আবির্ভাবে 'খড়্গ দুলিতেছে" দৃশ্যচিত্র নাটকীয় Suspense এরই উপযুক্ত বহিঃপ্রকাশ।

বঙ্কিমচন্দ্র জীবন-জিজ্ঞাসার অনিবার্য আকর্ষণে রোমান্সের জগতের সঙ্গে বাস্তব-জীবনকে গভীর অন্বেষায় বিশ্লেষণ করেছেন। কখনও কখনও বৈচিত্র্যময় জীবনের অন্তর্লীন ভাবনাকে দার্শনিকতায় ব্যক্ত করেছেন। এসবক্ষেত্রে তাঁর জীবন-দর্শনের ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত সংক্ষিপ্ত রূপে অসীম ব্যঞ্জনা দিয়েছে। মানুষের চিত্তবৃত্তির স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারে ব্যঞ্জনা (১) প্রণয় কর্কশকে মধুর করে, অসৎকে সৎ করে, অপুণ্যকে পুণ্যবান করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে! (২) সংসার রচনা অপূর্ব কৌশলময়। (৩) চিত্তের ধর্ম এই যে, যে মানসিক কর্ম যত অধিকবার করা যায়, সে কর্ম্মে অধিক প্রবৃত্তি হয়, সে কর্ম্ম ক্রমে স্বভাবসিদ্ধ হয়। (৪) মনুষ্যহৃদয় অনন্ত সমুদ্র, যখন তদুপরি ক্ষিপ্ত বায়ুগণ সময় করিতে থাকে, কে তাহার তরঙ্গমালা গণিতে পারে?

—এজাতীয় বেশ কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র বাক্‌ভঙ্গিমায় অনেক সময়

প্রবাদ-প্রবচনেরও যেন জন্ম দিয়েছেন। অন্ততঃ পরবর্তীকালে এই দৃষ্টিভঙ্গীতে তা গৃহীত হয়েছে। দু'-একটি উদাহরণ— (পূর্বোক্ত চারটি উদাহরণসহ) (গ) কবরের মাটিতে মুখের আদর্শ থাকিবে। (২) এইবার পাষাণমধ্যে কীট প্রবেশ করিয়াছিল। (৩) পাষাণ দ্রব হইতেছিল। ..... ইত্যাদি।

বঙ্কিমের ভাষা অলঙ্কারের বিভিন্ন অভিধা-লক্ষণের সঙ্গেও যেন যুক্ত হয়েছে। বাক্য, বাক্যাংশে, অনুচ্ছেদে শব্দের মত ধ্বন্যুক্তির সৌন্দর্য 'কপালকুণ্ডলা'র ভাষাগত ঐশ্বর্য! কানের তৃপ্তির সঙ্গে চিত্তে অর্থের ব্যঞ্জনা ধ্বন্যুক্তির সৌন্দর্য-সৃষ্টির কারণ। যেমন— (১) স্পর্শমণির স্পর্শে যোগিনী গৃহিণী হইয়াছে। (২) চন্দ্রমা অস্তমিত হইল। বিশ্বমণ্ডল অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল ইত্যাদি। অনুপ্রাস অলঙ্কারেরও প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যাবে 'কপালকুণ্ডলায়'— (১) শ্বশানভূমিতে শবভুক্ পশুগণ কর্কশকণ্ঠে ক্বচিৎ ধ্বনি করিতেছিল। (২) নিরলঙ্কার দেহ অলঙ্কারে খচিত করিয়াছেন। উপমা অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত— (১) স্রোতবিহারিণী রাজহংসী যেমন গতিবিরোধীর প্রতি গ্রীবাভঙ্গি করিয়া দাঁড়ায়, দলিতফণা ফণিণী যেমন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনি উন্মাদিনী যবনী মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইলেন। (২) অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না— তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। এ ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা রীতিতে শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের অন্যান্য উদাহরণও পাওয়া যাবে যেমন—সমাসোক্তি, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি।আসলে বঙ্কিমী-রীতির ভাষার উল্লেখযোগ্য দিক হ'ল সৌন্দর্যসৃষ্টির উপযোগী আলঙ্কারিক ভাষা নির্মাণ। বঙ্কিম এবিষয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী।

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত ভাষা বৈশিষ্ট্যের অন্যতম দিক হ'ল—(১) বাক্য বা বাক্যাংশের অঙ্গ বিন্যাসের ছেদগুলি—ভাব ও অর্থানুযায়ী বাক্যচ্ছেদ করলে, এ ভাষার অন্তঃপ্রকৃতিটি বোঝা যায়। (২) ভাষার ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য অনেকটাই শব্দ নির্ভর, তাই শব্দধ্বনির হ্রাস-বৃদ্ধির তারতম্যে বঙ্কিমের ভাষা মনোরম হয়েছে। (৩) বাক্যগঠনে ও শব্দপ্রয়োগে ছেদ-যদি চিহ্নের ব্যবহার একই সঙ্গে কোথাও নাটকীয় কোথাও বা কাব্যিক ছন্দ-সুষমা যুক্ত। (৪) ভাষার সাহায্যে সৌন্দর্যলোক সৃজন—প্রকৃতির রূপ-বর্ণনায়, পরিবেশ রচনায়, ঘটনাবৃত্ত প্রকাশে বা চরিত্রের স্বভাব-পরিচয় বা অন্তর্লোক আবিষ্কারে বঙ্কিমচন্দ্র যে সৌন্দর্য-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন, তা গদ্যভাষার ঐশ্বর্যবিশেষ।

'কপালকুণ্ডলা'র ভাষা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যেরই অভিনব ভাষা। শব্দের বাচ্যার্থ ও বাচ্যাতিরিক্ত ধ্বনি-ঝঙ্কারই নয়—এ ভাষা কখনও কাব্যময় ছন্দে, কখনও বা নাটকীয় বলিষ্ঠ ও কমনীয় ভাব-রীতিতে, ঔদাসীন্যে ও আকর্ষণে এ ভাষা আখ্যায়িকার গতিশীলতা এনেছে। গড়ে তুলেছে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিত্বময় এক স্বতন্ত্র স্টাইল, যা কেবল কপালকুণ্ডলা উপন্যাসেই প্রযুক্ত হতে পারে। মননশীল লেখক ভাবগভীর দার্শনিকতায়, যুক্তিনিষ্ঠায় শিল্পভাষাকে সাবলীলতায়, সৌন্দর্যে প্রাণবান করে তুলেছেন। শব্দ-চয়ন করেছেন বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে—কিন্তু অর্থ গৌরবে, স্পষ্টতায় এ ভাষা একইসঙ্গে বাস্তব-জীবনের উপযোগী ও ভাব-ব্যঞ্জনায় বাচ্যাতিরিক্ত অনির্বচনীয়তার অভিমুখী। উপন্যাসের দিক থেকে কপালকুণ্ডলা কেবল অদ্বিতীয় নয়—এর ভাষা ভঙ্গিমাও বাংলা সাহিত্যে অভিনব রূপ-রীতির পরিচয় দিয়েছে। তা বিদ্যাসাগর বা টেকচাঁদের মতো ভাষা নয়— উপন্যাসের প্রয়োজনে শিল্পসম্মত এক অপূর্ব ভাষা।

সাংকেতিকতা-আকস্মিকতা-অলৌকিকতা

সাহিত্য শিল্পে সাংকেতিকতার ব্যবহার অনিবার্য হয়ে ওঠে--বাস্তবজীবনের বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে জীবনের সকল ঘটনার কার্যকারণ সূত্র আবিষ্কার করা যায় না। নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক দৃশ্য,অদৃশ্য-শক্তির প্রভাবে আমাদের মানবজীবন পরিচালিত হয় বলে অনেকে মনে করেন। সাহিত্য কেবল বাস্তব জীবনের জন্ম-মৃত্যুর ইতিহাস নয়---মানুষের বোধ ও চৈতন্যশক্তির বৈচিত্র্যময় উপলব্ধির তা এক প্রতিবিম্বনও বটে। শিল্পীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জীবন-দর্শনে জীবনের মধ্যে জীবনাতীতের ব্যঞ্জনা সংকেতময়তায় ও অলৌকিকতায় আভাসিত হয়। সুতরাং "একথা অস্বীকার করা যায় না, দেশকাল-সাপেক্ষ জীবনের রূপায়ণের বদলে মানবজীবনের গভীর অন্তর্লোকশায়িত নির্বস্তুক ভাবরূপকে প্রতিফলিত করাই সাংকেতিকতার কাজ এবং সে ধরনের প্রয়োগে প্রখর বাস্তবসচেতনতা বা যুক্তিপারম্পর্যের দাবী কিছুটা স্তিমিত হতে বাধ্য।" (অধ্যাপক অরুণ কুমার বসু)। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র সাংকেতিকতার মাধ্যমে বৃহৎ জগতের আভাসের সঙ্গে মানুষের অন্তরাত্মার আকাঙ্ক্ষাকে যুক্ত করেছেন। বৃহৎ জগতের মধ্যস্থিত ঐশী শক্তির লীলার আলোকে মানব জীবনের গতি-প্রকৃতি নিরীক্ষণ করেছেন--আর এই সঙ্কেতের সাহায্যে আত্মার শুদ্ধ ও পবিত্র হওয়ার বাসনাকে উপন্যাসের রস পরিণামে মূর্ত করে তুলেছেন। সংকেত শব্দ চিহ্ন বা নিদর্শন নয় জ্ঞানাতীত বিষয় দুর্জ্ঞেয় অস্পষ্টতায় দ্যোতিত করাই তার কাজ--"A symbol is not only universal but extremely variable. A genuine human symbol is characterized not by its uniformity but by its varsatility."--এজন্য অধ্যাপক সুবোধ সেনগুপ্ত কপালকুণ্ডলা পর্যালোচনায় লিখেছেন--"কপালকুণ্ডলার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য অপূর্ব সাঙ্কেতিকতা যাহা বৃহত্তর জগতের আভাস আনিয়া দেয় এবং ইহারই জন্য নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক শক্তির মধ্যে অপরূপ সমন্বয় সাধিত হইয়াছে"(বঙ্কিমচন্দ্র)।

রোমান্সধর্মী 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে পরিদৃশ্যমান জগতের বাইরে অদৃশ্য অস্পষ্ট জগৎ আভাসে-ইঙ্গিতে বাস্তব জীবনকে কেবল স্পর্শই করে না---নিয়ন্ত্রিতও করে। সমুদ্রসৈকতের নির্জন অরণ্যানীর পটভূমিকায় অতিপ্রাকৃত স্বচ্ছন্দে অনুপ্রবেশ করে, নবকুমারের গৃহসংলগ্ন উপবনেও তার অস্তিত্ব অনুভূত হয়। লোকচক্ষুর অন্তরালে ছায়াধূসর জগতের আভাস, কপালকুণ্ডলার নিঃশব্দ পদচারণায়, কাপালিকের ভয়ঙ্কর তান্ত্রিক সাধন প্রক্রিয়ায় দুর্নিরীক্ষ্য অনৈসর্গিক শক্তির রূপ-লীলা বঙ্কিমের রোমান্টিক কবি-মনকে আকৃষ্ট করে থাকবে। অদৃশ্য শক্তির প্রবল ক্রিয়াশীলতায় উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্র নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সমুদ্র সৈকতের তটে প্রদোষতিমিরে প্রকৃতির রূপশোভার অন্তরালবর্তী অদৃশ্য শক্তির মায়াপ্রভাবে নবকুমারের কপালিনী দর্শন---সন্ধ্যালোকের অস্পষ্টতায় মোহিনী মূর্তির সাক্ষাৎ। নবকুমারের মোহময় দৃষ্টিতে কপালকুণ্ডলা প্রকৃতির মত দুর্জ্ঞেয় রহস্যের অন্তরালে যেন অবগুণ্ঠিতা। এ যেন বাহ্যিক প্রকৃতিলোকের মত মায়াময় মোহিনী মূর্তি--আকৃষ্ট করে, রূপান্ধতার জন্ম দেয়, কিন্তু কাছে আসতে দেয় না। অথচ এই অন্তর্নিহিত শক্তিকে অস্বীকারও করা যায় না। তারই নিত্য আকর্ষণে যেন জীবনে পথ-পরিক্রমা--পরিণাম তার যাই হোক না কেন। 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' কপালের এই উক্তি তো কেবল পথভ্রষ্ট নবকুমারের উদ্ধারের আহ্বান নয়---এ

তো সেই অদৃশ্য শক্তির অপ্রতিরোধ্য দুর্নিবার আকর্ষণ শক্তির বহিঃপ্রকাশ। সাগরবসনা সুন্দরী পৃথিবীর সুন্দরী রমণীর সুন্দর ধ্বনি হৃদয়তন্ত্রীতে যার তরঙ্গ উঠে এবং হৃদয়কে অবশ করে দেয়। কোন এক অজানা রহস্যময়তার আবেষ্টনে প্রকৃতি-শক্তি ও কপালকুণ্ডলা এভাবেই আবৃত থাকে--রূপ-সৌন্দর্যে, ধ্বনি-সৌন্দর্যে নবকুমারকে আবিষ্ট করে ফেলে। জীবন-পথ-পরিক্রমায় তার নিত্য-অবস্থিতি ও নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতিলোকের সেই অদৃশ্য শক্তি প্রবলভাবে কাজ করে উপন্যাসের রস-পরিণামের ক্ষেত্রেও। কপালকুণ্ডলার প্রকৃতির পরে নিত্য আকর্ষণ ও দুর্জ্ঞেয় আলৌকিক অদৃষ্ট শক্তি ভবানীর নির্দেশে কপালকুণ্ডলার জীবন-বিসর্জন মানবজীবনের পরে সেই শক্তির অখণ্ড লীলা। 'তটমৃত্তিকাখণ্ড' থেকে গঙ্গা প্রবাহমধ্যে পড়ে যাওয়ার ঘটনাটি তো কেবল আকস্মিক কোন দুর্ঘটনা নয়---অদৃশ্য-শক্তির ক্রিয়াশীলতায় কপালকুণ্ডলার অনিবার্য জীবন-পরিণাম। কাপালিক, অধিকারী ও কপালকুণ্ডলা সকলেই সেই অদৃশ্য শক্তির রূপ-অন্বেষণে সচেষ্ট। কাপালিক তাকে পেতে চেয়েছে নিষ্ঠাপূর্ণ তান্ত্রিক সাধনায়,অধিকারী তাকে মঙ্গলময়ের ভূমিকায় এবং কপালকুণ্ডলা স্বভাব-ধর্মে অদৃশ্য শক্তির লীলাকে আপন জীবনের মধ্যে গ্রহণ করেছে। এ সম্পর্কে পণ্ডিত-সমালোচকের অভিমত এইরকম—"কপালকুণ্ডলার চরিত্র ও জীবন প্রকৃতির লীলার সঙ্গে এত ঘনিষ্টভাবে জড়িত যে, ইহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। তাঁহার দেহের রূপ ও কণ্ঠের মাধুর্য্য যেন প্রকৃতির মহিমার অংশ। তাঁহার কটাক্ষ সাগরহৃদয়ে ক্রিয়াশীল চন্দ্রলেখার ন্যায় ; তাঁহার দেহে এমন একটি মোহিনী শক্তি ছিল যে, তাহা গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে দাঁড়াইয়া না দেখিলে স্পষ্ট অনুভব করা যায় না। তাঁহার কণ্ঠের শব্দ পবনে আন্দোলিত হইয়াছে, বৃক্ষপত্রে মর্ম্মরিত হইয়াছে, সাগরনাদে মন্দীভূত হইয়াছে। তাঁহার লীলাচঞ্চল গতি নিসর্গমায়ার মতই নবকুমারকে মুগ্ধ করিয়াছে, অভিভূত করিয়াছে, বিভ্রান্ত করিয়াছে। যখন কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে রক্ষা করিয়াছেন তখনও তাঁহাকে মায়া বলিয়াই ভ্রম হইয়াছে ; তাঁহার নিঃশব্দ সঞ্চার ও নিঃশব্দ অন্তর্ধানে নবকুমার চমৎকৃত ও বিমূঢ় হইয়াছেন। যখন এই পরমাশ্চর্য্য রমণী নবকুমারকে বন্ধন কাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন মনে হইয়াছে এ এক মোহিনী মায়া যাহার করে খড়্গ 'দুলিতেছে'।" (ড: সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত)।

কপাল - নবকুমারের জীবনে ভবানীর চরণে অভিন্ন বিল্বপত্র অর্পণ করার অসামান্য সাংকেতিক ব্যঞ্জনা আছে। অধিকারী কপালের সঙ্গে নবকুমারের বিবাহ-প্রস্তাবের অনুমোদন চেয়েছেন কালিকার কাছে---বিল্বপত্র গ্রহণ করে পরাশক্তি তা মঞ্জুর করেছেন। আবার,সপ্তগ্রামের পতিগৃহ যাত্রার প্রাক্‌কালে ভক্তিমতী কপাল কালী প্রণামার্থে মন্দিরে প্রবেশ করে প্রতিমার পাদপদ্মে বিল্বপত্র দিলে দেবী তা প্রত্যাখ্যান করেন--বিল্বপত্র পড়ে যাওয়া, তার প্রতীকী ব্যঞ্জনা। কপালকুণ্ডলার জীবনাকাশে ঘনান্ধকার অনিশ্চিতের ছায়া---অদৃশ্য শক্তির ইচ্ছাধীন মানব-জীবনের অনিবার্য রূপ-রেখা। অরণ্য ও সমুদ্রের নিত্য-আকর্ষণ এবং এই ঐশী শক্তির অপ্রসন্নতা কপালের সংসার অনাসক্তির অন্যতম কারণ হয়েছে। সমুদ্র ও অরণ্যানীর শান্ত নিস্তব্ধতা, সৌন্দর্য ও রহস্যময়তার সঙ্গে কাপালিকের ভীষণ-রুদ্র তান্ত্রিক সাধনার ভয়াবহতার মধ্যে কপালকুণ্ডলার বাল্যকাল থেকে যৌবন পর্যন্ত (১৬ বৎসর) অতিবাহিত হয়েছে। চরিত্র-স্বভাব বৈপরীত্য রূপ সমাবেশে বেড়ে উঠেছে--পরবর্তী জীবনে এই দুই ভাবই যথেষ্ট ক্রিয়াশীল দেখি। রাত্রির অন্ধকার এই উপন্যাসের অনন্যসাধারণ সাংকেতিকতায় উপস্থাপিত। কপালের সঙ্গে নপকুমারের সাক্ষাৎ রাত্রিতে, কাপালিক দর্শন ঘটেছে নবকুমারের রাত্রিকালে, কপালের সঙ্গে পলায়ন রাত্রিতে, অধিকারীর গৃহে করাল কালীমূর্তি দর্শন রাত্রিকালীন

ঘটনা, বিবাহের সিদ্ধান্তও রাত্রে, মতিবিবির সাক্ষাৎ ও পরিচয় লাভ সন্ধ্যালোকে, সংসার-জীবনে প্রবেশের পর শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে সন্ধ্যাকালে সন্নিকটস্থ অরণ্যের দিকে তাকিয়ে কপালকুণ্ডলার সমুদ্র ও অরণ্যের তুলনা, দীর্ঘশ্বাস, পেষমনের সঙ্গে সন্ধ্যার সময় কথোপকথনে নবকুমারের প্রতি মতিবিবির অনুরাগ ও উপনগর প্রান্তে ব্রাহ্মণবেশী রূপে কাপালিকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র রাত্রিকালীন ঘটনাবৃত্ত ; শ্যামার জন্য কপালের বনৌষধি সংগ্রহার্থে রাত্রিতে অরণ্যে গমন ও ব্রাহ্মণবেশীর সাক্ষাৎ, গৃহে প্রত্যাগমনে কাপালিকের অনুসরণ ও দ্বারপ্রান্তে কাপালিক দর্শন রাত্রিতেই ঘটেছে। ব্রাহ্মণ বেশীর পত্র নবকুমারের হাতে পাওয়া--সংশয় ও সন্দেহ, কাপালিকের সঙ্গে নবকুমারের পরামর্শ, কপালকুণ্ডলা, ও কাপালিকের স্বপ্নদর্শন, আকাশে ভৈরবী মূর্তি-দর্শন এবং 'প্রেতভূমে' কাপালিকের কপালবধের আয়োজন, কপালকুণ্ডলার আত্মবিসর্জন ও নবকুমারের অনুগমন--- উপন্যাসের ঘটনাচক্রের মধ্যে রাত্রির ব্যাপক ব্যবহার চরিত্র ও আখ্যানকে এক ভিন্নস্বাদের সাংকেতিকতায় ব্যঞ্জিত করেছে। অদৃশ্য শক্তির ঐশী লীলা ও অরণ্য সমুদ্র-আকাশ মানবজীবনে কী গভীর ক্রিয়া করে, জীবন-জিজ্ঞাসার অনুষঙ্গ হিসেবে "রাত্রির অন্ধকার" দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তার ইঙ্গিত দিয়েছে। এখানেই সঙ্কেতের সার্থকতা।

উপন্যাসের 'স্বপ্নদর্শন' সাঙ্কেতিক তাৎপর্যে আভাসিত। কপালকুণ্ডলার স্বপ্ন তার আগামী দিনের জীবন পরিণামের ইঙ্গিত--সাগরহৃদয়ে তরঙ্গসঙ্কুল তরণীমধ্যে কপালের হাত ধরে ব্রাহ্মণবেশী জটাজুটধারী এক প্রকাণ্ড পুরুষ তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন--"তোমায় রাখি, কি নিমগ্ন করি"--- প্রত্যুত্তরে কপালের "নিমগ্ন কর" অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময় ঘটনা। কপালের আসন্ন পরিণামের প্রেক্ষাপটে সম্ভবতঃ কাপালিকের ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু কপালিনীর দৃষ্টিতে বিশ্বশাসন কর্ত্রী, সুখদুঃখবিধায়িনী, কৈবল্যদায়িনী ভৈরবী তাকে জীবনবিসর্জনের আদেশ দিয়েছেন বলে বিশ্বাস করে। এরই অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে আকাশে ভৈরবীমূর্তির আহ্বান---"যেন ভৈরবী দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া কপালকুণ্ডলাকে ডাকিতেছেন।" পুনরায় কপালিনী দেখেছে--"রণরঙ্গিনী খল খল হাসিতেছে ; এক দীর্ঘ ত্রিশূল করে ধরিয়া পথপ্রতি সঙ্কেত করিতেছেন।" কপালকুণ্ডলার জীবন বৃত্তান্তে অলৌকিক শক্তির অসামান্য লীলা কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন এক বিশেষ রোমান্টিক আবেষ্টনের মধ্যে। আবার অন্যদিকে, কাপালিকের "স্বপ্নদর্শনে" ভৈরবীর ভর্ৎসনা তাকে কপালকুণ্ডলা বধে অনুপ্রাণিত করেছে এবং ঘটনাচক্রে মতিবিবিও এই ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু সমস্ত চক্রান্তের অবসান ঘটেছে কপালকুণ্ডলার ভৈরবীর নির্দেশকে শিরোধার্য করে আত্মবিসর্জনের কৃতসঙ্কল্পতায়।

উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণেও সাংকেতিকতার গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ-কৌশল বঙ্কিম গ্রহণ করেছেন। দস্যুদের দ্বারা নিগৃহীতা মতিবিবির সঙ্গে নবকুমারের সাক্ষাৎ, পান্থনিবাসে মতিবিবির পূর্বস্বামী নবকুমার শর্ম্মার দর্শন লাভ ও প্রেমবোধের জাগরণ সাংকেতিক ললাটলিখনের ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ ঘটনাবৃত্ত। নবকুমার কর্তৃক, সপ্তগ্রামের জীবনে, মতিবিবিকে প্রত্যাখ্যান, প্রতিশোধ গ্রহণার্থে কপালকুণ্ডলার অনিষ্টসাধনে ষড়যন্ত্র, বনমধ্যে কাপালিকের দর্শন ও কপালকে আপন অভিপ্রায় বলার মধ্যে ঘটনাক্রমের যে দ্রুত পরিণতি দেখা যায়, সেখানেও সংকেতকে নানান্ ভাবমূর্তিতে ঔপন্যাসিক ব্যক্ত করেছেন। মতিবিবির ত্রিবিধ নামকরণের মধ্যেও সাংকেতিকতার প্রাধান্য--তার জীবনের স্বরূপ ব্যাখ্যার উপযোগী। রামগোবিন্দ ঘোষালের কন্যা ও নবকুমারের পত্নীরূপে পদ্মাবতী, মোগল রাজৈশ্বর্যের ভোগ-বিলাসে লুৎফ-উন্নিসা, কারণ কপালের প্রতিযোগিনীরূপে মোগলসাম্রাজ্যের

কুপ্রবৃত্তি-স্বভাবযুক্তা এবং পরিশেষে ব্রাহ্মণবেশী।

আখ্যান রচনাতে সঙ্কেত যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, তেমনি আকস্মিকতাও উপন্যাসের কাহিনী গ্রন্থনে সহায়তা করেছে। অনেকসময় সাঙ্কেতিকতা ও আকস্মিকতা অভিন্ন ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত হয়েছে। নদীতে আকস্মিক জোয়ার আসার ফলে নগর জীবনের প্রতিনিধি নবকুমার সমুদ্রসৈকতে, অরণ্যময় তটভূমিতে এসে উপনীত হয়েছে। নির্জন বনমধ্যে হঠাৎ অপূর্ব রমণীমূর্তি কপালিনীর সাক্ষাৎ, কাপালিকের দর্শন ও অদৃশ্য জগৎ থেকে যেন কপালের করুণাদ্র চিত্তে নবকুমারকে উদ্ধার---দৃশ্য পরিকল্পনায় আকস্মিকতার ব্যঞ্জনা। মতিবিবির সঙ্গে নবকুমারের সাক্ষাৎ দৃশ্যটিও আকস্মিক ঘটনা। কাপালিকের স্তূপশিখর থেকে পড়ে যাওয়া ও হাত-ভাঙ্গা, ভবানী কর্তৃক বিল্বপত্র গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান, সপ্তগ্রামে নবকুমারের গৃহকন্নিকটস্থ উপবন, শ্যামাসুন্দরীর জন্য বনৌষধি সংগ্রহে কপালের অরণ্য ভ্রমণ ও ব্রাহ্মণবেশী কাপালিকের সাক্ষাৎ, ব্রাহ্মণবেশীর পত্র কবরীচ্যুত হওয়া ও নবকুমারের সন্দেহ এবং সর্বোপরি কাপালিকের ও কপালিনীর স্বপ্নদর্শন, কাপালিক কর্তৃক কপালবধের আয়োজন ও নবকুমারের অংশগ্রহণ---এই সমস্ত ঘটনাবৃত্তে সাঙ্কেতিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আকস্মিকতা। উপন্যাসের কয়েকটি অংশে এই আকস্মিকতা চরিত্র ও ঘটনাক্রমকে নিয়ন্ত্রিত করেছে---(১)নববিবাহিত নবকুমারের জীবনে মতিবিবির সাক্ষাৎ ও কাহিনীবৃত্তে প্রবেশ ; (২) শ্যামাসুন্দরীর স্বামীবশের জন্য বনৌষধির প্রয়োজনীয়তা ও সহানুভূতিশীল মনোভাবে কপালের ঔষধি সংগ্রহে বনে গমন এবং ঘটনাচক্রে বিপরীত দিক থেকে কাপালিক ও ব্রাহ্মণবেশীর ষড়যন্ত্র ও বধের পরিকল্পনা ; (৩) কপাল ও কাপালিকের স্বপ্নদর্শন ; (৪) কাহিনীর সূচনায় নবকুমার বধ পরিকল্পনা ও কপাল কর্তৃক উদ্ধার ; আবার আখ্যানের শেষাংশে কাপালিক কর্তৃক কপালিনী বধের আয়োজন ও নবকুমারের সহযোগিতা / অংশ গ্রহণ ; (৫) সমস্ত আয়োজনকে নিষ্ফল করে দিয়ে আত্মবিসর্জনে কৃতসঙ্কল্প। কপালকুণ্ডলার নদীপ্রবাহের তরঙ্গাঘাতে তটমৃত্তিকার সঙ্গে পতিত হওয়া ও নবকুমারের অনুগমন---আকস্মিকতার চমৎকার উদাহরণ। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে আখ্যানের প্রাধান্য,--তাই সাংকেতিকতা ও আকস্মিকতা এখানকার চরিত্রগুলির আন্তর স্বভাব ব্যাখ্যার উপযুক্ত না হলেও, কাহিনীর উত্থান-পতনে এই শিল্প-কৌশলের অনিবার্য ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না।

কপালকুণ্ডলা চরিত্রে প্রকৃতিময়তার অসামান্য ইঙ্গিত তার রূপ-বিন্যাসে বার বার ধরা পড়েছে। সূচনাপর্ব থেকে কপালিনীর 'অবেণী সম্বন্ধ' রূপ একটা সাংকেতিক ব্যঞ্জনাও দিয়েছে। সমুদ্রতট ও অরণ্য প্রকৃতি তার জীবনকে গড়েছে, পূর্ণতা দিয়েছে, এবং দেবী ভবানীর ইচ্ছায় তার জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। আবার কপালিনী ও দেবী কপালমালিনী তো একই সত্তার ভিন্ন রূপ। সংসারজীবনে মৃন্ময়ী উদাসীন, অনাসক্ত--'অবেণীসম্বন্ধ' কপালের রূপ সেই ব্যঞ্জনার অভিমুখী। (১) সমুদ্রতটে অরণ্যবেষ্টিত প্রকৃতিলোক থেকে কপালের প্রথম আবির্ভাব দৃশ্যটি প্রতীকী ভাবযুক্ত—"কেশভার-অবেণীসম্বন্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার (১ম/৫ম) ;" (২) কাপালিক সঙ্গে বধ্যস্থানে নবকুমারের গমনকালে অনুসরণকারিণী কপাল --"আগুল্‌ফলম্বিত-নিবিড় কেশরাশি ধারিণী বন্যদেবীমূর্তি। (১ম/৬ষ্ঠ)। (৩) পান্থনিবাসের একটি ঘরে একাকিনী কপালকুণ্ডলাকে মতিবিবি দেখেছিলেন এই মূর্তিতে--"একটি ক্ষীণালোক প্রদীপ জ্বলিতেছে মাত্র--অবদ্ধ নিবিড় কেশরাশি পশ্চাদ্ভাগ অন্ধকার করিয়া রহিয়াছিল।" বন্ধনহীন কেশরাশির সঙ্গে অন্ধকারের একাত্মতা---অপূর্ব ব্যঞ্জনা (২য়/৩য়) ; (৪) শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে কথোপকথনে মৃন্ময়ীর " চুলের রাশি " না বাঁধার ইঙ্গিত আছে ; (২য়/৬ষ্ঠ) সংসারজীবনে যোগিনী যে গৃহিণী হয়নি এ তো তারই রূপ ; (৫) চতুর্থ

খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে মাত্র একটি দৃশ্যে কপালের "আগুল্‌ফলম্বিত কেশরাশি পশ্চাদ্ভাগে স্থূলবেণীসম্বদ্ধ হইয়াছে।" এক বৎসরের অধিক কাল গৃহিণী জীবন অতিবাহিত করেও তার সংসার অনাসক্তি "স্থূলবেণীসম্বদ্ধ" এই সামান্য ঘটনার ইঙ্গিত দিয়েছে। কিন্তু বঙ্কিম "স্পর্শমণির স্পর্শে" যোগিনীকে সম্পূর্ণ গৃহিণী করতে চাননি, তাই "কেশভার মুখমণ্ডলকে অর্ধলুক্কায়িত" না করলেও "বন্ধনবিস্রংসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলকাগুচ্ছের" প্রসঙ্গ টেনে কপালকে অর্ধ-সংসারী করেছেন ঔপন্যাসিক। (৬) কপালকুণ্ডলা বনে গমনকালে "অনবকাশ প্রযুক্ত সে বিশাল কেশরাশি পুনর্বিন্যস্ত করিতে পারেন নাই, অতএব আজি কপালকুণ্ডলা অনূঢ়াকালের মত কেশমণ্ডল মধ্যবর্তিনী হইয়া চলিলেন।"(৪র্থ/৪র্থ পরি·) গৃহকার্যে ব্যাপৃত কপালকুণ্ডলার দৃশ্যচিত্রে বেণীবন্ধন দৃঢ় নয়--তাই ব্রাহ্মণবেশীর "লিপি কবরীবন্ধনচ্যুত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গিয়াছিল।" প্রকৃতিরূপিণী কপালের 'কেশভার অবেণীসম্বদ্ধ' হওয়াতে এই পত্র পড়ে যাওয়া ও নবকুমারের লিপি-পাঠে সন্দেহ ঘটনার দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত (৪র্থ/৫ম পরি·); (৭) নবকুমারের কপাল সম্পর্কে সন্দেহ দৃঢ় হয়েছে কপাল-ব্রাহ্মণবেশীর আলাপ দৃশ্যে (৪র্থ খণ্ড/৭ম পরি·)। কাহিনীর দিক থেকে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। "লুৎফ উন্নিসার পৃষ্ঠ পর্যন্ত কপালকুণ্ডলার কেশের সম্প্রসারণ হইয়াছিল-·" নবকুমারের দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণবেশী পুরুষের সঙ্গে কপালের আলিঙ্গন দৃশ্য বলে মনে হয়েছে। সুতরাং এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলার কেশরাশিকে নিয়ে দুটি সংকেত দিয়েছেন---প্রথমতঃ প্রকৃতির নিরাভরণ মূর্তির সঙ্গে একাত্মতা ও কালিকার এলোচুলের রূপমূর্তির সঙ্গে অভিন্নতা এবং দ্বিতীয়তঃ ঘটনাক্রমের দিক থেকে বন্ধনহীন বেণীর ভূমিকা। সুতরাং কবরীবন্ধনহীনা কপালিনী ইঙ্গিতময়তায় যে অসামান্য ব্যঞ্জনা দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র কপালকুণ্ডলার মধ্যে অদৃষ্টবাদ বা অলৌকিক শক্তির দুর্নিরীক্ষ্য প্রভাব আছে। প্রকৃতিলোকের নিত্য আকর্ষণ এবং ভবানীর লীলা বৈচিত্র্যে কপালকুণ্ডলার জীবন-পরিণাম বঙ্কিম আসাধারণ শিল্প কুশলতায় প্রকাশ করেছেন। (বিস্তৃত আলোচনা 'উপন্যাসের তত্ত্ব' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। আখ্যায়িকার অন্যান্য চরিত্রে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। কপালিনীর জীবনবৃত্ত নিয়তি-শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত--কিন্তু নবকুমার, কাপালিক, মতিবিবি এবং শ্যামাসুন্দরীর চরিত্রে যেন অদৃষ্ট-লিখন/ললাট-লিখনের প্রভাব। প্রত্যক্ষভাবে কপালকুণ্ডলা 'বনোন্মত্তা' এবং বাহ্যিক দৈবী প্রভাবে পরিচালিতা চরিত্র---তার আত্মবিসর্জন সেই শক্তিরই অনিবার্য লীলা। অন্যান্য চরিত্রে এ ভাব অনুপস্থিত---অন্ততঃ কপালের মতো অন্তঃ-প্রেরণায় ঐশী শক্তির অনুপম লীলা দেখা যায়নি। নবকুমার জোয়ার আসার অকস্মিকতায় সমুদ্রতটে অরণ্যানির মাঝে নির্বাসিত। কাপালিক সাক্ষাৎ, কাপালিক কর্তৃক নবকুমার বধের আয়োজন, কপালের দর্শনলাভ ও বিবাহ--রূপমুগ্ধ নবকুমার, মেদিনীপুরের পথে মতিবিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ, কপালের কবরীবন্ধনচ্যুত ব্রাহ্মণবেশীর পত্র প্রাপ্তি ও নবকুমারের সংশয়-সন্দেহ, কাপালিকের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে মৃন্ময়ী বধের আয়োজনে অংশগ্রহণ এবং কপালের অনুসরণ করে তার আত্মবিসর্জন---নবকুমারের জীবন-বৃত্তের প্রতিটি অধ্যায়ের ঘটনা 'অদৃষ্ট লিখন' বলে গণ্য হবে। ঔপন্যাসিকের ভাবনায় পুরুষের রূপমুগ্ধতার পরিণাম এই অদৃষ্ট লিখনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে। ললাট-লিখনের সঙ্গে রূপমুগ্ধতার প্রসঙ্গটিকে অভিন্ন করেই দেখতে হয়। নবকুমারের জীবন পর্যালোচনায় মনে হয়, তার জীবনে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, দুর্ঘটনা-মিলন-বিচ্ছেদ অদৃষ্ট-লিখনেরই অনিবার্য ফলশ্রুতি।

কাপালিক-চরিত্রেও বঙ্কিম অদৃষ্টের লিখনকে প্রত্যক্ষ করেছেন--নির্জন সমুদ্রতটে তার তান্ত্রিক

সাধনায় নবকুমারের উপস্থিতি, বধের প্রাঙ্গণ থেকে কপাল কর্তৃক নবকুমার-উদ্ধার ও কাপালিকের ব্যর্থতা, কপাল-নবকুমারকে অনুসরণকালে তটভূমি থেকে পড়ে গিয়ে 'ভগ্নবাহু' হওয়া, কপাল-বধের আয়োজন, নবকুমারের সহায়তা লাভ এবং কপালিনী বধে ব্যর্থ হওয়া—সমস্ত জীবন ব্যাপ্ত হয়ে থাকা অদৃষ্টের বিচিত্র বিড়ম্বনার দৃশ্য-চিত্র। তান্ত্রিক সাধন প্রক্রিয়ায় কাপালিক অসফল সাধক---তার সীমাহীন ব্যর্থতা অদৃষ্ট লিখনেরই যেন ইঙ্গিত দেয়। মতিবিবি চরিত্র তো প্রথমাবধি ললাট লিখনের দ্বারাই আভাসিত। খ্রীষ্টান দস্যু কর্তৃক অরণ্যবেষ্টিত সমুদ্রতটে পরিত্যক্ত হওয়া, কাপালিকের আশ্রয়লাভ, পদ্মাবতী রূপে নবকুমার কর্তৃক পরিত্যাগ, ঘটনাচক্রে রামগোপাল ঘোষালের ধর্মান্তরিত হওয়া ও মতিবিবির দিল্লী-আগ্রার প্রবৃত্তিমুখীন জীবনযাপন অধ্যায় ও নবকুমারের সঙ্গে সাক্ষাতের পরিণতিতে অন্তরে প্রেমবোধের জাগরণ—সর্বত্রই অদৃষ্ট-লিখনের ছায়াপাত। এ ছাড়াও মতিবিবির ষড়যন্ত্র, কাপালিকের সাক্ষাৎ ও নবকুমার লাভের ব্যর্থতা অদৃষ্ট লিখনেরই অনিবার্য ফলশ্রুতি। ঔপন্যাসিক অতি সাধারণ পার্শ্বচরিত্র শ্যামা সুন্দরীর জীবনাকাশেও সামাজিক কুপ্রথার সঙ্গে অদৃষ্টের লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন। কুলীনপত্নীর স্বামী-বশের আগ্রহ ও বনৌষধি সংগ্রহের জন্য কপালকুণ্ডলার আশ্রয় শেষপর্যন্ত কোন সমাধান-সূত্রে উপনীত হয় না---তার জীবনের সামগ্রিক ব্যর্থতার মূলেও দৈব-লিখন। সুতরাং সঙ্গত কারণে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র-মানবজীবনে দুর্জ্ঞেয়-অদৃশ্যশক্তির লীলার সঙ্গে অদৃষ্ট-লিখনকে প্রত্যক্ষ করেছেন গভীর মানব-জীবন-দর্শনের অনুভবে।

নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে কপালকুণ্ডলা

"বাইরে রেখায়-রেখায় বর্ণে বর্ণে, ভিতরে ভাবে-ভাবে এবং সব শেষে রূপে ও ভাবে সুসঙ্গতি নিয়ে আর্টে সৌন্দর্য বিকাশ লাভ করেছে।.....সৌন্দর্যলোকের সিংহদ্বারের ভিতর দিকে চাবি, নিজের ভিতর দিক থেকে সিংহদ্বার খুললো তো বাইরের সৌন্দর্য এসে পৌঁছল মন্দিরে এবং ভিতরের খবর বয়ে চললো বাইরে অবাধ স্রোতে---সুন্দর-অসুন্দরকে বোঝবার উৎকৃষ্ট উপায় প্রত্যেককে নিজে খুঁজে নিতে হয়।" (সৌন্দর্যের সন্ধান, বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী---অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের শৈল্পিক সৌন্দর্য রূপ-সুষমায় (Significant form) রসাস্বাদনের কারণ হয়েছে। আর এই সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে যুক্ত আছে Aesthetic pleasure বা আনন্দানুভব! বাংলা কথা সাহিত্যে "বঙ্কিম উদাহরণ বিন্যাসে প্রথম স্পষ্ট করেছেন 'সৌন্দর্য,' 'সৌন্দর্য দত্তপ্রাণ ' এবং 'সর্বসৌন্দর্যের রসগ্রাহী' কথার অর্থ কি। বঙ্কিমের নান্দনিক দৃষ্টির গতিভঙ্গীর স্বরূপ খুঁজতে গেলে 'কপালকুণ্ডলা' প্রথম হতে পারে সঠিক যাত্রাভূমি।" (বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প ও সঙ্গীতের জগৎ---শ্যামলী চক্রবর্তী) বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত শৈল্পিক অনুভবে ধরা পড়েছিল শিল্প-সৃষ্টির মৌল প্রেরণাটি--- "কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য-সৃষ্টি।... .....তাঁহারা (কবিরা) সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।"

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে নিসর্গলোকের সৌন্দর্য-শোভা নবকুমারের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। সমুদ্রকূলে দাঁড়িয়ে অনন্ত জলরাশিচঞ্চল রবিরশ্মিমালা প্রদীপ্ত হইয়া গগনপ্রান্তে গগন-সহিত মিশিয়াছে।.....দূরস্থ বারিরাশি নীলপ্রভ।"---নবকুমার প্রকৃতিলোকের অনন্ত রূপ-সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়েছিল। একদিকে অনন্ত জলরাশি ও অন্যদিকে নীরব, নিস্তব্ধ আকাশ, প্রান্তর---সমুদ্র গর্জনের সঙ্গে অরণ্যানীর নিস্তব্ধতা চমৎকার দৃশ্য সংস্থাপনে সৌন্দর্যের অপরূপ রূপমূর্তি নির্মিত হয়েছে।

সংসার-অনাসক্ত কপালকুণ্ডলার দৃষ্টিতে প্রকৃতির অখণ্ড সৌন্দর্যময় রূপ কি আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল, তার বিবরণ আছে উপন্যাসে। "সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। চতুর্দ্দিকে যাহা দেখা যাইতেছিল, তাহা লোচন-রঞ্জন বটে। নিকটে, এক দিকে নিবিড় বন ; তন্মধ্যে অসংখ্য পক্ষী কলরব করিতেছে। অন্যদিকে ক্ষুদ্র খাল, রূপার সুতার ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। দূরে মহানগরের অসংখ্য সৌধমালা, নববসন্তস্পর্শলোলুপ নাগরিকগণে পরিপূরিত হইয়া শোভা করিতেছে। অন্যদিকে, অনেক দূরে নৌকাভরণা ভাগীরথীর বিশাল বক্ষে সন্ধ্যাতিমির ক্ষণে ক্ষণে গাঢ়তর হইতেছে। " রূপের মধ্যে অরূপের সন্ধান---খণ্ড সৌন্দর্যের মধ্যে অখণ্ড সৌন্দর্যের পূর্ণাভাস।

চরিত্র নির্মিতিতেও সৌন্দর্যের স্বাভাবিক রূপান্বেষণ—নবকুমারের চিত্তবৃত্তির সৌন্দর্য কেবল নয়, চরিত্রেরও রূপ-নির্মাণে সুন্দরের রূপবিন্যাস—(১)গম্ভীর নদী, বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি।.....অলকাবলীর প্রাচুর্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃতচন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল।"---কপালকুণ্ডলার অপূর্ব দ্যুতিময় দৈহিক রূপমূর্তির বিবরণ। (২) "এই অপরিচিতা রমণীকে সুন্দরীপ্রধানা বলিয়া মনে হইবে।.....সে নয়ন মন্মথের স্বপ্ন শয্যা।.....মুখকান্তি-মধ্যে দুইটি অনির্ব্বচনীয় শোভা : প্রথম

সর্ব্বত্রগামিনী বুদ্ধির প্রভাব, দ্বিতীয় আত্মগরিমা। তৎকারণে যখন তিনি মরালগ্রীবা বঙ্কিম করিয়া দাঁড়াইতেন, তখন সহজেই বোধ হইত, তিনি রমণীকুল-রাজ্ঞী।"—মতিবিবির অনির্বচনীয় রূপের আভাস।

কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি দুহিতার রূপ ভাবে, ভাষায়, ব্যঞ্জনায় ছন্দোময় রূপের ইঙ্গিত দিয়েছে। অরণ্য প্রকৃতির মাঝে তার স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গীতে, নবকুমারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের অভিব্যক্তিতে, সাংসারিক জীবনে সংসার অনাসক্তি ও প্রকৃতির হাতছানিতে উদাসীন মৃন্ময়ীর জীবনের ছন্দ তরঙ্গ হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়। ভবানীর নির্দেশে জীবন বিসর্জনের কৃতসঙ্কল্পতায় সেই ছন্দ লয়ে মিলিত হয়। কপালকুণ্ডলার জীবন বৃত্তান্ত সেই ছন্দিত কাব্যময় ব্যঞ্জনায় অনুপম সৌন্দর্যের রসলোক নির্মাণ করে। মতিবিবির জীবনেও সেই ছন্দোময় সুষমার নানান উত্থান-পতন, অভিঘাতে বিক্ষুব্ধ ও প্রেমময়তায় শান্ত হবার চিত্র আছে। ছন্দের বিলম্বিত ও দ্রুতলয়ের মতো তার জীবন নিত্য ওঠাপড়ার লীলায় অপূর্ব ঢঙে চিত্রিত।

কাপালিক তার ভয়ঙ্কর তান্ত্রিক স্বভাবের মধ্যে দীপক রাগিণীর রুদ্র স্বভাবকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যে কোন ছন্দের চূড়ান্ত পর্বের পর বিলম্বিত রাগিণীর যে সামান্য মৃদু ঝংকার সোনা যায় কাপালিকের হাতভাঙ্গা ও অর্থহীন কপাল বধের আয়োজনে সেই ব্যর্থ প্রতিহিংসাপরায়ণ মেজাজে সেই সুরেরই অন্তিম ধ্বনি। আপন আপন বৃত্তের মধ্যে ছোট খাট ধ্বনি তরঙ্গ সৃষ্টি করেছে অপ্রধান চরিত্রগুলিও। প্রধান রাগ-রাগিণীর এও যেন এক ধরনের অনুষঙ্গ—যার সহায়তা ছাড়া সঙ্গীতের পূর্ণতা লাভ ঘটে না। এই সমস্ত চরিত্র রূপের আড়ালে খণ্ডিতের মধ্যে অখণ্ড সৌন্দর্য মূর্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, রূপ থেকে অরূপে, সীমা থেকে অসীমে উত্তরণের পথেই বোধ হয় সৌন্দর্যের সার্থকতা।

শব্দ ও অর্থ ধ্বনির দ্যোতনা 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শব্দ ধ্বনির ধ্বনি-তরঙ্গের উদাহরণ—

১। পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ? এ ধ্বনি নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল।....ধ্বনি যেন হর্ষবিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল।.....সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী, রমণী সুন্দরী ; ধ্বনিও সুন্দর, হৃদয় তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্যের লয় মিলিত লাগিল।"

২। চিত্র দৃশ্যে শব্দ-ধ্বনি—"ক্রমে সন্ধ্যা হইল। শীতকালের অনিবিড় মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যাও অতীত হইল। পৃথিবী অন্ধকারময়ী হইল। অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল।"

৩। "এই সুখাকাঙ্ক্ষা পার্বতী নির্ঝরিণীর ন্যায়,—প্রথমে নির্ম্মল, ক্ষীণ, ধারা বিজন প্রদেশ হইতে বাহির হয়, আপন গর্ভে আপনি লুকাইয়া রহে, কেহ জানে না ; আপনা আপনি কল কল করে, কেহ শুনে না।"

অর্থ-ধ্বনির দ্যোতনায় উপন্যাসের কাব্যময় জগৎ চমৎকার ধ্বনি-সাম্যে, অর্থপূর্ণ ব্যঞ্জনায় ভাবের উত্থান-পতনে কাজ করেছে। স্থান-কাল-পাত্রভেদে, অবস্থা-বিশেষে, বিভিন্ন মুহূর্তে অর্থ-ধ্বনি কাব্যিক ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পেয়েছে—

১। "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?"

২। "প্রদীপ নিবিয়া গেল"।

৩। "তখন ত আমি যোগিনীই ছিলাম।"

৪। "বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।"

৫। "কবরের মাটিতে মুখের আদর্শ থাকিবে।"

৬। " কিন্তু এইবার পাষাণ মধ্যে কীট প্রবেশ করিয়াছিল।"

৭। "পাষাণ দ্রব হইতেছিল।"

৮। "যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।"

৯। "মনুষ্য হৃদয় অনন্ত সমুদ্র, যখন তদুপরি ক্ষিপ্ত বায়ুগণ সমর করিতে থাকে, কে তাহার তরঙ্গমালা গণিতে পারে?"

১০। "আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।"

---'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে কাহিনী-বর্ণনায়, চরিত্র নির্মিতিতে, বিভিন্ন ঘটনার উত্থান-পতনে, ঘাত-প্রতিঘাতে, প্রকৃতি ও মানবলোকের চিত্র-দৃশ্যে শব্দ ও অর্থ ধ্বনির ছন্দোময় রূপ দেখা যায়। এই সমস্ত চিত্র, চরিত্রে একটা পূর্ণাঙ্গ বৃত্তের অবস্থিতি। 'বৃত্তের' পূর্ণতা প্রকৃতির চিত্র দৃশ্যে, ঘটনা-দৃশ্যে ও চরিত্রে, আবার সামগ্রিকভাবে কাহিনীতেও। প্রারম্ভিক পর্বে সূচনার সুর, মধ্যে গতিময়তা ও বৈচিত্র্য/বিস্তার, অন্তে বিচিত্র ধ্বনি তরঙ্গের লয়---বৃত্তের পূর্ণতা সামঞ্জস্যের ঐকতানে, ঐকতানের সৌন্দর্যে।

উপন্যাসের আখ্যায়িকায় অলংকরণের নানা চিহ্ন--ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার--বহিরঙ্গের উপকরণ অন্তরঙ্গের সৌন্দর্য-সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। বঙ্কিমের ব্যবহৃত ভাষা ছন্দ-সুষমায়, অর্থ-গৌরবে, ধ্বনি-সাম্যে, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-সমাসোক্তি অলংকার প্রয়োগে অখণ্ড সৌন্দর্যের দ্যোতনা দিয়েছে। মানবজীবন ও প্রকৃতিলোক খণ্ডিত রূপের হয়েও যে অখণ্ড অরূপের প্রতিধ্বনি/অভিব্যক্তি বঙ্কিমের দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েছিল। বহিঃপ্রকৃতি যেমন অন্তঃপ্রকৃতিতে সাড়া তোলে, বাহ্য ঘটনার অভিঘাত ও আনন্দের উপকরণ যেমন চিত্তের গভীরে ভাব সৃষ্টি করে, তেমনই বাহ্যরূপের সঙ্গে অন্তরঙ্গ অরূপ-ভাবের সমন্বয়ে সৌন্দর্যের পূর্ণ মূর্তি গড়ে ওঠে। বঙ্কিমের দৃষ্টিতে সৌন্দর্য-শোভার বিচিত্র রূপ-বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস আছে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে, কিন্তু তাঁর কবিত্বময় দৃষ্টিভঙ্গিতে অখণ্ড-অরূপের মাঝখানে খণ্ডিত রূপেরই বিন্যাস ঘটেছে। সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনা কেবল বস্তুগত রূপে নয়, সার্বিক ভাব সত্যেও বিধৃত। "সুন্দর জিনিষের বাইরের উপকরণে আর ভিতরের পদার্থে হরিহর আত্মা--যেমন রূপ তেমনি ভাব। বহিরঙ্গ যা তার সঙ্গে অন্তরঙ্গের অবিচ্ছেদ্য মিলন ঘটিয়ে সুন্দর বর্তমান হ'ল"। ('সুন্দর' প্রবন্ধ--অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। --'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে সৌন্দর্যের রূপ সুষমা অরূপের ব্যঞ্জনায় আনন্দানুভবের কারণ (Aesthetic pleasure) হয়েছে, "বর্ণ, আকার , গতি, রব ও অর্থপ্রযুক্ত বাক্য" সৌন্দর্য সৃজনের পথ তৈরি করে দিয়ে পূর্ণতা পেয়েছে---"ধ্বনিও সুন্দর ; হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্যের লয় মিলিতে লাগিল"।

চরিত্র-চিত্রণ

।। কপালকুণ্ডলা।।

চরিত্রসৃষ্টির দিক থেকে কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য শিল্পকুশলী সৃষ্টি--বাংলা সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী চরিত্র। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের কোন চরিত্রকেই কপালকুণ্ডলার সঙ্গে তুলনায় আনা যায় না। কালিদাসের শকুন্তলা, ভবভূতির কপালকুণ্ডলা, শেক্সপীয়ারের মিরান্দা বা পার্ডিটা, মিলটনের ঈভ্, ওয়ার্ডসওয়ার্থের লুসি কোন চরিত্রের সঙ্গেই কপাল চরিত্রের তুলনা চলে না। সাহিত্যে এ এক অভিনব চরিত্র। ভাব ও উপাদানের দিক থেকে কিছু কিছু মিল দেখা গেলেও এ চরিত্রের মৌলিক স্বভাবের দিকে তাকিয়ে বিদেশী সমালোচক আর, ডবলু, ফ্রেজার লিখেছেন—The novel throughout moves steadily its purpose. There is no over-elaboration, no undue working after-effect ; everywhere there are signs of the work of an artist whose hands falters not as he chisels out his lines with classic grace. The force that moves the whole with emotion and gives to it its subtle spell, is the mystic form of Eastern thought that clearly shows the new forms that lie ready for inspiring a new school of fiction with fresh life. Outside the Marriage de. Loti, there, is nothing comparable to the Kopala Kundala in the history of Western fiction. (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'কপালকুণ্ডলা'র ভূমিকায় প্রাপ্ত তথ্য)। অত্যন্ত সঙ্গত কথা-- অনবদ্য চরিত্র-সৃষ্টি হিসেবে কপালকুণ্ডলা বঙ্কিম প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান বলে বিবেচিত হবে।

প্রকৃতি দুহিতা কপালকুণ্ডলা "বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টিয়ান কর্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গ প্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা কালে এ সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন।..... .কাপালিক ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপন যোগসিদ্ধ মানসে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।" সুতরাং সমুদ্রবেষ্টিত অরণ্যানীর অপূর্ব রূপ-সৌন্দর্যের মাঝখানে, অনাবিল প্রকৃতি চেতনায় কপালিনী দীক্ষিতা। প্রকৃতির সঙ্গে তার যোগ আত্মিক--- এমনকি তাকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। প্রকৃতির রহস্যময়তায় কপালকুণ্ডলার জীবন দোলায়িত ছন্দে পরিণামমুখী। প্রথম আবির্ভাবের মুহূর্ত থেকে এই ছন্দের আভাস। তার অদৃশ্য, অবগুণ্ঠনাবৃত উপস্থিতি প্রকাশ্য দিবালোকে নয়—রাত্রির অন্ধকারে তার স্বচ্ছন্দ পদচারণা। দৈবী মূর্তির মোহিনী শক্তি, প্রকৃতির মত কাছে টানে, তার আকর্ষণ শক্তিও প্রবল—কিন্তু তা স্পর্শযোগ্য নয়। এমনই দুরধিগম্য তার চরিত্র-রহস্য। কপালের রূপমূর্তিতেও প্রকৃতি-লোকের অভিন্নতা-- "বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ম্ময় ; সে কটাক্ষ, এই সাগর হৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল।" প্রকৃতির অনাবিল রূপের মতো " রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ"। প্রকৃতির মতো সে অধরা, অপ্রাপনীয়া। নবকুমারের নাগালের বাইরে। মায়াবী মূর্তির অপরূপ রূপ-ব্যঞ্জনায়, অদৃশ্য জগতের আভাস পাওয়া যায় তার

লীলাচপল পদবিক্ষেপে---উপস্থিতি প্রমাণিত হয় শব্দ-ধ্বনির সুর-মূর্চ্ছনায়---"পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ? --- আবিষ্ট করে নবকুমারের চৈতন্যকে। কপাল চরিত্রে প্রকৃতি তাই বাহ্যজীবনের প্রতীক নয়, প্রকৃতি ও কপাল অভিন্ন ও একাত্ম। প্রকৃতি-শক্তি তার জীবন-পরিচালনায় নিয়ামক শক্তি।

কপালকুণ্ডলার চরিত্র স্বভাবের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে তার সারল্য, সঙ্কোচশূন্যতা, ভক্তিপরায়ণতা, নিঃস্বার্থপরতা, অনুকম্পা এবং শুচিতা বা পবিত্রতা, প্রকৃতির স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের ভিন্ন-রূপ। বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃতি-নারীকে ধ্যান করেছিলেন সাংখ্য-দর্শনের প্রকৃতিতত্ত্বের অনুগামী হয়ে-- কিন্তু উপন্যাস তো কেবল তত্ত্ব নয় তাই প্রকৃতির রূপ-দর্শনের মতো কপালকুণ্ডলাও অনির্বচনীয় রূপমূর্তিতে মায়াবীরূপ ধারণ করেছে। তবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতিরূপের অন্তরালে পরাশক্তির ঐশী লীলাকে কপাল-চরিত্রে গভীরভাবে কার্যকরী হতে দেখি। কালিকার পাদোপরি অভিন্ন বিল্বপত্র প্রদান ও পত্র পড়ে যাওয়ার পরিণতিতে তার ভক্তিমতী প্রাণে ঈশ্বরের অনিচ্ছার ইঙ্গিত প্রতিধ্বনিত হয়। স্বভাব স্বাধীন কপাল বন্য প্রকৃতিতে "বনোন্মত্তা"---"বোধকরি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।" সংসার জীবনে প্রবেশের পরেও তার প্রবল জীবন-অনাসক্তি, প্রকৃতির নিত্য আকর্ষণ ও ভবানীর অনিচ্ছার ইঙ্গিত তার জীবনকে ঔদাসীন্যে পূর্ণ করেছে। সুতরাং কপাল চরিত্রে প্রকৃতির দ্বিবিধ লীলা প্রত্যক্ষ করি ---এক সমুদ্র অরণ্যের নিরন্তর প্রভাব ও আকর্ষণ এবং দুই দর্জ্ঞেয় রহস্য শক্তির লীলা।

সমালোচক মোহিতলাল দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় ঐশী শক্তির লীলাকে কপালকুণ্ডলা চরিত্রে এভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন-- "এই কাব্যে এক প্রকার অদৃষ্ট বা অখণ্ডনীয় নিয়তির ক্রিয়া যেন অতিশয় প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ঐ কাহিনীর মূলে যে মহাশক্তির লীলা আছে বলিয়াছি অথবা যে শক্তির মহিমাই এ কাব্যের কল্পনা-বস্তু হইয়াছে, তাহাকেই যদি অদৃষ্ট বা সর্বজয়ী নিয়তি বলা হয়, তবে কপালকুণ্ডলার অদৃষ্টবাদকে একটু ভিন্ন বা বিশেষ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। কপালকুণ্ডলার কাহিনীতে,তাহার ঘটনাধারার গতি ও প্রকৃতিতে, আমরা যেন একটা দুর্বার ও প্রচ্ছন্ন শক্তির লীলা লক্ষ্য করি বটে, কিন্তু একমাত্র কপালকুণ্ডলার চিত্তে ও চরিত্রে সেই শক্তির সজ্ঞানতা এবং ভবিতব্যের দৃঢ়মূল দেখিতে পাই ; নতুবা এই উপন্যাসে যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহা মানব-প্রকৃতির বা বহিঃপ্রকৃতির, নৈসর্গিক নিয়মেই ঘটিয়াছে, ইহার দৈব-সংঘটনকে সাধারণ অর্থে দেবই বলা যায়, অদৃষ্টমূলক বলা যায় না।... কপালকুণ্ডলার ঐ 'অদৃষ্ট' সাধারণ মানবীয় সংস্কারের অদৃষ্ট নয়--উহা সেই দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় শক্তিরই লীলা।" (বঙ্কিম-বরণ)। আরণ্যক জীবনে কপালকে মানুষ করেছে প্রকৃতি, কিন্তু তার জীবনে দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় শক্তিরই লীলা। তার চৈতন্যের গভীরে এই পরাশক্তি ভবানী/কালিকার প্রভাবই পরিদৃষ্ট হয়। কপালের জীবনে সুখ-দুঃখের লৌকিক জীবনধারার পরে এই অদৃশ্য শক্তির লীলাকে প্রত্যক্ষ করি---"ভৈরবীও সৃষ্টিশাসনকর্ত্রী মুক্তিদাত্রী " এবং তিনিই "বিশ্বশাসন কর্ত্রী, সুখদুঃখবিধায়িনী, কৈবল্য দায়িনী।" কপালকুণ্ডলার অন্তঃপ্রকৃতিতে তাই সমুদ্র অরণ্যানীর নিরন্তর আকর্ষণের সঙ্গে প্রকৃতিরূপা পরাশক্তির ঐশী লীলার প্রভাব, তার চরিত্র-স্বভাবকে অপরূপ রূপে প্রকাশ করেছে---তার রূপের মধ্যে অরূপের অনির্বচনীয়তা, লৌকিক জীবনের মধ্যে অলৌকিকের রসব্যঞ্জনা।

কপালকুণ্ডলা চরিত্র প্রকৃতির দানে গড়ে ওঠা এক অপূর্ব ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্র। স্বভাব তার কোমল, করুণার্দ্র।---অপরের দুঃখে স্বভাবতই তার অন্তরের অকৃত্রিম দরদ। বিপদগ্রস্ত নবকুমারকে অনাবিল করুণায় সে বধ্যভূমি থেকে উদ্ধার করে, শ্যামাসুন্দরীর দুঃখে দুঃখ পায়। আবার, কাপালিক প্রতিপালিতা কপালকুণ্ডলা কাপালিককে ত্যাগ করে যেতেও দুঃখিত হয়। তার চিত্তধর্ম স্বাভাবিক

করুণা-মমতায় দীক্ষিত হলেও স্বভাব প্রকৃতিতে সে উদাসীন। সাংসারিক জীবনের কোন কিছুই তাকে আকৃষ্ট করে না। নারীসুলভ রূপচর্চায় তার অনাগ্রহ---অঙ্গসজ্জায় কবরীবন্ধনের প্রয়োজন হয় না। সংসার জীবনের প্রবল অনাসক্তির নেপথ্যে ভবানীর অশুভ সঙ্কেত ও সমুদ্রতট-অরণ্যানীর নিত্য আকর্ষণ---"আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।" স্বামী প্রেমের আকর্ষণ তার কাছে অনুভূত হয় না। তাই দ্বিধাহীন চিত্তে, নিরুদ্বেগে প্রতিযোগিনী মতিবিবিকে সে আপন অধিকার ছেড়ে দেয় নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যে--"অট্টালিকা, ধন, সম্পত্তি, দাস দাসীরও প্রযোজন নাই। আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব?" সংসারের মায়ার বন্ধন তার চিত্তে অনুপস্থিত। তার চরিত্র-লীলায় আদিম প্রকৃতির অকৃত্রিম রূপ। কাপালিক ও অধিকারী তার আরণ্যক জীবনে তেমন প্রভাব ফেলেছে বলে মনে হয় না। দেবী ভবানীর আরাধনায় কাপালিকের প্রতি তার অনুরাগ থাকলেও জীব বলী বিষয়ে তার অন্তরের সমর্থন ছিল না। অধিকারীর স্নেহলাভে সে অনুগৃহীতা হলেও, অধিকারীর পরে পিতৃতুল্য ভক্তির ভাব ছাড়া কপাল চরিত্রে অধিকারীর কোন সুদূর প্রসারী প্রভাব ছিল না। সুতরাং অরণ্য ও সংসার জীবনে কপালকুণ্ডলা মুক্ত ও স্বাধীন। তার জীবন-রহস্যের নেপথ্যে মুক্ত ও স্বাধীন ভাবনার গুরুত্ব আছে।

সংসার জীবনে প্রবেশের পূর্ববর্তী কপালকুণ্ডলার জীবন-পরিধি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও, তার আবির্ভাবে, দৈহিক রূপ-বিন্যাসের ইঙ্গিতে, স্বল্পবাক্ রমণীর সামান্য সংলাপে তার চরিত্রকে আভাসিত করেছেন বঙ্কিম অসামান্য ব্যঞ্জনায়। প্রকৃতি, পরাশক্তি কালিকা ও কাপালিকের তান্ত্রিক সাধনার প্রভাব তার সংসার জীবনকে আসক্তিতে পরিপূর্ণ করে তোলেনি। এই অনাসক্তির রূপ পর্যবেক্ষণ করে সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করেছেন---"তাহার অন্তরমধ্যে যে একটি চির-উদাসিনী আলুলায়িতকুন্তলা অতীত স্বাধীনতার দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছিল, তাহাকে সংসার শত আদর প্রলোভনেও পোষ মানাইতে পারিল না।" (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা)। দেবী পদে বিল্বপত্র অর্পণ প্রসঙ্গ কপালের সংসারজীবনকে কতকটা প্রভাবিত করলেও, তার এ জীবনের প্রতি প্রবল অনাসক্তির নেপথ্যে প্রকৃতির মতো ঔদাসীন্যবোধের নির্লিপ্ততা কাজ করে থাকবে। স্বভাবগত দিক থেকে প্রকৃতি ও কপালকুণ্ডলা অভিন্ন--উভয়েই উদাসীন ও আসক্তিহীন। অথচ প্রকৃতির বুকে নিত্য বিচিত্র রঙ-রূপের লীলা---কপালের জীবনও বৈচিত্র্যময় রূপ-লীলার অঙ্গীভূত। দৈবী শক্তির অদৃশ্য লীলায় প্রকৃতি ও মানবজীবন যে কত গভীরভাবে নিয়ন্ত্রিত, কপালকুণ্ডলা চরিত্র তারই উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বঙ্কিম সেই রূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন--শিল্পকুশলী মন নিয়ে গড়ে তুলেছেন সেই মানবী প্রতিমাকে। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস তারই ইতিবৃত্ত।

কপালকুণ্ডলার সরলতা, সংসার অনাসক্তি ও অনভিজ্ঞতার চিত্র-দৃশ্যে বঙ্কিম এই মানবী চরিত্রকে গড়ে তুলেছেন। মতিবিবি প্রদত্ত অলঙ্কারের প্রতি তার কোন আকর্ষণ নেই---স্বচ্ছন্দে ভিক্ষুককে দান করতে পারে। তার সরলতা--ভিক্ষুক দৌড়িল কেন?--অনুভব করতে অক্ষম। নবকুমারের সঙ্গে বিবাহ প্রসঙ্গে অধিকারীর বক্তব্য সে যথার্থভাবে অনুধাবন করতে পারে না। তার হৃদয়তলে প্রকৃতির দুর্নিবার প্রভাব, অন্তঃকরণে কাপালিকের সামান্য প্রভাব--চৈতন্যের গভীরে ভবানীর প্রভাব। মনে হয়, মানব সংসারের পরিদৃশ্যমান জগৎ তার চিত্তাকাশে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। ভাব জগতের প্রভাবে প্রভাবান্বিতা কপালকুণ্ডলা শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে কথোপকথনে সংসার অনভিজ্ঞতা ও অনাসক্তিকে প্রকাশ করে অনাবিল সারল্যে---"ভাল, বুঝিলাম। পরশপাথর যেন ছুঁয়েছি, সোনা হলেম। চুল বাঁধিলাম ; ভাল কাপড় পরিলাম ; খোঁপায় ফুল দিলাম ; কাঁকালে চন্দ্রহার পরিলাম ; কানে দুল দুলিল ; চন্দন, কুঙ্কুম, চুয়া, পান,গুয়া,সোনার পুত্তলি পর্য্যন্ত হইল। মনে কর সকলই হইল। তাহা হইলেই বা কি সুখ?" শ্যামার মঙ্গলের জন্য তার করুণাকাতর চিত্ত রাত্রিকালে বনৌষধি

সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত হলে, শ্যামার--"মন্দ লোকে মন্দ বলবে"--প্রত্যুত্তরে সরলা কপাল বলেছিল-"বলুক,তাতে আমি মন্দ হব না।" দাদাকে অসুখী করার প্রসঙ্গে কপালের উত্তর--"ইহাতে তিনি অসুখী হয়েন, আমি কি করিব? যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।" কপালের অন্তরে নারীসুলভ সংসার আসক্তি, ঈর্ষা জাগে না। মতিবিবিকেও স্বচ্ছন্দে সে আপন স্থান ছেড়ে দেয়--তার প্রতিটি পদক্ষেপে সরলতার ছন্দ-সুষমা, যা একান্তভাবেই প্রকৃতিময়তায় আচ্ছন্ন। এখান থেকেই তার সংসার অনাসক্তি ও ঔদাসীন্যের জন্ম।

কপালকুণ্ডলার সংসার জীবন সম্পর্কে এই অনীহা কতটা যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন উঠেছে। নবকুমার তার কাছে একান্তই এক 'ব্রাহ্মণ সন্তান', 'অপরিচিত ব্যক্তিমাত্র।' অঙ্গসজ্জা, অলঙ্কার প্রীতি, রূপচর্চা কোন কিছুই তাকে আকৃষ্ট করে না। এজন্য তার নারীত্ব যথার্থভাবে বিকশিত নয় বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন। মনে হয়, এ ধরনের মন্তব্য আংশিক সত্য। কপালকুণ্ডলার স্বভাবে নারীজনোচিত মমতাবোধ ও করুণা ছিল অবশ্যই। কাপালিক প্রসঙ্গে, অধিকারীর সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ কালে, ভিক্ষুকের আর্তিতে, শ্যামার দুঃখে এবং 'প্রেতভূমে' নবকুমারের প্রীতি মমতা-মাখানো সহমর্মিতাবোধের সুরে কপালকুণ্ডলার করুণার্দ্র চিত্তের পরিচয় আছে। তবে, স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্কের আভাসে, স্বামী প্রেমের ভাব তেমন প্রকাশ পায়নি, একথা সত্য। তার মূলে আছে কপালকুণ্ডলার স্বভাব-বৈরাগ্য বা স্বভাব-ঔদাসীন্য। ঐশী শক্তির প্রভাবে লীলাময় তার জীবন, প্রকৃতিলোকের নিরন্তর আকর্ষণ তাকে উদ্বেলিত করে, মুক্ত, স্বাধীন প্রকৃতির কোলে সে পদচারণা করতে উন্মুখ, আদিম আরণ্যক জীবনের সীমাহীন আকর্ষণে তার সংসার জীবন হয়েছে ম্লান, অসম্পূর্ণ। এ চরিত্রের প্রকৃতিই আলাদা। সুতরাং কপাল চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গেলে তীক্ষ্ণ বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ই যথেষ্ট নয়---প্রয়োজন প্রকৃতি দুহিতাকে অনুভব করার মতো বস-বোধের। সেখানেই ঐ চরিত্রের প্রতিষ্ঠা। সমালোচক মোহিতলাল ও প্রসঙ্গটিকে যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করেছেন---"গ্রন্থকার তাহার সেই অনমনীয়, অতি মানবীয় প্রকৃতির মধ্যেও যতদূর সম্ভব রক্ত মাংসের বাস্তবতা রক্ষা করিয়াছেন। প্রথমতঃ নারী প্রকৃতিসুলভ দুর্বলতা হইতে সে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়, পালক পিতার প্রতি কন্যার মত স্নেহভক্তিও তাহার আছে। দ্বিতীয়তঃ তাহারও একপ্রকার ধর্মবিশ্বাস ও তজ্জনিত মিথ্যা ভয় (Superstition) আছে (বিল্বপত্রের ঘটনা)। তৃতীয়তঃ শ্যামাসুন্দরীর দুঃখে সে যে দুঃখ অনুভব করে, তাহাও একটা সহজ নারীসুলভ সহানুভূতি। এই জন্য, যদিও তাহার চরিত্রের আর সকল লক্ষণ অতিরিক্ত সরলতা, ঘোরতর স্বার্থশূন্যতা ও চিত্তের দুর্দমনীয় স্বাধীনতাস্পৃহা---এ সকলই তাহাকে কবি-কল্পিত একটি মানসী প্রতিমা করিয়া তুলিয়াছে, তথাপি ঐ অপর লক্ষণগুলি সেই আদর্শকে সম্পূর্ণ অবাস্তব হইতে দেয় নাই।"

সংসার জীবনে মৃন্ময়ীর প্রবল অনাসক্তি ও ঔদাসীন্যে অঙ্গসজ্জায় আলুলায়িত কুন্তলা, অন্তর মানসে প্রকৃতি দুহিতা-তাই বনেন্মোত্তা, অন্তঃকরণে তান্ত্রিক কাপালিকের প্রভাবপুষ্টা, আর তার জীবন-বৃত্তে রহস্যময়ী ঐশী শক্তির লীলা। শুধু একটিমাত্র ক্ষেত্রে কপালের জীবনে কাপালিকের প্রভাব আছে---"কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণ সম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান ; তান্ত্রিক যেরূপ কালিকা প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় পরপ্রাণ সংহারে সঙ্কোচশূন্য, কপালকুণ্ডলা সেই আকাঙ্ক্ষায় আত্মজীবন বিসর্জ্জনে তদ্রূপ। কপালকুণ্ডলা যে কাপালিকের ন্যায় অনন্যচিত্ত হইয়া শক্তি প্রসাদ প্রার্থিনী হইয়াছিলেন, তাহা নহে ; তথাপি অহর্নিশ শক্তিভক্তি শ্রবণ, দর্শন ও সাধনে তাহার মনে কালিকানুরাগ বিশিষ্ট প্রকারে জন্মিয়াছিল।" তান্ত্রিক সাধনার উপাস্য দেবী পরাশক্তি কালিকার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির অন্যতম কারণ অবশ্যই কাপালিক। কপালের জীবনে কাপালিকের এটুকুই সীমাবদ্ধ ভূমিকা।

কিন্তু " যে সৌন্দর্য এবং যে ভাববস্তুকে কেন্দ্র করিয়া এই কাহিনী আরব্ধ ও সমাপ্ত হইয়াছে,

কবি প্রথমেই তাঁহার সেই অবাস্তব রমণীয় মানসী-প্রতিমাকে যেরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে এবং পরিপূর্ণ মহিমায় আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত করিয়াছেন, তাহাতেই তাহার আদি ও শেষ পরিচয় রহিয়াছে---গ্রন্থের শেষ দৃশ্যে আমরা সেই অপার্থিব মনোহর কাব্য কুসুমটিকে তাহার সেই এক স্বভাবের বশেই ঝরিয়া পড়িতে দেখি।" (বঙ্কিম বরণ)। কপালের কাছে ভৈরবী সৃষ্টি-শাসনকর্ত্রী এবং মুক্তিদাত্রী। তার জীবনকে আচ্ছাদিত করে আছে এই ঐশী শক্তির লীলা। তাই--"সেই বিশ্বশাসনকর্ত্রী, সুখদুঃখবিধায়িনী, কৈবল্যদায়িনী ভৈরবী স্বপ্নে তাহার জীবন সমর্পণ আদেশ করিযাছেন। কেনই বা কপালকুণ্ডলা সে আদেশ পালন না করিবেন।" (৪র্থ/৮ম পরিচ্ছদ)। কবিচিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলাকে অদৃষ্ট-তত্ত্বের অনুগামী করেছেন। দস্যু কর্তৃক পরিত্যক্ত অরণ্যময় জীবনে, কাপালিক সংসর্গে, নবকুমারের সঙ্গে পরিচয়, বিবাহ ও সংসার জীবনে--তার জীবন চক্রের প্রতিটি স্তরে দৈব শক্তির অনিবার্য প্রভাব। তার জীবন ট্র্যাজেডিব অন্তিম পর্ব ঈশ্বর নির্দেশিত পথেই পবিসমাপ্ত হয়েছে। তবে, তার এই পরিণতিকে ট্রাজেডি বলাও বোধ হয় সঙ্গত নয়। কারণ, ভৈরবীর নির্দেশ পালনে কপালকে দেখি আত্মসন্তুষ্টা এক নারী রূপে--কোন ক্ষোভ, বঞ্চনা, বেদনা তার চিত্তকে স্পর্শ করে নি। অপূর্ব নির্লিপ্ততায় দেবী আজ্ঞা পালনের জনাই তার কৃতসঙ্কল্পতা---পবিত্র, বিশুদ্ধ আত্মার দেবীচরণে আত্মবিসর্জন। কপালকুণ্ডলা সত্যই বঙ্কিমচন্দ্রের এক অনবদ্য সৃষ্টি।

।। নবকুমার ।।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের আখ্যানবস্তু সংক্ষিপ্ত--সংখ্যার দিক থেকে চরিত্রও কম। গুটিকয়েক চরিত্রেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য কপালকুণ্ডলা, নবকুমার, কাপালিক ও মতিবিবি। কপালকুণ্ডলা চরিত্র উপন্যাসের নায়িকা--আখ্যানের কেন্দ্রীযভাব কপালকুণ্ডলার দ্বারাই আবর্তিত। তার জীবনে প্রকৃতির প্রভাব ও ঐশীশক্তির লীলা দেখানো লেখকের উদ্দেশ্য। পাঠকেরও মুখ্য সহানুভূতি কপালকুণ্ডলা চরিত্রের পরেই নিবদ্ধ। "নবকুমারের প্রত্যেকটি গুণ, বিশেষতঃ তাহার সুগভীর প্রেম এবং তাঁহার ধৈর্য, গাম্ভীর্য ও আত্মত্যাগ--সকলই কপালকুণ্ডলার বৈশিষ্ট্যবিকাশের জন্য একান্তরূপে প্রয়োজনীয়। তাঁহার প্রতি পাঠকের যে সহানুভূতি জন্মে তাহা গভীর হইলেও গৌণ।...সেইজন্য আমরা কপালকুণ্ডলাকে নায়িকা বলি, কিন্তু নবকুমারকে নায়ক বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।....নায়কহীনতাই কপালকুণ্ডলা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের গৌরব।" (অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত)। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পুরুষচরিত্র অপেক্ষা নারীচরিত্রই অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলতর সন্দেহ নেই। এ উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র অবশ্যই নবকুমার এবং একই সঙ্গে সে নায়ক চরিত্রও বটে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, নবকুমারকে উপন্যাসের নায়ক চরিত্র বলা যায় কিনা।

আধুনিককালে ব্যক্তিত্বের মহত্ত্বকে নায়কচরিত্রেব অন্যতম গুণ বলে গণ্য করা হয়। চরিত্রের দোষগুণের মাত্রা পরিমাপের বিচারে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গীই আসল কথা। নায়ককে মহৎ বা ধীরোদাত্ত হতেই হবে এমন বিচার সাম্প্রতিক কালে অচল। সাধারণ মাপের মানুষের মধ্যেও শিল্পী তাঁর পাঠকের সহানুভূতিশীল দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিতে পারেন। সুতরাং উপাদান বড়ো কথা নয়--কথা হ'ল রসসৃষ্টির। নায়কের উদ্যম বা ক্রিয়াশীলতা বলতে দৈহিক, মানসিক বা আত্মিক ক্রিয়ার কথাই বুঝি। এসব বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের বিচার সম্ভব।

উপন্যাসের সূচনাপর্বে, যাত্রিশেষের কুজ্ঝটিকায় দিক্‌ভ্রান্ত নৌকারোহীদের সঙ্গে নব্যযুবক নবকুমার

যে অরণ্যবেষ্টিত সমুদ্রতটে বিসর্জিত হ'ল, সেখান থেকেই কাহিনীর সূত্রপাত। সাগরসঙ্গমে তীর্থদর্শনে তার আগ্রহ নেই--পুণ্য অর্জনের জন্য শাস্ত্রবিধি মেনে তার আগমন নয়। সমুদ্র-দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় সে নৌকারোহীদের সহযাত্রী। নবকুমার চরিত্রের প্রথম আবির্ভাবেই ঔপন্যাসিক তার মধ্যে নিসর্গপ্রীতি ও সৌন্দর্যতন্ময়তার ভাবকে স্পষ্ট করেছেন। নবকুমারের সৌন্দর্যপ্রীতি, রূপমুগ্ধতা তার চরিত্র-স্বভাব। নীলবর্ণ সমুদ্রের নয়নমুগ্ধকর বেলাভূমি---তমাল ও তালীবন সমাকীর্ণ সমুদ্রতট, তার হৃদয়ের ভাবসৌন্দর্যলোককে মোহিত করে। আবার, আধুনিক মানসিকতায় যুক্তিবাদী সে। শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত অর্থ যুক্তিশৃঙ্খলায় তার কাছে স্পষ্ট---"যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।" আধুনিক যুক্তিবাদী মননে, সৌন্দর্যপ্রীতি ও প্রকৃতিপ্রেমে প্রথম দু'টি পরিচ্ছেদেই নবকুমার নায়কোচিত গুণসম্পন্ন উল্লেখযোগ্য পুরুষচরিত্র বলে গণ্য হয়েছে। তার শিক্ষা, বুদ্ধি, সামাজিক জ্ঞান ছিল অত্যন্ত প্রখর। প্রথম আবির্ভাব সূত্রেই তার চমৎকার পরিচয় আছে। উত্তরকালের ঘটনাবৃত্ত এই স্বভাব-পরিচয়ের দ্বারাই তার চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

নবকুমারকে কেন্দ্র করে উপন্যাসে এক একটি চরিত্রের আবির্ভাব ঘটেছে---কাপালিক, কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি---নবকুমারের জীবনে আবির্ভূত হয়ে তার জীবনকে যেন নিয়ন্ত্রিত করেছে। কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখলেও অধিকারী, শ্যামাসুন্দরী বা পেষমন, নবকুমারের জীবনে পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়েছে। নবকুমারকে বঙ্কিম কাহিনীর মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নদীতে জোয়ার আসার কারণে নির্জনতটে বিসর্জিত নবকুমারকে নিয়ে কাহিনী গড়ে উঠেছে। সুতরাং এদিক থেকেও নবকুমারকে নায়ক চরিত্র বলে গণ্য করতে হয়। তবে উপন্যাসের নামকরণ, ভাববস্তু পাঠকের দৃষ্টি-আকর্ষণকারী চরিত্র কপালকুণ্ডলার পরে নিবদ্ধ। তাই নবকুমারকে নায়ক চরিত্ররূপে কল্পনা করার ক্ষেত্রে সংশয়ের অবকাশ আছে। তথাপি একথা স্বীকার্য, ঔপন্যাসিকের বৈচিত্র্যময় মানবদর্শনের সেই কেন্দ্রীয় চরিত্র---কারণ তারই চরিত্র আশ্রয়ে কাহিনীর বিবর্তন।

নবকুমার ব্রাহ্মণসন্তান, মৃদুভাষী, উদারচিত্ত, পরোপকারী, সংযত ও পরিশীলিত এক ব্যক্তিত্ব। তার রূপমুগ্ধতা প্রকৃতি ও নারী উভয়কে ঘিরেই আবর্তিত। নবকুমার চরিত্রে কোন আদর্শবাদের অন্বেষণ করেননি শিল্পী---তার গভীর জীবনবোধের সত্য অনুসন্ধানে তিনি আগ্রহী। তারই রূপরেখায় এই চরিত্র নির্মিত। শাস্ত্রানুমোদিত সংস্কারের দাসত্ব সে করে না, অপরের ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রয়োজনে সে কাষ্ঠাহরণে শত বিপদের সম্ভাবনাকেও অবজ্ঞা করতে পারে। নবকুমারের পরিশীলিত, মার্জিত রুচি ও সংযতভাব তার ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বলরেখায় চিত্রিত করেছে।

সমুদ্রদর্শনের সৌন্দর্যানুরাগ দিয়ে নবকুমারের উপস্থিতি সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি---অপূর্ব কপালকুণ্ডলা ও অপরূপা মতিবিবি দর্শনেও সেই সৌন্দর্যানুভূতি রূপানুরাগে প্রসারিত হয়েছে। তার চরিত্র-গভীরের এই বিশেষ আকর্ষণ, তার স্বভাব রূপের অন্যতম পরিচায়ক। এরই দ্বারাই সে নিয়ন্ত্রিত। তার ভাগ্যাকাশে সুখ-দুঃখের নিরন্তর ওঠাপড়ার মধ্যে রূপমুগ্ধতার প্রবল প্রভাব আছে। এমনকি, এই রূপমুগ্ধতা তার জীবনবৃত্তের ট্রাজেডি। বঙ্কিমচন্দ্র গভীর জীবন দর্শনের আলোকে মানবজীবনের মূলীভূত রহস্যের অনুসন্ধান করেছেন---"রূপবহ্নি, ধনবহ্নি, মান-বহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে---আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি।" কপালকুণ্ডলা চরিত্রের উৎস ও পরিণাম একই বৃত্তের কেন্দ্রাভিমুখী শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নবকুমারের রূপমুগ্ধতা তার দৃষ্টিভঙ্গীর অন্যতম দিক হলেও, এই চরিত্রের সূচনা আছে, বিবর্তন আছে, সুখ ও দুঃখের পরিণতি আছে। তার ক্রিয়াশীলতা পরিবর্তনশীল জীবন কাহিনীর চিত্তাকর্ষক রূপ-নির্মাণে সাহায্য করেছে---কপালের মতো একই

বৃত্তে আবর্তিত হয়নি। নবকুমারকে নায়ক চরিত্ররূপে উপস্থাপিত করার এখানেই যৌক্তিকতা।

সমালোচক অধ্যাপক অরুণকুমার বসু 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের নবকুমার চরিত্র পর্যালোচনায় লিখেছেন—"মনোভাব ও সূক্ষ্মচিদ্‌বৃত্তিতে আধুনিক হয়েও নবকুমার তিনটি কালচেতনার অভিজ্ঞতার দ্বারা স্পৃষ্ট। একটি প্রাগৈতিহাসিক বিশ্বাসের কাল, একটি সময়রেখাহীন অসীম কাল এবং আর একটি নির্দিষ্ট দেশনামযুক্ত ইতিহাসের কাল। কাপালিক, কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবি যথাক্রমে এই তিনটি কালের প্রতীক। নবকুমারকে ঘিরে এই তিনটি কাল একই সময়ে আবির্ভূত হয়েছে।" নবকুমারের জীবনে এই তিন চরিত্র তিন কালের প্রতীকী ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ চরিত্র হলেও এদেরই প্রত্যক্ষ সহযোগিতা বা সক্রিয়তায় তার জীবন-কাহিনীর ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে। অবশ্য এক্ষেত্রে নবকুমারের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী, তার মোহগ্রস্ত রূপান্ধতা, সংশয়ের দোলায় দোলায়িত চিত্ত-বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে কাজ করেছে সন্দেহ নেই।

সহযাত্রীদের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ক্লান্ত নবকুমার, আকাশ, প্রান্তরের নির্জনতায় ও সমুদ্রে কল্লোলিত গর্জন ও 'কদাচিৎ বন্য পশুর রবে'র মাঝখানে 'শিখরাসীন ধ্যানরত 'অদ্ভুতদর্শন কাপালিককে দেখে এবং মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তার অনুসরণ করে। প্রকৃতির অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা ও বন্যপশুদের বিচিত্র কর্কশধ্বনির মধ্যে কাপালিকের দর্শনলাভ ঘটে নবকুমারের। আবার এই সমুদ্রতটে, বিপরীত প্রকৃতি-পরিবেশে "অপূর্ব্ব মূর্ত্তি" কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ লাভ—"এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল"। তারপর নবকুমারের রূপমুগ্ধ দৃষ্টিতে কপালকুণ্ডলার অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী রূপ—"যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে।"—এবং "তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে, সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।"—মোহিনীশক্তি কেবল কপালচরিত্রের বৈশিষ্ট্যে সীমাবদ্ধ নয়—রূপান্ধ নবকুমারের চিত্তলোকেই সে অনুরাগের অস্তিত্ব। তাই—'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' —এই অপূর্ব কণ্ঠস্বর ধ্বনিতবঙ্গে তাকে মোহিত করে ফেলে—তার চৈতন্য আবৃত হয়ে পড়ে। মনের মধ্যে মায়াবী নারীর রূপমাধুর্য, কণ্ঠস্বর, ছন্দিত ভঙ্গিমা সুর-মূর্চ্ছনায় তরঙ্গ তোলে। মোহগ্রস্ত নবকুমার রূপ-বহ্নিতে আত্মাহুতি দেবার আয়োজন করে।

কাপালিকের বধ্যভূমি থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত নবকুমার অধিকারীর সহায়তায় কপালকে বিবাহ করে এবং স্বদেশে উপনীত হয়। নবকুমারের প্রণয়মুগ্ধতার চিত্র আছে এখানে—"জলরাশির গতিমুখ হইতে বেগনিরোধকারী উপলমোচনে যেমন দুর্দম স্রোতোবেগ জন্মে, সেইরূপ বেগে নবকুমারের প্রণয়সিন্ধু উছলিয়া উঠিল।...সকল সংসার সুন্দর বোধ হইতে লাগিল।" (৩য়/৫মপরিঃ)। কিন্তু নবকুমারের এই প্রেমবোধে উচ্ছলতা ছিল না—এই প্রেম তাকে প্রগল্‌ভ করেনি। সংযতচিত্তে সে কেবল রূপান্বেষণে মগ্ন ছিল—তাই "এই প্রেমাবির্ভাব সর্বদা কথায় ব্যক্ত হইত না"। সংসার জীবনের প্রাত্যহিক জীবনচিত্রের আর তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়নি সত্য, কারণ এই সময় কাহিনীর দৃষ্টি অন্য প্রসঙ্গে নিবিষ্ট ছিল। ফলে নবকুমারের দীর্ঘ অনুপস্থিতি দেখা যায়। কিন্তু তাতে নবকুমার চরিত্রের গুরুত্ব অস্বীকৃত হয়নি। আখ্যায়িকার গতি ও পরিণামে নবকুমারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপস্থিতি অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। অতঃপর, গভীর রাত্রে বনমধ্যে ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে কপালের সাক্ষাৎকার দৃশ্যকে ঘিরে নবকুমারের সংশয় ও সন্দেহের সূত্রপাত। নবকুমারের আশঙ্কা ও সন্দেহের গভীরে কোন কোন সমালোচক পদ্মাবতী চরিত্রকে কেন্দ্র করে নবকুমারের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করেছেন। কপাল চরিত্রের প্রতি নবকুমারের সন্দেহের নেপথ্যে এ ভাবনা কাজ করে থাকবে। যাই হোক, কাপালিকের সান্নিধ্যে নবকুমারের সন্দেহ সংশয় নিশ্চয়তার রূপ নেয়। তার জীবন-ট্রাজেডি অনিবার্য হয়ে ওঠে। অন্তিমলগ্নে নবকুমার মৃণ্ময়ীকে আপন অন্তরের সত্য অনুভব ব্যক্ত

ক রেছে---"তুমি ত কখন রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই।" নবকুমারের সত্য-মিথ্যার চেতনা হারানোর নেপথ্যেও কাজ করেছে এই রূপান্ধতা---বঙ্কিমের জীবন-দর্শনের অঙ্গীভূত 'রূপ-বহ্নি'। আর এই রূপ-বহ্নির অনিবার্য পরিণতিতে কপালের সঙ্গে নবকুমারেরও আত্মবিসর্জন। মানব জীবনে গভীরতর ট্রাজেডির রূপচিত্র।

কপালকুণ্ডলার প্রতি কেবল রূপমুগ্ধতা নয়, মতিবিবির ক্ষেত্রেও এই রূপতন্ময়তা কাজ করেছে। কিন্তু তার প্রকৃতি আলাদা। অধিকারীর 'আশ্রয়ে' অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে কপালকে সে বিবাহ করেছিল প্রাণরক্ষাকর্ত্রীর মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে। নবকুমার অকৃতজ্ঞ নয়---আবার প্রথম দিকে সে যে কপালকে বিবাহ করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, তার মূলে ছিল তার ব্যক্তিগত সুবিবেচনা। আর এই সুবিবেচনার বশবর্তী হয়ে নবকুমার মতিবিবিকেও গ্রহণ করেনি। মৃণ্ময়ীর রূপ ও প্রণয়ের প্রতি আকর্ষণ তার জীবনে অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই কপালকুণ্ডলার আবর্তে তার বিচরণ এবং জীবন পরিণাম। তবু, বঙ্কিমচন্দ্র নবকুমারের রূপমুগ্ধতাকে একটু বিস্তৃত পটভূমিকায় স্থাপন করেছেন। মতিবিবির অপরূপা রূপ-মূর্তি দর্শনে তার ইঙ্গিত আছে---"অপরিচিতা রমণীকে সুন্দরীপ্রধানা বলিয়া অনুভব হইবে।....তাহার কটাক্ষ স্থির, অথচ মর্ম্মভেদী।.... যেন সে নয়ন মন্মথের স্বপ্নশয্যা।" তার এই আবিষ্ট রূপমুগ্ধতাকে নিয়ে মতিবিবিও পরিহাস করেছে। বঙ্কিম কেবল মতিবিবির রূপচিত্র অঙ্কন করেননি-- নবকুমারের চেতনায় এ রূপ যে রূপানুধ্যানে আবিষ্ট, তারও পরিচয় রেখেছেন। এছাড়া, নবকুমারের আত্মসংযমবোধের উদাহরণ পাওয়া যাবে তৃতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে। চরণতলে মতিবিবি নবকুমারের অনুগ্রহপ্রার্থিনী --কিন্তু নবকুমার (পূর্বতন স্ত্রী) যবনীকে গ্রহণে সম্মত হলেন না---"আমার আশা ত্যাগ কর।" কেবল রূপান্ধতার মোহে নবকুমার নিজের জীবনকে অসংযমী করে তোলেনি। অথচ তার সুযোগ ছিল প্রচুর। বাধা কেবল ধর্মগত নয় এবং সে বাধা অতিক্রম করা অসম্ভবও নয়। আসলে চিত্তসংযম, যুক্তিবাদিতা ও ইউরোপীয় শিভালরির কিছু গুণ বঙ্কিম এ চরিত্রে দেখিয়েছেন। চরিত্রটির সৌন্দর্য এখানেই।

বঙ্কিমচন্দ্র নবকুমারকে সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ করে গড়ে তুলেছেন। উপন্যাসের বাস্তবভিত্তি এ চরিত্র সংযোজনে দৃঢ় হয়েছে সন্দেহ নেই। পুরুষ ও প্রকৃতিদুহিতা নারীকে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনদর্শন অভিনব রূপে প্রকাশ পেয়েছে। কপালকুণ্ডলার নিয়তি নির্দিষ্ট মৃত্যু এবং নবকুমারের রূপমোহে আত্মবিসর্জন---মানবজীবনের গভীরতর ট্রাজেডির চমৎকার জীবনালেখ্য রচনা করেছেন ঔপন্যাসিক। যাই হোক, নবকুমার চরিত্র এই উপন্যাসের নায়ক-চরিত্র। তার doing এবং suffering রূপমুগ্ধতাহেতুই ঘটেছে। কপালের রূপে মুগ্ধ হয়ে এবং অবস্থার চাপে যদি তার বিবাহ হয়ে থাকে, তাহলে এই কার্যের অবশ্য পরিণাম---তার ভোগান্তি, যা শুরু হয়েছে কপাল চরিত্রের প্রতি সন্দেহের সূত্রপাত থেকে। সেই আত্মযন্ত্রণার দীর্ঘায়ত অবকাশ আখ্যানে না থাকলেও উপন্যাসের পরিণতি নবকুমারের সন্দেহ-সংশয়রূপ ভোগান্তির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। সুতরাং উপন্যাসের ভাববস্তুকে পরিপূর্ণতা দেওয়ার ব্যাপারে নবকুমারের ভূমিকার কথা স্মরণ করে তাকেই "কপালকুণ্ডলা" আখ্যায়িকার নায়ক চরিত্র বলতে হয়।।

।।পদ্মাবতী লুৎফ-উন্নিসা মতিবিবি ।।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে সর্বাধিক চিত্তাকর্ষক চরিত্র হ'ল মতিবিবি। মতিবিবির রূপবর্ণনায় বঙ্কিম তার স্বভাব প্রকৃতির ইঙ্গিত দিয়েছেন---"যেন সে নয়ন মন্মথের স্বপ্নশয্যা। কখনও বা লালসাবিস্ফারিত, মদনরসে টলটলায়মান। আবার কখনও লোলাপাঙ্গে ক্রূর কটাক্ষ---যেন মেঘমধ্যে

বিদ্যুদ্দাম। মুখকান্তিমধ্যে দুইটি অনির্বচনীয় শোভা; প্রথম সর্বত্রগামিনী বুদ্ধির প্রভাব, দ্বিতীয় আত্মগরিমা।" বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতিধ্যানের অনিবার্য ফলশ্রুতি যদি প্রকৃতি-দুহিতা কপালকুণ্ডলা হয়, তাহলে মতিবিবি হ'ল বাস্তবজীবন থেকে আহৃত এক অপূর্ব নারীচরিত্র। কপালকুণ্ডলার সঙ্গে তার পার্থক্য একান্তই চরিত্র-স্বভাবের প্রকৃতিগত। মতিবিবি চরিত্রে কপালের মত সারল্য, ঔদাসীন্য, প্রকৃতিশক্তির অনুবর্তী নিসর্গলোক ও ভবানীর নিত্য আকর্ষণ নেই--- কপালের মত পবিত্র ও শুদ্ধ চেতনায় সে দীক্ষিত নয়। সংসার অনাসক্তি ও ঔদাসীন্য মতিবিবির চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে না। কপালের মতো নিরাসক্ত, আত্মভোলা স্বভাবপ্রকৃতি তার নয়। বরং সব দিক থেকে 'কপালকুণ্ডলা' বৃত্তের বাইরে মতিবিবির অবস্থিতি। তার প্রখর বুদ্ধি ও আত্মগরিমাবোধ, 'দুর্দ্দমবেগবতী' মনোবৃত্তি, প্রবৃত্তিব বাধাবন্ধনহীন কামনা-বাসনা, সৎ ও অসৎ কর্মে সমান আগ্রহী, মতিবিবি নামক নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে মতিবিবি ইহজীবনের সাধনা করেছে। তাই উপন্যাস অংশের নায়িকা অবশ্যই মতিবিবি।

কবি-সমালোচক মোহিতলাল মতিবিবির চরিত্র পর্যালোচনায় লিখেছেন---"মতিবিবি চিরন্তনী নাবী -পুরুষেব ভোগ-সহচরী, তাহাব সুখদুঃখবিধায়িনী, বাসনাকামনাময়ী, মোহিনী, নায়িকারূপিণী নাবী! নারীর এই মূর্ত্তিই শ্রেষ্ঠ কবিগণের কল্পনাকে যেমন উদ্বুদ্ধ, তেমনই মূর্চ্ছিত করিয়াছে। যে কয়টি গুণ এইরূপ নারীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাহার প্রায় সবই মতিবিবিব চবিত্রে আছে---কামনা-উদ্রেককারী (voluptuous) রূপ, প্রখর বুদ্ধি, সাহস বা প্রগল্‌ভতা এবং সুনিপুণ রসিকতা শক্তি।" তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে বঙ্কিম মতিবিবির চরিত্র ব্যাখ্যাকালে বলেছেন---"মতির চবিত্র মহাদোষ-কলুষিত, মহদ্‌গুণেও শোভিত।" দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা পদ্মাবতী নবকুমারেব প্রথমা পত্নী---কিন্তু পিতা রামগোবিন্দ ঘোষালের মুসলমান ধর্মগ্রহণের ফলে পদ্মাবতী লুৎফ-উন্নিসাতে পরিণত হ'ল। পিতার সঙ্গে আগ্রায় বসবাসকালে পদ্মাবতী 'পারসীক, সংস্কৃত, নৃত্য, গীত, রসবাদ ইত্যাদিতে সুশিক্ষিতা হইলেন। বাজধানীর অসংখ্য রূপবতী গুণবতীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্যা হইতে লাগিলেন।" লুৎফ উন্নিসা "ধর্ম্ম সম্বন্ধে" নীতিহীন। ওমরাহদেব সাহচর্যে তার "যৌবনকালের মনোবৃত্তি" দুর্দমনীয় হয়ে উঠলে, তার পিতা তাকে গৃহ থেকে বহিষ্কৃত করেন। লুৎফ-উন্নিসা গোপনে যাদের "কৃপা প্রদর্শন" করতেন তাদের মধ্যে অন্যতম যুবরাজ সেলিম। যুবরাজ তাকে প্রধানা মহিষীর (মানসিংহের ভগিনী) প্রধানা সহচরী করেন। কিন্তু শের আফগানের স্ত্রী মেহেব-উন্নিসা আকবরেব মৃত্যু হলে সেলিমের মহিষী হবেন, এই সম্ভাবনায় লুৎফ-উন্নিসা সিংহাসনের আশা ত্যাগ করেন।

পদ্মাবতী নিতান্ত ব্রাহ্মণপুরুষ নবকুমারের পত্নী---অথচ আগ্রার রাজৈশ্বর্যময় জীবনে সে "ভোগ-সহচরী"---তাই লুৎফ-উন্নিসা। লুৎফ-উন্নিসার জীবনে প্রেমবোধ জাগরিত হয়নি, "কুসুমে কুসুমে বিহারিণী ভ্রমরীব" মতো প্রবৃত্তিকেই জীবনেব একমাত্র অবলম্বন কবেছিল সে। ঐশ্বর্যের স্বর্গভূমিতেই যেন তার প্রতিষ্ঠা---চিত্তবৃত্তির অবাধ প্রশ্রয়ে তার অনুরাগ---চিত্ত-চাঞ্চল্য তার স্বভাব। কূটবুদ্ধি বা ষড়যন্ত্রে সে অগ্রগণ্যা---দুঃসাহসিক সংকল্পে (মানসিংহের ভগ্নী) সেলিমের প্রধানা মহিষীর পুত্র খসরুকে সে সিংহাসনে বসাতে আগ্রহী। সেলিমের প্রতি প্রতিশোধস্পৃহা তার এতই প্রবল। ভোগ ও ঐশ্বর্যেব স্বর্গভূমি তার বিচরণক্ষেত্র---তাই বঙ্কিম সুকৌশলে তার চরিত্র-স্বভাবকে লুৎফ-উন্নিসা নামের মধ্যে ব্যঞ্জিত করেছেন। এ চরিত্র যেন পদ্মাবতী নয়---ভ্রমণকালে ছদ্মনাম মতিবিবিও নয়। মতিবিবি তার তৃতীয় রূপ---সে রূপের মধ্যে প্রেমবোধ সঞ্চারিত হয়েছে। আত্মকৃচ্ছ্রতায় সে প্রেম স্বচ্ছন্দে, অবলীলায় ভোগৈশ্বর্যের স্বর্গভূমি ত্যাগ করতে পরাঙ্মুখ নয়। নবকুমারের প্রতি তীব্র প্রণয়াকৃতিতে মতিবিবি এক স্বতন্ত্র নায়িকা। "কেবল তোমার দাসী হইতে চাহি। তোমার যে পত্নী হইব, এ গৌরব চাহি না, কেবল দাসী!"---মতিবিবির এ রূপের মধ্যে আত্মনিবেদনে উৎকণ্ঠিত

এক নাবীর জীবনাকৃতি যেন গভীর আর্তিতে প্রকাশ পেয়েছে।

কিন্তু তবু মতিবিবির চরিত্র-রূপের মধ্যে পদ্মাবতী ও লুৎফ-উন্নিসার কিছু স্বভাব-বৈশিষ্ট্য থেকে গিয়েছিল---তাই কখনও সে পদ্মাবতী, কখনও লুৎফ-উন্নিসা আবার কখনও বা মতিবিবি। নবকুমার জাতিভ্রষ্টা পদ্মাবতীকে পরিত্যাগ করেছিল---চক্ষু প্রদীপ্ত করে---"দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা তখন সদর্পে তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল"। যে আত্মগরিমাবোধ এই নারীচবিত্রের বৃত্তিসত্তার সঙ্গে জড়িত ছিল, তারই কিছু ভিন্নতর রূপ লুৎফ-উন্নিসার মধ্যেও দেখা গিয়েছিল। আত্মবশ্যতা নয়---কোন চরিত্রের কাছেও বশ্যতা স্বীকার নয়--- বিচিত্র ফুলবনে বহুবিধ মধু আহরণে তার অনুরাগ, সেলিমের মহিষী হওয়ার ইচ্ছা, তার আত্মদৃপ্ত অধিকারবোধের আকাঙ্ক্ষা বলে গণ্য হবে। যাই হোক, মতিবিবি চরিত্র-স্বরূপেও এই আত্মদৃপ্ত ভঙ্গিমা। পরাভবের যন্ত্রণাবোধ থেকে আগ্রার ষড়যন্ত্রে লুৎফ-উন্নিসা অংশগ্রণ করেছিল। আবার সপ্তগ্রামের জীবনে নবকুমার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবার পর তার অন্তরে দেখা গিয়েছিল পরাভবের গভীরতর জ্বালা। "স্রোতবিহারিণী রাজহংসী যেমন গতিরোধীর প্রতি গ্রীবাভঙ্গি করিয়া দাঁড়ায়, দলিতফণা যেমন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনি উন্মাদিনী যবনী মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, 'এ জন্মে না। তুমি আমারই হইবে।' তবু অন্তরের গভীরে যে নতুন প্রেমবোধের তৃষ্ণা জেগেছিল মতিবিবির, তা থেকেই জন্ম নিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মানসিকতার। সে প্রতিজ্ঞা হ'ল কপালকুণ্ডলার অনিষ্ট সাধন---এরই জন্য কাপালিকের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে সেও যুক্ত হয়ে পড়ল। ষড়যন্ত্রকারিণী হিসেবে ব্রাহ্মণবেশীর চতুর্থরূপ--তখনও সে লুৎফ-উন্নিসা, তবে অন্য ভঙ্গীতে।

সমালোচক অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ-পুস্তকে লিখেছেন---"মতিবিবির চিত্রে কবি কতকগুলি জটিল ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাই এই চিত্রের অনন্যসাধারণ শিল্পগৌরব।" মতিবিবির চরিত্রের প্রখর বুদ্ধি, প্রগল্‌ভতা ও রসিকতা সত্যই বিস্ময়কর। ইতিহাসের ভাবসমীপ্যে সৃষ্ট এই কল্পিত চরিত্র বঙ্কিমের শিল্প-কুশলী নারী-চরিত্র হিসেবে গণ্য হবে সৃষ্টি সন্দেহ নেই। কপালের মত স্বল্পবাক্, অন্তর্মুখীন সে নয়। তাব বুদ্ধি ও সমগ্রসত্তা বাস্তব জীবনের কাঠিন মৃত্তিকার পরে যেন সংস্থাপিত---সেখানে বাঁচার, আধিপত্য বিস্তার করার কলাকৌশল আয়ত্ত করতে হয়। এসব বিষয়ে মতিবিবি নিপুণা নারী। প্রখর বুদ্ধির জোরে সে আমীর-ওমরাহদের বশীভূত করে, এমনকি সেলিমও তার অনুরক্ত। খসরুকে সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্রেও সে অংশীদার। আবার "রাজনিকেতনে" উপস্থিত হয়ে বুদ্ধির সহায়তায় জাহাঙ্গীরের সঙ্গে রহস্যালাপে তাকে পটু দেখি। রসিকতায় মতিবিবি অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী---তৃতীয় খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে তার পরিচয় আছে---[লু-- দাসী আপন স্বামীকেই বিবাহ করিবার অনুমতি চাহিতেছে। বাদ---বটে! এ পুরাতন নফরের দশা কি করিবে? লু— দিল্লীশ্বরী মেহের উন্নিসাকে দিয়া যাইব। বাদ--- দিল্লীশ্বরী মেহের-উন্নিসা কে? লু--- যিনি হইবেন।] মতিবিবির পরিহাসবোধের আরও পরিচয় আছে 'রাজপথে' নবকুমারের সঙ্গে পরিচয় হবার মুহূর্তে ---দস্যু কর্তৃক "নিষ্কুণ্ডলা" হলেও 'পান্থনিবাসে' নবকুমারের সঙ্গে তার রসিকতাময় সংলাপ চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই। ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতায় নবকুমারকে বিদ্ধ করেছে মতিবিবি---"আপনি কখনও কি স্ত্রীলোক দেখেন নাই, না আপনি আমাকে বড় সুন্দরী মনে করিতেছেন?"

'পান্থনিবাসে' নবকুমার শর্মার সাক্ষাৎ পেয়ে মতিবিবির "পাষাণ (হৃদয়) মধ্যে কীট প্রবেশ করিয়াছিল এবং "পাষাণ দ্রব হইতেছিল।" তার চিত্তবৃত্তি সকলের পরিবর্তন সূচিত হ'ল। নবকুমারের প্রেমে আগ্রার ভোগময় জীবন ত্যাগ করে সপ্তগ্রামের ঔপনগরিক অংশে তার স্থান হ'ল। নবকুমার কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের পর মতিবিবির কাতর প্রার্থনা তার প্রেমবোধের

ঐকান্তিকতাকেই প্রমাণ করে --"আর কিছু চাহি না, এক একবার তুমি এই পথে যাইও; দাসী ভাবিয়া এক একবার দেখা দিও, কেবল চক্ষুঃ পরিতৃপ্তি করিব।" নবকুমার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা রমণী লুৎফ-উন্নিসা কপালকুণ্ডলার অনিষ্টসাধনে কৃতসংকল্প হ'ল---প্রয়োজন হ'ল ছদ্মবেশ ধারণের। ব্রাহ্মণবেশী পুরুষ রূপে কাপালিকের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের কালে কপালের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ। এখানে লুৎফ-উন্নিসার চিত্তবৃত্তির কিছু স্বতন্ত্র পরিচয় আছে। কপালের অনিষ্টসাধনে সে কৃতসঙ্কল্পা হলেও, তার মৃত্যু মতিবিবির কাম্য নয়---কাপালিকের হোমের আয়োজনের কথা ব্যক্ত করে কপালকে সে বলেছে---"তোমার মৃত্যুই তাঁহার অভীষ্ট। তাহাতে আমার কোন ইষ্ট নাই। আমি ইহজন্মে কেবল পাপই করিয়াছি, কিন্তু পাপের পথে আমার এতদূর অধঃপাত হয় নাই যে আমি নিরপরাধে বালিকার মৃত্যুসাধন করি। আমি তাহাতে সম্মতি দিলাম না।" (৪র্থ/৭ম)। এখানে লুৎফ-উন্নিসার স্বামীলাভের জন্য কাতর প্রার্থনা তার পরিবর্তিত চরিত্রের ইঙ্গিত দেয়। কপালের উদ্দেশে--"আমারও প্রাণদান দাও---স্বামী ত্যাগ কর"---মতির সংলাপে তার অন্তরাত্মার কাতর-ক্রন্দনধ্বনি শোনা যায়। তারপর স্বেচ্ছায় কপাল আপন অধিকার ত্যাগ করেনে, মতিবিবির সহানুভূতিশীল অন্তঃকরণের একটা চিত্র পাই---"ভগিনি! তুমি চিরায়ুষ্মতী হও, আমার জীবন দান করিলে। কিন্তু আমি তোমাকে অনাথা হইয়া যাইতে দিব না।" অসংযমী মতিবিবির এ এক ভিন্নতর চিত্তবৃত্তির পরিচয়---বঙ্কিমের কুশলী দৃষ্টিতে মতিবিবি এক অনন্য চরিত্ররূপে উপস্থাপিত।

" পান্থনিবাসে" নবকুমারের দর্শনলাভের পর মতিবিবির হৃদয়ে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, এ যেন তারই ইঙ্গিত। "আত্মমন্দিরে" (৩য়/৫ম) মতিবিবির প্রেমবোধের অভিব্যক্তিতে তার বিগত জীবনের ভোগবাসনাকেন্দ্রিক বিলাসময় অপরিমিত আকাঙ্ক্ষার চমৎকার বিশ্লেষণ আছে---"অনেকদিন আগ্রায় বেড়াইলাম, কি ফললাভ হইল? সুখের তৃষ্ণা বাল্যাবধি বড়ই প্রবল ছিল।....কোন্ দুষ্কর্ম না করিয়াছি? আর যে যে উদ্দেশ্যে এত দূর করিলাম, তাহার কোনটাই বা হস্তগত হয় নাই? ঐশ্বর্য, সম্পদ, ধন, গৌরব, প্রতিষ্ঠা সকলই ত প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিলাম।। তিন বৎসর রাজ প্রাসাদের ছায়ায় বসিয়া যে সুখ না হইয়াছে, উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমনের পথে এক রাত্রে সে সুখ হইয়াছে।" সে উচ্চাভিলাষ, ইন্দ্রিয়-প্রশ্রয় বর্তমান জীবনে অনুপস্থিত হলেও তার আত্মাভিমানের সূক্ষ্ম ব্যক্তিত্বময়ী অনুভূতি উত্তরকালের জীবনেও লক্ষ্য করা যায়। নবকুমারের প্রতি প্রেমবোধে সে প্রার্থনা জানায়, কিন্তু প্রত্যাখ্যাতা হয়ে আত্মদৃপ্ত ভঙ্গিমায় আপন অধিকার ছিনিয়ে নেবার জন্য ব্রতী হয়। ব্যক্তিত্বের স্বাধীন চিন্তায় সে কাপালিকের কপালবধের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে একমত হয় না। সমালোচক মোহিতলাল বিষয়টির সুন্দর পর্যালোচনা করেছেন---"তাহার সেই প্রবল ভোগাসক্তির মধ্যেও দুইটি বিরোধী চরিত্র লক্ষণ ছিল---একটি তাহার অত্যুগ্র আত্মাভিমান, আরেকটি তাহার স্বাভাবিক ঔদার্য। এই দুইটিই তাহার ভোগজীবনের বাধা হইয়া শেষে তাহার সর্বনাশ ঘটাইয়াছে। প্রথমটির জন্য সে আগ্রার বিলাসজীবন ত্যাগ করিয়াছিল, অথচ নবকুমারকে বশ করিবার মত নম্রতা, বিনয় ও সহিষ্ণুতা তাহার ছিল না। দ্বিতীয়টির জন্য সে কাপালিকের সহিত ষড়যন্ত্রে সম্যক সম্মত হইতে পারে নাই।...এই জন্য মতিবিবির চরিত্রসৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে নারীচরিত্রের জটিলতর গ্রন্থি-মোচন করিতে হইয়াছে।"

সপত্নী কপালকুণ্ডলার কাছ থেকে তার বিদায়দৃশ্যটি স্নেহ-মমতা-কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ--এ নারী সম্পূর্ণ পরিবর্তিতা এক নারী। দৃশ্যটি এইরকম---"মৃদুস্বরে কপালকুণ্ডলাকে কহিতে লাগিলেন---"ভগিনি! তুমি যে কার্য্য করিলে, তাহার প্রতিশোধ করিবার আমার ক্ষমতা নাই; তবু যদি আমি চিরদিন তোমার মনে থাকি, সেও আমার সুখ।...এই অঙ্গুরীয়টি তুমি রাখ। ইহার পরে অঙ্গুরীয় দেখিয়া যবনী ভগিনীকে মনে করিও।" কিন্তু মতিবিবির ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি---স্বামীলাভ

তার জীবনে ঘটেনি। ঔপন্যাসিক মতিবিবির শেষ পরিণাম চিত্রিত করেননি---ঐ অংশেই তার সমাপ্তি বেখা টেনেছেন। কারণ অবশ্য ছিল। কপালকুণ্ডলার ভাবতত্ত্বে মতিবিবি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল। "অনন্তগঙ্গা প্রবাহমধ্যে" কপালকুণ্ডলার অনুবর্তী হয়ে নবকুমারের আত্মবিসর্জন, মতিবিবির প্রত্যাশাকে পূর্ণ করেনি। তার জীবনে ট্রাজেডির এক অপূর্ব মহিমা করুণরসে প্লাবিত হয়ে গিয়েছে। মতিবিবির জীবন-চিত্রে দার্শনিক বঙ্কিমের মানবজীবন দর্শনের আভাস পাওয়া যায়---"জ্ঞান-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নি, রূপ-বহ্নি, ধর্ম্ম-বহ্নি, ইন্দ্রিয়-বহ্নি-- সংসার বহ্নিময়... এই বহ্নিব দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি।" মতিবিবির জীবন সেই জীবন দর্শনেরই অঙ্গীভূত। উপন্যাস অংশের নায়িকাও তাই মতিবিবি। আব, কপালকুণ্ডলার ভাব-তত্ত্ব উপন্যাসেব আধারে পরিবেশিত কাব্যময় জীবনবৃত্তান্ত। পরিবর্তনশীল চরিত্ররূপে মতিবিবি উপন্যাসেব চিত্তাকর্ষক নারী চরিত্র।

।। কাপালিক ।।

উপন্যাসে কাপালিক অপ্রযোজনীয় চবিত্র নয়। অবণ্যানী বেষ্টিত নির্জন সমুদ্রতটে পরিত্যক্তা কপালকুণ্ডলার সে পালকপিতা। কপালকুণ্ডলা-সূত্রে কাপালিকের আবির্ভাব। আখ্যায়িকায় তাব ভূমিকা কোন অংশেই গৌণ নয়। ভবানীর সাধনায় তান্ত্রিকতার পথে সে নবকুমাবকে বলি দিতে চেয়েছিল দেবীর চরণে। এখান থেকেই কপাল-নবকুমারের কাহিনীবৃত্ত শুরু হয়েছে। মাঝখানে সে অনুপস্থিত হলেও চতুর্থ খণ্ডে আবার তার আবির্ভাব ঘটেছে এবং সে আবির্ভাবের গুরুত্ব অপরিসীম। একদিকে নবকুমারের সংশয় সন্দেহ, অন্যদিকে কাপালিকের সাহচর্য ও প্রভাব, তাকে কপাল চরিত্রের পরে সন্দেহ দৃঢ়মূল করতে সাহায্য করেছে এবং উপন্যাসের পরিণতি কাপালিকের বাহ্যপ্রভাব জাত হয়েছে। কাপালিক চরিত্র পর্যালোচনায় সমালোচক মোহিতলাল লিখেছেন--- "কাপালিকের চরিত্র স্বাভাবিক বা সামাজিক মানব-চরিত্র নয়, তাহা আমরা দেখিয়াছি। সে একপ্রকার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার আশায় সকল মনুষ্যসুলভ সংস্কার বিসর্জন দিয়াছে; তাহার যে ইষ্টদেবতা ---তন্ত্রে তাহার বহুতর নাম আছে; সেই মহাশক্তিকে আরাধনায় তুষ্ট করিয়া সেও মহাশক্তিমান হইতে চায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে একটা বিকৃত মস্তিষ্ক নর-পিশাচমাত্রে পর্যাবসিত হইয়াছে। তাহার ঐ সংস্কৃতভাষায় কথোপকথন এবং দুই-একটি তত্ত্বকথার মত বচন শুনিযা এবং তাহার অসীম দেহবল ও নিষ্ঠুর মনোবল দেখিয়া প্রথমে যেমন ভয় ও বিস্ময় জাগে, পরে তাহার দুরবস্থা দর্শনে তেমনই ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। একটা অমানুষিক সংকল্পসিদ্ধির জন্য তাহার যে একাগ্রতা তাহাও যেন একটা fixed idea বা একপ্রকার মানসিক ব্যাধির মত। গ্রন্থকার এ চরিত্রে মনুষ্যপ্রকৃতির বিকৃতিই বিশেষভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। এ চরিত্র স্বাভাবিকও নয়, আবার স্বভাবকে অতিক্রম করার যে মহত্ত্ব তাহাও ইহাতে নাই।"

ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখা কাপালিক চরিত্রের ভয়ঙ্কর রূপ বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনায় গড়ে নিয়েছেন। তার আবির্ভাবের মুহূর্তটি রোমাঞ্চকর 'ভয়ঙ্কর' ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ---"শিখরাসীন মনুষ্যনয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছিল। ... কটিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত শার্দ্দূলচর্মে আবৃত। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা; আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজটাপরিবেষ্টিত। ...জটাধারী এক ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর বসিয়া আছেন্।... সম্মুখে নরকপাল রহিয়াছে, তন্মধ্যে রক্তবর্ণ দ্রব পদার্থ রহিয়াছে। চতুর্দিকে স্থানে স্থানে অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে---এমনকি, যোগাসীনের কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষমালামধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড গ্রথিত রহিয়াছে।"(১ম/৪র্থ পরিঃ)। পৈশাচিক শবাসন শক্তিসাধনায় তান্ত্রিকের অসামাজিক ক্রিয়া অরণ্যের নির্জনতায় সাধিত হতে পারে। তাই লোকালয়ের বাইরে তার অবস্থিতি। কাপালিকেব

সাধনা তন্ত্রাশ্রিত পরাশক্তি কালিকার সাধনা। সে সাধন প্রক্রিয়া বাহ্যতঃ সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বীভৎস। কিন্তু দেবী ভবানীর অনুগ্রহ লাভের জন্য কাপালিকের বিরামহীন সাধনা চরিত্রটিকে বলিষ্ঠ করে গড়ে তুলেছে। দেবী ভবানীর সন্তুষ্টির জন্য তার নরবলির আয়োজন। ভৈরবীই সৃষ্টি শাসনকর্ত্রী, সুখদুঃখবিধায়িনী ও কৈবল্যদায়িনী। তাই তার দৃষ্টিতে জাগতিক কার্যকারণ সূত্রের নেপথ্যে ঈশ্বরের লীলা-- তাঁর অভিপ্রায়ে জগৎ চালিত হয়। সমুদ্রতটে বিসর্জিত নবকুমারকে সে "ভৈরবী প্রেরিতোহসি" বলে মনে করে। কাপালিক মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে ঈশ্বরের পূজায় নিবেদিত হলে মানুষের জন্ম সার্থক হয়। তাই সে নবকুমারকে বলে---(১) "পরিতাষঃ তে ভবিষ্যতি।" (২) "তোমার জন্ম আজি সার্থক হইল। ভৈরবীর পূজায় তোমার এই মাংসপিণ্ড অর্পিত হইবেক, ইহার অধিক তোমার তুল্য লোকের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে?" কাপালিকের এই বিশ্বাসের মধ্যে কোন সংশয় নেই। তাই স্থির প্রত্যয়ে সে দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তৎপর এবং কৃতসংকল্প। বামাচারী সাধক বন্য মহিষের মতো শক্তিধর—বীরাচারী তান্ত্রিক সাধকের উপযুক্ত চরিত্র এই কাপালিক।

নরবলি দেওয়ার প্রাক্কালিক সাধনক্রিয়ার মধ্যে তার একধরনের নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়-- ভবানীর সন্তুষ্টি বিধানের দ্বারা কাপালিক সাধনায় সফল হতে চায়। অধিকারীর কথায় মনে হয়, অন্য কোন কারণে নয়, কেবল পঞ্চ ম-কার তত্ত্বের আভিচারিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য কপালকুণ্ডলাকে লালন-পালন করেছিল সে। যাই হোক, স্নেহ-মমতাহীন কাপালিক ঈশ্বর-সন্তুষ্টির ব্যাঘাত ঘটলে রুষ্ট হয়---নবকুমারকে নিরস্ত করতে উদ্যত হলে কাপালিক কপালকুণ্ডলাকে "মেঘগর্জ্জনবৎ" কণ্ঠে ডেকেছিল। মানসী কন্যার জন্য তার হৃদয়ে স্নেহ-মমতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না---এমনই নিষ্ঠুর ও নির্মম প্রকৃতির সে। তার দৈহিক শক্তির আভাস আছে নবকুমারকে গুল্ফ লতাগুল্ম দিয়ে বাঁধবার কালে -- তার দেহে "মত্ত হস্তীর বল"। কাপালিকের দৈহিক গঠন, সাধনক্রিয়া, নরবলির আয়োজন--সমস্তই যেন ঈশ্বরের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নিবেদিত। অলৌকিক পরাশক্তির নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে তার জীবনের অস্তিত্ব, সাধনক্রিয়া ও সংকল্পের দৃঢ়তা। তাই কাপালিকের দৃষ্টিতে মানবিক মূল্যবোধের কোন গুরুত্ব নেই। বধ্যভূমি থেকে নবকুমার এবং কপাল অন্তর্হিত হলে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে তাদের অন্বেষণ করে, প্রস্তুত হয় প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য। নিষ্ঠুর কাঠিন্যে এ চরিত্রটি আগাগোড়া নির্মিত।

আখ্যায়িকার শেষাংশে আবার তার প্রত্যাবর্তন। নবকুমারকে স্মৃতিচারণায় ভৈরবীর স্বপ্নাদেশ প্রসঙ্গ বিবৃত করেছে কাপালিক। কাপালিককে তিরস্কৃত করে স্বপ্নে ভবানী বলেছেন যে তারই চিত্তাশুদ্ধিহেতু পূজায় বিঘ্ন ঘটেছে---ইন্দ্রিয়লালসায় কুমারীর শোণিতে পূজা না করায় পূর্ব্বকৃত্যফল বিনষ্ট হয়েছে। সুতরাং কপালকুণ্ডলাকে বলি না দেওয়া পর্যন্ত ভবানী পূজা বন্ধ রাখতে হয়েছে কাপালিককে। স্তূপশিখর থেকে পড়ে যাওয়ার কারণে কাপালিকের বাহুদ্বয় ভগ্ন হয়েছিল, তাই দেবী ভবানীর সন্তুষ্টিবিধানের জন্য নবকুমারের সাহায্য প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে সে মতিবিবির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে---কপাল বধের জন্য হোমের আয়োজন করেছে। তবে ব্রাহ্মণবেশীকে মতিবিবি বলে না বোঝার কারণে কাপালিকও কপালকুণ্ডলাকে দ্বিচারিণী বলে মনে করেছিল। যাই হোক, নবকুমারের সহায়তায় প্রেতভূমে কাপালিকের কপালবধের প্রাক্কালিক পূজা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তান্ত্রিক সাধনায় কাপালিকের পৈশাচিক ক্রিয়া, নীতি বিহর্গিত পূজাপদ্ধতি এবং ঈশ্বর বিশ্বাসের এক ভিন্ন রূপরেখা অঙ্কন করেছেন আখ্যায়িকার সামান্য অংশে। কিন্তু এই চরিত্রের ভূমিকাকে উপন্যাসে ছোট করে দেখা যায় না।

।। শ্যামাসুন্দরী ।।

নবকুমারের দুই ভগিনীর মধ্যে কনিষ্ঠা শ্যামাসুন্দরী---"সধবা হইয়াও বিধবা; কেননা, তিনি কুলীন পত্নী।" সামাজিক প্রথার বলি হওয়া শ্যামা স্বামী-সোহাগ বঞ্চিতা এক নারী---তাই কুলীন পত্নী। অথচ তার অন্তরে স্বামীপ্রেমের জন্য কি গভীর আকুলতা। বঙ্কিমচন্দ্র অপূর্ব শিল্প-কৌশলে বুভুক্ষু নারী শ্যামার পাশে স্বামীপ্রেমে স্বভাব-উদাসীন কপালকুণ্ডলাকে উপস্থাপিত করেছেন। সামান্য দু' একটি দৃশ্যচিত্রে তার চরিত্র-স্বভাব ও উপন্যাসে তার ভূমিকা প্রসঙ্গটির অবতারণা করেছেন। শ্যামার সংসার-আসক্তি এবং মৃণ্ময়ীর সংসার-অনাসক্তি---বৈপরীত্যমূলক দুই ভাবের উপস্থাপনায় বঙ্কিম উপন্যাসের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করেছেন। এজন্যই মোহিতলাল মন্তব্য করেছেন---"কপালকুণ্ডলা চরিত্রকে তুলনায় উজ্জ্বলতর করিবার জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল---এই দুইটিকে একত্র স্থাপন করিয়া লেখক সমাজ-সংসার ও প্রকৃতি এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব অতিশয় পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন---শ্যামাসুন্দবীর পাশে না দেখিলে আমরা কপালকুণ্ডলাকে উত্তমরূপে চিনিতে পারিতাম না।"

উপন্যাসে মাত্র দু'বার শ্যামাসুন্দরীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়---'অবরোধে' ও 'শয়নাগারে'। স্বামী-অভাবজনিত দুঃখ গভীর হলেও তার রহস্যময় কৌতুকপ্রিয়তা জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়েছে। যদিও এই কৌতুকের অন্তরালে সুগভীর বেদনা দুর্নিরীক্ষ্য নয়। যাই হোক, তপস্বিনীর যোগিনীভাব তার স্বামী সৌভাগ্য-বঞ্চিতা হৃদয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে---মৃণ্ময়ীর ঔদাসীন্য ও অরণ্যপ্রীতি এবং ভবানীর বিল্বপত্র প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গ তার সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে। পরশপাথররূপ স্বামীপ্রেমে যোগিনীও গৃহিণী হয়, কিন্তু কপালের সংসার জীবনের নিদারুণ অনাসক্তি শ্যামার কাছে বোধগম্য হয় না। সাংসারিক জীবনের সরল গতিপথে বিশ্বাসী শ্যামা মৃন্ময়ীর অন্তঃকরণের রহস্যকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে না।

তথাপি শ্যামার দ্বারাই মৃন্ময়ী কতকটা সংসারী হয়েছে। শ্যামার সঙ্গে কথোপকথনে কপালকুণ্ডলার অন্তর্লোকের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য গ্রন্থকার আবিষ্কার করে নিয়েছেন এই সুযোগে। তার অরণ্য প্রীতি ও ভবানী ভক্তি শ্যামার কাছে খুব একটা স্পষ্ট না হলেও, এর দ্বারা উপন্যাসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। শ্যামার দ্বারা ঔপন্যাসিক আরও একটি প্রয়োজন সম্পন্ন করেছেন। স্বামীবশের জন্য শ্যামার উৎকণ্ঠা এবং বনৌষধি সংগ্রহের জন্য মৃন্ময়ীর আগ্রহ, কাহিনীকে দ্রুত পরিণামমুখী করেছে। দুই প্রহর রাত্রে এলোচুলে এই ঔষধি সংগ্রহ করতে হয়। কপাল সম্মত, কিন্তু হিতাকাঙ্ক্ষিণী শ্যামা ভ্রাতৃবধূর অকল্যাণ কামনা করে না বলেই মৃন্ময়ীকে অনুরোধ করে---(১) "রাত্রে তুমি আর বাহির হইও না। (২) মন্দলোকে মন্দ বলবে। ... তোমাকে কেহ কিছু মন্দ বলিলে আমাদিগের অন্তঃকরণে ক্লেশ হবে।... দাদাকে কেন অসুখী করিবে?" কপালকুণ্ডলা আপন অন্তরের সত্য-অনুভবকে ব্যক্ত করেছে অবলীলায় "যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না" শ্যামামুন্দরীর মতো পল্লীরমণী এ কথার অর্থ স্পষ্ট অনুধাবন করতে অক্ষম। যাই হোক, শ্যামাসুন্দরী আখ্যায়িকায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। শ্যামার প্রতি মৃন্ময়ীর সহানুভূতি, তাকে বনৌষধি সংগ্রহার্থে বনে যেতে অনুপ্রাণিত করেছে এবং উপন্যাসের গতি-প্রকৃতি অনেকটাই এই ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত--- শ্যামাসুন্দবী এই উপন্যাসের অপরিহার্য চরিত্র।

।। অধিকারী ।।

উপন্যাসে অধিকারী চরিত্রের স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ, কিন্তু আখ্যানবস্তুতে এই চরিত্রের অসামান্য ভূমিকা আছে। দু'টি দিক থেকে অধিকারী চরিত্রের গুরুত্ব---এক, কপাল-নবকুমারের বিবাহদান প্রসঙ্গে উপন্যাসের ঘটনাক্রমের গতিপথ তারই দ্বারা নির্দিষ্ট হয়েছে। দুই, তার ভবানী প্রীতি। উপন্যাসে এই বিষয়টির প্রাধান্য আছে। সমালোচক-কবি মোহিতলাল চরিত্রটির সমালোচনায় লিখেছেন---"অধিকারী চরিত্রটিও এই কাহিনীর পক্ষে বড় প্রয়োজনীয় হইয়াছে। কপালকুণ্ডলার জীবনের গতি সেই ফিরাইয়া দিয়াছে; কপালকুণ্ডলার চরিত্রের উপরেও তাহার প্রভাব অল্প নহে। সংসারত্যাগী ঐ পুরুষটির মধ্যে যে হৃদয়মাধুর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহা যেমন মুগ্ধ করে, তেমনই সে চরিত্রের নিরভিমান নম্রতা, সামাজিক শিষ্টতা ও ব্যবহার জ্ঞান প্রভৃতি সদ্‌গুণে উহা আমাদের চিত্তে একটি গভীর রেখাপাত করে। কপালকুণ্ডলাকে বিদায় দেওয়ার কালে কণ্ব কর্তৃক শকুন্তলা-বিদায়ের অনুরূপ দৃশ্য মনে পড়ে।"

অধিকারীর কপালকুণ্ডলার প্রতি অপত্য স্নেহ সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত। কন্যাস্নেহে কপালের তিনি হিতাকাঙ্ক্ষী। নবকুমারসহ কপাল যখন তাঁর আশ্রয়ে, তখন তার মঙ্গলভাবনায় তিনি চিন্তিত-কাপালিকের কাছে প্রত্যাবর্তন করলে অশুভ ভাবনায় তিনি উৎকণ্ঠিত। ব্রাহ্মণকুমার নবকুমারের সঙ্গে কন্যাতুল্য কপালের বিবাহদানে সকল সঙ্কটের অবসান ঘটবে, এই সম্ভাবনায় তিনি উভয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। উপন্যাসের গতিপথ তাঁরই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এছাড়া, সমাজজীবন বহির্ভূত দেবালয়ের অধিবাসী হয়েও সমাজসম্পর্কে তাঁর জ্ঞান উল্লেখ করার মতো। তাই নবকুমারের সঙ্গে কুমারীরূপে কপালের যাওয়া অসঙ্গত, এই বিবেচনা তাঁর সামাজিক মনেরই পরিচায়ক।

ঈশ্বর সম্পর্কে অধিকারীর সাধনা কাপালিকের মতো বামাচারী সাধনা নয়—তান্ত্রিক সাধন প্রক্রিয়ায় জীববলি তাঁর অন্তঃসাধনক্রিয়ার আবশ্যিক পদ্ধতি নয়। শুদ্ধ-ভক্তিভাবে অধিকারী "মন্দির মধ্যে মানবাকার করাল কালীমূর্ত্তি'র" উপাসনা করেন। ঈশ্বর জগতের মঙ্গল ও কল্যাণের কারণ, এই ভাবনা অধিকাবীব সাধন চিত্তের মূল ভাবনা। তাঁর সাধনা পূর্ণ কিনা এ প্রসঙ্গ অবান্তর। কিন্তু অধিকারীর নিষ্ঠা, ভক্তি প্রমাণ করে যে তিনি ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত প্রাণ। বঙ্কিম অধিকারীর পরাশক্তির সাধনার সঙ্গে মানবিক স্নেহ-প্রেমের এক নিবিড় যোগসূত্র আবিষ্কার করেছেন। তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাস প্রশ্নাতীত--আবার, কপালের প্রতি স্নেহ-মমতাও অপরিসীম। কপাল-নবকুমারের বিদায় লগ্নে পিতৃতুল্য অধিকারীর "কাঁদিতে কাঁদিতে" যাওয়া, তাঁর স্নেহ-বিগলিত পিতৃ-হৃদয়েরই দীর্ঘশ্বাস। কাপালিকের এসব কিছুই ছিল না—তার নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা তো সীমাহীন। একই ঈশ্বর সাধনায় দুই পথিকের পথ ও চরিত্র পার্থক্য বঙ্কিম অসামান্য দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন। উপন্যাসের কাহিনী-বৃত্তে অধিকারীর ভূমিকা তাই কোন অবস্থাতেই ছোট করে দেখা যায় না।

।। মেহের-উন্নিসা ।।

"মেহের-উন্নিসা চরিত্রের সহিত এই উপন্যাসের ঘটনাগত সম্পর্ক নাই, গ্রন্থকার একটি সুযোগ-সৃষ্টি দ্বারা উপন্যাস মধ্যে এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধা নারীর একটু স্থান করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে এ কাহিনীর শোভাবৃদ্ধি হইয়াছে।" (বঙ্কিম বরণ)—সমালোচকের এই সিদ্ধান্ত যুক্তিগ্রাহ্য। কিন্তু উপন্যাসে মেহের-উন্নিসার কিছু ভূমিকা আছে। উপন্যাসে ইতিহাস অংশের নায়িকা সে। শের আফগনের স্ত্রী হয়েও মেহের জাহাঙ্গীরের প্রণয়িনী--আকবর শাহের মৃত্যুর পর সেলিম যখন জাহাঙ্গীর হন, তখন জাহাঙ্গীরের মেহেরের প্রতি প্রণয় কোন পথে পরিচালিত হয়, মতিবিবির তা জানার প্রয়োজন

ছিল। লুৎফ উন্নিসা ও জাহাঙ্গীরের কৃপাপ্রার্থিনী। নবকুমারের সাথে নব পরিচয় তার মনে যে নতুনভাবে প্রেমের উন্মেষ ঘটিয়েছিল, সে সম্পর্কে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসার জন্য মেহের উন্নিসা ও জাহাঙ্গীরের মন জানবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। বঙ্কিম দেখিয়েছেন---"উভয়েই দিল্লীর সাম্রাজ্য লাভের জন্য প্রতিযোগিনী" হয়ে উঠেছিলেন। (৩য়/৩য়) উপন্যাসের আখ্যানবস্তুর সঙ্গে ইতিহাসের যোগ যেমন গভীর ও প্রত্যক্ষ হয়েছে, তেমনই মতিবিবি-সূত্রে জাহাঙ্গীর ও মেহের-উন্নিসা আখ্যায়িকার অবান্তর চরিত্র হয়ে ওঠেনি। এখানেই মেহের-উন্নিসা চরিত্র সংযুক্তিকরণের সার্থকতা। অন্য সার্থকতাও আছে। উপন্যাসের ব্যাপক ও গভীর অর্থে মানবজীবনের বহুবিচিত্র রূপকে প্রত্যক্ষ করে---ঔপন্যাসিকের জীবনদৃষ্টি সৃষ্টির বৈচিত্র্যময় রূপে মুগ্ধ হয়। সেই মুগ্ধ, মগ্ন চৈতন্যে বিধৃত নরনারীর বিচিত্র লীলা, রূপ-বৈচিত্র্যে তাঁকে শিল্প রচনায় অনুপ্রাণিত করে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের পাশাপাশি পার্শ্বচরিত্রও স্থান পেয়ে যায়। এমনই এক চরিত্র মেহের-উন্নিসা। ইতিহাস-খ্যাত নূরজাহান জাহাঙ্গীরের মহিষী হবার পূর্ববর্তী অধ্যায়ে মেহের-উন্নিসা। ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বঙ্কিম এ চরিত্রটিকে গড়ে তুলেছেন।

আকবরশাহের কোষাধ্যক্ষ (আক্তিমাদউদ্দৌলা) খাজা আয়াসের কন্যা মেহের-উন্নিসা যবনকূলে প্রধানা সুন্দরী"। মেহের রূপবতী ও গুণবতী। "নৃত্যগীতে মেহের-উন্নিসা অদ্বিতীয়া; কবিতা রচনায় বা চিত্রলিখনেও তিনি সকলের মন মুগ্ধ করিতেন। তাঁহার সরস কথা, তাঁহার সৌন্দর্য অপেক্ষাও মোহময়ী ছিল।" (৩য়/৩য়) মেহের অভিমানিনী এবং জাহাঙ্গীরের প্রতি প্রণয়ের আশু কোন সমাধান না দেখে হতাশও বটে। "কবরের মাটিতে মুখের আদর্শ থাকিবে"---এ অভিব্যক্তির মধ্যে গভীর বেদনা লুকিয়ে আছে। কিন্তু তবু মতির সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে তার জাহাঙ্গীরের প্রতি গভীর প্রেম প্রকাশ পেয়েছে অনবদ্য ভঙ্গীতে-- "আত্মজীবন বিস্মৃত হইব, তথাপি যুবরাজকে বিস্মৃত হইতে পারিব না"। মেহের-উন্নিসার মধ্যে যথার্থ অনুরাগিনীর স্বভাব বঙ্কিম দেখিয়েছেন--কিন্তু মতিবিবি চতুরা, স্বার্থপরায়ণা---মেহেরের অন্তরের ভাব বোঝার জন্যই তার এই প্রতিযোগিনীর গৃহে আগমন। মেহের "আত্মবুদ্ধিপ্রভাবে দিল্লীশ্বরের ঈশ্বরী" হয়েছিলেন। সুতরাং সামান্য অবকাশে, বঙ্কিম, মেহের-উন্নিসার চমৎকার এক প্রেমময়ী রূপ অঙ্কন করেছেন। কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবির পাশে মেহের-উন্নিসার ঐতিহাসিক প্রেমবোধ উজ্জ্বল রেখায় চিত্রিত করেছেন ঔপন্যাসিক। ইতিহাসের প্রাঙ্গণে এক অপূর্ব বাস্তব চরিত্র মেহের।

।। পেষমন্ ।।

মতিবিবির চরিত্র--সূত্রে উপন্যাসে পেষমন্ চরিত্রের আবির্ভাব। মতিবিবির চরিত্র-প্রকৃতি উদঘাটনে এই নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নবকুমারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর মতিবিবির অন্তর্লোকের রহস্য জানার প্রয়োজন ছিল। সেই উদ্দেশ্যেই পেষমন্ চরিত্রের উপস্থাপনা। পেষমন্ চরিত্রের প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা কালে মোহিতলাল লিখেছেন---"বাঁদী পেষমন্ যেন মতিবিবিরূপ হীরকখণ্ডটিকে বসাইবার একটি রূপার আংটি। আংটিটি অতি সামান্য বটে, কিন্তু এই সাধারণ সামান্যা নারীর সাংসারিক বুদ্ধি ও তাহার অবস্থা অনুযায়ী আশা-আকাঙ্ক্ষা মতিবিবির আভিজাত্য ও উচ্চাভিলাষকে তুলনায় অতিশয় লক্ষ্যগোচর করিয়াছে। যাহাকে ক্ষুদ্র মনে হইতেছে তাহারও মূল্য কম নহে;... পেষমনের সহিত মতিবিবির কথোপকথন যদি বাদ দেওয়া যায়, তবে মতিবিবি কাহিনী অঙ্গহীন হইয়া পড়ে।" অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ কথা।

তৃতীয় খণ্ডের তিনটি দৃশ্যে (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ---পথান্তরে পঞ্চম পরিচ্ছেদ---আত্মমন্দিরে

এবং সপ্তম পরিচ্ছেদ---উপনগরপ্রান্তে) পেষমনের সাক্ষাৎ পাই। পেষমনের সঙ্গে কথোপকথনে মতিবিবির চিত্তচাঞ্চল্য, প্রেমবোধ, রাজৈশ্বর্যের ভোগবাসনাময় জীবন পরিত্যাগের বাসনা এবং ষড়যন্ত্রের জন্য আত্মকৃচ্ছ্রতার পথে ব্রাহ্মণবেশীর ছদ্মবেশ ধারণের তাৎপর্য স্পষ্টতর হয়েছে। পেষমনের মতো দাসী নারীর বোধশক্তির গণ্ডীটা বড়ো সংকীর্ণ। তাই তার কাছে মতিবিবির ধন, ঐশ্বর্য, রূপ, বিলাসের জগৎ পরিত্যাগের বাসনা অর্থহীন বলে মনে হয়েছে। অথচ তখন মতিবিবিরূপ 'পাষাণে কীট প্রবেশ করেছিল। পেষমনের স্থূল বুদ্ধি ধন-রত্নের প্রতি কেবল আকর্ষণ বোধ করে---কপালকে মতিবিবির অলঙ্কারদানের ঘটনা তার কাছে মর্মান্তিক হয়েছিল। অলঙ্কারের প্রতি সীমাহীন লোভ ও তা না পাওয়ার বেদনা থেকেই মতিবিবি স্বামীকে 'দরিদ্র ব্রাহ্মণ' বলে অভিহিত করেছে। জাহাঙ্গীরের বদলে মতিবিবির এই মতিভ্রমে সে বিস্মিত হয়ে ব্রাহ্মণ-স্বামীর দেশকে চুয়াড়ের দেশ বলেও ব্যঙ্গ করেছে। যাই হোক, পেষমন চরিত্রটি বাস্তব জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ চরিত্র এবং মতিবিবির চরিত্র-রহস্য উদঘাটনে এই চরিত্রের ভূমিকা কম নয়।

।। জাহাঙ্গীর ।।

প্রত্যক্ষভাবে উপন্যাসের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের কোন সম্পর্ক নেই। ইতিহাস-বিশ্রুত এই চরিত্রটি মতিবিবি-সূত্রে আখ্যায়িকায় স্থান পেয়েছে। মেহের-উন্নিসার প্রেমে গভীরভাবে আসক্ত হলেও প্রধানা মহিষীর পরিচারিকা মতিবিবির পরেও সেলিম অনুগ্রহ-ভাগিনী। লুৎফ-উন্নিসা সেলিমের 'পাটরাণী' হবেন, এমন সম্ভাবনাও দেখা গেল। ইতিমধ্যে নবকুমার দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে মতিবিবির চিত্তাকাশে যে নতুন প্রেমবোধের সঞ্চার হয়, তাতে মতির জীবনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অবকাশ আসে। সেলিমের মেহেরপ্রীতি জানার উদ্দেশ্যে তার আগ্রা গমন এবং আপন স্থান সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করার বাসনা থেকে রাজ নিকেতনে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ। ইতিহাসের রাজ-কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত মতিবিবি জাহাঙ্গীরের সম্মুখে উপনীত হয়ে, তার যথার্থ অনুরাগের প্রসঙ্গটি যাচাই করেছে। জাহাঙ্গীর চরিত্রের রহস্যপ্রিয়তা ও কৌতুকবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আভিজাত্যবোধ। মতিবিবির প্রতি জাহাঙ্গীরের অনুরাগের ভঙ্গীটি চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে। "এক বৃন্তে কি দু'টি ফুল ফুটে না!" অথচ লুৎফ-উন্নিসার আপন স্বামীকে বিবাহ করার প্রস্তাব ও একই মৃণালে দু'টি কমল ফোটে না---বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ তাঁর কাছে পরিষ্কার হয় না। যাইহোক, মতিবিবির প্রয়োজনেই, ইতিহাসপ্রেমী বঙ্কিম, জাহাঙ্গীরের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন।

কপালকুণ্ডলা, ঘরে-বাইরে ও গৃহদাহ ঃ ত্রয়ী নারীচরিত্র

কপালকুণ্ডলা, বিমলা ও অচলা

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের তিন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী---বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র ব্যক্তি-স্বভাবধর্মের দৃষ্টিভঙ্গীতে স্বতন্ত্র জীবনদর্শনের পরিচয় দিয়েছেন আপন আপন সৃষ্টি কল্পনায়। আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিমের দ্বারা উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা, রবীন্দ্রনাথে মননধর্মের উজ্জীবন এবং শরৎচন্দ্রে প্রাকৃত জীবন-বিশ্লেষণ সেই শিল্প-সৃষ্টির বহুবিচিত্র রূপ। প্রতিষ্ঠা, ধারণ ও বিশ্লেষণ মনে হয় তিন ঔপন্যাসিকের তিনটি স্বতন্ত্র দায়িত্ব পালন। জীবনদর্শনেও তাঁদের পার্থক্য প্রবল---বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের অন্তরালশায়ী আশ্চর্য শক্তিগুলির অন্বেষণে রত, রবীন্দ্রনাথ মানব জীবনের সঠিক কল্যাণ-ভাবনায় আত্মনিয়োজিত, শরৎচন্দ্র আবার মানব-মনের বৈচিত্র্যময় রূপ সন্ধানে অন্বিষ্ট। কাহিনীবৃত্ত ও চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যে ঔপন্যাসিকের জীবন-দর্শনের স্থিতি ও প্রকাশ--- কেউ মানবজীবনের নেপথ্যে রহস্যময় অদৃশ্য শক্তির লীলায় জীবনকে দেখেছেন, কেউবা কল্যাণময় রূপের আরাধনা করেছেন, আবার কেউ বা জীবনের প্রতিনিয়ত রূপের বা রূপ পরিবর্তনের কারণ অন্বেষণে ব্যাপৃত রয়েছেন। শৈল্পিক দৃষ্টির পার্থক্যের সঙ্গে তাঁদের শিল্প-সৃষ্টি গভীরভাবে অন্বিত বলে শিল্পিত রূপের মধ্যে তাঁদের জীবন-দর্শনের উপস্থিতি। দৃষ্টিভঙ্গির শিল্পসম্মত রূপ হ'ল, কাহিনীর আধারে চরিত্র নির্মিতি। আবার চরিত্রই তার জীবনকে উপলব্ধি করবার, অনুভবকে দ্যোতিত করবার অবলম্বন। E. M. Forster এই চরিত্র-নির্মিতির প্রসঙ্গে বলেছেন---"The first device is the use of different kinds of characters. The second is connected with the point of view." (Aspects of the Novel)। বৈচিত্র্যময় চরিত্র এবং চরিত্র-আশ্রিত দৃষ্টিভঙ্গীবাজ জীবনদর্শন,আধুনিক কথাসাহিত্যের/নাটকের মর্মকথা।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কাহিনীর প্রাধান্য---তবে কাহিনী তো কেবল গল্পকথন নয়, চরিত্রের সহায়তা গ্রহণ সেখানে অনিবার্য। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতিতে কাহিনীর প্রবল গতিবেগ চরিত্রের অন্তর্লীন ভাব-স্বভাবের বিশ্লেষণে মনোযোগী হবার অবকাশ পায়নি। কাহিনীর অতি দ্রুত স্রোতধারায় যেন চরিত্রের অন্তর্লোকের গভীরে অবগাহন করার অবকাশ পাওয়া যায়নি। কাহিনী গ্রন্থনে এমনই নৈপুণ্য বঙ্কিম দেখিয়েছেন যে উপন্যাস পাঠে পরবর্তী ঘটনাবৃত্তের জন্য পাঠকের চিত্ত উন্মুখ হয়ে থাকে। কিন্তু আধুনিককালের রচনারীতিতে কিছু পার্থক্য এসেছে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র থেকেই তার সূত্রপাত। উপন্যাসে কাহিনী থাকেই, কিন্তু আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী চরিত্র-ভিত্তিক। জীবনে মূল্যবোধ সম্পর্কিত সমস্যা ও সমাধানের ইঙ্গিত রূপ ও রেখায় চরিত্রে প্রকাশ পায়। "We need not ask what happened next, but to whom did it happen. the novelist will be appealing to our intelligence and imagination not merely to our curiosity. A new emphasis enters his voice, emphasis upon value," (Forster)

উপন্যাস হিসেবে কপালকুণ্ডলা, ঘরে-বাইরে ও গৃহদাহ কেবল শ্রেষ্ঠ উপন্যাসই নয়- গ্রন্থকারদের দিকও থেকে অতি উৎকৃষ্ট ও বিশিষ্ট উপন্যাস। 'কপালকুণ্ডলা' বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যময় রসসৃষ্টি-তাঁর মানসী প্রতিমা মৃণ্ময়ী। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ কাব্য ও জীবনকে মিলিয়েছেন

বিমলা চরিত্র সেই ভাবনার অধীন। শরৎচন্দ্র 'গৃহদাহে' অচলা চরিত্রের 'অন্তর্দ্বন্দ্বে চিত্তচাঞ্চল্যের পরিচয় রেখেছেন। তিন ঔপন্যাসিকের জীবনদৃষ্টির পার্থক্যহেতু এই তিন নারীচরিত্রের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্য। ই. এম ফরস্টার চরিত্র-নির্মিতির প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুত্ব যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তার সাহায্য নিয়ে বলা যায়---বঙ্কিম বাইরের দৃশ্যপট থেকে চরিত্রের পরে আলো ফেলেছেন এবং বিস্মিত হয়েছেন তার স্বভাবরূপ দর্শনে (Is he telling the story and describing the characters from the outside: Or, does he go in for being surprised?) রবীন্দ্রনাথ সমাজজীবন সম্পর্কে গভীর অনুভবে তার অমঙ্গল ও কল্যাণময় রূপকে দেখেছেন, আপন জীবন-প্রত্যয়ের গভীর দার্শনিকতায় এবং জীবন-দর্শনের অভিন্নতায় চরিত্র-স্বভাবের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন প্রায়শঃ (Does he pretend that he knows and foresees eveything? Does he identify himself with oneof the character? শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলো বাস্তব জীবনবোধের আলোয় নির্মিত চরিত্র হলেও, গ্রন্থকারের সহৃদয় সহমর্মিতাবোধ চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং এ জন্য সুখ-দুঃখের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর সহানুভূতিশীল দরদী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় (Does he identify himself with one of the characters?) ।চরিত্র-সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় এই পার্থক্য অবশ্যই ঔপন্যাসিকদের জীবনদর্শনের পার্থক্যকে সূচিত করে।

ব্যাপক অর্থে উপন্যাসে মানব-ভাগ্যের বিচিত্র সুখ-দুঃখের লীলাকে আপন দৃষ্টির আলোকে উপস্থাপিত করেন গ্রন্থকার---কারণ, এক অর্থে ভাগ্যই তো কবি-কল্পনাকে উজ্জীবিত করে তাই Man's destiny will always be an object for speculation (Forster) । আবার জীবন-সত্যের উপস্থাপনায় তাঁর অন্বেষণ আবেগ-আকুতির রূপনির্মিতিতে নিয়োজিত হয় (The artist aims at truth and succeds if he raises the emotions - E. M. Forster) কাব্য-প্রেরণার এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য কথাসাহিত্যে ও উপস্থিত---তবে, চরিত্র-রূপসৃষ্টিতে প্রতিভার বৈচিত্র্য, জীবনবোধের ব্যঞ্জনায় আভাসিত হয় প্রায়শই।

'কপালকুণ্ডলা' বঙ্কিমচন্দ্রের উৎকৃষ্ট কাব্য-সৃষ্টি---চরিত্র সেই কাব্যিক ব্যঞ্জনায় ছন্দিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে স্ব-মাধুর্যে। রোমান্সরসসিক্ত এ উপন্যাসের নায়িকা কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-প্রতিভার অনন্যসাধারণ সৃষ্টি সুষমায় বিধৃত। সমুদ্রবেষ্টিত অরণ্যময় জীবনে কাপালিক ও নিসর্গের প্রভাবে বিবর্ধিতা এই নারী একান্তই প্রকৃতি-দুহিতা। ঔপন্যাসিকের মানসলোকেই এর জন্ম---ভাবময় অনুভূতির গভীরে এর অবস্থিতি--কাব্যময় ছন্দেই এর জীবনপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত বলে অন্ধকারের রহস্যময়তায় এ চরিত্র আচ্ছন্ন। রাত্রির অন্ধকারের অস্পষ্টতায় কপালকুণ্ডলা আপাদমস্তক আবৃত বলে, তার হৃদয়-রহস্যের ইঙ্গিত পাওয়া গেল না উপন্যাসে---কঠিন বাস্তবের স্পষ্টালোকে মৃত্তিকার আকর্ষণে কপাল নেমে এলো না। সংসার জীবনে 'মৃণ্ময়ী' আপন রহস্যময়তায় দুরধিগম্য হয়েই রইল। সংসার জীবনের বাস্তবতায় তাকে স্থাপন করেও ঔপন্যাসিক মৃণ্ময়ীর চরিত্র-বৃত্তের মধ্যে যেন একটা গণ্ডী টেনে দিলেন। মৃণ্ময়ী মাটির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত চরিত্র না হয়ে গ্রন্থকারের কল্পনায় মানসী হয়ে রইল। কবি-দৃষ্টিতে যে ঐশী শক্তির লীলা সমগ্র মানবজীবনে পরিব্যাপ্ত---তার রূপ-রহস্য, গতি-প্রকৃতি নিরীক্ষণে স্বকপোলকল্পিত ভাবনায় কপালকুণ্ডলার মানসী-প্রতিমা বঙ্কিম গড়ে নিয়েছিলেন। প্রকৃতিলোক, কাপালিক ও ঐশী শক্তির লীলা---এই তিন ভাববস্তুর সহায়তায় বঙ্কিম যে মৃণ্ময়ীর রূপ নির্মাণ করেছেন, কবি-কল্পনায় সেই মৃণ্ময়ী চিণ্ময়ীরূপে কপালচরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কপালকুণ্ডলার আবেদন তাই প্রখর বুদ্ধির কাছে নয়---একান্তই হৃদয় উপলব্ধির কল্পিত মানসলোকে। মায়াবী নারীর চরিত্র নির্মিতিতে বঙ্কিমের মায়াঞ্জন মাখানো দৃষ্টিভঙ্গীই বেশী কাজ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের বিমলা কেবল চরিত্র হিসেবে নয়, মনোদর্শনেব আলোকে এ চরিত্র নতুন রূপে ও ভঙ্গিতে প্রকাশিত। বিমলার সমস্যা ও সংকট, জীবনাচরণ ও ভাবনা, তার মোহ ও প্রবৃত্তিময়তা, সুস্থ বিবেকবোধে পরিচালিত না হওয়া প্রবল আসক্তি---একক, বিচ্ছিন্ন ও সীমিতভাবে চরিত্রেরই একমাত্র বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠেনি---গ্রন্থকারের নিবিড় জীবন অনুধ্যানের অনুষঙ্গ হিসেবেও তার গভীর মূল্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের চরিত্র ও ভাব নির্মিতিতে কেবল "মতবাদেব প্রাধান্য" এই অভিমত ব্যক্ত করার নেপথ্যে যে অশ্রদ্ধার মনোভঙ্গী দেখা যায়, সুস্থ বিচারবোধেব অভাবই তার কারণ।'রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাদর্শ কথাসাহিত্যেও বর্তমান তা অনস্বীকার্য---কিন্তু, সে তত্ত্ব জীবন ও ভাবনাকে কতটা নিয়ন্ত্রিত করেছে, আমাদের চৈতন্য ও জীবনবোধের কাছে তা কতটা প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার নেপথ্যে মানবজীবনেব শান্তি, সুস্থিতি, কল্যাণবোধের সঙ্গে তার নিবিড় যোগ কতখানি---এসব প্রশ্ন সঙ্গত বলেই মনে হয়। স্থূল রুচি ও জীবনভঙ্গিমাকে যাঁরা বাস্তবতার প্রাঙ্গণভূমিতে দাঁড় করিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টির মৌল প্রেরণা বলে আস্ফালন করেন, রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শনের জগৎ তাঁদের সেই চিন্তা-চেতনার বাইরে জগৎ। তাই মতবাদ নয়, ববীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যে জীবন-এক নতুন সুর-যা মগ্ন চৈতন্যের গভীর-অনুভবে চিরন্তন বলে মনে হবে। 'মতবাদ'--এই ভাবনার মধ্যে একটা বিচ্ছিন্নতার সুর আছে---স্থান-কাল-পাত্রের পরিপ্রেক্ষিতে তার রূপান্তর সম্ভব---তাই তাকে স্থানিক, কালিক সীমাবদ্ধতায় আচ্ছন্ন হতে দেখা যায়। এই অর্থে রবীন্দ্র-সৃষ্ট কোন চরিত্রই মতবাদে ভারাক্রান্ত নয়---তার একটা স্থানগত রূপ থাকলেও (প্রয়োজনটা অবশ্যই শিল্পিত রূপের) তা একই সঙ্গে বিশ্বাত্মক 'অখণ্ড জীবনধারায় খণ্ড জীবনের প্রকাশ ---"মানব চরিত্রের মধ্যে চিরন্তনত্ব আছে, কিন্তু ঘটনার মধ্যে নেই।" অনন্তকালপ্রবাহে মানবজীবনের সত্য অন্বেষণের নিরন্তর প্রচেষ্টা আমাদের অগ্রগতিকে চিহ্নিত করেছে আধুনিকতায়--মানবজীবনের উত্তরণও তো সেই সত্যবোধে। সেই শাশ্বত চেতনার মহামানবিক অনুভবেব দ্যোতনায় সীমিত জীবনে পরিপূর্ণতার আভাস মেলে। খণ্ডিত জীবনরূপের মালিন্য ও আবিলতা অখণ্ড সত্যচেতনায় ম্লান হয়ে পড়ে---অসত্যকে বর্জন করে হয় সত্যের প্রতিষ্ঠা। বিমলা চরিত্র সেই জীবন-ভাবনার প্রতীক চরিত্র।

সহজ, সঙ্গত সত্যবোধে নিখিলেশ আত্ম-স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বেব মর্যাদায় বিমলাকে অভিষিক্ত করতে চেয়েছিল--বিবাহের মধ্যে পাওয়া বিমলকে প্রথা-সর্বস্বতায় অপূর্ণভাবে লাভ করার মধ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা খণ্ডিত হয় বলে তাকে মুক্তি দিয়েছিল নিখিলেশ। এই মুক্তি অহেতুক নয়---সত্য ও পূর্ণের জগৎ থেকে তাকে যদি লাভ করা যায়, তবেই তার ভালোবাসা অখণ্ড সত্যের মাঝে যথার্থভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। বিমলার প্রতি তার আহ্বান ছিল---"আমি চাই বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই। ওইখানে আমাদের দেনা পাওনা বাকি আছে।.... সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয়, তবেই আমাদের ভালবাসা সার্থক হবে। এই মুক্তি সূত্রে বিমলার বাইরের জীবনে পদার্পণ এবং সন্দীপের সঙ্গে পরিচয়। নিখিলেশের আপাত-উত্তাপহীন সত্যাদর্শ মোহান্ধ বিমলার অন্তরে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারেনি---অথচ সন্দীপের সম্মোহনী শক্তির আসক্তিপূর্ণ কামনা-বাসনা বিমলার অন্তরে আলোড়ন তুলেছিল। স্বদেশপ্রেমের অন্তঃসারশূন্য উন্মাদনা নিয়ে সন্দীপের উপস্থিতি তাকে মোহাবিষ্ট করে তুলল---শেষে সন্দীপের ইন্দ্রিয়াসক্তির প্রবল ঘূর্ণিপাকে বিমলা আত্মবিস্মৃত হয়ে কাম-কামনার অনুবর্তী হয়ে পড়ল। সন্দীপ তার সমস্ত শক্তি দিয়ে বিমলার বিকৃত, সংকীর্ণ, ক্ষুদ্র 'আমি'কে জাগিয়ে তুলল---"আমি জানি লোভী মানুষকে মেয়েরা ভালবাসে। ওই লোভের উপর দিয়েই তো তাদের জয় করে" নিজের এই মহিমার নেশায় মাতাল হয়ে বিমলা যখন মোহান্ধতায় উন্মত্তপ্রায় তখন সন্দীপের টাকা চাওয়া ও অমূল্যর

প্রতি বিমলার অপত্য-স্নেহের পরে তীব্র বিদ্বেষ,. বিমলার অন্তর্দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করে তুলল। তার মগ্ন-চৈতন্যে সত্যবোধ সত্যভাবনায় আবির্ভূত হ'ল। কিন্তু ঘটনাক্রম তখন অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে--প্রত্যাবর্তনের পথ হয়েছে রুদ্ধ---গৃহের শ্রী হয়েছে অন্তর্হিত। অমূল্যর অহেতুক মৃত্যু, স্বদেশপ্রেমের সংকীর্ণতায় জেগে ওঠা দাঙ্গা-হাঙ্গামা, প্রতাপ-প্রভুত্ব-মোহের সর্বনাশী রূপ, নিখিলেশের আহত হওয়া---ঘর ও বাইরের জীবনকে অমঙ্গলের অবাঞ্ছিত রূপে আবৃত হতে দেখি। বিমলার ভাগ্য হতাশা ও দুঃখে পূর্ণ হয়ে উঠল---তবে এ ভাগ্য তো আত্মকৃত মোহান্ধময় জীবনের অনিবার্য পরিণতি।

আসলে, যাকে আমরা স্বভাব বলি, বাস্তব বলি-- তা তো জীবনের উপরিতলের খণ্ডাংশ মাত্র --সেখান থেকেই জন্ম নেয় বিকৃতির। তাকেই আমরা 'স্বভাব' বলে চেঁচাতে থাকি। বিমলা সেই বিকৃতির প্রতীক চরিত্র---অবশ্য ষড়রিপুর প্রবল প্রভাবে সন্দীপের বিকৃতি তার তুলনায় অনেকটাই বেশী। স্থূল ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে যে জীবনকে বিমলা গ্রহণ করেছিল, তার মধ্যে না ছিল সত্য, না ছিল পূর্ণতা, না ছিল মঙ্গল-কল্যাণের ভাব। সন্দীপের দেশপ্রেমের স্থূলতা, প্রভাব-প্রতিপত্তিলাভের মোহ, অহং-সর্বস্বতায় শেষ হয়নি---পঙ্কিল কামনা-বাসনায় তা বিস্তৃত হয়েছিল অনিবার্যভাবে। দেশপ্রেম প্রসঙ্গ ও জীবন---এই দুই কেন্দ্র থেকে ঘর ও বাইরের অমঙ্গল কিভাবে ঘটল, তারই ইতিবৃত্ত বিমলা চরিত্রকে আশ্রয় করে প্রকাশ পেয়েছে। "মানুষের অন্তরের সঙ্গে বাইরের এবং একের সঙ্গে অন্যের ঘাত-প্রতিঘাতে যে হাসিকান্না উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, এর মধ্যে তারই বর্ণনা আছে"---বিমলা এই ভাবনাব চমৎকার উদাহরণ। চরিত্র-রূপের মধ্যে অসঙ্গতি, অসম্পূর্ণতা, বিকৃতি, মোহান্ধতা, প্রবৃত্তিময়তা---ব্যক্তির ও পরিবারের, সমাজের ও সমগ্র মানবজাতির কি অকল্যাণ ডেকে আনে, রবীন্দ্রনাথ বিমলা চরিত্রের মধ্য দিয়ে তা দেখিয়েছেন। মানব-মঙ্গলের কল্যাণময় রূপের/ভাবের পরিপূর্ণ, অখণ্ড, শাশ্বত, প্রেম-ভাবনার সত্য দিক বিকৃতির পাশাপাশি দ্যোতিত হয়েছে অনিবার্যভাবে।

শরৎচন্দ্র 'গৃহদাহ' উপন্যাসের অচলা চরিত্র রূপায়ণে জটিল মনস্তত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বুদ্ধির সঙ্গে অবচেতন মনের সংঘাতে মানবজীবনে যে নিত্য টানাপোড়েন দেখা যায়, তারই আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসায় অচলা চরিত্র নির্মিত হয়েছে। অচলার সচেতন বুদ্ধি যাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে চেয়েছে, হৃদয় তাকে পূর্ণভাবে অনুসরণ করেনি---বরং বিপরীত ক্রিয়ায় একের পর এক সমস্যা, সংকটে জড়িত হয়ে পড়েছে। শরৎচন্দ্র বাস্তব জীবনের পটভূমিকায় নারীর জটিল রহস্যময় দিকগুলিকে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করেছেন। অচলার হৃদয়ের দোলাচলবৃত্তি, নারীসুলভ স্নেহ-মমতা-প্রেম, অবস্থাবৈগুণ্যে যে কি ভয়ানক পরিণতি লাভ করেছে উপন্যাসে তারই বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। খুব সূক্ষ্ম ভাবের নিত্য ওঠাপড়ায় অচলার জীবন এক অর্থে দ্বিধাবিভক্তও বটে। মহিমকে যথার্থই ভালবেসে অচলা তাকে বিবাহ করেছিল। সুরেশের প্রতি কৃতজ্ঞ সে---মহিমের জীবন-রক্ষায় সুরেশের সাহায্য ও এই চরিত্রের ঔদার্যগুণ অচলাকে আকৃষ্ট করেছিল নিঃসন্দেহে। মহিমের বন্ধু ও উপকারী সুরেশ—অচলার কাছে বন্ধুসুলভ সহমর্মিতাবোধে, কৃতজ্ঞতায় উপস্থিত হয়েছিল। সুরেশের ঔদার্য, উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রাণবান ও বেগবান স্বভাব অচলার মনে ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করে। বিশেষ করে, তার অকপট উক্তি, কখনও বা অচলার প্রতি প্রশংসাসূচক কথাবার্তা অচলার মনে দোলা দিয়েছে বলে মনে হলেও, বাঙালী নারী-চেতনার গভীরে স্বামীপ্রীতির দৃঢ়বদ্ধ রূপের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। আসলে একে স্বাভাবিক সৌজন্যবোধ বলে গ্রহণ করতে হয়। তবে, হৃদয়বান সুরেশের উচ্ছ্বাসপূর্ণ, প্রাণোচ্ছল ভঙ্গীর পাশে, বিবাহোত্তর জীবনে মহিমের আপাত ঔদাসীন্য, স্ত্রীকে বাদ দিয়ে সমাজসেবার কর্তব্যপরায়ণতা, গাম্ভীর্য ও স্বভাবগত বাক-সংযম অচলার কাছে

ম্লান ও আকর্ষণহীন হয়ে পড়েছিল। এর উপরে যুক্ত হয়েছে মহিম-মৃণাল সম্পর্কে সন্দেহ। একদিকে বিবাহোত্তর নারীজীবনের অপূর্ণতা, সন্দেহের জ্বালা ও গ্রাম্য পরিবেশ তার ধৈর্যাচ্যুতি ঘটিয়েছিল, গ্রাম্য জীবনে হঠাৎ আবির্ভূত সুরেশের কাছে সে ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছিল। বন্ধুর কাছে যে আস্থা ও বিশ্বাসে নিজেকে সমর্পণ করা যায়, সে ভাবনাই এখানে প্রবল ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু পরস্ত্রীলুব্ধ সুরেশের কাছে তার অর্থ হ'ল ভিন্নরূপ। অচলার জীবন-ট্রাজেডির রহস্য এখানেই।

সুরেশের অন্তরে সযত্নে লালিত অচলার প্রতি তীব্র আসক্তি অনুকূল অবকাশ পেয়ে স্বেচ্ছাচারে পরিচালিত হয়েছে। মোগলসরাই স্টেশনে তাকে প্রায় জোর করেই অন্য গাড়িতে তুলল সুরেশ। অচলা যে কোনদিনই সুরেশকে ভালোবাসেনি, তার দু'টি পরিষ্কার প্রমাণ আখ্যায়িকায় আছে। ট্রেনে তোলার পর চির-অভ্যস্ত সংস্কারে ও সুরেশের হঠকারিতায় অচলা বিমূঢ় হয়ে পড়ল---আবার একরাত্রি সুরেশের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে তার জীবন বিস্বাদে পূর্ণ হয়ে গেল। মনে হয়, অচলার সুরেশের প্রতি প্রেমানুরাগ কখনও দেখা দেয়নি। যেটুকু দেখা গিয়েছে, তাকে পরার্থপর বন্ধুর প্রতি আস্থা, বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতায় ব্যাখ্যা করা চলে। সুরেশের দুঃখ-বেদনায়, আধিব্যাধিতে তার যে সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে, তা তো বাঙালী নারীচরিত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। তাকে ভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা অর্থহীন। সুরেশও মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে একথা মহিমকে বলেছে---"অচলা যে তোমাকে কত ভালবাসত, সে আমিও বুঝিনি, তুমিও বোঝোনি---সে নিজেও বুঝতে পারেনি।" সুরেশের উপস্থিতিতে মহিম অচলার বাহ্য গৃহদাহ শেষপর্যন্ত কি সাংঘাতিক মর্মদাহে অন্তর্লোকের বিচ্ছেদ-বেদনায় পরিণত হ'ল, গৃহদাহ উপন্যাসে তার বিবরণ আছে। ডিহরী-প্রবাসের দিনগুলিতে অচলার অন্তর্দাহ, নৈরাশ্য, মিথ্যা পরিচয়ের গ্লানিতে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তারই মধ্যে সুরেশের মৃত্যু, মহিমের উপস্থিতি---অচলার আত্মলাঞ্ছনার নিদারুণ চিত্র। অচলার জীবন-ট্রাজেডি কতকটা সুরেশ এবং মহিমের চরিত্র-স্বভাবের অনিবার্য পরিণতি। তার নিজের দায়ও এতে কম নয়---কারণ অচলার নিজের কাছে স্নেহ-প্রেম-মায়া-মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্যের কোন স্পষ্ট সীমারেখা-ভেদ জানা ছিল না। এই নারী মূর্তির মধ্যে শরৎচন্দ্র সংঘাতময় পরিবেশে দ্বিধাগ্রস্ত, বিপরীত ক্রিয়ায় বিপর্যস্ত, মানুষের ট্রাজেডির চিরন্তন এক রূপ আবিষ্কার করেছেন---আধুনিক বিশ্লেষণরীতির সাহায্যে ঘটনাবৃত্ত, পরিবেশ, চরিত্র, ঘটনা-সংস্থান অপূর্ব গভীর মানবিক ব্যঞ্জনায় রূপায়িত হয়েছে।

সুতরাং বাংলা সাহিত্যে এই ত্রিবিধ নায়িকার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ঔপন্যাসিকদের জীবন দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে চিত্রিত হয়েছে বলা যায়। চরিত্রত্রয়ের পার্থক্য সূত্রাকারে এইভাবে বলা যেতে পারে ঃ (১) পরিবেশগত পার্থক্য---কপালকুণ্ডলার আবির্ভাব, স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যে প্রকৃতির দুর্নিবার প্রভাব। কাপালিকের তান্ত্রিকতা ও ভবানী-প্রীতি তার জীবনকে গভীরভাবে আবিষ্ট করেছিল। মৃণ্ময়ীর সাংসারিক পরিবেশেও বনোন্মত্ততা উল্লেখযোগ্য চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। কপালকুণ্ডলা আদ্যোপান্ত প্রকৃতিদুহিতা। বিমলা-চরিত্র নিখিলেশের অভিজাত পরিবেশ-প্রভাবে সংস্থাপিত। গৃহপ্রাঙ্গণের বাইরে সন্দীপের সাথে পরিচয়, কামনা-বাসনার জগতে অবতীর্ণ হওয়ার পরিবেশটি ফুটিয়ে তুলেছেন গ্রন্থকার আভিজাত্যের পরিবেষ্টনে। প্রবৃত্তির প্রশ্রয়---অথচ কৃত্রিমতায় গোপন করার চেষ্টা, কথাবার্তা, আচার-আচরণে পরিবেশগত প্রভাবের পরিচয় আছে। অচলা ব্রাহ্মসমাজের নারী---প্রগতিশীল, শিক্ষিত নারী হিসেবে তার বুদ্ধি ও মার্জিত রুচি লক্ষণীয়। বিপরীত গ্রাম্য পরিবেশে, মহিমের সঙ্গে জীবনযাপনে, কতকটা স্বাচ্ছন্দ্যহীন অবস্থায় তার মানসিক বৈকল্য---সুরেশের উপস্থিতিতে জটিল রূপ নিয়েছিল। সুতরাং পরিবেশগত দিক থেকে কপাল, বিমলা ও অচলার অবস্থানভূমি স্বতন্ত্র এবং স্বতন্ত্র এই পরিবেশ প্রভাবে ত্রয়ী নায়িকার জীবন অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

(২) আখ্যায়িকায় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পটভূমিকায় এই তিন চরিত্রকে বিচার করা চলে। কপালকুণ্ডলার

স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে সংঘাতের অবকাশ নেই। ঐশী শক্তির লীলাই তার জীবন। প্রকৃতি-দুহিতার সংসার জীবনেও কোন সমস্যা, সংকট নেই। নিদারুণ ঔদাসীন্যে অনাসক্ত কপাল স্বচ্ছন্দে প্রতিযোগিনী মতিবিবিকে আপন স্থান ছেড়ে দেয়। সংসার জীবনের প্রতি তার অনীহা সীমাহীন ব্যঞ্জনায় আভাসিত হয়েছে। বিমলার সংকট ও সমস্যা আছে। একদিকে সন্দীপের প্রতি মোহের সঞ্চার, কামনা-বাসনার দোলায় দোলায়িত জীবনতরঙ্গ, অন্যদিকে বিবেকবোধের সত্য ভাবনায় পীড়িত বিমলা---এই দ্বৈতভাবের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে বিকৃত জীবন পরিত্যাগের আগ্রহ বিমলার জেগেছিল। অচলার জীবনে সমস্যা আরও জটিলতর রূপ নিয়েছে সুরেশ ও মহিমকে কেন্দ্র করে। অচলার নিজের কাছেই অস্পষ্ট তার হৃদয়ের গতিপথ। স্বামী মহিমের প্রতি তার কর্তব্য আছে--হিন্দুধর্মের সংস্কারাবদ্ধ মনও তার আছে। অথচ সুরেশের প্রতি তার অন্তরের আকর্ষণ ভিন্ন ব্যাখ্যায় প্রেম বলে মনে হলেও অচলার নিজের কাছেই তা প্রত্যক্ষ নয়। তবু মহিম-সুরেশকে ঘিরে তার অন্তর্দ্বন্দ্ব পূর্ণতা পাবার আগেই সুরেশের হঠকারিতায় অচলার জীবন-পরিণাম নির্দিষ্ট হয়। ডিহরী প্রবাস-উত্তর জীবনে অনুশোচনার বহুবিচিত্র পর্ব তার জীবনকে গভীর দুঃখে উপনীত করিয়েছে।

(৩) কাহিনীগত দিক থেকে তিনটি উপন্যাসের পার্থক্য কম নয়। বাঙালী পরিবার জীবনে পুরুষের তুলনায় নারীর প্রাধান্য স্বীকৃত। ত্রয়ী উপন্যাসে নারীর ভূমিকাই চিত্তাকর্ষক--তুলনায় পুরুষ চরিত্র অনেকটাই নিষ্প্রভ। নারীকেন্দ্রিক কাহিনীবৃত্তে এটুকু সাধর্ম্যের কথা বাদ দিলে, আখ্যানবস্তুর পার্থক্য চরিত্রগুলিকে যেন গড়ে তুলেছে। কপালকুণ্ডলা, বিমলা ও অচলা কাহিনীগত গঠনকৌশলে ত্রয়ী উপন্যাসের চালিকা শক্তি। কপালের প্রকৃতি ও ভবানীপ্রীতি, বিমলার সন্দীপ প্রীতি ও বিকৃতি এবং অচলার অন্তর্দ্বন্দ্ব---তিন উপন্যাসের আখ্যায়িকাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে প্রত্যক্ষভাবে। সুতরাং এই তিন চরিত্র ও কাহিনী কেবল অবিচ্ছেদ্য বন্ধনেই আবদ্ধ নয়---উপন্যাসের মূল কথাবস্তু এই তিন চরিত্রের আলোকে প্রকাশিত।

(৪) রস-পরিণামের দিক থেকে তিন উপন্যাসের ট্রাজেডির মিল আছে। তবে সে মিল বহিরঙ্গ গত--অন্তরঙ্গ নয়। কারণ কপাল, বিমলা ও অচলার জীবন-কাহিনী স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। প্রকৃতি-দুহিতা কপাল প্রবল সংসার-অনাসক্তিতে এবং ভবানীর নির্দেশে জীবন-বিসর্জনে কৃতসংকল্পা ; বিমলা আত্মকৃত কামনা-বাসনার বিকৃত ভাবনায় পরিবার ও সমাজের যে অমঙ্গল সাধন করেছে, তারই অনিবার্য পরিণামে নিখিলেশের আঘাত প্রাপ্তি ও অমূল্যর মৃত্যু। সুস্থ ও সত্যজীবনে প্রত্যাবর্তনের সব পথ তার রুদ্ধ হয়েছিল। কারণ, বিমলা সঠিকভাবে অনুভব করে---"আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি সংসারকে আমার পাপ নানা দিক থেকে মারতে থাকবে।" আবার, অচলার অন্তর্দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে তার জীবনে দুঃখেরই একাধিপত্য। মহিমের নির্লিপ্ততায় ও মৃণালের সঙ্গে মহিমের অদৃশ্য সম্পর্ক কল্পনায় অচলার সমস্যা সুরেশের উচ্ছ্বাসপূর্ণ পরস্ত্রীলুব্ধতায় সংকটে পরিণত হয়। গ্রাম্যজীবনে মহিমের গৃহদাহ এবং ডিহরী প্রবাসের দিনগুলোতে অচলার অন্তর্দাহ শোচনীয় পরিণতির পথকে প্রশস্ততর করে তোলে। কপালকুণ্ডলা, ঘরে-বাইরে ও গৃহদাহ উপন্যাসের নায়িকা চরিত্রগুলি আপন স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে ট্রাজিক পরিণামের সম্মুখীন হয়েছে.

(৫) দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতায় তিন ঔপন্যাসিকের তিন ধরনের স্বতন্ত্র ভাবনার পরিচয় কপালকুণ্ডলা, ঘরে-বাইরে ও গৃহদাহ উপন্যাসে পাওয়া যায়। কপালকুণ্ডলায় কাপালিকের হাত থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত নবকুমারের সঙ্গে কপালের বিবাহ হয়েছিল অধিকারীর 'আশ্রয়ে'। সংসার জীবনে অনাসক্ত মৃণ্ময়ী এবং রূপমুগ্ধ নবকুমার--দু'টি বিপরীত ভাবাশ্রয়ে তাদের সাংসারিক দাম্পত্য জীবনকে অস্পষ্ট রেখায় চিত্রিত করেছে। শ্যামার জন্য বনৌষধি সংগ্রহার্থে বনে গমন, ব্রাহ্মণবেশী পুরুষরূপে মতিবিবির সঙ্গে মৃণ্ময়ীর সাক্ষাৎ---নবকুমারের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে---তাদের

দাম্পত্যজীবনের অন্তিম লগ্ন ঘনিয়ে এসেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভবানীর নির্দেশ এবং কাপালিকের দেবীচরণে কপালকে বলি দেবার ষড়যন্ত্র। সব মিলে নবকুমার-কপালের দাম্পত্যজীবনের অবসান ঘটেছে। তবে, বাইরের ষড়যন্ত্র বা সন্দেহ নয়-- কপালের হৃদয়ে দৈবী নির্দেশের গভীর প্রভাবেই তার জীবন-পরিণাম নির্দেশিত হয়েছে এবং নবকুমার রূপমুগ্ধতায় তার অনুগমন করেছে মাত্র।

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের নিখিলেশ-বিমলার দাম্পত্য জীবন "স্ত্রীর উপর স্বামীর নিত্য দখলের" অহংকারে সূচনা-পর্বে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু "বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে শক্তিতে প্রেমে পূর্ণ বিকশিত বিমল"কে দেখবার ইচ্ছা থেকে বিমলকে মুক্তি দিয়েছিল নিখিলেশ। প্রত্যাশা ছিল, বাইরের জগতের স্বাধীন, মুক্ত প্রেম-ভাবনায় বিমল নিখিলেশকে গ্রহণ করবে। কিন্তু 'বন্দে মাতরম' মন্ত্র নিয়ে উপস্থিত সন্দীপ বিকৃত পঙ্কিল কামনা-বাসনা নিয়ে বিমলার অন্তরে আলোড়ন তুলল---বিমলাও সম্মোহনী শক্তি প্রভাবে যতই আত্মবিস্মৃত হতে লাগল, ততই নিখিলেশের হৃদয়-যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেতে থাকল। সৃষ্টি হ'ল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব---একই গৃহকোণে থেকে নিখিলেশ-বিমলার এই মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে তাদের দাম্পত্য-সম্পর্কের জটিলতা রবীন্দ্রনাথ চমৎকার ভাবে চিত্রিত করেছেন। বিমলার তীব্র অন্তর্যাতনা লক্ষ্য করেও নিখিল সত্য-আদর্শবোধে ব্যক্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেনি। মানুষের অন্তর্নিহিত সত্য-ভাবনার পরে নিখিলেশের আস্থা ছিল গভীর। অবশেষে, সন্দীপের দেশপ্রেমের অন্তঃসারশূন্যতা ও অমূল্যর প্রতি বিদ্বেষ এবং তার কামনা-বাসনারূপ ইন্দ্রিয়সর্বস্বতা বিমলাকে বিকৃত জীবন থেকে সত্য জীবনে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ করে দিয়েছে। কিন্তু হতশ্রী জীবন থেকে তার প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়নি---দাঙ্গা-হাঙ্গামা, নিখিলেশের দাঙ্গা থামানোর জন্য গমন ও আহত হওয়া এবং অমূল্যর মৃত্যু---বিমলার দাম্পত্যজীবনের শোচনীয় ইতিকথা। পরিবার, সমাজ ও দেশের অকল্যাণের রূপটি রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন দাম্পত্য জীবনের প্রেক্ষাপটে।

'গৃহদাহ' উপন্যাসের দাম্পত্যজীবন অত্যন্ত জটিল। প্রাক্-বিবাহপর্বে মহিম সুরেশকে নিয়ে অচলার টানাপোড়েন ও অবশেষে মহিমকে বিবাহ করার মধ্যে এই পর্বের সমাপ্তি। পল্লীজীবনে মহিম-অচলার দাম্পত্যজীবন সুরেশের উপস্থিতি ও মৃণাল-মহিম সম্পর্কিত সন্দেহে জটিলতর রূপ নিয়েছে। মহিমের গৃহদাহ ও অসুস্থতা এবং বায়ুপরিবর্তনের জন্য পশ্চিমে যাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে অচলা-মহিমের দাম্পত্য জীবন নতুন পথে পরিচালিত হয়েছে। মহিমের সমাজপ্রীতি ও কর্তব্যপরায়ণতা, অচলা সম্পর্কে আপাত নির্লিপ্ততা, অচলার বিক্ষুব্ধ মনে যে জ্বালার সৃষ্টি করেছিল সুরেশের উপস্থিতিতে ও উচ্ছ্বাসপ্রবণতায় অনুকূল অবকাশ পেয়ে তা কিছুটা বিরুদ্ধ পথকে অবলম্বন করেছে। একদিকে অচলার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্তরের দোলাচল মানসিকতা ও অন্যদিকে পরস্ত্রীলুব্ধ সুরেশের হঠকারিতায় অচলার জীবনে দুর্বিপাক ঘনিয়ে এসেছে। ডিহরী প্রবাসের দিনগুলিতে অচলার অন্তর্দাহ সীমাহীন বেদনায় চিত্রিত হয়েছে। মহিম-অচলার দাম্পত্যজীবন জটিলতর পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এভাবেই অবসিত হয়েছে।

(৬) ঔপন্যাসিকের জীবন-দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে কপালকুণ্ডলা, বিমলা ও অচলা চরিত্রের পার্থক্য অনুভব করা যায়। কপালকুণ্ডলায় বঙ্কিম ঐশী শক্তির লীলায় জীবনকে দেখছেন; বিমলার মধ্যে প্রবৃত্তির অকল্যাণময় রূপ দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ; আবার শরৎচন্দ্র বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ থেকে অচলার অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রত্যক্ষ করছেন---"জীবন যে রূপে দেখা যায়" ভঙ্গিতে। উপন্যাসের ভাববস্তুতে অন্য কথা থাকলেও ---এই তিন নারীচরিত্র ঔপন্যাসিকদের জীবনদর্শনের সিংহভাগ অধিকার করে আছে, একথা স্বীকার করতে হবে।

ত্রয়ী উপন্যাসের পুরুষ চরিত্র

নবকুমার, নিখিলেশ ও মহিম

বাংলা কথাসাহিত্যে পুরুষের তুলনায় নারীরই প্রাধান্য স্বীকৃত। কপালকুণ্ডলায় কপাল, 'ঘরে-বাইরে'র বিমল ও 'গৃহদাহে' অচলা নিঃসন্দেহে নায়িকারূপিণী নারীচরিত্র—উপন্যাসত্রয়ের ভাববস্তু এদের দ্বারাই বহুলাংশে সম্পাদিত হয়েছে। আবার, এই ত্রয়ী নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে যে তিন পুরুষ চরিত্র আখ্যায়িকায় স্থান পেয়েছে তাদের ভূমিকা অনেকাংশেই নায়কচরিত্রের সমতুল। 'কপালকুণ্ডলা', 'ঘরে-বাইরে' ও 'গৃহদাহ' উপন্যাসের নবকুমার, নিখিলেশ ও মহিম—স্ব স্ব ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে চরিত্র-কেন্দ্রিক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছে। উপন্যাসের পটভূমিকায় এই চরিত্রগুলির ভূমিকা অনবদ্য—নায়িকা চরিত্রের স্বরূপ উদঘাটনে অথবা কাহিনীবৃত্তের ক্রম-পরিণতির স্তরকে পরিস্ফুট করার ক্ষেত্রে এই ত্রয়ী চরিত্রের ভূমিকা কম নয়। ঔপন্যাসিকের জীবন-দর্শনের সঙ্গে চরিত্রগুলির নিবিড় সম্পর্ক পরিবার, সমাজ, অরণ্যপ্রকৃতির ও ব্যক্তির সঙ্গে সংঘাতে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, মানসিক দ্বন্দ্ব, ব্যক্তির স্বতন্ত্র ভাব-ভাবনা আখ্যায়িকার স্বরূপ আবিষ্কারের কার্যকরী হয়েছে। নবকুমার, নিখিলেশ ও মহিম-চরিত্রের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের পর্যালোচনায় এই তিন চরিত্রের পার্থক্য নিরূপণ করা যেতে পারে।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের নবকুমার চরিত্রে প্রথমাবধি রূপ-সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হবার প্রবণতা দেখা যায়। প্রকৃতিলোকের রূপ দর্শনে মুগ্ধ, বিস্মিত অবস্থায় তার উপন্যাসের মধ্যে প্রবেশ ঘটেছে—মানবী মূর্তির রূপ মুগ্ধতায় আবিষ্ট হয়ে তার জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সমুদ্রবেষ্টিত অরণ্যময় প্রকৃতির অনাবিল রূপ-সৌন্দর্যে নবকুমারের যে মগ্ন ভাব ছিল, কপালকুণ্ডলা সম্পর্কে তা রূপমুগ্ধতায় রূপবহ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হতে দেখি। পুরুষের স্বভাব সম্পর্কে গ্রন্থকারের জীবন-জিজ্ঞাসা অনিবার্যভাবে যুক্ত আছে চরিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে। কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবির রূপ-সৌন্দর্যে সে আকৃষ্ট। রূপমুগ্ধতায় ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কপালকে বিবাহ ও সংসার জীবনে প্রবেশ ঘটেছে তার। 'স্বদেশে' সংসার-জীবনে কপালের প্রতি প্রেমময় দৃষ্টিতে সে আচ্ছন্ন। রূপান্ধ নবকুমারের এই চিত্ত-দৌর্বল্য কপাল চরিত্র সম্পর্কে সংশয় / সন্দেহ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। কাপালিকের সঙ্গে ষড়যন্ত্রেও সে লিপ্ত। অন্তিম দৃশ্যে মৃন্ময়ীর প্রতি রূপোন্মত্ততা আবার প্রকাশ পেয়েছে। আর, এই রূপ-বহ্নিতেই তার পুড়ে মরার কাহিনী কপালের সঙ্গে আত্ম-বিসর্জনে স্পষ্ট হয়েছে। যাইহোক, নবকুমারের চরিত্র-বিশ্লেষণে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যাবে—এই ব্রাহ্মণপুরুষ রূপমুগ্ধ, মৃদুভাষী, উদারচিত্ত, পরোপকারী, ব্যবহারে সংযত ও পরিশীলিত এক ব্যক্তিত্ব।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট স্বতন্ত্র। নিখিলেশের চরিত্র-প্রকৃতি স্বতন্ত্র এবং রবীন্দ্রনাথের বিশেষ জীবনদর্শনজাত মতাদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উপন্যাসের মূল সত্যভাব নিখিলেশ চরিত্র আশ্রয়ে ব্যক্ত হয়েছে। ব্যক্তিত্বে, শিক্ষা-দীক্ষা ও সত্যবোধে অনুপ্রাণিত নিখিলেশ সত্য-সাধনায় আত্মনিয়োজিত। তাই সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ জীবনকে ঔদার্যে, প্রেমে, সেবায় সে উত্তীর্ণ করতে চায় মানব-জীবনের সার্বিক কল্যাণ ভাবনায়—এখানেই তার বৃহৎ সত্যাদর্শের অখণ্ড রূপের সাধনা। দু'টি দিক থেকে নিখিলেশের ভাবনাকে রবীন্দ্রনাথ সত্যের ভূমিতে দাঁড় করাতে চেয়েছেন—এক,

বিমলাকে চার দেওয়ালের বাইরে মুক্তি দেওয়া ও "বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে শক্তিতে প্রেমে পূর্ণ-বিকশিত বিমলা"কে পাওয়ার বাসনা। কারণ, "ভোগই প্রেমের একমাত্র লক্ষণ নয়। প্রেমের একটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে এই যে, প্রেম আনন্দে দুঃখে স্বীকার করে নেয়। কেননা, দুঃখের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারাই তার পূর্ণ সার্থকতা।" (রসের ধর্মঃ শান্তিনিকেতন)। বিমলাকে বাইরের জগতে মুক্তি দিয়ে সন্দীপ-বিমলার বিকৃতি দেখে নিখিলেশ পীড়িত হয়, দুঃখ পায়। কিন্তু তার দৃষ্টিতে "একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলন-বিচ্ছেদের সুখদুঃখ ছাড়িয়ে এ পৃথিবী অনেকদূর বিস্তৃত। বিপুল মানুষের জীবন; তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে তবেই যেন নিজের হাসিকান্নার পরিমাপ করি।"— নিখিলেশের সত্যবোধ তাই তপস্যা,—সাধনার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি-সীমানা অতিক্রম করে পূর্ণতার দিকে অগ্রগামী হওয়াই তার ধর্ম। সঙ্কীর্ণ জীবনদৃষ্টি থেকে প্রতাপ, প্রভুত্ব, আত্মসর্বস্বতায় বা আত্মকেন্দ্রিকতায় নিখিলেশ দীক্ষিত নয়—ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য-স্বীকৃতি তার স্বভাবধর্মের অনুগত। তাই বিমলার পরে সে আপন অধিকার জাহির করে না, সন্দীপের সঙ্কীর্ণ ও অর্থহীন দেশপ্রেমের ভাবনা অসত্য বলে জেনেও এবং সন্দীপের আচরণের অসঙ্গতি দেখেও সন্দীপকে নিখিলেশ সহ্য করে—বিতাড়িত করে না।

দুই, স্বদেশপ্রেম সম্পর্কিত ভাবনায় সন্দীপের সঙ্গে নিখিলেশের পার্থক্য স্পষ্ট— "গড়ে তোলবার কাজে তোমার সমস্ত শক্তি দাও, অনাবশ্যক ভেঙে ফেলবার উত্তেজনায় তার সিকি পয়সা বাজে খরচ করতে নেই।" নিখিলেশের কাছে স্বদেশপ্রেমের অর্থ দেশসেবা, সে সেবা অবশ্যই মানব সেবা। মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণভাবনায় যথার্থ দেশপ্রেম প্রকাশ পায় বলেই তার বিশ্বাস। তাই সে বৃহত্তের মঙ্গলের জন্য গ্রামবাসীর কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে। নিখিলেশের ব্যক্তিপ্রেম, স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম—একই সূত্রে বিধৃত। প্রতাপ, প্রভুত্ব, অহংসর্বস্ব মানসিকতায় বিকৃতিকে যারা গ্রহণ করে, তারাই দেশপ্রেমের নামে উত্তেজনা ছড়ায়, জবরদস্তি করে, দেশকে 'মা' বলে পূজো করতে চায়। অপরের সর্বস্ব আদায় করে এরা তাদেরই স্বাধীনতা দেবে বলে চীৎকার করে। এদের অর্থহীন আস্ফালনে মত্ততা আছে কিন্তু সত্য নেই। সন্দীপ এই জাতীয় চরিত্র। নিখিলেশের সত্যবোধের পাশে, সত্যপথের সন্ধানীর পাশে ভাবের দিক থেকে সন্দীপ চরিত্র বড়ো ম্লান বলে মনে হয়। নিখিলেশের জীবন-ভাবনাই যে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনেরই সাহিত্যকৃত-রূপ সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

কিন্তু বিমলা ও সন্দীপের কামনা-বাসনাকেন্দ্রিক জীবন-বিকৃতি ও দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে জবরদস্তি ও অন্তঃসারশূন্যতা পরিবেশকে বিষিয়ে তুলল— "মুসলমানের দল খেপে" উঠল। সুযোগ বুঝে সন্দীপের অন্তর্ধান ও মানবসেবা ব্রতী নিখিলেশ আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে তাদের থামাতে গেল। মাথায় আঘাত নিয়ে সংজ্ঞাহীন নিখিলেশের প্রত্যাবর্তন ও অমূল্যর মৃত্যুসংবাদ "সংসারকে আমার পাপ নানান দিক থেকে মারতে থাকবে"—বিমলার পাপে নিখিলেশের গৃহশান্তি, সুখ ও শ্রী বিসর্জিত হল। সন্দীপের পাপে দেশময় জ্বলে উঠল বিদ্বেষের আগুন। ঘর ও বাইরের অমঙ্গলের আবহাওয়ায় কেবল মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে নিখিলেশের কল্যাণভাবনা সত্যাদর্শের গভীরতাকে প্রমাণ করল। আর, এখানেই তো নিখিলেশ চরিত্রের সার্থকতা।

'গৃহদাহ' উপন্যাসের মহিম চরিত্র আশ্চর্য সহিষ্ণুতার গুণে চিত্রিত। সংযত, ধীর, কতকটা অন্তর্মুখী স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে মহিম আখ্যায়িকার সংকটময় মুহূর্তে অবিচল ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিয়েছে। যে সুরেশ ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করেছিল, মহিমের গ্রামের বাড়ীতে থাকাকালীন অনুপস্থিত

সময়ে তার কেদারবাবু ও অচলার সঙ্গে হৃদ্যতায় বিস্মিত হয়েছিল মহিম। তারই চোখের সামনে হাত ধরে সুরেশ-অচলার গাড়ী থেকে নামার দৃশ্য তাকে হতবাক্ করে। প্রাক্-বিবাহ জীবনপর্বে তার এই বিস্ময়ের ভাব উত্তর-জীবনেও নানানভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে। কিন্তু অবিচল ধৈর্য ও আত্মসংযমে মহিম বারবার আপন অন্তরের দুঃখকে গোপন করেছে। বিবাহোত্তর পল্লীগ্রামের গৃহে সুরেশের উপস্থিতি ও অসংগত আচরণ, মৃণাল সম্পর্কে অচলার ইঙ্গিতপূর্ণ কথাবার্তায় মহিম কেবলই বিস্ময়ে হতবাক্ হয়েছে। তার স্বচ্ছ বুদ্ধি ও স্পষ্ট যুক্তি সুরেশ ও অচলার আচরণ ও কথাকে অনুসরণ করতে পারে নি। তার আত্মমগ্নতা ও অপরের জন্য কর্তব্যপরায়ণতা দেখা গেলেও এক আশ্চর্য ঔদাসীন্যে সে নিজেকে আচ্ছন্ন রেখেছে। অচলার দুঃখ প্রতিকার করার কোন উদ্যোগ সে গ্রহণ করেনি। অথচ অচলাকে যে মহিম গভীরভাবে ভালোবাসত, তার প্রমাণ উপন্যাসে একাধিক জায়গায় আছে। পল্লীগ্রামের বাড়ী থেকে অচলার কোলকাতায় পিতার কাছে যাওয়ার প্রসঙ্গে মহিমের বুদ্ধি ও হৃদয়ের চমৎকার পরিচয় আছে— "কিন্তু একে ব্যবসা বলেই যদি তুমি বুঝতে শিখে থাকো, আমার সঙ্গে তোমার মতের মিল হবে না, কিন্তু এ কথাটাও ভুলো না যে, ব্যবসা জিনিসটাকে বুঝতে সময় লাগে। সে ভুল যদি কখনো ধরা পড়ে আমাকে জানিয়ো, আমি তখনই গিয়ে নিয়ে আসব। ..... আমি সত্যই তোমাকে যেতে দিতে চাইনে।"

সীমাহীন ধৈর্য ও সহনশীলতায় মহিম জীবনের সংকটময় মুহূর্তগুলো অতিক্রম করেছে। সুরেশ-অচলার অসংগত আচরণ প্রতিরোধ করা তার সাধ্যাতীত— পরিবেশ, পরিস্থিতি তাকে বারবার বিমূঢ় করেছে—অথচ প্রতিকারহীন সহনশীলতা তাকে নীরব করেছে "আপনাকে আপনার মধ্যে ধরিয়া রাখাই তাহার চিরদিনের অভ্যাস।" স্বল্পভাষী মহিম আত্মসংযমবোধের পরিচয় দিয়েছে বেশ কয়েকটি সমস্যাসঙ্কুল মুহূর্তে। বিবাহ-পূর্ব জীবনে অচলা-সুরেশের ব্যবহারে ও সুরেশের আকস্মিক পরিবর্তনে, পল্লীগ্রামের বাড়ীতে অচলা-সুরেশের অসঙ্গত আলাপচারিতা ও অন্তরঙ্গতায়, ভিহরীপ্রবাসের দিনে হঠাৎ অচলার সাক্ষাৎ প্রাপ্তিতে, সুরেশের মৃত্যু শয্যায় ও অচলার আশ্রয়হীন অবস্থায় ও অন্যান্য দু'একটি দৃশ্যচিত্রে মহিমের সংযমবোধের পরিচয় পাওয়া যাবে। মহিমের স্বভাবে সমস্যা-উত্তরণের পথ জানা ছিল না—একক নিঃসঙ্গতায় তার জীবন পরিপূর্ণ ছিল। সুরেশের মতো বাক্‌পটু সে নয়—কাজের জন্য আত্মশ্লাঘা অনুভব করা তার স্বভাব নয়। সুরেশের মতো আবেগে সে উচ্ছ্বাসপূর্ণও নয়—তাই সুখ-দুঃখের বিচিত্র আঘাত তার অন্তরকে বিদ্ধ করেছে সকলের অজান্তে। এমনকি অচলাও তার হদিশ পায়নি। তাছাড়া, অপরের মন জয় করবার পদ্ধতি তার অজানা। অপরের দুঃখে, বিশেষ করে মৃণাল প্রসঙ্গে, তাকে কাতর হতে দেখি। এক্ষেত্রে, তার কর্তব্য পরায়ণতারও প্রচুর উদাহরণ আছে। সুরেশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর মহিমের চিত্তলোকের চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন শরৎচন্দ্র— " অচলাকে তিল তিল করিয়া ভালবাসিবার প্রথম ইতিহাস তাহার কাছে অস্পষ্ট। কিন্তু এই মেয়েটিকেই কেন্দ্র করিয়া তাহার জীবনের উপর দিয়া যাহা বহিয়া গিয়াছে, তাহা যেমন প্রলয়ের মত অসীম, তেমনি উপমাহীন। আবার নিঃশব্দ সহিষ্ণুতার শক্তিও বিধাতা তাহাকে হিসাব করিয়া দেন নাই। তাহার গৃহ যখন বাহির এবং ভিতর হইতে জ্বলিয়া উঠিল, তখন সে ঐ খানে দাঁড়াইয়া ভস্মসাৎ হইল—এতটুকু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সংসারে ছড়াইতে পারিল না।" মহিমের দুঃখপ্রাপ্তিতেই তার জীবনের যেন পরিণাম সূচিত হয়েছে।

পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচারে নবকুমার, নিখিলেশ ও মহিমের পার্থক্য চোখে পড়ে। নবকুমার শিক্ষিত, মার্জিত রুচিসম্পন্ন ও নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত— তার আচার-আচরণের নেপথ্যে

পরিবেশের প্রভাব দেখা যাবে। তার স্বচ্ছ বুদ্ধি ও যুক্তিবাদী মনের পরিচয় পাওয়া যায় শাস্ত্র সম্পর্কিত আলোচনা ও মনোভাবে—তার বুদ্ধি, রুচি, শিক্ষা নগরজীবন-কেন্দ্রিক। নিখিলেশ অভিজাত পরিবারের সন্তান হয়েও বংশের প্রথানুযায়ী আচার আচরণে বিশ্বাসী নয়। মেজ বৌরাণীর কথাতেই জানা যায় নিখিল সবদিক থেকেই ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্র। বিমলাকে নিয়ে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা দেশপ্রেম সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা তার শিক্ষিত, মার্জিত রুচিরই ফল বলে মনে হয়। মহিমের পল্লীজীবনে আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় পেলেও কোলকাতার সাথে নিবিড়যোগে আর মানসিকতা যে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হয়েছে, তার ইঙ্গিত উপন্যাসে আছে। ধর্মগত কোন গোঁড়ামি না থাকার প্রসঙ্গটি স্মরণ করে মনে হয়, মহিমের বিচারবোধ ও বুদ্ধি নগর-জীবন আশ্রিত।

স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই ত্রয়ী পুরুষ চরিত্রের সুগভীর পার্থক্য আছে। নবকুমারের সৌন্দর্য-প্রীতি সমুদ্র-দর্শনে ও মানবীরূপে রূপমুগ্ধতার সৃষ্টি করেছিল। নিখিলেশের তা নয়। নিখিল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে বিমলাকে পেতে চেয়েছিল বাইরের জগৎ থেকে। বাইরের মুক্ত জীবন থেকে বিমলাকে লাভের মধ্যে প্রেমের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে এই ছিল তার ধারণা। এছাড়া মানব-কল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 'দেশপ্রেম' তার কাছে দেশসেবা বা মানব-সেবা বলেই মনে হয়েছিল। মহিমের চরিত্র-স্বভাবে অচলার প্রতি প্রেম তেমন স্পষ্ট রেখায় মুদ্রিত না হলেও অচলার প্রতি তার প্রেমের অভাব ছিল, এমন মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। তবে, পল্লীগ্রামস্থ ঘরোয়া জীবনে সে কেবল অচলাকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত নয়—মৃণাল প্রভৃতির কল্যাণ-ভাবনা পরোপকারের রূপ নিয়েছিল। সুতরাং অবস্থানগত দিক থেকে এই তিন চরিত্রের পার্থক্য আছে। আবার ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই ত্রয়ী চরিত্রের সাদৃশ্যও কিছু দেখা যাবে। নবকুমারের বিচারশক্তি, শিক্ষিত ও মার্জিত রুচি, ব্যক্তিত্বের সংযমবোধ (মতিবিবি ও কপাল প্রসঙ্গে) চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নিখিলেশেরও এই একই গুণের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। আবার মহিমও অনুরূপ চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে গঠিত। এই আপাত মিলের নেপথ্যে আছে তাদের জীবনদৃষ্টির পার্থক্য—যা ঔপন্যাসিকদের একান্তই জীবন-দর্শন প্রসূত বলা যায়। এছাড়া নবকুমারের ঔদার্যবোধ ও পরোপকারিতার পরিচয় আছে স্বেচ্ছায় কাষ্ঠাহরণের দৃশ্যচিত্রে— নিখিলের ঔদার্যবোধ তার স্বভাবজাত—সন্দীপের মিথ্যা স্বদেশপ্রেমে বিশ্বাসী না হয়েও প্রয়োজনে টাকা ধার দেয়; সন্দীপ-বিমলার বিকৃতি দেখেও কোন কঠোর প্রতিকার বিধান করে না; বিমলার প্রত্যাবর্তনেও সে ক্ষমাশীল। আসলে নিখিলেশের ঔদার্য ও পরোপকারিতায় নেপথ্যে আছে ব্যক্তি, স্বদেশ ও বিশ্বমানব-হিতৈষণার ভাবনা। গ্রামের মানুষের মঙ্গলচিন্তা এই ভাবনারই অনুষঙ্গ। মহিমের মধ্যেও এক ধরনের ঔদার্যবোধের পরিচয় পাওয়া যাবে—প্রাক্-বিবাহ পর্বে সুরেশ-অচলার আংশিক অন্তরঙ্গতা তার চিত্তের গভীরে কোন আলোড়ন তোলেনি। সুরেশের গ্রাম্যজীবনে উপস্থিতি ও অচলার আচরণ তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটালেও ঔদার্যের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে মহিম উদাসীন। মৃণাল ও গ্রামবাসীর মঙ্গল-ভাবনা তার পরোপকারী মানসিকতার পরিচায়ক বলে মনে হয়।

দাম্পত্যজীবনে নবকুমারের সাংসারিক চিত্র অত্যন্ত স্বল্প-পরিসরে ব্যক্ত। সেখানে মৃন্ময়ীর অরণ্যপ্রীতিই প্রধানতঃ দেখিয়েছেন লেখক। কেবলমাত্র, স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের প্রথম পর্বে নবকুমারের প্রেমময় অনুভূতির চমৎকার বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। সঠিক অর্থে নবকুমারের দাম্পত্যজীবন সাংসারিক টানাপোড়েনে নিয়ন্ত্রিত হয়নি কপালের সংসার অনাসক্তির কারণে। নবকুমারের রূপমুগ্ধতাই হয়ত কপাল চরিত্রের পরে সন্দেহ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল। নিখিলেশের দাম্পত্য-জীবন

নবকুমার ও মহিমের থেকে স্বতন্ত্র। বিবাহ সূত্রে বিমলাকে পেয়েছিল নিখিল—কিন্তু বন্ধনের মধ্যে নয়, বাইরের মুক্ত জীবন থেকে তাকে পূর্ণ করে পাওয়াই ছিল নিখিলের প্রেম-সম্পর্কিত ভাবনা। কিন্তু সন্দীপের আবির্ভাবে ও সম্মোহনী শক্তি-প্রভাবে বিমলা বিকৃত কামনা-বাসনার জগতে পদার্পণ করল। নিখিলেশের দাম্পত্যজীবনের দুঃখ প্রতিকারহীন—কারণ, ব্যক্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ তার জীবন-বিরুদ্ধ ভাবনা। তাই সন্দীপের ব্যক্তিগত ও স্বদেশপ্রেমের অনাচার ও বিমলার অধঃপতন নিখিলকে বিদ্ধ করলেও তা থেকে মুক্তি পাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। নিখিলের দাম্পত্য জীবনের দুঃখ-বেদনা তার সত্য জীবন পথে দুঃখের মধ্যে তপস্যা বলে গণ্য হয়েছে। পরিণামে বিমলার প্রত্যাবর্তনে সে দাম্পত্য জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। পাপের বিকারে ও মিথ্যা স্বদেশপ্রেমের বিদ্বেষের আগুনে নিখিলেশের দাম্পত্য-জীবনের পরিসমাপ্তি। মহিমের দাম্পত্য-জীবন সুরেশের হঠকারিতায় ও অচলার দোলাচল মানসিকতায় অবসিত হয়েছে। পল্লীজীবনে সুবেশের উপস্থিতি, অচলার অহেতুক মৃণাল সম্পর্কে মহিমের প্রতি সন্দেহ ও সুরেশের প্রতি আংশিক দুর্বলতা এবং মহিমের বাক্-সংযম, কিছুটা ঔদাসীন্য, অনুকূল পরিবেশে তার দাম্পত্য জীবনে গভীর সংকটের সৃষ্টি করল। মহিমের গৃহদাহ, সুরেশ কর্তৃক অচলাকে জোর করে ডিহ্রী প্রবাসের জীবনে নিয়ে যাওয়া ঘটনা দৃশ্যে মহিমের ঘরভাঙ্গার ইতিবৃত্ত পাওয়া যাবে। অন্তিম পর্বে দেখা যায়, মহিমের দীর্ঘশ্বাস কেবল তার জীবন সহচর হয়েছে।

তত্ত্বগত দিক থেকে নবকুমার, নিখিল ও মহিম—তিন স্বতন্ত্র ভাবনার প্রতীক। নবকুমারের মধ্যে বঙ্কিম দেখেছেন পুরুষের রূপমুগ্ধতাকে—যা স্বভাবতঃই প্রকৃতিমুখী। কপালকে ঘিরে তার মোহান্ধতা প্রকাশ পেয়েছে। তাই কপালের আত্মবিসর্জনের অনুগমন করতে হয়েছে তাকে। সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্বের ভাব নবকুমার-কপালের মধ্যে বঙ্কিম প্রত্যক্ষ করেছেন বলে মনে হয়। নিখিলেশ রবীন্দ্রনাথের জীবন-সত্যের তত্ত্বভাবনায় গঠিত এক পুরুষ চরিত্র। মাস্টার মশাই বা চন্দ্রনাথবাবু সেই প্রেম, মঙ্গল—কল্যাণের মূর্তিমান পুরুষ হলেও, নিখিলেশ সেই সত্য পথের পথিক। ব্যক্তিগত জীবনে ও স্বদেশভাবনায় নিখিল সত্যকে বরণ করে নিতে চেয়েছিল। তার সাধনা সেই সত্য লাভের সাধনা। মহিমের মধ্যে শরৎচন্দ্র "জীবন যে রকম" এই অনুভবকে যেন প্রত্যক্ষ করেছেন। তার দাম্পত্য-জীবন বন্ধু সুরেশ ও অচলার চিত্ত-চাঞ্চল্যে কিভাবে ভেঙ্গে গেল, তাকেই সে নিশ্চল মূর্তিতে প্রত্যক্ষ করেছে। এই দুঃখময় পরিণামকে নিয়ন্ত্রণ করা তার সাধ্যাতীত। এই ব্যঞ্জনা গোটা উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ঔপন্যাসিক জীবন-দর্শনের পার্থক্যহেতু চরিত্রগুলির পার্থক্য সূচিত হয়েছে। কেবল নায়িকারূপে নারীই নয়, পুরুষ চরিত্র-ত্রয়ের মধ্যেও জীবন-ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে অনিবার্য ভাবে। তাই "কপালকুণ্ডলা", "ঘরে-বাইরে" ও "গৃহদাহ" উপন্যাসে তিন নায়ক চরিত্র নবকুমার, নিখিলেশ, মহিমের জীবন-বৃত্তে ত্রয়ী নায়িকা চরিত্র যে বিচিত্র কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে, তারই ইতিবৃত্ত বর্ণনাতেই ঔপন্যাসিকত্রয়ের সার্থকতা।

কপালকুণ্ডলা

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ : সাগরসঙ্গমে

"Floating straight obedient to the stream."

Comedy of Errors.

প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এক দিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পর্ত্তুগিস্ ও অন্যান্য নাবিকদস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল; কিন্তু এই নৌকারোহীরা সঙ্গিহীন। তাহার কারণ এই যে, রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল; নাবিকেরা দিঙ্‌নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল। এক্ষণে কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না। নৌকারোহিগণ অনেকেই নিদ্রা যাইতেছিলেন। একজন প্রাচীন এবং একজন যুবা পুরুষ, এই দুই জন মাত্র জাগ্রৎ অবস্থায় ছিলেন। প্রাচীন যুবকের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। বারেক কথাবার্ত্তা স্থগিত করিয়া বৃদ্ধ নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, আজ কত দূর যেতে পারবি?" মাঝি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বলিতে পারিলাম না।"

বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। যুবক কহিলেন, "মহাশয়, যাহা জগদীশ্বরের হাত, তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না— ও মূর্খ কি প্রকারে বলিবে? আপনি ব্যস্ত হইবেন না।"

বৃদ্ধ উগ্রভাবে কহিলেন, "ব্যস্ত হব না? বল কি, বেটারা বিশ পঁচিশ বিঘার ধান কাটিয়া লইয়া গেল, ছেলেপিলে সম্বৎসর খাবে কি?"

এ সংবাদ তিনি সাগরে উপনীত হইলে পরে পশ্চাদাগত অন্য যাত্রীর মুখে পাইয়াছিলেন। যুবা কহিলেন, "আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, মহাশয়ের বাটীতে অভিভাবক আর কেহ নাই —মহাশয়ের আসা ভাল হয় নাই।"

প্রাচীন পূর্ব্ববৎ উগ্রভাবে কহিলেন, "আস্‌ব না? তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। এখন পরকালের কর্ম্ম করিব না ত কবে করিব?"

যুবা কহিলেন, "যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "তবে তুমি এলে কেন?"

যুবা উত্তর করিলেন, "আমি ত আগেই বলিয়াছি যে, সমুদ্র দেখিব বড় সাধ ছিল, সেই জন্যই আসিয়াছি।" পরে অপেক্ষাকৃত মৃদু স্বরে কহিতে লাগিলেন, "আহা! কি দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।

"দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-
র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥"

বৃদ্ধের শ্রুতি কবিতার প্রতি ছিল না, নাবিকেরা পরস্পর যে কথোপকথন করিতেছিল, তাহাই একতানমনা হইয়া শুনিতেছিলেন।

একজন নাবিক অপরকে কহিতেছিল, "ও ভাই--এ ত বড় কাজটা খারাবি হলো—এখন কি বার-দরিয়ায় পড়লেম—কি কোন্ দেশে এলেম, তা যে বুঝিতে পারি না।"

বক্তার স্বর অত্যন্ত ভয়কাতর। বৃদ্ধ বুঝিলেন যে, কোন বিপদ্ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। সশঙ্কচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, কি হয়েছে?" মাঝি উত্তর করিল না। কিন্তু

যুবক উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, প্রায় প্রভাত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক অতি গাঢ় কুজ্ঝটিকায় ব্যাপ্ত হইয়াছে; আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, উপকূল, কোন দিকে কিছুই দেখা যাইতেছে না। বুঝিলেন, নাবিকদের দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে। এক্ষণে কোন্ দিকে যাইতেছে, তাহার নিশ্চয়তা পাইতেছে না—পাছে বাহির-সমুদ্রে পড়িয়া অকূলে মারা যায়, এই আশঙ্কায় ভীত হইয়াছে।

হিমনিবারণ জন্য সম্মুখে আবরণ দেওয়া ছিল, এজন্য নৌকার ভিতর হইতে আরোহীরা এ সকল বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। কিন্তু নব্য যাত্রী অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধকে সবিশেষ কহিলেন; তখন নৌকামধ্যে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। যে কয়েকটি স্ত্রীলোক নৌকামধ্যে ছিল, তন্মধ্যে কেহ কেহ কথার শব্দে জাগিয়াছিল, শুনিবামাত্র তাহারা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। প্রাচীন কহিল, "কেনারায় পড়! কেনারায় পড়! কেনারায় পড়!"

নব্য ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "কেনারা কোথা, তাহা জানিতে পারিলে এত বিপদ্ হইবে কেন?"

ইহা শুনিয়া নৌকারোহীদিগের কোলাহল আরও বৃদ্ধি পাইল। নব্য যাত্রী কোন মতে তাহাদিগকে স্থির করিয়া নাবিকদিগকে কহিলেন, "আশঙ্কার বিষয় কিছু নাই, প্রভাত হইয়াছে —চারি পাঁচ দণ্ডের মধ্যে অবশ্য সূর্য্যোদয় হইবে। চারি পাঁচ দণ্ডের মধ্যে নৌকা কদাচ মারা যাইবে না। তোমরা এক্ষণে বাহন বন্ধ কর, স্রোতে নৌকা যথায় যায় যাক্; পশ্চাৎ রৌদ্র হইলে পরামর্শ করা যাইবে।"

নাবিকেরা এই পরামর্শে সম্মত হইয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নাবিকেরা নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। যাত্রীরা ভয়ে কণ্ঠাগতপ্রাণ। বেশী বাতাস নাই। সুতরাং তাঁহারা তরঙ্গান্দোলনকম্প বড় জানিতে পারিলেন না। তথাপি সকলেই মৃত্যু নিকট নিশ্চিত করিলেন। পুরুষেরা নিঃশব্দে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকেরা সুর তুলিয়া বিবিধ শব্দবিন্যাসে কাঁদিতে লাগিল। একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছিল, ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই,—সেই কেবল কাঁদিল না।

প্রতীক্ষা করিতে করিতে অনুভবে বেলা প্রায় এক প্রহর হইল। এমত সময়ে অকস্মাৎ নাবিকেরা দরিয়ার পাঁচ পীরের নাম কীর্ত্তিত করিয়া মহাকোলাহল করিয়া উঠিল। যাত্রীরা সকলেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কি' কি' মাঝি, কি হইয়াছে?" মাঝিরাও একবাক্যে কোলাহল করিয়া কহিতে লাগিল, "রোদ উঠেছে' রোদ উঠেছে! ঐ দেখ ডাঙ্গা!" যাত্রীরা সকলেই ঔৎসুক্যসহকারে নৌকার বাহিরে আসিয়া কোথায় আসিয়াছেন, কি বৃত্তান্ত, দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সূর্য্যপ্রকাশ হইয়াছে। কুজ্ঝটিকার অন্ধকাররাশি হইতে দিঙ্‌মণ্ডল একেবারে বিমুক্ত হইয়াছে। বেলা প্রায় প্রহরাতীত হইয়াছে। যে স্থানে নৌকা আসিয়াছে, সে প্রকৃত মহাসমুদ্র নহে, নদীর মোহানা মাত্র, কিন্তু তথায় নদীর যেরূপ বিস্তার, সেরূপ বিস্তার আর কোথাও নাই। নদীর এক কূল নৌকার অতি নিকটবর্ত্তী বটে,—এমন কি, পঞ্চাশৎ হস্তের মধ্যগত, কিন্তু অপর কূলের চিহ্ন দেখা যায় না। আর যে দিকেই দেখা যায় অনন্ত জলরাশি চঞ্চল রবিরশ্মিমালাপ্রদীপ্ত হইয়া গগনপ্রান্তে গগনসহিত মিশিয়াছে। নিকটস্থ জল, সচরাচর সকর্দ্দম নদীজলবর্ণ; কিন্তু দূরস্থ বারিরাশি নীলপ্রভ। আরোহীরা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহারা মহাসমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছেন· তবে সৌভাগ্য এই যে, উপকূল নিকটে, আশঙ্কার বিষয় নাই। সূর্য্যপ্রতি দৃষ্টি করিয়া দিক্ নিরূপিত করিলেন। সম্মুখে যে উপকূল দেখিতেছিলেন, সে সহজেই সমুদ্রের পশ্চিম তট বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। তটমধ্যে নৌকার অনতিদূরে এক নদীর মুখ মন্দগামী কলধৌতপ্রবাহবৎ আসিয়া পড়িতেছিল। সঙ্গমস্থলে দক্ষিণ পার্শ্বে বৃহৎ সৈকতভূমিখণ্ডে নানাবিধ পক্ষিগণ অগণিত সংখ্যায় ক্রীড়া করিতেছিল। এই নদী এক্ষণে "রসুলপুরের নদী" নাম ধারণ করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উপকূলে

"Ingratitude! Thou marble-hearted fiend!—"
King Lear.

আরোহীদিগের স্ফূর্তিব্যঞ্জক কথা সমাপ্ত হইলে, নাবিকেরা প্রস্তাব করিল যে, জোয়ারের বিলম্ব আছে;—এই অবকাশে আরোহিগণ সম্মুখস্থ সৈকতে পাকাদি সমাপন করুন, পরে জলোচ্ছ্বাস আরম্ভেই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিতে পারিবেন। আরোহিবর্গও এই পরামর্শে সম্মতি দিলেন। তখন নাবিকেরা তরি তীরলগ্ন করিলে আরোহিগণ অবতরণ করিয়া স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্নানাদির পর পাকের উদ্যোগে আর এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত হইল—নৌকায় পাকের কাষ্ঠ নাই। ব্যাঘ্রভয়ে উপর হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতে কেহই স্বীকৃত হইল না। পরিশেষে সকলের উপবাসের উপক্রম দেখিয়া প্রাচীন, প্রাগুক্ত যুবাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাপু নবকুমার! তুমি ইহার উপায় না করিলে আমরা এতগুলি লোক মারা যাই।"

নবকুমার কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা যাইব; কুড়ালি দাও, আর দা লইয়া একজন আমার সঙ্গে আইস।"

কেহই নবকুমারের সহিত যাইতে চাহিল না।

"খাবার সময় বুঝা যাবে" এই বলিয়া নবকুমার কোমর বাঁধিয়া একাকী কুঠার হস্তে কাষ্ঠাহরণে চলিলেন।

তীরোপরি আরোহণ করিয়া নবকুমার দেখিলেন যে, যত দূর দৃষ্টি চলে, তত দূর মধ্যে কোথাও বসতির লক্ষণ কিছুই নাই। কেবল বন মাত্র। কিন্তু সে বন, দীর্ঘ বৃক্ষাবলীশোভিত বা নিবিড় বন নহে;—কেবল স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ মণ্ডলাকারে কোন কোন ভূমিখণ্ড ব্যাপিয়াছে। নবকুমার তন্মধ্যে আহরণযোগ্য কাষ্ঠ দেখিতে পাইলেন না, সুতরাং উপযুক্ত বৃক্ষের অনুসন্ধানে নদীতট হইতে অধিক দূর গমন করিতে হইল। পরিশেষে ছেদনযোগ্য একটি বৃক্ষ পাইয়া তাহা হইতে প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ সমাহরণ করিলেন। কাষ্ঠ বহন করিয়া আনা আর এক বিষম কঠিন ব্যাপার বোধ হইল। নবকুমার দরিদ্রের সন্তান ছিলেন না, এ সকল কর্ম্মে অভ্যাস ছিল না; সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া কাষ্ঠ আহরণে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে কাষ্ঠভার বহন বড় ক্লেশকর হইল। যাহাই হউক, যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে অল্পে ক্ষান্ত হওয়া নবকুমারের স্বভাব ছিল না, এজন্য তিনি কোন মতে কাষ্ঠভার বহিয়া আনিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর বহেন, পরে ক্ষণেক বসিয়া বিশ্রাম করেন, আবার বহেন; এইরূপে আসিতে লাগিলেন।

এই হেতুবশতঃ নবকুমারের প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে সমভিব্যাহারিগণ তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল; তাহাদিগের এইরূপ আশঙ্কা হইল যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। সম্ভাব্য কাল অতীত হইলে এইরূপই তাহাদিগের হৃদয়ে স্থির সিদ্ধান্ত হইল। অথচ কাহারও এমন সাহস হইল না যে, তীরে উঠিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করে।

নৌকারোহিগণ এইরূপে কল্পনা করিতেছিল, ইত্যবসরে জলরাশিমধ্যে ভৈরব কল্লোল উত্থিত হইল। নাবিকেরা বুঝিল যে, জোয়ার আসিতেছে। নাবিকেরা বিশেষ জানিত যে, এ সকল স্থানে জলোচ্ছ্বাসকালে তটদেশে এরূপ প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত হয় যে, তখন নৌকাদি তীরবর্ত্তী থাকিলে তাহা খণ্ডখণ্ড হইয়া যায়। এজন্য তাহারা অতিব্যস্তে নৌকার বন্ধন মোচন করিয়া নদী-মধ্যবর্ত্তী হইতে লাগিল। নৌকা মুক্ত হইতে না হইতে সম্মুখস্থ সৈকতভূমি জলপ্লাবিত হইয়া গেল, যাত্রিগণ কেবল ত্রস্তে নৌকায় উঠিতে অবকাশ পাইয়াছিল, তণ্ডুলাদি যাহা যাহা চরে স্থিত হইয়াছিল, তৎসমুদায় ভাসিয়া গেল। দুর্ভাগ্যবশতঃ নাবিকেরা সুনিপুণ নহে; নৌকা সামলাইতে পারিল না; প্রবল জলপ্রবাহবেগে তরণী রসুলপুর নদীর মধ্যে লইয়া চলিল। একজন আরোহী কহিল, "নবকুমার রহিল যে?" একজন নাবিক কহিল, "আঃ, তোর নবকুমার কি আছে? তাকে শিয়ালে খাইয়াছে।"

জলবেগে নৌকা রসুলপুরের নদীর মধ্যে লইয়া যাইতেছে. প্রত্যাগমন করিতে বিস্তর ক্লেশ হইবে, এই জন্য নাবিকেরা প্রাণপণে তাহার বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন কি, সেই মাঘ মাসে তাহাদিগের ললাটে স্বেদস্রুতি হইতে লাগিল। এইরূপ পরিশ্রম দ্বারা রসুলপুর নদীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু নৌকা যেমন বাহিরে আসিল, অমনি তথাকার প্রবলতর স্রোতে উত্তরমুখী হইয়া তীরবৎ বেগে চলিল, নাবিকেরা তাহার তিলার্দ্ধ মাত্র সংযম করিতে পারিল না। নৌকা আর ফিরিল না।

যখন জলবেগ এমত মন্দীভূত হইয়া আসিল যে, নৌকার গতি সংযত করা যাইতে পারে, তখন যাত্রীরা রসুলপুরের মোহানা অতিক্রম করিয়া অনেক দূর আসিয়াছিলেন। এখন নবকুমারের জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করা যাইবে কি না, এ বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক হইল। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, নবকুমারের সহযাত্রীরা তাঁহার প্রতিবেশী মাত্র, কেহই আত্মবন্ধু নহে। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, তথা হইতে প্রতিবর্ত্তন করা আর এক ভাঁটার কর্ম্ম। পরে রাত্রি আগত হইবে, আর রাত্রে নৌকা চালনা হইতে পারিবে না, অতএব পর দিনের জোয়ারের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। এ কাল পর্য্যন্ত সকলকে অনাহারে থাকিতে হইবে। দুই দিন নিরাহারে সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবেক। বিশেষ নাবিকেরা প্রতিগমন করিতে অসম্মত; তাহারা কথার বাধ্য নহে। তাহারা বলিতেছে যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। তাহাই সম্ভব। তবে এত ক্লেশ-স্বীকার কি জন্য?

এরূপ বিবেচনা করিয়া যাত্রীরা নবকুমার ব্যতীত স্বদেশে গমনই উচিত বিবেচনা করিলেন। নবকুমার সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে বনবাসে বিসর্জ্জিত হইলেন।

ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কখনও পরের উপবাস নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না, তবে তিনি উপহাসাস্পদ। আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জ্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি, তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে—কিন্তু যত বার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্ব্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বিজনে

"—Like a veil,
Which if withdrawn, would but disclose the frown
Of one who hates us, so the night was shown
And grimly darkled o'er their faces pale
And hopeless eyes."

Don Juan

যে স্থানে নবকুমারকে ত্যাগ করিয়া যাত্রীরা চলিয়া যান, তাহার অনতিদূরে দৌলতপুর ও দরিয়াপুর নামে দুই ক্ষুদ্র গ্রাম এক্ষণে দৃষ্ট হয়। পরন্তু যে সময়ের বর্ণনায় আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে সময়ে তথায় মনুষ্যবসতির কোন চিহ্ন ছিল না; অরণ্যময় মাত্র। কিন্তু বাঙ্গালাদেশের অন্যত্র ভূমি যেরূপ সচরাচর অনুর্ব্বরা, এ প্রদেশে সেরূপ নহে। রসুলপুরের মুখ হইতে সুবর্ণরেখা পর্য্যন্ত অবাধে কয়েক যোজন পথ ব্যাপিত করিয়া এক বালুকাস্তূপশ্রেণী বিরাজিত আছে। আর কিছু উচ্চ হইলে ঐ বালুকাস্তূপশ্রেণীকে বালুকাময় ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী বলা যাইতে পারিত। এক্ষণে লোকে উহাকে বালিয়াড়ি বলে। ঐ সকল বালিয়াড়ির ধবল শিখরমালা মধ্যাহ্নসূর্য্যকিরণে দূর হইতে অপূর্ব্ব প্রভাবিশিষ্ট দেখায়। উহার উপর উচ্চ বৃক্ষ জন্মে না। স্তূপতলে সামান্য ক্ষুদ্র বন জন্মিয়া থাকে, কিন্তু মধ্যদেশে বা শিরোভাগে প্রায়ই ছায়াশূন্য ধবলশোভা বিরাজ করিতে থাকে। অধোভাগমণ্ডনকারী বৃক্ষাদির মধ্যে, ঝাটী, বনঝাউ এবং বনপুষ্পই অধিক।

এইরূপ অপ্রফুল্লকর স্থানে নবকুমার সঙ্গিগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে কাষ্ঠভার লইয়া নদীতীরে আসিয়া নৌকা দেখিলেন না; তখন তাঁহার অকস্মাৎ অত্যন্ত ভয়সঞ্চার

হইল বটে, কিন্তু সঙ্গিগণ যে তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এমত বোধ হইল না। বিবেচনা করিলেন, জলোচ্ছ্বাসে সৈকতভূমি প্লাবিত হওয়ায় তাঁহারা নিকটস্থ অন্য কোন স্থানে নৌকা রক্ষা করিয়াছেন, শীঘ্র তাঁহাকে সন্ধান করিয়া লইবেন। এই প্রত্যাশায় কিয়ৎক্ষণ তথায় বসিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু নৌকা আইল না। নৌকারোহীও কেহ দেখা দিল না। নবকুমার ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত হইলেন। আর প্রতীক্ষা করিতে না পারিয়া, নৌকার সন্ধানে নদীর তীরে তীরে ফিরিতে লাগিলেন। কোথাও নৌকার সন্ধান পাইলেন না, প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বস্থানে আসিলেন। তখন পর্য্যন্ত নৌকা না দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, জোয়ারের বেগে নৌকা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে. এখন প্রতিকূল স্রোতে প্রত্যাগমন করিতে সঙ্গীদিগের কাজে-কাজেই বিলম্ব হইতেছে। কিন্তু জোয়ারও শেষ হইল। তখন ভাবিলেন, প্রতিকূল স্রোতের বেগাধিক্যবশতঃ জোয়ারে নৌকা ফিরিয়া আসিতে পারে নাই; এক্ষণে ভাঁটায় অবশ্য ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু ভাঁটাও ক্রমে অধিক হইল—ক্রমে ক্রমে বেলাবসান হইয়া আসিল; সূর্য্যাস্ত হইল। যদি নৌকা ফিরিয়া আসিবার হইত, তবে এতক্ষণ ফিরিয়া আসিত।

তখন নবকুমারের প্রতীতি হইল যে, হয় জলোচ্ছ্বাসসম্ভূত তরঙ্গে নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে, নচেৎ সঙ্গিগণ তাঁহাকে এই বিজনে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

নবকুমার দেখিলেন যে, গ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, লোক নাই, আহার্য্য নাই, পেয় নাই; নদীর জল অসহ্য লবণাক্ত; অথচ ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। দুরন্ত শীতনিবারণজন্য আশ্রয় নাই, গাত্রবস্ত্র পর্য্যন্ত নাই। এই তুষার-শীতল-বায়ু-সঞ্চারিত-নদী-তীরে, হিমবর্ষী আকাশতলে, নিরাশ্রয়ে নিরাবরণে শয়ন করিয়া থাকিতে হইবেক। রাত্রিমধ্যে ব্যাঘ্র ভল্লুকের সাক্ষাৎ পাইবার সম্ভাবনা। প্রাণনাশই নিশ্চিত।

মনের চাঞ্চল্যহেতু নবকুমার এক স্থানে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তীর ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিলেন। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে অন্ধকার হইল। শিশিরাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল, যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে, তেমনি ফুটিতে লাগিল। অন্ধকারে সর্ব্বত্র জনহীন—আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র, সর্ব্বত্র নীরব, কেবল অবিরল কল্লোলিত সমুদ্রগর্জ্জন আর কদাচিৎ বন্য পশুর রব। তথাপি নবকুমার সেই অন্ধকারে, হিমবর্ষী আকাশতলে বালুকাস্তূপের চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখনও উপত্যকায়, কখনও অধিত্যকায়, কখনও স্তূপতলে, কখনও স্তূপশিখরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে প্রতি পদে হিংস্র পশু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এক স্থানে বসিয়া থাকিলেও সেই আশঙ্কা।

ভ্রমণ করিতে করিতে নবকুমারের শ্রম জন্মিল। সমস্ত দিন অনাহার; এজন্য অধিক অবসন্ন হইলেন। এক স্থানে বালিয়াড়ির পার্শ্বে পৃষ্ঠরক্ষা করিয়া বসিলেন। গৃহের সুখতপ্ত শয্যা মনে পড়িল। যখন শারীরিক ও মানসিক ক্লেশের অবসাদে চিন্তা উপস্থিত হয়, তখন কখনও কখনও নিদ্রা আসিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়। নবকুমার চিন্তা করিতে করিতে তন্দ্রাভিভূত হইলেন। বোধ হয় যদি এরূপ নিয়ম না থাকিত, তবে সাংসারিক ক্লেশের অপ্রতিহত বেগ সকলে সকল সময়ে সহ্য করিতে পারিত না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : স্তূপশিখরে

"—সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন মূর্ত্তি।"

মেঘনাদবধ

যখন নবকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন রজনী গভীরা। এখনও যে তাঁহাকে ব্যাঘ্রে হত্যা করে নাই, ইহা তাঁহার আশ্চর্য্য বোধ হইল। ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ব্যাঘ্র আসিতেছে কি না। অকস্মাৎ সম্মুখে, বহু দূরে, একটা আলোক দেখিতে পাইলেন। পাছে ভ্রম জন্মিয়া থাকে, এজন্য নবকুমার মনোভিনিবেশপূর্ব্বক তৎপ্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আলোকপরিধি ক্রমে বর্দ্ধিতায়তন এবং উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল—আগ্নেয় আলোক বলিয়া

প্রতীতি জন্মাইল। প্রতীতিমাত্র নবকুমারের জীবনাশা পুনরুদ্দীপ্ত হইল। মনুষ্যসমাগম ব্যতীত এ আলোকের উৎপত্তি সম্ভবে না, কেন না, এ দাবানলের সময় নহে। নবকুমার গাত্রোত্থান করিলেন। যথায় আলোক, সেই দিকে ধাবিত হইলেন। একবার মনে ভাবিলেন, "এ আলোক ভৌতিক?—হইতেও পারে; কিন্তু শংকায় নিরস্ত থাকিলেই কোন্ জীবন রক্ষা হয়?" এই ভাবিয়া নির্ভীকচিত্তে আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। বৃক্ষ, লতা, বালুকাস্তূপ পদে পদে তাঁহার গতিরোধ করিতে লাগিল। বৃক্ষলতা দলিত করিয়া, বালুকাস্তূপ লঙ্ঘিত করিয়া নবকুমার চলিলেন। আলোকের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন যে, এক অত্যুচ্চ বালুকাস্তূপের শিরোভাগে অগ্নি জ্বলিতেছে, তৎপ্রভায় শিখরাসীন মনুষ্যমূর্ত্তি আকাশপটস্থ চিত্রের ন্যায় দেখা যাইতেছে; নবকুমার শিখরাসীন মনুষ্যের সমীপবর্ত্তী হইবেন স্থির সংকল্প করিয়া, অশিথিলীকৃত বেগে চলিলেন। পরিশেষে স্তূপারোহণ করিতে লাগিলেন। তখন কিঞ্চিৎ শংকা হইতে লাগিল—তথাপি অকম্পিতপদে স্তূপারোহণ করিতে লাগিলেন। আসীন ব্যক্তির সম্মুখবর্ত্তী হইয়া যাহা যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার রোমাঞ্চ হইল। তিষ্ঠিবেন কি প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

শিখরাসীন মনুষ্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছিল—নবকুমারকে প্রথমে দেখিতে পাইল না। নবকুমার দেখিলেন, তাহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর হইবে। পরিধানে কোন কার্পাসবস্ত্র আছে কি না, তাহা লক্ষ্য হইল না; কটিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত শার্দ্দূলচর্ম্মে আবৃত। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা; আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজটাপরিবেষ্টিত। সম্মুখে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিতেছিল—সেই অগ্নির দীপ্তি লক্ষ্য করিয়া নবকুমার সে স্থলে আসিতে পারিয়াছিলেন। নবকুমার একটা বিকট দুর্গন্ধ পাইতে লাগিলেন, ইহার আসন প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার কারণ অনুভূত করিতে পারিলেন। জটাধারী এক ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর বসিয়া আছেন। আরও সভয়ে দেখিলেন যে, সম্মুখে নরকপাল রহিয়াছে, তন্মধ্যে রক্তবর্ণ দ্রব পদার্থ রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে—এমন কি, যোগাসীনের কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষমালামধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড গ্রথিত রহিয়াছে। নবকুমার মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। অগ্রসর হইবেন, কি স্থান ত্যাগ করিবেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কাপালিকদিগের কথা শ্রুত ছিলেন। বুঝিলেন যে, এ ব্যক্তি কাপালিক।

যখন নবকুমার উপনীত হইয়াছিলেন, তখন কাপালিক মন্ত্রসাধনে বা জপে বা ধ্যানে মগ্ন ছিল, নবকুমারকে দেখিয়া ভ্রূক্ষেপও করিল না। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, "কস্ত্বং?" নবকুমার কহিলেন, "ব্রাহ্মণ।"

কাপালিক কহিল, "তিষ্ঠ।" এই কহিয়া পূর্ব্বকার্য্যে নিযুক্ত হইল। নবকুমার দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এইরূপে প্রহরার্দ্ধ গত হইল। পরিশেষে কাপালিক গাত্রোত্থান করিয়া নবকুমারকে পূর্ব্ববৎ সংস্কৃতে কহিল, "মামনুসর।"

ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, অন্য সময়ে নবকুমার কদাপি ইহার সঙ্গী হইতেন না। কিন্তু এক্ষণে ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ কণ্ঠাগত। অতএব কহিলেন, "প্রভুর যেমত আজ্ঞা। কিন্তু আমি ক্ষুধাতৃষ্ণায় বড় কাতর। কোথায় গেলে আহার্য্য সামগ্রী পাইব অনুমতি করুন।"

কাপালিক কহিল, "ভৈরবীপ্রেরিতোঽসি; মামনুসর; পরিতোষং তে ভবিষ্যতি।"

নবকুমার কাপালিকের অনুগামী হইলেন। উভয়ে অনেক পথ বাহিত করিলেন—পথিমধ্যে কেহ কোন কথা কহিল না। পরিশেষে এক পর্ণকুটীর প্রাপ্ত হইল—কাপালিক প্রথমে প্রবেশ করিয়া নবকুমারকে প্রবেশ করিতে অনুমতি করিল; এবং নবকুমারের অবোধগম্য কোন উপায়ে একখণ্ড কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালিত করিল। নবকুমার তদালোকে দেখিলেন যে, ঐ কুটীর সর্ব্বাংশে কিয়াপাতায় রচিত। তন্মধ্যে কয়েকখানা ব্যাঘ্রচর্ম্ম আছে—এক কলস জল ও কিছু ফলমূল আছে।

কাপালিক অগ্নি জ্বালিত করিয়া কহিল, "ফলমূলে যাহা আছে, আত্মসাৎ করিতে পার। পর্ণপাত্র রচনা করিয়া, কলসজল পান করিও। ব্যাঘ্রচর্ম্ম আছে, অভিরুচি হইলে শয়ন করিও। নির্ব্বিঘ্নে তিষ্ঠ—ব্যাঘ্রের ভয় করিও না। সময়ান্তরে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। যে পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ না হয়, সে পর্য্যন্ত এ কুটীর ত্যাগ করিও না।"

এই বলিয়া কাপালিক প্রস্থান করিল। নবকুমার সেই সামান্য ফলমূল আহার করিয়া এবং সেই ঈষত্তিক্ত জল পান করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। পরে ব্যাঘ্রচর্ম্মে শয়ন করিলেন, সমস্ত দিবসজনিত ক্লেশহেতু শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সমুদ্রতটে

"——যোগপ্রভাবো ন চ লক্ষ্যতে তে।
বিভর্ষি চাকারমনির্ব্বৃতানাং মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্॥"

রঘুবংশ

প্রাতে উঠিয়া নবকুমার সহজেই বাটী গমনের উপায় করিতে ব্যস্ত হইলেন; বিশেষ, এ কাপালিকের সান্নিধ্য কোনক্রমেই শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু আপাততঃ এ পথহীন বনমধ্য হইতে কি প্রকারে নিষ্ক্রান্ত হইবেন? কি প্রকারেই বা পথ চিনিয়া বাটী যাইবেন? কাপালিক অবশ্য পথ জানে, জিজ্ঞাসিলে কি বলিয়া দিবে না? বিশেষ, যত দূর দেখা গিয়াছে, তত দূর কাপালিক তাঁহার প্রতি কোন শঙ্কাসূচক আচরণ করে নাই—কেনই বা তবে তিনি ভীত হন? এ দিকে কাপালিক তাঁহার পুনঃসাক্ষাৎ পর্য্যন্ত কুটীর ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছে, তাহার অবাধ্য হইলে বরং তাহার রোষোৎপত্তির সম্ভাবনা। নবকুমার শ্রুত ছিলেন যে, কাপালিকেরা মন্ত্রবলে অসাধ্যসাধনে সক্ষম—এ কারণে তাহার অবাধ্য হওয়া অনুচিত। ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া নবকুমার আপাততঃ কুটীরমধ্যে অবস্থান করাই স্থির করিলেন।

কিন্তু ক্রমে বেলা অপরাহ্ণ হইয়া আসিল, তথাপি কাপালিক প্রত্যাগমন করিল না। পূর্ব্বদিনের উপবাস, অদ্য এ পর্য্যন্ত অনশন, ইহাতে ক্ষুধা প্রবল হইয়া উঠিল। কুটীরমধ্যে যে অল্প পরিমাণ ফলমূল ছিল, তাহা পূর্ব্বরাত্রেই ভুক্ত হইয়াছিল—এক্ষণে কুটীর ত্যাগ করিয়া ফলমূলান্বেষণ না করিলে ক্ষুধায় প্রাণ যায়। অল্প বেলা থাকিতে ক্ষুধার পীড়নে নবকুমার ফলান্বেষণে বাহির হইলেন।

নবকুমার ফলান্বেষণে নিকটস্থ বালুকাস্তূপসকলের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যে দুই একটা গাছ বালুকায় জন্মিয়া থাকে, তাহার ফলাস্বাদন করিয়া দেখিলেন যে, এক বৃক্ষের ফল বাদামের ন্যায় অতি সুস্বাদু। তদ্দ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তি করিলেন।

কথিত বালুকাস্তূপশ্রেণী প্রস্থে অতি অল্প, অতএব নবকুমার অল্পকাল ভ্রমণ করিয়া তাহা পার হইলেন। তৎপরে বালুকাবিহীন নিবিড় বনমধ্যে পড়িলেন। যাঁহারা ক্ষণকালজন্য অপূর্ব্ব-পরিচিত বনমধ্যে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে পথহীন বনমধ্যে ক্ষণমধ্যেই পথভ্রান্তি জন্মে। নবকুমারের তাহাই ঘটিল। কিছু দূর আসিয়া আশ্রম কোন্ পথে রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। গম্ভীর জলকল্লোল তাঁহার কর্ণপথে প্রবেশ করিল; তিনি বুঝিলেন যে, এ সাগরগর্জ্জন। ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে, সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। সিকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন। ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র! উভয় পার্শ্বে যত দূর চক্ষুঃ যায়, তত দূর পর্য্যন্ত তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা; স্তূপীকৃত বিমল কুসুমদাম-গ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। নীলজলমণ্ডলমধ্যে সহস্র স্থানেও সফেন তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখন এমত প্রচণ্ড বায়ুবহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবেই সে সাগরতরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল। অতিদূরে কোন ইউরোপীয় বণিকজাতির সমুদ্রপোত শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধিহৃদয়ে উড়িতেছিল।

কতক্ষণ যে নবকুমার তীরে বসিয়া অনন্যমনে জলধিশোভা দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তদ্বিষয়ে তৎকালে তিনি পরিমাণ-বোধ-রহিত। পরে একেবারে প্রদোষতিমির আসিয়া কাল জলের উপর বসিল। তখন নবকুমারের চেতনা হইল যে, আশ্রম সন্ধান করিয়া লইতে হইবেক। দীর্ঘনিশ্বাস

ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন কেন, তাহা বলিতে পারি না—তখন তাঁহার মনে কোন্ ভূতপূর্ব্ব সুখের উদয় হইতেছিল, তাহা কে বলিবে? গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন, অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! কেশভার—অবেণীসম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ম্ময়; সে কটাক্ষ, এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য; বাহুযুগলের বিমলশ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্ত্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্দ্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদিবর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল; পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকসিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে, সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।

নবকুমার অকস্মাৎ এইরূপ দুর্গমমধ্যে দৈবী মূর্ত্তি দেখিয়া নিস্পন্দশরীর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বাক্‌শক্তি রহিত হইল;—স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। রমণীও স্পন্দহীন, অনিমেষ-লোচনে বিশাল চক্ষুর স্থিরদৃষ্টি নবকুমারের মুখে ন্যস্ত করিয়া রাখিলেন। উভয়মধ্যে প্রভেদ এই যে, নবকুমারের দৃষ্টি চমকিত লোকের দৃষ্টির ন্যায়, রমণীর দৃষ্টিতে সে লক্ষণ কিছুমাত্র নাই, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ হইতেছিল।

অনন্তর সমুদ্রের জনহীন তীরে, এইরূপে বহুক্ষণ দুই জনে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। তিনি অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?"

এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নবকুমারের হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিল। বিচিত্র হৃদয়যন্ত্রের তন্ত্রীচয় সময়ে সময়ে এরূপ লয়হীন হইয়া থাকে যে, যত যত্ন করা যায়, কিছুতেই পরস্পর মিলিত হয় না। কিন্তু একটি শব্দে, একটি রমণীকণ্ঠসম্ভূত স্বরে সংশোধিত হইয়া যায়। সকলই লয়বিশিষ্ট হয়। সংসারযাত্রা সেই অবধি সুখময় সঙ্গীতপ্রবাহ বলিয়া বোধ হয়। নবকুমারের কর্ণে সেইরূপ এ ধ্বনি বাজিল।

"পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?" এ ধ্বনি নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কি অর্থ, কি উত্তর করিতে হইবে, কিছুই মনে হইল না। ধ্বনি যেন হর্ষবিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল; যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল; বৃক্ষপত্রে মর্ম্মরিত হইতে লাগিল; সাগরনাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল। সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী; রমণী সুন্দরী; ধ্বনিও সুন্দর; হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্য্যের লয় মিলিতে লাগিল।

রমণী কোন উত্তর না পাইয়া কহিলেন, "আইস।" এই বলিয়া তরুণী চলিল; পদক্ষেপ লক্ষ্য হয় না। বসন্তকালে মন্দানিল-সঞ্চালিত শুভ্র মেঘের ন্যায় ধীরে ধীরে, অলক্ষ্য পাদবিক্ষেপে চলিল; নবকুমার কলের পুত্তলীর ন্যায় সঙ্গে চলিলেন। এক স্থানে একটা ক্ষুদ্র বন পরিবেষ্টন করিতে হইবে, বনের অন্তরালে গেলে, আর সুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন না। বনবেষ্টনের পর দেখেন যে, সম্মুখে কুটীর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : কাপালিকসঙ্গে

"কথং নিগড়সংযতাসি। দ্রুতম্
নয়ামি ভবতীমিতঃ—"

রত্নাবলী

নবকুমার কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারসংযোজনপূর্ব্বক করতলে মস্তক দিয়া বসিলেন। শীঘ্র আর মস্তকোত্তোলন করিলেন না।

"এ কি দেবী—মানুষী—না কাপালিকের মায়ামাত্র!" নবকুমার নিস্পন্দ হইয়া হৃদয়মধ্যে এই কথার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

অন্যমনস্ক ছিলেন বলিয়া, নবকুমার আর একটি ব্যাপার দেখিতে পান নাই। সেই কুটীরমধ্যে তাঁহার আগমনপূর্ব্বাবধি একখানি কাষ্ঠ জ্বলিতেছিল। পরে যখন অনেক রাত্রে স্মরণ হইল যে, সায়াহ্নকৃত্য অসমাপ্ত রহিয়াছে—তখন জলান্বেষণ অনুরোধে চিন্তা হইতে ক্ষান্ত হইয়া এ বিষয়ের অসম্ভাবিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। শুধু আলো নহে, তণ্ডুলাদি পাকোপযোগী কিছু কিছু সামগ্রীও আছে। নবকুমার বিস্মিত হইলেন না—মনে করিলেন যে, এও কাপালিকের কর্ম্ম—এ স্থানে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে।

নবকুমার সায়ংকৃত্য সমাপনান্তে তণ্ডুলগুলি কুটীরমধ্যে প্রাপ্ত এক মৃৎপাত্রে সিদ্ধ করিয়া আত্মসাৎ করিলেন।

পরদিন প্রভাতে চর্ম্মশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই সমুদ্রতীরাভিমুখে চলিলেন। পূর্ব্ব-দিনের যাতায়াতের গুণে অদ্য অল্প কষ্টে পথ অনুভূত করিতে পারিলেন। তথায় প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন? পূর্ব্বদৃষ্টা মায়াবিনী পুনর্ব্বার সে স্থলে যে আসিবেন—এমত আশা নবকুমারের হৃদয়ে কত দূর প্রবল হইয়াছিল বলিতে পারি না—কিন্তু সে স্থান তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। অনেক বেলাতেও তথায় কেহ আসিল না। তখন নবকুমার সে স্থানের চারিদিকে ভ্রমিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বৃথা অন্বেষণ মাত্র। মনুষ্যসমাগমের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলেন না। পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া সেই স্থানে উপবেশন করিলেন। সূর্য্য অস্তগত হইল; অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল; নবকুমার হতাশ হইয়া কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন। সায়াহ্নকালে সমুদ্রতীর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নবকুমার দেখিলেন যে, কাপালিক কুটীরমধ্যে ধরাতলে উপবেশন করিয়া নিঃশব্দে আছে। নবকুমার প্রথমে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহাতে কাপালিক কোন উত্তর করিল না।

নবকুমার কহিলেন, "এ পর্য্যন্ত প্রভুর দর্শনে কি জন্য বঞ্চিত ছিলাম?" কাপালিক কহিল, "নিজ ব্রতে নিযুক্ত ছিলাম।"

নবকুমার গৃহগমনাভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। কহিলেন, "পথ অবগত নহি—পাথেয় নাই; যদ্বিহিতবিধান প্রভুর সাক্ষাৎ পাইলেই হইতে পারিবে, এই ভরসায় আছি।"

কাপালিক কেবলমাত্র কহিল, "আমার সঙ্গে আগমন কর।" এই বলিয়া উদাসীন গাত্রোত্থান করিলেন। বাটী যাইবার কোন সদুপায় হইতে পারিবে প্রত্যাশায় নবকুমারও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

তখন সন্ধ্যালোক অন্তর্হিত হয় নাই—কাপালিক অগ্রে অগ্রে, নবকুমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন। অকস্মাৎ নবকুমারের পৃষ্ঠদেশে কাহার কোমল করস্পর্শ হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে স্পন্দহীন হইলেন। সেই আগুল্ফলম্বিত-নিবিড়কেশরাশি-ধারিণী বনাদেবীমূর্ত্তি! পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দ নিস্পন্দ। কোথা হইতে এ মূর্ত্তি অকস্মাৎ তাঁহার পশ্চাতে আসিল! নবকুমার দেখিলেন, রমণী মুখে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া আছে। নবকুমার বুঝিলেন যে, রমণী বাক্স্ফূর্ত্তি নিষেধ করিতেছে, নিষেধের বড় প্রয়োজন ছিল না। নবকুমার কি কথা কহিবেন? তিনি তথায় চমৎকৃত হইয়া দাঁড়াইলেন। কাপালিক এ সকল কিছুই দেখিতে পাইল না, অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেল। তাহারা উদাসীনের শ্রবণাতিক্রান্ত হইলে রমণী মৃদুস্বরে কি কথা কহিল। নবকুমারের কর্ণে এই শব্দ প্রবেশ করিল,

"কোথা যাইতেছ? যাইও না। ফিরিয়া যাও—পলায়ন কর।"

এই কথা সমাপ্ত করিয়াই উক্তিকারিণী সরিয়া গেলেন, প্রত্যুত্তর শুনিবার জন্য তিষ্ঠিলেন না। নবকুমার কিয়ৎকাল অভিভূতের ন্যায় দাঁড়াইলেন; পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু রমণী কোন্ দিকে গেল, তাহার কিছুই স্থিরতা পাইলেন না। মনে করিতে লাগিলেন—"এ কাহার মায়া? না আমারই ভ্রম হইতেছে। যে কথা শুনিলাম—সে ত আশঙ্কাসূচক, কিন্তু কিসের আশঙ্কা? তান্ত্রিকেরা সকলই করিতে পারে। তবে কি পলাইব? পলাইব বা কেন? সে দিন যদি বাঁচিয়াছি, আজিও বাঁচিব। কাপালিকও মনুষ্য, আমিও মনুষ্য।"

নবকুমার এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন, কাপালিক তাঁহাকে সঙ্গে না দেখিয়া প্রত্যাগমন করিতেছে। কাপালিক কহিল, "বিলম্ব করিতেছ কেন?"

কাপালিক পুনরাহ্বান করাতে বিনা বাক্যব্যয়ে নবকুমার তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া সম্মুখে এক মৃৎপ্রাচীরবিশিষ্ট কুটীর দেখিতে পাইলেন। তাহাকে কুটীরও বলা যাইতে পারে, ক্ষুদ্র গৃহও বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে আমাদিগের কোন প্রয়োজন নাই। ইহার পশ্চাতেই সিকতাময় সমুদ্রতীর। গৃহপার্শ্ব দিয়া কাপালিক নবকুমারকে সেই সৈকতে লইয়া চলিলেন; এমত সময় তীরের তুল্য বেগে পূর্ব্বদৃষ্টা রমণী তাঁহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল; গমনকালে তাঁহার কর্ণে বলিয়া গেল, "এখনও পলাও। নরমাংস নহিলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না, তুমি কি জান না?"

নবকুমারের কপালে স্বেদনির্গম হইতে লাগিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ যুবতীর এই কথা কাপালিকের কর্ণে গেল। সে কহিল, "কপালকুণ্ডলে!"

স্বর নবকুমারের কর্ণে মেঘগর্জ্জনবৎ ধ্বনিত হইল। কিন্তু কপালকুণ্ডলা কোন উত্তর দিল না।

কাপালিক নবকুমারের হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মানুষঘাতী করস্পর্শে নবকুমারের শোণিত ধমনীমধ্যে শতগুণ বেগে প্রধাবিত হইল—লুপ্ত সাহস পুনর্ব্বার আসিল কহিলেন, "হস্ত ত্যাগ করুন।"

কাপালিক উত্তর করিল না। নবকুমার পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছেন?"

কাপালিক কহিল, "পূজার স্থানে।"

নবকুমার কহিলেন, "কেন?"

কাপালিক কহিল, "বধার্থ।"

অতি তীব্রবেগে নবকুমার নিজ হস্ত টানিলেন। যে বলে তিনি হস্ত আকর্ষিত করিয়াছিলেন তাহাতে সামান্য লোকে তাঁহার হাত ধরিয়া থাকিলে হস্তরক্ষা করা দূরে থাকুক—বেগে ভূপতিত হইত। কিন্তু কাপালিকের অঙ্গমাত্রও হেলিল না:—নবকুমারের প্রকোষ্ঠ তাহার হস্তমধ্যেই রহিল নবকুমারের অস্থিগ্রন্থিসকল যেন ভগ্ন হইয়া গেল। নবকুমার দেখিলেন, বলে হইবে না। কৌশলের প্রয়োজন। "ভাল দেখা যাউক,"—এইরূপ স্থির করিয়া নবকুমার কাপালিকের সঙ্গে চলিলেন।

সৈকতের মধ্যস্থানে নীত হইয়া নবকুমার দেখিলন, পূর্ব্বদিনের ন্যায় তথায় বৃহৎ কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিতেছে। চতুঃপার্শ্বে তান্ত্রিক পূজার আয়োজন রহিয়াছে, তন্মধ্যে নরকপালপূর্ণ আসব রহিয়াছে—কিন্তু শব নাই। অনুমান করিলেন, তাঁহাকে শব হইতে হইবে।

কতকগুলি শুষ্ক, কঠিন লতাগুল্ম তথায় পূর্ব্ব হইতেই আহরিত ছিল। কাপালিক তদ্দ্বারা নবকুমারকে দৃঢ় বন্ধন করিতে আরম্ভ করিল। নবকুমার সাধ্যমত বল প্রকাশ করিলেন কিন্তু বল প্রকাশ কিছুমাত্র ফলদায়ক হইল না। তাঁহার প্রতীতি হইল যে, এ বয়সেও কাপালিক মত্ত হস্তীর বল ধারণ করে। নবকুমারের বল প্রকাশ দেখিয়া কাপালিক কহিল,

"মূর্খ! কি জন্য বল প্রকাশ কর? তোমার জন্ম আজি সার্থক হইল। ভৈরবীর পূজায় তোমার এই মাংসপিণ্ড অর্পিত হইবেক, ইহার অধিক তোমার তুল্য লোকের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে?"

কাপালিক নবকুমারকে দৃঢ় বন্ধন করিয়া সৈকতোপরি ফেলিয়া রাখিলেন। এবং বধের প্রাক্কালিক পূজাদি ক্রিয়ায় ব্যাপৃত হইলেন। ততক্ষণ নবকুমার বাঁধন ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু শুষ্ক লতা অতি কঠিন—বন্ধন অতি দৃঢ়। মৃত্যু আসন্ন! নবকুমার ইষ্টদেব-চরণে চিত্ত নিবিষ্ট করিলেন। একবার জন্মভূমি মনে পড়িল, নিজ সুখের আলয় মনে পড়িল একবার বহুদিন অন্তর্হিত জনক এবং জননীর মুখ মনে পড়িল, দুই এক বিন্দু অশ্রুজল সৈকত-বালুকায় শুষিয়া গেল। কাপালিক বলির প্রাক্কালিক ক্রিয়া সমপনান্তে বধার্থ খড়্গ লইবার জন্য আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল। কিন্তু যথায় খড়্গ রাখিয়াছিল, তথায় খড়্গ পাইল না। আশ্চর্য্য! কাপালিক কিছু বিস্মিত হইল। তাহার নিশ্চিত মনে হইতেছিল যে, অপরাহ্ণে খড়্গ আনিয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিয়াছিল এবং স্থানান্তরও করে নাই, তবে খড়্গ কোথায় গেল? কাপালিক ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিল। কোথাও পাইল না। তখন পূর্ব্বকথিত কুটীরাভিমুখ হইয়া কপালকুণ্ডলাকে ডাকিল, কিন্তু পুনঃ পুনঃ ডাকাতেও কপালকুণ্ডলা কোন উত্তর দিল না। তখন কাপালিকের চক্ষু লোহিত, ভ্রূযুগ আকুঞ্চিত হইল। দ্রুতপদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিল; এই

অবকাশে বন্ধনলতা ছিন্ন করিতে নবকুমার আর একবার যত্ন পাইলেন—কিন্তু সে যত্নও নিষ্ফল হইল।

এমত সময়ে নিকটে বালুকার উপর অতি কোমল পদধ্বনি হইল—এ পদধ্বনি কাপালিকের নহে। নবকুমার নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন, সেই মোহিনী—কপালকুণ্ডলা। তাঁহার করে খড়্গ দুলিতেছে।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "চুপ! কথা কহিও না—খড়্গ আমারই কাছে—চুরি করিয়া রাখিয়াছি।"

এই বলিয়া কপালকুণ্ডলা অতি শীঘ্রহস্তে নবকুমারের লতাবন্ধন খড়্গ দ্বারা ছেদন করিতে লাগিলেন। নিমিষমধ্যে তাঁহাকে মুক্ত করিলেন। কহিলেন, "পলায়ন কর; আমার পশ্চাৎ আইস, পথ দেখাইয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া কপালকুণ্ডলা তীরের ন্যায় বেগে পথ দেখাইয়া চলিলেন। নবকুমার লাফ দিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : অন্বেষণে

"And the great lord of Luna
Fell at that deadly stroke;
As falls on mount Alvernus
A thunder-smitten oak."
Lays of Ancient Rome.

এদিকে কাপালিক গৃহমধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া, না খড়্গ, না কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে পাইয়া সন্দিগ্ধচিত্তে সৈকতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তথায় আসিয়া দেখিল যে, নবকুমার তথায় নাই। ইহাতে অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই ছিন্ন লতাবন্ধনের উপর দৃষ্টি পড়িল। তখন স্বরূপ অনুভূত করিতে পারিয়া কাপালিক নবকুমারের অন্বেষণে ধাবিত হইল। কিন্তু বিজনমধ্যে পলাতকেরা কোন্ দিকে কোন্ পথে গিয়াছে তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য। অন্ধকারবশতঃ কাহাকেও দৃষ্টিপথবর্ত্তী করিতে পারিল না। এজন্য বাক্যশব্দ লক্ষ্য করিয়া ক্ষণেক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু সকল সময়ে কণ্ঠধ্বনিও শুনিতে পাওয়া গেল না। অতএব বিশেষ করিয়া চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে এক উচ্চ বালিয়াড়ির শিখরে উঠিল। কাপালিক এক পার্শ্ব দিয়া উঠিল; তাহার অন্যতর পার্শ্বে বর্ষার জলপ্রবাহে স্তূপমূল ক্ষয়িত হইয়াছিল, তাহা সে জানিত না। শিখরে আরোহণ করিবামাত্র কাপালিকের শরীরভরে সেই পতনোন্মুখ স্তূপশিখর ভগ্ন হইয়া অতি ঘোর রবে ভূপতিত হইল। পতনকালে পর্ব্বত-শিখরচ্যুত মহিষের ন্যায় কাপালিকও তৎসঙ্গে পড়িয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : আশ্রয়ে

"And that very night——
Shall Romeo bear thee to Mantua."
Romeo and Juliet.

সেই অমাবস্যার ঘোরান্ধকার যামিনীতে দুই জনে ঊর্দ্ধশ্বাসে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বন্য পথ নবকুমারের অপরিজ্ঞাত; কেবল সহচারিণী ষোড়শীকে লক্ষ্য করিয়া তদ্বর্ত্মসম্বর্ত্তী হওয়া ব্যতীত তাঁহার অন্য উপায় নাই। মনে মনে ভাবিলেন, "এও কপালে ছিল!" নবকুমার জানিতেন না যে, বাঙ্গালী অবস্থার বশীভূত, অবস্থা বাঙ্গালীর বশীভূত হয় না। জানিলে এ দুঃখ করিতেন না। ক্রমে তাঁহারা পাদক্ষেপ মন্দ করিয়া চলিতে লাগিলেন। অন্ধকারে কিছুই লক্ষ্য হয় না; কেবল কখন কোথাও নক্ষত্রালোকে কোন বালুকাস্তূপের শুভ্র শিখর অস্পষ্ট দেখা যায়—কোথাও খদ্যোতমালাসংবৃত বৃক্ষের অবয়ব জ্ঞানগোচর হয়।

কপালকুণ্ডলা পথিককে সমভিব্যাহারে লইয়া, নিভৃত কাননাভ্যন্তরে উপনীত হইলেন। তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। সম্মুখে অন্ধকারে বনমধ্যে এক অত্যুচ্চ দেবালয়চূড়া লক্ষিত হইল; তন্নিকটে ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরবেষ্টিত একটি গৃহও দেখা গেল। কপালকুণ্ডলা প্রাচীরদ্বারের নিকটস্থ হইয়া তাহাতে করাঘাত করিতে লাগিলেন; পুনঃ পুনঃ করাঘাত করাতে ভিতর হইতে এক ব্যক্তি কহিল, "কে ও, কপালকুণ্ডলা বুঝি?" কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "দ্বার খোল।"

উত্তরকারী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। যে ব্যক্তি দ্বার খুলিয়া দিল, সে ঐ দেবালয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতার সেবক বা অধিকারী; বয়সে পঞ্চাশৎ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল। কপালকুণ্ডলা তাহার বিরলকেশ মস্তক কর দ্বারা আকর্ষিত করিয়া আপন অধরের নিকট তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় আনিলেন এবং দুই চারি কথায় নিজ সঙ্গীর অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। অধিকারী বহুক্ষণ পর্য্যন্ত করতললগ্নশীর্ষ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কহিলেন, "এ বড় বিষম ব্যাপার। মহাপুরুষ মনে করিলে সকল করিতে পারেন। যাহা হউক, মায়ের প্রসাদে তোমার অমঙ্গল ঘটিবে না। সে ব্যক্তি কোথায়?"

কপালকুণ্ডলা, "আইস" বলিয়া নবকুমারকে আহ্বান করিলেন। নবকুমার অন্তরালে দাঁড়াইয়াছিলেন, আহূত হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অধিকারী তাঁহাকে কহিলেন, "আজি এইখানে লুকাইয়া থাক, কালি প্রত্যূষে তোমাকে মেদিনীপুরের পথে রাখিয়া আসিব।"

ক্রমে কথায় কথায় অধিকারী জানিতে পারিলেন যে, এ পর্য্যন্ত নবকুমারের আহারাদি হয় নাই। ইহাতে অধিকারী তাঁহার আহারের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, নবকুমার আহারে নিতান্ত অস্বীকৃত হইয়া কেবলমাত্র বিশ্রামস্থানের প্রার্থনা জানাইলেন। অধিকারী নিজ রন্ধনশালায় নবকুমারের শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। নবকুমার শয়ন করিলে, কপালকুণ্ডলা সমুদ্রতীরে প্রত্যাগমন করিবার উদ্যোগ করিলেন। অধিকারী তাঁহার প্রতি সস্নেহ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "যাইও না। ক্ষণেক দাঁড়াও, এক ভিক্ষা আছে।"

কপালকুণ্ডলা। কি?

অধিকারী। তোমাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত মা বলিয়া থাকি, দেবীর পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতে পারি যে, মাতার অধিক তোমাকে স্নেহ করি। আমার ভিক্ষা অবহেলা করিবে না?

কপা। করিব না।

অধি। আমার এই ভিক্ষা, তুমি আর সেখানে ফিরিয়া যাইও না।

কপা। কেন?

অধি। গেলে তোমার রক্ষা নাই।

কপা। তা ত জানি।

অধি। তবে আর জিজ্ঞাসা কর কেন?

কপা। না গিয়া কোথায় যাইব?

অধি। এই পথিকের সঙ্গে দেশান্তরে যাও।

কপালকুণ্ডলা নীরব হইয়া রহিলেন। অধিকারী কহিলেন, "মা, কি ভাবিতেছ?"

কপা। যখন তোমার শিষ্য আসিয়াছিল, তখন তুমি কহিয়াছিলে যে, যুবতীর এরূপ যুবাপুরুষের সহিত যাওয়া অনুচিত, এখন যাইতে বল কেন?

অধি। তখন তোমার জীবনের আশঙ্কা করি নাই, বিশেষ যে সদুপায়ের সম্ভাবনা ছিল না, এখন সে সদুপায় হইতে পারিবে। আইস, মায়ের অনুমতি লইয়া আসি।

এই বলিয়া অধিকারী দীপহস্তে দেবালয়ের দ্বারে গিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন। কপালকুণ্ডলাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। মন্দিরমধ্যে মানবাকারপরিমিতা করালা কালীমূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল। উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। অধিকারী আচমন করিয়া পুষ্পপাত্র হইতে একটি অচ্ছিন্ন বিল্বপত্র লইয়া মন্ত্রপূত করিলেন, এবং তাহা প্রতিমার পাদোপরি সংস্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে কহিলেন,

"মা, দেখ, দেবী অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছেন; বিল্বপত্র পড়ে নাই, যে মানস করিয়া অর্ঘ্য দিয়াছিলাম, তাহাতে অবশ্য মঙ্গল। তুমি এই পথিকের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে গমন কর; কিন্তু আমি বিষয়ী লোকের রীতি চরিত্র জানি। তুমি যদি গলগ্রহ হইয়া ইহার সঙ্গে যাও, তবে এ ব্যক্তি অপরিচিত যুবতী সঙ্গে লইয়া লোকালয়ে লজ্জা পাইবে। তোমাকেও লোকে ঘৃণা করিবে।

তুমি বলিতেছ, এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণসন্তান; গলাতেও যজ্ঞোপবীত দেখিতেছি। এ যদি তোমাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যায়, তবে সকল মঙ্গল। নচেৎ আমিও তোমাকে ইহার সহিত যাইতে বলিতে পারি না।"

"বি—বা—হ" এই কথাটি কপালকুণ্ডলা অতি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন। বলিতে লাগিলেন, "বিবাহের নাম ত তোমাদিগের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্তু কাহাকে বলে সবিশেষ জানি না। কি করিতে হইবে?"

অধিকারী ঈষন্মাত্র হাস্য করিয়া কহিলেন, "বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্মের সোপান; এই জন্য স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে; জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা।"

অধিকারী মনে করিলেন, সকলই বুঝাইলেন। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন, সকলই বুঝিলেন। বলিলেন,

"তাহাই হউক। কিন্তু তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে আমার মন সরিতেছে না। তিনি যে আমাকে এতদিন প্রতিপালন করিয়াছেন।"

অধি। কি জন্য প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহা জান না।

এই বলিয়া অধিকারী তান্ত্রিক সাধনে স্ত্রীলোকের যে সম্বন্ধ, তাহা অস্পষ্ট রকম কপালকুণ্ডলাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কপালকুণ্ডলা তাহা কিছু বুঝিল না, কিন্তু তাহার বড় ভয় হইল। বলিল, "তবে বিবাহই হউক।"

এই বলিয়া উভয়ে মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন। এক কক্ষমধ্যে কপালকুণ্ডলাকে বসাইয়া, অধিকারী, নবকুমারের শয্যাসন্নিধানে গিয়া তাঁহার শিওরে বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! নিদ্রিত কি?"

নবকুমারের নিদ্রা যাইবার অবস্থা নহে; নিজদশা ভাবিতেছিলেন। বলিলেন, "আজ্ঞে না।"

অধিকারী কহিলেন, "মহাশয়! পরিচয়টা লইতে একবার আসিলাম, আপনি ব্রাহ্মণ?"

নব। আজ্ঞা হাঁ।

অধি। কোন্ শ্রেণী?

নব। রাঢ়ীয় শ্রেণী।

অধি। আমরাও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ—উৎকল ব্রাহ্মণ বিবেচনা করিবেন না। বংশে কুলাচার্য্য তবে এক্ষণে মায়ের পদাশ্রয়ে আছি। মহাশয়ের নাম?

নব। নবকুমার শর্ম্মা।

অধি। নিবাস?

নব। সপ্তগ্রাম।

অধি। আপনারা কোন্ গাঁই?

নব। বন্দ্যঘটী।

অধি। কয় সংসার করিয়াছেন?

নব। এক সংসার মাত্র।

নবকুমার সকল কথা খুলিয়া বলিলেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার এক সংসারও ছিল না। তিনি রামগোবিন্দ ঘোষালের কন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর পদ্মাবতী কিছু দিন পিত্রালয়ে রহিলেন। মধ্যে মধ্যে শ্বশুরালয়ে যাতায়াত করিতেন। যখন তাঁহার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা সপরিবারে পুরুষোত্তম দর্শনে গিয়াছিলেন। এই সময়ে পাঠানেরা আকবরশাহ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত হইয়া উড়িষ্যায় সদলে বসতি করিতেছিল। তাহাদিগের দমনের জন্য আকবরশাহ বিধিমতে যত্ন পাইতে লাগিলেন। যখন রামগোবিন্দ ঘোষাল উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমন করেন, তখন মোগল পাঠানের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। আগমন কালে তিনি পথিমধ্যে পাঠানসেনার হস্তে পতিত হয়েন। পাঠানেরা তৎকালে ভদ্রাভদ্র বিচারশূন্য, তাহারা নিরপরাধী পথিকের প্রতি অর্থের জন্য বলপ্রকাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। রামগোবিন্দ কিছু উদ্ধতস্বভাব; পাঠানদিগকে কটু কহিতে লাগিলেন। ইহার ফল এই হইল যে, সপরিবারে অবরুদ্ধ হইলেন; পরিশেষে জাতীয় ধর্ম্ম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সপরিবারে মুসলমান হইয়া নিষ্কৃতি পাইলেন।

রামগোবিন্দ ঘোষাল সপরিবারে প্রাণ লইয়া বাটী আসিলেন বটে, কিন্তু মুসলমান বলিয়া

আত্মীয় জনসমাজে এককালীন পরিত্যক্ত হইলেন। এ সময় নবকুমারের পিতা বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাকে সুতরাং জাতিভ্রষ্ট বৈবাহিকের সহিত জাতিভ্রষ্টা পুত্রবধূকে ত্যাগ করিতে হইল। আর নবকুমারের সহিত তাঁহার স্ত্রীর সাক্ষাৎ হইল না।

স্বজনত্যক্ত ও সমাজচ্যুত হইয়া রামগোবিন্দ ঘোষাল অধিক দিন স্বদেশে বাস করিতে পারিলেন না। এই কারণেও বটে, এবং রাজপ্রসাদে উচ্চপদস্থ হইবার আকাঙ্ক্ষায়ও বটে, তিনি সপরিবারে রাজধানী রাজমহলে গিয়া বসতি করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া তিনি সপরিবারে মহম্মদীয় নাম ধারণ করিয়াছিলেন। রাজমহলে যাওয়ার পরে শ্বশুরের বা বনিতার কি অবস্থা হইল, তাহা নবকুমারের জানিতে পারিবার কোন উপায় রহিল না এবং এ পর্য্যন্ত কখন কিছু জানিতেও পারিলেন না। নবকুমার বিরাগবশতঃ আর দারপরিগ্রহ করিলেন না। এই জন্য বলিতেছি, নবকুমারের "এক সংসারও" নহে।

অধিকারী এ সকল বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন না। তিনি বিবেচনা করিলেন, "কুলীনের সন্তানের দুই সংসারে আপত্তি কি?" প্রকাশ্যে কহিলেন, "আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম। এই যে কন্যা আপনার প্রাণরক্ষা করিয়াছে—এ পরহিতার্থ আত্মপ্রাণ নষ্ট করিয়াছে। যে মহাপুরুষের আশ্রয়ে ইহার বাস, তিনি অতি ভয়ঙ্করস্বভাব। তাঁহার নিকট প্রত্যাগমন করিলে, আপনার যে দশা ঘটিতেছিল, ইহার সেই দশা ঘটিবে। ইহার কোন উপায় বিবেচনা করিতে পারেন কি না?"

নবকুমার উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন, "আমিও সেই আশঙ্কা করিতেছিলাম। আপনি সকল অবগত আছেন—ইহার উপায় করুন। আমার প্রাণদান করিলে যদি কোন প্রত্যুপকার হয় —তবে তাহাতেও প্রস্তুত আছি। আমি এমন সঙ্কল্প করিতেছি যে, আমি সেই নরঘাতকের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া আত্মসমর্পণ করি। তাহা হইলে ইহার রক্ষা হইবে।" অধিকারী হাস্য করিয়া কহিলেন, "তুমি বাতুল। ইহাতে কি ফল দর্শিবে? তোমারও প্রাণসংহার হইবে—অথচ ইহার প্রতি মহাপুরুষের ক্রোধোপশম হইবে না। ইহার একমাত্র উপায় আছে।"

নব। সে কি উপায়?

অধি। আপনার সহিত ইহার পলায়ন। কিন্তু সে অতি দুর্ঘট। আমার এখানে থাকিলে দুই এক দিনের মধ্যে ধৃত হইবে। এ দেবালয়ে মহাপুরুষের সর্ব্বদা যাতায়াত। সুতরাং কপালকুণ্ডলার অদৃষ্টে অশুভ দেখিতেছি।

নবকুমার আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সহিত পলায়ন দুর্ঘট কেন?"

অধি। এ কাহার কন্যা,—কোন্ কুলে জন্ম, তাহা আপনি কিছুই জানেন না। কাহার পত্নী,—কি চরিত্রা, তাহা কিছুই জানেন না! আপনি ইহাকে কি সঙ্গিনী করিবেন? সঙ্গিনী করিয়া লইয়া গেলেও কি আপনি ইহাকে নিজগৃহে স্থান দিবেন? আর যদি স্থান না দেন, তবে এ অনাথা কোথায় যাইবে?

নবকুমার ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমার প্রাণরক্ষয়িত্রীর জন্য কোন কার্য্য আমার অসাধ্য নহে। ইনি আমার আত্মপরিবারস্থা হইয়া থাকিবেন।"

অধি। ভাল। কিন্তু যখন আপনার আত্মীয়-স্বজন জিজ্ঞাসা করিবে যে, এ কাহার স্ত্রী কি উত্তর দিবেন?

নবকুমার পুনর্ব্বার চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আপনিই ইহার পরিচয় আমাকে দিন। আমি সেই পরিচয় সকলকে দিব।"

অধি। ভাল। কিন্তু এই পক্ষান্তরের পথ যুবক যুবতী অনন্যসহায় হইয়া কি প্রকারে যাইবে? লোকে দেখিয়া শুনিয়া কি বলিবে? আত্মীয়-স্বজনের নিকট কি বুঝাইবে? আর আমিও এই কন্যাকে মা বলিয়াছি, আমিই বা কি প্রকারে ইঁহাকে অজ্ঞাতচরিত্র যুবার সহিত একাকী দূরদেশে পাঠাইয়া দিই?

ঘটকরাজ ঘটকালিতে মন্দ নহেন।

নবকুমার কহিলেন, "আপনি সঙ্গে আসুন।"

অধি। আমি সঙ্গে যাইব? ভবানীর পূজা কে করিবে?

নবকুমার ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, "তবে কি কোন উপায় করিতে পারেন না?"

অধি। একমাত্র উপায় হইতে পারে,—সে আপনার ঔদার্য্য গুণের অপেক্ষা করে।

নব। সে কি? আমি কিসে অস্বীকৃত? কি উপায় বলুন?

অধি। শুনুন। ইনি ব্রাহ্মণকন্যা। ইঁহার বৃত্তান্ত আমি সবিশেষ অবগত আছি। ইনি বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গপ্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা কালে এ সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন। সে সকল বৃত্তান্ত পশ্চাৎ ইঁহার নিকট আপনি সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন। কাপালিক ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপন যোগসিদ্ধিমানসে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অচিরাৎ আত্মপ্রয়োজন সিদ্ধ করিতেন। ইনি এ পর্য্যন্ত অনূঢ়া. ইঁহার চরিত্র পরম পবিত্র। আপনি ইঁহাকে বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যান। কেহ কোন কথা বলিতে পারিবে না। আমি যথাশাস্ত্র বিবাহ দিব।

নবকুমার শয্যা হইতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। অতি দ্রুতপাদবিক্ষেপে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কোন উত্তর করিলেন না। অধিকারী কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন,

"আপনি এক্ষণে নিদ্রা যান। কল্য প্রত্যূষে আপনাকে আমি জাগরিত করিব। ইচ্ছা হয়, একাকী যাইবেন। আপনাকে মেদিনীপুরের পথে রাখিয়া আসিব।"

এই বলিয়া অধিকারী বিদায় লইলেন। গমনকালে মনে মনে করিলেন, "রাঢ়দেশের ঘটকালি কি ভুলিয়া গিয়াছি না কি?"

নবম পরিচ্ছেদ : দেবনিকেতনে

"কথং। অলং রুদিতেন; স্থিরা ভব, ইতঃ পন্থানমালোকয়।"

শকুন্তলা

প্রাতে অধিকারী নবকুমারের নিকট আসিলেন। দেখিলেন, এখনও নবকুমার শয়ন করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি কর্ত্তব্য?"

নবকুমার কহিলেন, "আজি হইতে কপালকুণ্ডলা আমার ধর্ম্মপত্নী। ইহার জন্য সংসার ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিব। কে কন্যা সম্প্রদান করিবে?"

ঘটকচূড়ামণির মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। মনে মনে ভাবিলেন, "এত দিনে জগদম্বার কৃপায় আমার কপালিনীর বুঝি গতি হইল।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "আমি সম্প্রদান করিব।" অধিকারী নিজ শয়নকক্ষমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। একটি ঝুঙ্গীর মধ্যে কয়েক খণ্ড অতি জীর্ণ তালপত্র ছিল। তাহাতে তাঁহার তিথি নক্ষত্রাদি নির্দ্দিষ্ট থাকিত। তৎসমুদায় সবিশেষ সমালোচনা করিয়া আসিয়া কহিলেন, "আজি যদিও বৈবাহিক দিন নহে—তথাচ বিবাহে কোন বিঘ্ন নাই। গোধূলিলগ্নে কন্যা সম্প্রদান করিব। তুমি অদ্য উপবাস করিয়া থাকিবে মাত্র। কৌলিক আচরণ সকল বাটী গিয়া করাইও। এক দিনের জন্য তোমাদিগকে লুকাইয়া রাখিতে পারি, এমন স্থান আছে। আজি যদি তিনি আসেন, তবে তোমদিগের সন্ধান পাইবেন না। পরে বিবাহান্তে কালি প্রাতে সপত্নীক বাটী যাইও।"

নবকুমার ইহাতে সম্মত হইলেন। এ অবস্থায় যত দূর সম্ভবে, তত দূর যথাশাস্ত্র কার্য্য হইল। গোধূলিলগ্নে নবকুমারের সহিত কাপালিকপালিতা সন্ন্যাসিনীর বিবাহ হইল।

কাপালিকের কোন সংবাদ নাই। পরদিন প্রত্যূষে তিন জনে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অধিকারী মেদিনীপুরের পথ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে রাখিয়া আসিবেন।

যাত্রাকালে কপালকুণ্ডলা কালীপ্রণামার্থ গেলেন। ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া, পুষ্পপাত্র হইতে একটি অভিন্ন বিল্বপত্র প্রতিমার পাদোপরি স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। পত্রটি পড়িয়া গেল।

কপালকুণ্ডলা নিতান্ত ভক্তিপরায়ণা। বিল্বদল প্রতিমাচরণচ্যুত হইল দেখিয়া ভীত হইলেন; এবং অধিকারীকে সংবাদ দিলেন। অধিকারীও বিষণ্ণ হইলেন। কহিলেন,

"এখন নিরুপায়। এখন পতিমাত্র তোমার ধর্ম্ম। পতি শ্মশানে গেলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে। অতএব নিঃশব্দে চল।"

সকলে নিঃশব্দে চলিলেন। অনেক বেলা হইলে মেদিনীপুরের পথে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। তখন অধিকারী বিদায় হইলেন। কপালকুণ্ডলা কাঁদিতে লাগিলেন। পৃথিবীতে যে জন তাঁহার একমাত্র সুহৃদ্, সে বিদায় হইতেছে।

অধিকারীও কাঁদিতে লাগিলেন। চক্ষের জল মুছাইয়া কপালকুণ্ডলার কাণে কাণে কহিলেন, "মা! তুই জানিস্, পরমেশ্বরীর প্রসাদে তোর সন্তানের অর্থের অভাব নাই। হিজলীর ছোট বড় সকলেই তাঁহার পূজা দেয়। তোর কাপড়ে যাহা বাঁধিয়া দিয়াছি, তাহা তোর স্বামীর নিকট দিয়া তোকে পাল্কী করিয়া দিতে বলিস্।—সন্তান বলিয়া মনে করিস্।"

অধিকারী এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গেলেন। কপালকুণ্ডলাও কাঁদিতে কাঁদিতে চলিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ : রাজপথে

"—There—now lean on me:
Place your foot here—"

Manfred

নবকুমার মেদিনীপুরে আসিয়া অধিকারীর প্রদত্ত ধনবলে কপালকুণ্ডলার জন্য একজন দাসী, একজন রক্ষক ও শিবিকাবাহক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে শিবিকারোহণে পাঠাইলেন। অর্থের অপ্রাচুর্য্য হেতু স্বয়ং পদব্রজে চলিলেন। নবকুমার পূর্ব্বদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত ছিলেন, মধ্যাহ্নভোজনের পর বাহকেরা তাঁহাকে অনেক পশ্চাৎ করিয়া গেল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। শীতকালের অনিবিড় মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যাও অতীত হইল। পৃথিবী অন্ধকারময়ী হইল। অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল। নবকুমার কপালকুণ্ডলার সহিত একত্র হইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। মনে স্থির জ্ঞান ছিল যে, প্রথম সরাইতে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন, কিন্তু সরাইও আপাততঃ দেখা যায় না। প্রায় রাত্রি চারি ছয় দণ্ড হইল। নবকুমার দ্রুতপাদবিক্ষেপ করিতে করিতে চলিলেন। অকস্মাৎ কোন কঠিন দ্রব্যে তাঁহার চরণস্পর্শ হইল। পদভরে সে বস্তু খড়্ খড়্ মড়্ মড়্ শব্দে ভাঙ্গিয়া গেল। নবকুমার দাঁড়াইলেন; পুনর্ব্বার পদচালনা করিলেন; পুনর্ব্বার ঐরূপ হইল। পদস্পৃষ্ট বস্তু হস্তে করিয়া তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন, ঐ বস্তু তক্তাভাঙ্গার মত।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলেও সচরাচর এমত অন্ধকার হয় না যে, অনাবৃত স্থানে স্থূল বস্তুর অবয়ব লক্ষ্য হয় না। সম্মুখে একটা বৃহৎ বস্তু পড়িয়া ছিল; নবকুমার অনুভব করিয়া দেখিলেন যে, সে ভগ্ন শিবিকা, অমনি তাঁহার হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার বিপদ আশঙ্কা হইল। শিবিকার দিকে যাইতে আবার ভিন্নপ্রকার পদার্থে তাঁহার পাদস্পর্শ হইল। এ স্পর্শ কোমল মনুষ্যশরীর-স্পর্শের ন্যায় বোধ হইল। বসিয়া হাত বুলাইয়া দেখিলেন, মনুষ্যশরীর বটে। স্পর্শ অত্যন্ত শীতল; তৎসঙ্গে দ্রব পদার্থের স্পর্শ অনুভূত হইল। নাড়ীতে হাত দিয়া দেখিলেন, স্পন্দ নাই, প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। বিশেষ মনঃসংযোগ করিয়া দেখিলেন, যেন নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে। নিশ্বাস আছে, তবে নাড়ী নাই কেন? এ কি রোগী? নাসিকার নিকট হাত দিয়া দেখিলেন, নিশ্বাস বহিতেছে না। তবে শব্দ কেন? হয়ত কোন জীবিত ব্যক্তিও এখানে আছে, এই ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কেহ জীবিত ব্যক্তি আছে?"

মৃদুস্বরে এক উত্তর হইল, "আছি।"

নবকুমার কহিলেন, "কে তুমি?"

উত্তর হইল, "তুমি কে?" নবকুমারের কর্ণে স্বর স্ত্রীকণ্ঠজাত বোধ হইল। ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কপালকুণ্ডলা না কি?"

স্ত্রীলোক কহিল, "কপালকুণ্ডলা কে, তা জানি না—আমি পথিক, আপাততঃ দস্যুহস্তে নিষ্কুণ্ডলা হইয়াছি।"

ব্যঙ্গ শুনিয়া নবকুমার ঈষৎ প্রসন্ন হইলেন। জিজ্ঞাসিলেন, "কি হইয়াছে?"

উত্তরকারিণী কহিলেন, "দস্যুতে আমার পাল্কী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, আমার একজন বাহককে মারিয়া ফেলিয়াছে; আর সকলে পলাইয়া গিয়াছে। দস্যুরা আমার অঙ্গের অলঙ্কার সকল লইয়া আমাকে পাল্কীতে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে।"

নবকুমার অন্ধকারে অনুধাবন করিয়া দেখিলেন, যথার্থই একটি স্ত্রীলোক শিবিকাতে বস্ত্রদ্বারা দৃঢ় বন্ধনযুক্ত আছে। নবকুমার শীঘ্রহস্তে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া কহিলেন, "তুমি উঠিতে পারিবে কি?" স্ত্রীলোক কহিল, "আমাকেও এক ঘা লাঠি লাগিয়াছিল; এজন্য পায়ে বেদনা আছে; কিন্তু বোধ হয়, অল্প সাহায্য করিলে উঠিতে পারিব।"

নবকুমার হাত বাড়াইয়া দিলেন। রমণী তৎসাহায্যে গাত্রোত্থান করিলেন। নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "চলিতে পারিবে কি?"

স্ত্রীলোক উত্তর না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার পশ্চাতে কেহ পথিক আসিতেছে দেখিয়াছেন?"

নবকুমার কহিলেন, "না।"

স্ত্রীলোক পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "চটি কত দূর?"

নবকুমার কহিলেন, "কত দূর বলিতে পারি না—কিন্তু বোধ হয় নিকট।"

স্ত্রীলোক কহিল, "অন্ধকারে একাকিনী মাঠে বসিয়া কি করিব, আপনার সঙ্গে চটি পর্য্যন্ত যাওয়াই উচিত বোধ হয়, কোন কিছুর উপর ভর করিতে পারিলে, চলিতে পারিব।"

নবকুমার কহিলেন, "বিপৎকালে সঙ্কোচ মূঢ়ের কাজ। আমার কাঁধে ভর করিয়া চল।"

স্ত্রীলোকটি মূঢ়ের কার্য্য করিল না। নবকুমারের স্কন্ধেই ভর করিয়া চলিল।

যথার্থই চটি নিকটে ছিল। এ সকল কালে চটির নিকটেও দুষ্ক্রিয়া করিতে দস্যুরা সঙ্কোচ করিত না। অনধিক বিলম্বে নবকুমার সমভিব্যাহারিণীকে লইয়া তথায় উপনীত হইলেন।

নবকুমার দেখিলেন যে, ঐ চটিতেই কপালকুণ্ডলা অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার দাসদাসী তজ্জন্য একখানা ঘর নিযুক্ত করিয়াছিল। নবকুমার স্বীয় সঙ্গিনীর জন্য তৎপার্শ্ববর্ত্তী একখানা ঘর নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে তন্মধ্যে প্রবেশ করাইলেন। তাঁহার আজ্ঞামত গৃহস্বামীর বনিতা প্রদীপ জ্বালিয়া আনিল। যখন দীপরশ্মিস্রোতঃ তাঁহার সঙ্গিনীর শরীরে পড়িল, তখন নবকুমার দেখিলেন যে, ইনি অসামান্যা সুন্দরী। রূপরাশিতরঙ্গে, তাঁহার যৌবনশোভা শ্রাবণের নদীর ন্যায় উছলিয়া পড়িতেছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পান্থনিবাসে

"কৈষা যোষিৎ প্রকৃতিচপলা"

উদ্ধবদূত

যদি এই রমণী নির্দ্দোষ সৌন্দর্য্যবিশিষ্টা হইতেন, তবে বলিতাম, "পুরুষ পাঠক! ইনি আপনার গৃহিণীর ন্যায় সুন্দরী। আর সুন্দরী পাঠকারিণি! ইনি আপনার দর্পণস্থ ছায়ার ন্যায় রূপবতী।" তাহা হইলে রূপবর্ণনার একশেষ হইত। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নহেন, সুতরাং নিরস্ত হইতে হইল।

ইনি যে নির্দ্দোষসুন্দরী নহেন, তাহা বলিবার কারণ এই যে, প্রথমতঃ ইঁহার শরীর মধ্যমাকৃতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ; দ্বিতীয়তঃ অধরৌষ্ঠ কিছু চাপা; তৃতীয়তঃ প্রকৃতপক্ষে ইনি গৌরাঙ্গী নহেন।

শরীর ঈষদ্দীর্ঘ বটে, কিন্তু হস্তপদ হৃদয়াদি সর্ব্বাঙ্গ সুগোল, সম্পূর্ণীভূত। বর্ষাকালে বিটপীলতা যেমন আপন পত্ররাশির বাহুল্যে দলমল করে, ইঁহার শরীর তেমনি আপন পূর্ণতায় দলমল করিতেছিল; সুতরাং ঈষদ্দীর্ঘ দেহও পূর্ণতাহেতু অধিকতর শোভার কারণ হইয়াছিল। যাঁহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে গৌরাঙ্গী বলি, তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও বর্ণ পূর্ণচন্দ্র-কৌমুদীর ন্যায়, কাহারও কাহারও ঈষদারক্তবদনা ঊষার ন্যায়। ইঁহার বর্ণ এতদুভয়বর্জ্জিত সুতরাং ইঁহাকে প্রকৃত গৌরাঙ্গী বলিলাম না বটে, কিন্তু মুগ্ধকরী শক্তিতে ইঁহার বর্ণও ন্যূন নহে ইনি শ্যামবর্ণা। "শ্যামা মা" বা "শ্যামসুন্দর" যে শ্যামবর্ণের উদাহরণ, এ সে শ্যামবর্ণ নহে তপ্ত কাঞ্চনের যে শ্যামবর্ণ, এ সেই শ্যাম। পূর্ণচন্দ্রকরলেখা, অথবা হেমাম্বুদকরীটিনী ঊষা যদি গৌরাঙ্গীদিগের বর্ণপ্রতিমা হয়, তবে বসন্তপ্রসূত নবচূতদলরাজির শোভা এই শ্যামার বর্ণের অনুরূপ বলা যাইতে পারে। পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে গৌরাঙ্গীর বর্ণের প্রতিষ্ঠ করিতে পারেন, কিন্তু যদি কেহ এরূপ শ্যামার মন্ত্রে মুগ্ধ হয়েন, তবে তাঁহাকে বর্ণজ্ঞানশূন্ বলিতে পারিব না। এ কথায় যাঁহার বিরক্তি জন্মে, তিনি একবার নবচূতপল্লববিরাজী ভ্রমর শ্রেণীর তুল্য, সেই উজ্জ্বলশ্যামললাটবিলম্বী অলকাবলী মনে করুন; সেই সপ্তমীচন্দ্রাকৃতিললাট তলস্থ অলকস্পর্শী ভ্রূযুগ মনে করুন; সেই পক্কচূতোজ্জ্বল কপোলদেশ মনে করুন; তন্মধ্যবর্ত্তী ঘোরারক্ত ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর মনে করুন, তাহা হইলে এই অপরিচিতা রমণীকে সুন্দরীপ্রধানা বলিয়া অনুভব হইবে। চক্ষু দুইটি অতি বিশাল নহে, কিন্তু সুবঙ্কিম পল্লবরেখাবিশিষ্ট—আর

অতিশয় উজ্জ্বল। তাহার কটাক্ষ স্থির, অথচ মর্ম্মভেদী। তোমার উপর দৃষ্টি পড়িলে তুমি তৎক্ষণাৎ অনুভূত কর যে, এ স্ত্রীলোক তোমার মন পর্য্যন্ত দেখিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে মর্ম্মভেদী দৃষ্টির ভাবান্তর হয়; চক্ষু সুকোমল স্নেহময় রসে গলিয়া যায়। আবার কখনও বা তাহাতে কেবল সুখাবেশজনিত ক্লান্তিপ্রকাশ মাত্র, যেন সে নয়ন মন্মথের স্বপ্নশয্যা। কখনও বা লালসাবিস্ফারিত, মদনরসে টলটলায়মান। আবার কখনও লোলাপাঙ্গে ক্রূর কটাক্ষ—যেন মেঘমধ্যে বিদ্যুদ্দাম। মুখকান্তিমধ্যে দুইটি অনির্ব্বচনীয় শোভা; প্রথম সর্ব্বত্রগামিনী বুদ্ধির প্রভাব, দ্বিতীয় আত্মগরিমা। তৎকারণে যখন তিনি মরালগ্রীবা বঙ্কিম করিয়া দাঁড়াইতেন, তখন সহজেই বোধ হইত, তিনি রমণীকুলরাজ্ঞী।

সুন্দরীর বয়ঃক্রম সপ্তবিংশতি বৎসর—ভাদ্র মাসের ভরা নদী। ভাদ্র মাসের নদীজলের ন্যায়, ইঁহার রূপরাশি টলটল করিতেছিল—উছলিয়া পড়িতেছিল। বর্ণাপেক্ষা, নয়নাপেক্ষা, সর্ব্বাপেক্ষা সেই সৌন্দর্য্যের পরিপ্লব মুগ্ধকর। পূর্ণযৌবনভরে সর্ব্বশরীর সতত ঈষচ্চঞ্চল; বিনা বায়ুতে শরতের নদী যেমন ঈষচ্চঞ্চল, তেমনি চঞ্চল; সে চাঞ্চল্য মুহুর্ম্মুহুঃ নূতন নূতন শোভাবিকাশের কারণ। নবকুমার নিমেষশূন্যনেত্রে সেই নূতন নূতন শোভা দেখিতেছিলেন।

সুন্দরী, নবকুমারের চক্ষু নিমেষশূন্য দেখিয়া কহিলেন, "আপনি কি দেখিতেছেন, আমার রূপ?"

নবকুমার ভদ্রলোক; অপ্রতিভ হইয়া মুখাবনত করিলেন। নবকুমারকে নিরুত্তর দেখিয়া অপরিচিতা পুনরপি হাসিয়া কহিলেন,

"আপনি কখনও কি স্ত্রীলোক দেখেন নাই, না আপনি আমাকে বড় সুন্দরী মনে করিতেছেন?"

সহজে এ কথা কহিলে, তিরস্কারস্বরূপ বোধ হইত, কিন্তু রমণী যে হাসির সহিত বলিলেন, তাহাতে ব্যঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই বোধ হইল না। নবকুমার দেখিলেন, এ অতি মুখরা; মুখরার কথায় কেন না উত্তর করিবেন? কহিলেন,

"আমি স্ত্রীলোক দেখিয়াছি; কিন্তু এরূপ সুন্দরী দেখি নাই।"

রমণী সগর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটিও না?"

নবকুমারের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার রূপ জাগিতেছিল; তিনিও সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, একটিও না, এমত বলিতে পারি না।"

উত্তরকারিণী কহিলেন, "তবুও ভাল। সেটি কি আপনার গৃহিণী?"

নব। কেন? গৃহিণী কেন মনে ভাবিতেছ?

স্ত্রী। বাঙ্গালীরা আপন গৃহিণীকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখে।

নব। আমি বাঙ্গালী; আপনিও ত বাঙ্গালীর ন্যায় কথা কহিতেছেন, আপনি তবে কোন্ দেশীয়?

যুবতী আপন পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "অভাগিনী বাঙ্গালী নহে; পশ্চিমপ্রদেশীয়া মুসলমানী।" নবকুমার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, পরিচ্ছদ পশ্চিমপ্রদেশীয়া মুসলমানীর ন্যায় বটে। কিন্তু বাঙ্গালা ত ঠিক বাঙ্গালীর মতই বলিতেছে। ক্ষণপরে তরুণী বলিতে লাগিলেন,

"মহাশয় বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে আমার পরিচয় লইলেন—আপন পরিচয় দিয়া চরিতার্থ করুন। যে গৃহে সেই অদ্বিতীয়া রূপসী গৃহিণী, সে গৃহ কোথায়?"

নবকুমার কহিলেন, "আমার নিবাস সপ্তগ্রাম।"

বিদেশিনী কোন উত্তর করিলেন না। সহসা তিনি মুখাবনত করিয়া, প্রদীপ উজ্জ্বল করিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পরে মুখ না তুলিয়া বলিলেন, "দাসীর নাম মতি। মহাশয়ের নাম কি শুনিতে পাই না?"

নবকুমার বলিলেন, "নবকুমার শর্ম্মা।"

প্রদীপ নিবিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সুন্দরী সন্দর্শনে

———ধর দেবি মোহন মূরতি
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বরবপু আনি
নানা আভরণ!"

মেঘনাদবধ

নবকুমার গৃহস্বামীকে ডাকিয়া অন্য প্রদীপ আনিতে বলিলেন। অন্য প্রদীপ আনিবার পূর্ব্বে একটি দীর্ঘনিশ্বাসশব্দ শুনিতে পাইলেন। প্রদীপ আনিবার ক্ষণেক পরে ভৃত্যবেশী একজন মুসলমান আসিয়া উপস্থিত হইল। বিদেশিনী তাহাকে দেখিয়া কহিলেন,

"সে কি, তোমাদিগের এত বিলম্ব হইল কেন? আর সকলে কোথায়?"

ভৃত্য কহিল, "বাহকেরা সকল মাতোয়ারা হইয়াছিল, তাহাদের গুছাইয়া আনিতে আমরা পাল্কীর পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম। পরে ভগ্ন শিবিকা দেখিয়া এবং আপনাকে না দেখিয়া আমরা একেবারে অজ্ঞান হইয়াছিলাম। কেহ কেহ সেই স্থানে আছে: কেহ কেহ অন্যান্য দিকে আপনার সন্ধানে গিয়াছে। আমি এদিকে সন্ধানে আসিয়াছি।"

মতি কহিলেন, "তাহাদিগকে লইয়া আইস।"

নফর সেলাম করিয়া চলিয়া গেল, বিদেশিনী কিয়ৎকাল করলগ্নকপোলা হইয়া বসিয়া রহিলেন।

নবকুমার বিদায় চাহিলেন। তখন মতি স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ব্ববৎভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথায় অবস্থিতি করিবেন?"

নব। ইহারই পরের ঘরে।

মতি। আপনার সে ঘরের কাছে একখানি পাল্কী দেখিলাম, আপনার কি কেহ সঙ্গী আছেন?

"আমার স্ত্রী সঙ্গে।"

মতিবিবি আবার ব্যঙ্গের অবকাশ পাইলেন। কহিলেন, "তিনিই কি অদ্বিতীয়া রূপসী?"

নব। দেখিলে বুঝিতে পারিবেন।

মতি। দেখা কি পাওয়া যায়?

নব। (চিন্তা করিয়া) ক্ষতি কি?

"তবে একটু অনুগ্রহ করুন। অদ্বিতীয়া রূপসীকে দেখিতে বড় কৌতূহল হইতেছে। আগরা গিয়া বলিতে চাহি, কিন্তু এখনই নহে—আপনি এখন যান। ক্ষণেক পরে আমি আপনাকে সংবাদ দিব।"

নবকুমার চলিয়া গেলেন। ক্ষণেক পরে অনেক লোকজন, দাসদাসী ও বাহক সিন্দুক ইত্যাদি লইয়া উপস্থিত হইল। একখানি শিবিকাও আসিল: তাহাতে একজন দাসী। পরে নবকুমারের নিকট সংবাদ আসিল, "বিবি স্মরণ করিয়াছেন।"

নবকুমার মতিবিবির নিকট পুনরাগমন করিলেন। দেখিলেন, এবার আবার পাত্তর। মতিবিবি, পূর্ব্বপরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া সুবর্ণমুক্তাদিশোভিত কারুকার্য্যযুক্ত বেশভূষা ধারণ করিয়াছেন: নিরলঙ্কার দেহ অলঙ্কারে খচিত করিয়াছেন। যেখানে যাহা ধরে—কুন্তলে, কবরীতে কপালে, নয়নপার্শ্বে, কর্ণে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, বাহুযুগে, সর্ব্বত্র সুবর্ণমধ্য হইতে হীরকাদি রত্ন ঝলসিতেছে। নবকুমারের চক্ষু অস্থির হইল। প্রভূতনক্ষত্রমালাভূষিত আকাশের ন্যায়—মধুরায়ত শরীর সহিত অলঙ্কারবাহুল্য সুসঙ্গত বোধ হইল, এবং তাহাতে আরও সৌন্দর্য্যপ্রভা বর্দ্ধিত হইল। মতিবিবি নবকুমারকে কহিলেন,

"মহাশয়, চলুন, আপনার পত্নীর নিকট পরিচিত হইয়া আসি।" নবকুমার বলিলেন, "সে জন্য অলঙ্কার পরিবার প্রয়োজন ছিল না। আমার পরিবারের কোন গহনাই নাই।"

মতিবিবি। গহনাগুলি না হয়, দেখাইবার জন্য পরিয়াছি। স্ত্রীলোকের গহনা থাকিলে, সে না দেখাইলে বাঁচে না। এখন, চলুন।

নবকুমার মতিবিবিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন। যে দাসী শিবিকারোহণে আসিয়াছিল, সেও সঙ্গে চলিল। ইহার নাম পেষমন্।

কপালকুণ্ডলা দোকানঘরের আর্দ্র মৃত্তিকায় একাকিনী বসিয়া ছিলেন। একটি ক্ষীণালোক প্রদীপ জ্বলিতেছে মাত্র—অবদ্ধ নিবিড় কেশরাশি পশ্চাদ্ভাগ অন্ধকার করিয়া রহিয়াছিল। মতিবিবি প্রথম যখন তাঁহাকে দেখিলেন, তখন অধরপার্শ্বে ও নয়নপ্রান্তে ঈষৎ হাসি ব্যক্ত হইল। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য প্রদীপটি তুলিয়া কপালকুণ্ডলার মুখের নিকট আনিলেন। তখন সে হাসি-হাসি ভাব দূর হইল; মতির মুখ গম্ভীর হইল;—অনিমিষলোচনে দেখিতে লাগিলেন। কেহ কোন কথা কহেন না;—মতি মুগ্ধা, কপালকুণ্ডলা কিছু বিস্মিতা।

ক্ষণেক পরে মতি আপন অঙ্গ হইতে অলঙ্কাররাশি মোচন করিতে লাগিলেন। মতি আত্মশরীর হইতে অলঙ্কাররাশি মুক্ত করিয়া একে একে কপালকুণ্ডলাকে পরাইতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা কিছু বলিলেন না। নবকুমার কহিতে লাগিলেন, "ও কি হইতেছে?" মতি তাহার কোন উত্তর করিলেন না।

অলঙ্কারসমাবেশ সমাপ্ত হইলে, মতি নবকুমারকে কহিলেন, "আপনি সত্যই বলিয়াছিলেন। এ ফুল রাজোদ্যানেও ফুটে না। পরিতাপ এই যে, রাজধানীতে এ রূপরাশি দেখাইতে পারিলাম না। এ সকল অলঙ্কার এই অঙ্গেরই উপযুক্ত—এই জন্য পরাইলাম। আপনিও কখন কখন পরাইয়া মুখরা বিদেশিনীকে মনে করিবেন।"

নবকুমার চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, "সে কি! এ যে বহুমূল্য অলঙ্কার। আমি এ সব লইব কেন?"

মতি কহিলেন, "ঈশ্বরপ্রসাদাৎ আমার আর আছে। আমি নিরাভরণা হইব না। ইহাকে পরাইয়া আমার যদি সুখবোধ হয়, আপনি কেন ব্যাঘাত করেন?"

মতিবিবি ইহা কহিয়া দাসীসঙ্গে চলিয়া গেলেন। বিরলে আসিলে পেষমন্ মতিবিবিকে জিজ্ঞাসা করিল,

"বিবিজান! এ ব্যক্তি কে?"

যবনবালা উত্তর করিলেন, "মেরা শৌহর।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : শিবিকারোহণে

"————খুলিনু সত্বরে,
কঙ্কণ, বলয়, হার, সীঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর কাঞ্চি।"

মেঘনাদবধ

গহনার দশা কি হইল, বলি শুন। মতিবিবি গহনা রাখিবার জন্য একটি রৌপ্যজড়িত হস্তিদন্তের কৌটা পাঠাইয়া দিলেন। দস্যুরা তাঁহার অল্প সামগ্রীই লইয়াছিল—নিকটে যাহা ছিল, তদ্ব্যতীত কিছুই পায় নাই।

নবকুমার দুই একখানি গহনা কপালকুণ্ডলার অঙ্গে রাখিয়া অধিকাংশ কৌটায় তুলিয়া রাখিলেন। পরদিন প্রভাতে মতিবিবি বর্দ্ধমানাভিমুখে, নবকুমার সপত্নীক সপ্তগ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে শিবিকাতে তুলিয়া দিয়া তাঁহার সঙ্গে গহনার কৌটা দিলেন। বাহকেরা সহজেই নবকুমারকে পশ্চাৎ করিয়া চলিল। কপালকুণ্ডলা শিবিকাদ্বার খুলিয়া চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলেন। একজন ভিক্ষুক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, ভিক্ষা চাইতে চাইতে পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "আমার ত কিছু নাই, তোমাকে কি দিব?"

ভিক্ষুক কপালকুণ্ডলার অঙ্গে যে দুই একখানা অলঙ্কার ছিল, তৎপ্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "সে কি মা! তোমার গায়ে হীরা মুক্তা—তোমার কিছুই নাই?"

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "গহনা পাইলে তুমি সন্তুষ্ট হও?"

ভিক্ষুক কিছু বিস্মিত হইল। ভিক্ষুকের আশা অপরিমিত। ক্ষণমাত্র পরে কহিল, "হই বই কি?"

কপালকুণ্ডলা অকপটহৃদয়ে কৌটাসমেত সকল গহনাগুলি ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন। অঙ্গের অলংকারগুলিও খুলিয়া দিলেন।

ভিক্ষুক ক্ষণেক বিহ্বল হইয়া রহিল। দাসদাসী কিছুমাত্র জানিতে পারিল না। ভিক্ষুকের বিহ্বলভাব ক্ষণিকমাত্র। তখনই এদিক ওদিক চাহিয়া গহনা লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। কপালকুণ্ডলা ভাবিলেন, "ভিক্ষুক দৌড়িল কেন?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : স্বদেশে

"শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ।
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ॥"

মেঘদূত

নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া স্বদেশে উপনীত হইলেন। নবকুমার পিতৃহীন, তাঁহার বিধবা মাতা গৃহে ছিলেন, আর দুই ভগিনী ছিল। জ্যেষ্ঠা বিধবা; তাহার সহিত পাঠক মহাশয়ের পরিচয় হইবে না। দ্বিতীয়া শ্যামাসুন্দরী সধবা হইয়াও বিধবা; কেন না, তিনি কুলীনপত্নী। তিনি দুই একবার আমাদের দেখা দিবেন।

অবস্থান্তরে নবকুমার অজ্ঞাতকুলশীলা তপস্বিনীকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনায়, তাঁহার আত্মীয়-স্বজন কতদূর সন্তুষ্টিপ্রকাশ করিতেন, তাহা আমরা বলিয়া উঠিতে পারিলাম না। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে তাঁহাকে কোন ক্লেশ পাইতে হয় নাই। সকলেই তাঁহার প্রত্যাগমনপক্ষে নিরাশ্বাস হইয়াছিল। সহযাত্রীরা প্রত্যাগমন করিয়া রটনা করিয়াছিলেন যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। পাঠক মহাশয় মনে করিবেন যে, এই সত্যবাদীরা আত্মপ্রতীতি মতই কহিয়াছিলেন;—কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে তাঁহাদিগের কল্পনাশক্তির অবমাননা করা হয়। প্রত্যাগত যাত্রীর মধ্যে অনেকে নিশ্চিত করিয়া কহিয়াছিলেন যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রমুখে পড়িতে তাঁহারা প্রত্যক্ষই দৃষ্টি করিয়াছিলেন।—কখনও কখনও ব্যাঘ্রটার পরিমাণ লইয়া তর্কবিতর্ক হইল; কেহ বলিলেন, "ব্যাঘ্রটা আট হাত হইবেক—" কেহ কহিলেন, "না, প্রায় চৌদ্দ হাত।' পূর্ব্বপরিচিত প্রাচীন যাত্রী কহিলেন, "যাহা হউক, আমি বড় রক্ষা পাইয়াছিলাম। ব্যাঘ্রটা আমাকে অগ্রে তাড়া করিয়াছিল, আমি পলাইলাম; নবকুমার তত সাহসী পুরুষ নহে; পলাইতে পারিল না।"

যখন এই সকল রটনা নবকুমারের মাতা প্রভৃতির কর্ণগোচর হইল, তখন পুরমধ্যে এমত ক্রন্দনধ্বনি উঠিল যে, কয়দিন তাহার ক্ষান্তি হইল না। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুসংবাদে নবকুমারের মাতা একেবারে মৃতপ্রায় হইলেন। এমত সময়ে যখন নবকুমার সস্ত্রীক হইয়া বাটী আগমন করিলেন, তখন তাঁহাকে কে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমার বধূ কোন্ জাতীয়া বা কাহার কন্যা? সকলেই আহ্লাদে অন্ধ হইল। নবকুমারের মাতা মহাসমাদরে বধূ বরণ করিয়া গৃহে লইলেন।

যখন নবকুমার দেখিলেন যে, কপালকুণ্ডলা তাঁহার গৃহমধ্যে সাদরে গৃহীতা হইলেন, তখন তাঁহার আনন্দ-সাগর উছলিয়া উঠিল। অনাদরের ভয়ে তিনি কপালকুণ্ডলা লাভ করিয়াও কিছুমাত্র আহ্লাদ বা প্রণয়লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই;—অথচ তাঁহার হৃদয়াকাশ কপালকুণ্ডলার মূর্ত্তিতেই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছিল। এই আশংকাতেই তিনি কপালকুণ্ডলার পাণিগ্রহণ প্রস্তাবে অকস্মাৎ সম্মত হয়েন নাই, এই আশংকাতেই পাণিগ্রহণ করিয়াও গৃহাগমন পর্যন্তও বারেকমাত্র কপালকুণ্ডলার সহিত প্রণয়সম্ভাষণ করেন নাই; পরিপ্লবোন্মুখ অনুরাগসিন্ধুতে বীচিমাত্র বিক্ষিপ্ত হইতে দেন নাই। কিন্তু সে আশংকা দূর হইল; জলরাশির গতিমুখ হইতে বেগনিরোধকারী উপলমোচনে যেমন দুর্দ্দম স্রোতোবেগ জন্মে, সেইরূপ বেগে নবকুমারের প্রণয়সিন্ধু উছলিয়া উঠিল।

এই প্রেমাবির্ভাব সর্ব্বদা কথায় ব্যক্ত হইত না, কিন্তু নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে দেখিলেই যেরূপ সজললোচনে তাঁহার প্রতি অনিমেষ চাহিয়া থাকিতেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইত; যেরূপ

নিষ্প্রয়োজনে, প্রয়োজন কল্পনা করিয়া কপালকুণ্ডলার কাছে আসিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ বিনাপ্রসঙ্গে কপালকুণ্ডলার কাছে আসিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ বিনাপ্রসঙ্গে কপালকুণ্ডলার প্রসঙ্গ উত্থাপনের চেষ্টা পাইতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ দিবানিশি কপালকুণ্ডলার সুখস্বচ্ছন্দতার অন্বেষণ করিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; সর্ব্বদা অন্যমনস্কতা-সূচক পদবিক্ষেপেও প্রকাশ পাইত। তাঁহার প্রকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। যেখানে চাপল্য ছিল, সেখানে গাম্ভীর্য্য জন্মিল; যেখানে অপ্রসাদ ছিল, সেখানে প্রসন্নতা জন্মিল; নবকুমারের মুখ সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। হৃদয় স্নেহের আধার হওয়াতে অপর সকলের প্রতি স্নেহের আধিক্য জন্মিল; বিবক্তিজনকের প্রতি বিরাগের লাঘব হইল; মনুষ্যমাত্র প্রেমের পাত্র হইল; পৃথিবী সৎকর্ম্মের জন্য মাত্র সৃষ্টা বোধ হইতে লাগিল; সকল সংসার সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। প্রণয় এইরূপ! প্রণয় কর্কশকে মধুর করে অসৎকে সৎ করে, অপুণ্যকে পুণ্যবান্ করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে!

আর কপালকুণ্ডলা? তাহার কি ভাব! চল পাঠক, তাহাকে দর্শন করি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : অবরোধে

"কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে
ধৃতং ত্বয়া বার্দ্ধকশোভি বল্কলম্।
বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্রতারকা
বিভাবরী যদারুণায় কল্পতে॥

কুমারসম্ভব

সকলেই অবগত আছেন যে, পূর্ব্বকালে সপ্তগ্রাম মহাসমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। এককালে যবদ্বীপ হইতে রোমক পর্য্যন্ত সর্ব্বদেশের বণিকেরা বাণিজ্যার্থ এই মহানগরে মিলিত হইত। কিন্তু বঙ্গীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির লাঘব জন্মিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তন্নগরের প্রান্তভাগ প্রক্ষালিত করিয়া যে স্রোতস্বতী বাহিত হইত, এক্ষণে তাহা সংকীর্ণশরীরা হইয়া আসিতেছিল; সুতরাং বৃহদাকার জলযান সকল আর নগর পর্য্যন্ত আসিতে পারিত না। এ কারণ বাণিজ্যবাহুল্য ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল। বাণিজ্যগৌরব নগরের বাণিজ্যনাশ হইলে সকলই যায়। সপ্তগ্রামের সকলই গেল। বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীতে হুগলি নূতন সৌষ্ঠবে তাহার প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছিল। তথায় পর্ত্তুগীসেরা বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া সপ্তগ্রামের ধনলক্ষ্মীকে আকর্ষিতা করিতেছিলেন। কিন্তু তখনও সপ্তগ্রাম একেবারে হতশ্রী হয় নাই। তথায় এ পর্য্যন্ত ফৌজদার প্রভৃতি প্রধান রাজপুরুষদিগের বাস ছিল; কিন্তু তখনও অনেকাংশ শ্রীভ্রষ্ট এবং বসতিহীন হইয়া পল্লীগ্রামের আকার ধারণ করিয়াছিল।

সপ্তগ্রামের এক নির্জ্জন ঔপনগরিক ভাগে নবকুমারের বাস। এক্ষণে সপ্তগ্রামের ভগ্নদশায় তথায় প্রায় মনুষ্যসমাগম ছিল না; রাজপথ সকল লতাগুল্মাদিতে পরিপূরিত হইয়াছিল। নবকুমারের বাটীর পশ্চাদ্ভাগেই এক বিস্তৃত নিবিড় বন। বাটীর সম্মুখে প্রায় ক্রোশার্দ্ধ দূরে একটি ক্ষুদ্র খাল বহিত; সেই খাল একটা ক্ষুদ্র প্রান্তর বেষ্টন করিয়া গৃহের পশ্চাদ্ভাগস্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। গৃহটি ইষ্টকরচিত; দেশকাল বিবেচনা করিলে তাহাকে নিতান্ত সামান্য গৃহ বলা যাইতে পারিত না। দোতালা বটে, কিন্তু ভয়ানক উচ্চ নহে; এখন একতলায় সেরূপ উচ্চতা অনেক দেখা যায়।

এই গৃহের ছাদের উপরে দুইটি নবীনবয়সী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতেছিলেন। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। চতুর্দ্দিকে যাহা দেখা যাইতেছিল, তাহা লোচনরঞ্জন বটে। নিকটে, একদিকে নিবিড় বন; তন্মধ্যে অসংখ্য পক্ষী কলরব করিতেছে। অন্যদিকে ক্ষুদ্র খাল, রূপার সূতার ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। দূরে মহানগরের অসংখ্য সৌধমালা, নববসন্তপবন-স্পর্শলোলুপ নাগরিকগণে পরিপূরিত হইয়া শোভা করিতেছে। অন্যদিকে, অনেক দূরে নৌকাভবণা ভাগীরথীর বিশাল বক্ষে সন্ধ্যাতিমির ক্ষণে ক্ষণে গাঢ়তর হইতেছে।

যে নবীনাদ্বয় প্রাসাদোপরি দাঁড়াইয়া ছিলেন, তন্মধ্যে একজন চন্দ্ররশ্মিবর্ণাভা; অবিন্যস্ত কেশভার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধলুক্কায়িতা। অপরা কৃষ্ণাঙ্গী; তিনি সুমুখী ষোড়শী, তাঁহার ক্ষুদ্র দেহ, মুখখানি ক্ষুদ্র, তাহার উপরার্দ্ধে চারি দিক্ দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কুন্তলদাম বেড়িয়া পড়িয়াছে; যেন নীলোৎপলদলরাজি উৎপলমধ্যকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। নয়নযুগল বিস্ফারিত, কোমল-শ্বেতবর্ণ, সফরীসদৃশ; অঙ্গুলিগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সঙ্গিনীর কেশতরঙ্গমধ্যে ন্যস্ত হইয়াছে। পাঠক মহাশয় বুঝিয়াছেন যে, চন্দ্ররশ্মিবর্ণশোভিনী কপালকুণ্ডলা: তাঁহাকে বলিয়া দিই, কৃষ্ণাঙ্গী, তাঁহার ননন্দা শ্যামাসুন্দরী।

শ্যামাসুন্দরী ভ্রাতৃজায়াকে কখনও "বউ," কখনও আদর করিয়া "বন," কখনও "মৃণ্ময়ী" সম্বোধন করিতেছিলেন। কপালকুণ্ডলা নামটি ব্রিকট বলিয়া, গৃহস্থেরা তাঁহার নাম মৃণ্ময়ী রাখিয়াছিলেন: এই জন্যই "মৃণ্ময়ী" সম্বোধন। আমরাও এখন কখন কখন ইঁহাকে মৃণ্ময়ী বলিব।

শ্যামাসুন্দরী একটি শৈশবাভ্যস্ত কবিতা বলিতেছিলেন, যথা—

"বলে—পদ্মরাণি, বদনখানি, রেতে রাখে ঢেকে।
ফুটায় কলি, ছুটায় অলি, প্রাণপতিকে দেখে॥
আবার—বনের লতা, ছড়িয়ে পাতা, গাছের দিকে ধায়।
নদীর জল, নামলে ঢল, সাগরেতে যায়॥
ছি ছি—সরম টুটে, কুমুদ ফুটে, চাঁদের আলো পেলে।
বিয়ের কনে রাখতে নারি ফুলশয্যা গেলে॥
মরি—এ কি জ্বালা, বিধির খেলা, হরিষে বিষাদ।
পরপরশে, সবাই রসে, ভাঙ্গে লাজের বাঁধ॥"

"তুই কি লো একা তপস্বিনী থাকিবি?"

মৃণ্ময়ী উত্তর করিল, "কেন, কি তপস্যা করিতেছি?"

শ্যামাসুন্দরী দুই করে মৃণ্ময়ীর কেশতরঙ্গমালা তুলিয়া কহিল, "তোমার এ চুলের রাশি কি বাঁধিবে না?"

মৃণ্ময়ী কেবল ঈষৎ হাসিয়া শ্যামাসুন্দরীর হাত হইতে কেশগুলি টানিয়া লইলেন।

শ্যামাসুন্দরী আবার কহিলেন, "ভাল, আমার সাধটি পুরাও। একবার আমাদের গৃহস্থের মেয়ের মত সাজ। কতদিন যোগিনী থাকিবে?"

মৃ। যখন এই ব্রাহ্মণসন্তানের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, তখন ত আমি যোগিনীই ছিলাম।

শ্যা। এখন থাকিতে পারিবে না।

মৃ। কেন থাকিব না?

শ্যা। কেন? দেখিবি? যোগ ভাঙ্গিব। পরশপাতর কাহাকে বলে জান?

মৃণ্ময়ী কহিলেন, "না।"

শ্যা। পরশপাতরের স্পর্শে রাঙ্গও সোনা হয়।

মৃ। তাতে কি?

শ্যা। মেয়েমানুষেরও পরশপাতর আছে।

মৃ। সে কি?

শ্যা। পুরুষ। পুরুষের বাতাসে যোগিনীও গৃহিণী হইয়া যায়। তুই সেই পাতর ছুঁয়েছিস্। দেখিবি,

"বাঁধাব চুলের রাশ, পরাব চিকন বাস,
খোঁপায় দোলাব তোর ফুল।
কপালে সীঁথির ধার, কাঁকালেতে চন্দ্রহার,
কানে তোর দিব যোড়া দুল॥
কুংকুম চন্দন চুয়া, বাটা ভরে পান গুয়া,
রাঙ্গামুখ রাঙ্গা হবে রাগে।
সোণার পুত্তলি ছেলে, কোলে তোর দিব ফেলে,
দেখি ভাল লাগে কি না লাগে॥"

মৃন্ময়ী কহিলেন, "ভাল, বুঝিলাম। পরশপাতর যেন ছুঁয়েছি, সোণা হলেম। চুল বাঁধিলাম; ভাল কাপড় পরিলাম; খোঁপায় ফুল দিলাম, কাঁকালে চন্দ্রহার পরিলাম; কাণে দুল দুলিল; চন্দন, কুঙ্কুম, চুয়া, পান, গুয়া, সোণার পুত্তলি পর্য্যন্ত হইল। মনে কর সকলই। তাহা হইলেই বা কি সুখ?"

শ্যা। বল দেখি ফুলটি ফুটিলে কি সুখ?

মৃ। লোকের দেখে সুখ, ফুলের কি?

শ্যামাসুন্দরীর মুখকান্তি গম্ভীর হইল; প্রভাতবাতাহত নীলোৎপলবৎ বিস্ফারিত চক্ষু ঈষৎ দুলিল; বলিলেন, "ফুলের কি? তাহা ত বলিতে পারি না। কখনও ফুল হইয়া ফুটি নাই। কিন্তু যদি তোমার মত কলি হইতাম, তবে ফুটিয়া সুখ হইত।"

শ্যামাসুন্দরী তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কহিলেন,—"আচ্ছা—তাই যদি না হইল,—তবে শুনি দেখি, তোমার সুখ কি?"

মৃন্ময়ী কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "বলিতে পারি না। বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।"

শ্যামাসুন্দরী কিছু বিস্মিতা হইলেন। তাঁহাদিগের যত্নে যে মৃন্ময়ী উপকৃতা হয়েন নাই, ইহাতে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধা হইলেন, কিছু রুষ্টা হইলেন। কহিলেন, "এখন ফিরিয়া যাইবার উপায়?"

মৃ। উপায় নাই।

শ্যা। তবে করিবে কি?

মৃ। অধিকারী কহিতেন, "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

শ্যামাসুন্দরী মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া বলিলেন, "যে আজ্ঞা, ভট্টাচার্য্য মহাশয়! কি হইল?"

মৃন্ময়ী নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "যাহা বিধাতা করাইবেন, তাহাই করিব। যাহা কপালে আছে, তাহাই ঘটিবে।"

শ্যা। কেন, কপালে আর কি আছে? কপালে সুখ আছে। তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল কেন?

মৃন্ময়ী কহিলেন, "শুন। যে দিন স্বামীর সহিত যাত্রা করি, যাত্রাকালে আমি ভবানীর পায়ে ত্রিপত্র দিতে গেলাম। আমি মার পাদপদ্মে ত্রিপত্র না দিয়া কোন কর্ম্ম করিতাম না। যদি কর্ম্মে শুভ হইবার হইত, তবে মা ত্রিপত্র ধারণ করিতেন: যদি অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে ত্রিপত্র পড়িয়া যাইত। অপরিচিত ব্যক্তির সহিত অজ্ঞাত দেশে আসিতে শঙ্কা হইতে লাগিল; ভাল মন্দ জানিতে মার কাছে গেলাম। ত্রিপত্র মা ধারণ করিলেন না—অতএব কপালে কি আছে জানি না।"

মৃন্ময়ী নীরব হইলেন। শ্যামাসুন্দরী শিহরিয়া উঠিলেন।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ : ভূতপূর্ব্বে

"কস্যোহয়ং খলু ভৃত্যভাবঃ।"

রত্নাবলী

যখন নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া চটি হইতে যাত্রা করেন, তখন মতিবিবি পথান্তরে বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যতক্ষণ মতিবিবি পথবাহন করেন, ততক্ষণ আমরা তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত কিছু বলি। মতির চরিত্র মহাদোষ কলুষিত, মহদ্‌গুণেও শোভিত। এরূপ চরিত্রের বিস্তারিত বৃত্তান্তে পাঠক মহাশয় অসন্তুষ্ট হইবেন না।

যখন ইঁহার পিতা মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বন করিলেন, তখন ইঁহার হিন্দু নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া লুৎফ-উন্নিসা নাম হইল। মতিবিবি কোন কালেও ইঁহার নাম নহে। তবে কখনও কখনও ছদ্মবেশে দেশবিদেশে ভ্রমণকালে ঐ নাম গ্রহণ করিতেন। ইঁহার পিতা ঢাকায় আসিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তথায় অনেক নিজদেশীয় লোকের সমাগম। দেশীয় সমাজে সমাজচ্যুত হইয়া সকলের থাকিতে ভাল লাগে না। অতএব তিনি কিছু দিনে সুবাদারের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিয়া তাঁহার সুহৃদ্ অনেকানেক ওমরাহের নিকট পত্রসংগ্রহপূর্ব্বক সপরিবারে আগ্রায় আসিলেন। আকবরশাহের নিকট কাহারও গুণ অবিদিত থাকিত না; শীঘ্রই তিনি ইঁহার গুণগ্রহণ করিলেন। লুৎফ-উন্নিসার পিতা শীঘ্রই উচ্চপদস্থ হইয়া আগ্রার প্রধান ওমরাহ মধ্যে গণ্য হইলেন। এদিকে লুৎফ-উন্নিসা ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। আগ্রাতে আসিয়া তিনি পারসীক, সংস্কৃত, নৃত্য, গীত, রসবাদ ইত্যাদিতে সুশিক্ষিতা হইলেন। রাজধানীর অসংখ্য রূপবতী গুণবতীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্যা হইতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্যাসম্বন্ধে তাঁহার যাদৃশ শিক্ষা হইয়াছিল, ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার কিছুই হয় নাই। লুৎফ-উন্নিসার বয়স পূর্ণ হইলে প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, তাঁহার মনোবৃত্তি সকল দুর্দ্দমবেগবতী। ইন্দ্রিয়দমনে কিছুমাত্র ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছাও নাই। সদসতে সমান প্রবৃত্তি। এ কার্য্য সৎ, এ কার্য্য অসৎ, এমত বিচার করিয়া তিনি কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না; যাহা ভাল লাগিত, তাহাই করিতেন। যখন সৎকর্ম্মে অন্তঃকরণ সুখী হইত, তখন সৎকর্ম্ম করিতেন; যখন অসৎকর্ম্মে অন্তঃকরণ সুখী হইত, তখন অসৎকর্ম্ম করিতেন; যৌবনকালের মনোবৃত্তি দুর্দ্দম হইলে যে সকল দোষ জন্মে, তাহা লুৎফ-উন্নিসাসম্বন্ধে জন্মিল। তাঁহার পূর্ব্বস্বামী বর্ত্তমান,—ওমরাহেরা কেহ তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনিও বড় বিবাহের অনুরাগিণী হইলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, কুসুমে কুসুমে বিহারিণী ভ্রমরীর পক্ষচ্ছেদ কেন করাইব? প্রথমে কাণাকাণি, শেষে কালিমাময় কলঙ্ক রটিল। তাঁহার পিতা বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে আপন গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

লুৎফ-উন্নিসা গোপনে যাহাদিগকে কৃপা বিতরণ করিতেন, তন্মধ্যে যুবরাজ সেলিম এক জন। এক জন ওমরাহের কুলকলঙ্ক জন্মাইলে, পাছে আপন অপক্ষপাতী পিতার কোপানলে পড়িতে হয়, সেই আশঙ্কায় সেলিম এ পর্য্যন্ত লুৎফ-উন্নিসাকে আপন অবরোধবাসিনী করিতে পারেন নাই। এক্ষণে সুযোগ পাইলেন। রাজপুতপতি মানসিংহের ভগিনী, যুবরাজের প্রধানা মহিষী ছিলেন। যুবরাজ লুৎফ-উন্নিসাকে তাঁহার প্রধানা সহচরী করিলেন। লুৎফ-উন্নিসা প্রকাশ্যে বেগমের সখী, পরোক্ষে যুবরাজের অনুগ্রহভাগিনী হইলেন।

লুৎফ-উন্নিসার ন্যায় বুদ্ধিমতী মহিলা যে অল্প দিনেই রাজকুমারের হৃদয়াধিকার করিবেন, ইহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। সেলিমের চিত্তে তাঁহার প্রভুত্ব এরূপ প্রতিযোগিশূন্য হইয়া উঠিল যে, লুৎফ-উন্নিসা উপযুক্ত সময়ে তাঁহার পাটরাণী হইবেন, ইহা তাঁহার স্থির প্রতিজ্ঞা হইল। কেবল লুৎফ-উন্নিসার স্থির প্রতিজ্ঞা হইল, এমত নহে; রাজপুরবাসী সকলেরই উহা সম্ভব বোধ হইল। এইরূপ আশার স্বপ্নে লুৎফ-উন্নিসা জীবন বাহিত করিতেছিলেন, এমত সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইল। আকবরশাহের কোষাধ্যক্ষ (আকতিমাদ-উদ্দৌলা) খ্বাজা আয়াসের কন্যা মেহের-উন্নিসা যবনকুলে প্রধানা সুন্দরী। একদিন কোষাধ্যক্ষ রাজকুমার সেলিম ও অন্যান্য

প্রধান ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিলেন। সেই দিন মেহের-উন্নিসার সহিত সেলিমের সাক্ষাৎ হইল এবং সেই দিন সেলিম মেহের-উন্নিসার নিকট চিত্ত রাখিয়া গেলেন। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। শের আফগান নামক একজন মহাবিক্রমশালী ওমরাহের সহিত কোষাধ্যক্ষের কন্যার সম্বন্ধ পূর্ব্বেই হইয়াছিল। সেলিম অনুরাগান্ধ হইয়া সে সম্বন্ধ রহিত করিবার জন্য পিতার নিকট যাচমান হইলেন। কিন্তু নিরপেক্ষ পিতার নিকট কেবল তিরস্কৃত হইলেন মাত্র। সুতরাং সেলিমকে আপাততঃ নিরস্ত হইতে হইল। আপাততঃ নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু আশা ছাড়িলেন না। শের আফগানের সহিত মেহের-উন্নিসার বিবাহ হইল। কিন্তু সেলিমের চিত্তবৃত্তি সকল লুৎফ-উন্নিসার নখদর্পণে ছিল: —তিনি নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে, শের আফগানের সহস্র প্রাণ থাকিলেও তাঁহার নিস্তার নাই, আকবরশাহের মৃত্যু হইলেই তাঁহার প্রাণান্ত হইবে—মেহের-উন্নিসা সেলিমের মহিষী হইবেন। লুৎফ-উন্নিসা সিংহাসনের আশা ত্যাগ করিলেন।

মহম্মদীয় সম্রাট্ কুলগৌরব আকবরের পরমায়ু শেষ হইয়া আসিল। যে প্রচণ্ড সূর্য্যের প্রভায় তুরকী হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়াছিল, সে সূর্য্য অস্তগামী হইল। এ সময়ে লুৎফ-উন্নিসা আত্মপ্রাধান্য রক্ষার জন্য এক দুঃসাহসিক সঙ্কল্প করিলেন।

রাজপুতপতি রাজা মানসিংহের ভগিনী সেলিমের প্রধানা মহিষী। খস্রু তাঁহার পুত্র। এক দিন তাঁহার সহিত আকবরশাহের পীড়িত শরীর সম্বন্ধে লুৎফ-উন্নিসার কথোপকথন হইতেছিল; রাজপুতকন্যা এক্ষণে বাদশাহপত্নী হইবেন, এই কথার প্রসঙ্গ করিয়া লুৎফ-উন্নিসা তাঁহাকে অভিনন্দন করিতেছিলেন, প্রত্যুত্তরে খস্রুর জননী কহিলেন, "বাদশাহের মহিষী হইলে মনুষ্যজন্ম সার্থক বটে, কিন্তু যে বাদশাহ-জননী, সেই সর্ব্বোপরি।" উত্তর শুনিবামাত্র এক অপূর্ব্বচিন্তিত অভিসন্ধি লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ে উদয় হইল। তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, "তাহাই হউক না কেন? সেও ত আপনার ইচ্ছাধীন।" বেগম কহিলেন, "সে কি?" চতুরা উত্তর করিলেন, "যুবরাজপুত্র খস্রুকে সিংহাসন দান করুন।"

বেগম কোন উত্তর করিলেন না। সে দিন এ প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপিত হইল না, কিন্তু কেহই এ কথা ভুলিলেন না। স্বামীর পরিবর্ত্তে পুত্র যে সিংহাসনারোহণ করেন, ইহা বেগমের অনভিমত নহে; মেহের-উন্নিসার প্রতি সেলিমের অনুরাগ লুৎফ-উন্নিসার যেরূপ হৃদয়শেল, বেগমেরও সেইরূপ। মানসিংহের ভগিনী আধুনিক তুর্কমান কন্যার যে আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকিবেন, তাহা ভাল লাগিবে কেন? লুৎফ-উন্নিসারও এ সঙ্কল্পে উদ্যোগিনী হইবার গাঢ় তাৎপর্য্য ছিল। অন্য দিন পুনর্ব্বার এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। উভয়ের মত স্থির হইল।

সেলিমকে ত্যাগ করিয়া খস্রুকে আকবরের সিংহাসনে স্থাপিত করা অসম্ভাবনীয় বোধ হইবার কোন কারণ ছিল না। এ কথা লুৎফ-উন্নিসা, বেগমের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করাইলেন। তিনি কহিলেন, "মোগলের সাম্রাজ্য রাজপুতের বাহুবলে স্থাপিত রহিয়াছে; সেই রাজপুতজাতির চূড়া রাজা মানসিংহ, তিনি খস্রুর মাতুল; আর মুসলমানদিগের প্রধান খাঁ আজিম, তিনি প্রধান রাজমন্ত্রী, তিনি খস্রুর শ্বশুর; ইঁহারা দুই জনে উদ্যোগী হইলে, কে ইঁহাদিগের অনুবর্ত্তী না হইবে? আর কাহার বলেই বা যুবরাজ সিংহাসন গ্রহণ করিবেন? রাজা মানসিংহকে এ কার্য্যে ব্রতী করা, আপনার ভার। খাঁ আজিম ও অন্যান্য মহম্মদীয় ওমরাহগণকে লিপ্ত করা আমার ভার। আপনার আশীর্ব্বাদে কৃতকার্য্য হইব, কিন্তু এক আশঙ্কা, পাছে সিংহাসন আরোহণ করিয়া খস্রু এ দুশ্চারিণীকে পুরবহিষ্কৃত করিয়া দেন।"

বেগম সহচরীর অভিপ্রায় বুঝিলেন। হাসিয়া কহিলেন, "তুমি আগ্রার যে ওমরাহের গৃহিণী হইতে চাও, সেই তোমার পাণিগ্রহণ করিবে। তোমার স্বামী পঞ্চ হাজারি মন্সবদার হইবেন।"

লুৎফ-উন্নিসা সন্তুষ্ট হইলেন। ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। যদি রাজপুরীমধ্যে সামান্যা পুরস্ত্রী হইয়া থাকিতে হইল, তবে প্রতিপুষ্পবিহারিণী মধুকরীর পক্ষচ্ছেদন করিয়া কি সুখ হইল? যদি স্বাধীনতা ত্যাগ করিতে হইল, তবে বাল্যসখী মেহের-উন্নিসার দাসীত্বে কি সুখ? তাহার অপেক্ষা কোন প্রধান রাজপুরুষের সর্ব্বময়ী ঘরণী হওয়া গৌরবের বিষয়।

শুধু এই লোভে লুৎফ-উন্নিসা এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন না। সেলিম যে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া মেহের-উন্নিসার জন্য এত ব্যস্ত, ইহার প্রতিশোধও তাঁহার উদ্দেশ্য।

খাঁ আজিম প্রভৃতি আগ্রা দিল্লীর ওমরাহেরা লুৎফ-উন্নিসার বিলক্ষণ বাধ্য ছিলেন। খাঁ আজিম যে জামাতার ইষ্টসাধনে উদ্যুক্ত হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। তিনি এবং আর আর ওমরাহগণ সম্মত হইলেন। খাঁ আজিম লুৎফ-উন্নিসাকে কহিলেন, "মনে কর, যদি কোন অসুযোগে আমরা কৃতকার্য্য না হই, তবে তোমার আমার রক্ষা নাই। অতএব প্রাণ বাঁচাইবার একটা পথ রাখা ভাল।'

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "আপনার কি পরামর্শ?" খাঁ আজিম কহিলেন, "উড়িষ্যা ভিন্ন অন্য আশ্রয় নাই। কেবল সেই স্থানে মোগলের শাসন তত প্রখর নহে। উড়িষ্যায় সৈন্য আমাদিগের হস্তগত থাকা আবশ্যক। তোমার ভ্রাতা উড়িষ্যায় মৎসবদার আছেন; আমি কল্য প্রচার করিব, তিনি যুদ্ধে আহত হইয়াছেন। তুমি তাঁহাকে দেখিবার ছলে কল্যই উড়িষ্যায় যাত্রা কর। তথায় যৎকর্ত্তব্য, তাহা সাধন করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন কর।"

লুৎফ-উন্নিসা এ পরামর্শে সম্মত হইলেন। তিনি উড়িষ্যায় আসিয়া যখন প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সহিত পাঠক মহাশয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পথান্তরে

"যে মাটিতে পড়ে লোকে উঠে তাই ধরে।
বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় মরে॥
তুফানে পতিত কিন্তু ছাড়িব না হাল।
আজিকে বিফলা হলো, হতে পারে কাল॥"

নবীন তপস্বিনী

যে দিন নবকুমারকে বিদায় করিয়া মতিবিবি বা লুৎফ-উন্নিসা বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিলেন, সে দিন তিনি বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত যাইতে পারিলেন না। অন্য চটিতে রহিলেন। সন্ধ্যার সময়ে পেষমনের সহিত একত্র বসিয়া কথোপকথন হইতেছিল, এমন কালে মতি সহসা পেষমন্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"পেষমন্! আমার স্বামীকে কেমন দেখিলে?"

পেষমন্ কিছু বিস্মিত হইয়া কহিল, "কেমন আর দেখিব? মতি কহিলেন, "সুন্দর পুরুষ বটে কি না?"

নবকুমারের প্রতি পেষমনের বিশেষ বিরাগ জন্মিয়াছিল। যে অলঙ্কারগুলি মতি কপালকুণ্ডলাকে দিয়াছিলেন, তৎপ্রতি পেষমনের বিশেষ লোভ ছিল: মনে মনে ভরসা ছিল, এক দিন চাহিয়া লইবেন। সেই আশা নির্ম্মূল হইয়াছিল, সুতরাং কপালকুণ্ডলা এবং তাঁহার স্বামী, উভয়ের প্রতি তাঁহার দারুণ বিরক্তি। অতএব স্বামিনীর প্রশ্নে উত্তর করিলেন,

"দরিদ্র ব্রাহ্মণ আবার সুন্দর কুৎসিৎ কি?"

সহচরীর মনের ভাব বুঝিয়া মতি হাস্য করিয়া কহিলেন, "দরিদ্র ব্রাহ্মণ যদি ওমরাহ হয়, তবে সুন্দর পুরুষ হইবে কি না?'

পে। সে আবার কি?

মতি। কেন, তুমি জান না যে, বেগম স্বীকার করিয়াছেন যে, খস্রু বাদশাহ হইলে আমার স্বামী ওমরাহ হইবে?

পে। তা ত জানি। কিন্তু তোমার পূর্ব্বস্বামী ওমরাহ হইবেন কেন?

মতি। তবে আমার আর কোন্ স্বামী আছে?

পে। যিনি নূতন হইবেন।

মতি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আমার ন্যায় সতীর দুই স্বামী, বড় অন্যায় কথা—ও কে যাইতেছে?"

যাহাকে দেখিয়া মতি কহিলেন, "ও কে যাইতেছে?" পেষমন্ তাহাকে চিনিল: সে আগ্রা-নিবাসী, খাঁ আজিমের আশ্রিত ব্যক্তি। উভয়ে ব্যস্ত হইলেন। পেষমন্ তাহাকে ডাকিলেন। সে ব্যক্তি আসিয়া লুৎফ-উন্নিসাকে অভিবাদনপূর্ব্বক একখানি পত্র দান করিল: কহিল,

"পত্র লইয়া উড়িষ্যা যাইতেছিলাম। পত্র জরুরি।"

পত্র পড়িয়া মতিবিবির আশা ভরসা সকল অন্তর্হিত হইল। পত্রের মর্ম্ম এই,

"আমাদিগের যত্ন বিফল হইয়াছে। মৃত্যুকালেও আকবরশাহ আপন বুদ্ধিবলে আমাদিগকে পরাভূত করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকে গতি হইয়াছে। তাঁহার আজ্ঞাবলে, কুমার সেলিম এক্ষণে জাহাঁগীর শাহ হইয়াছেন। তুমি খস্রুর জন্য ব্যস্ত হইবে না। এই উপলক্ষে কেহ তোমার শত্রুতা সাধিতে না পারে, এমত চেষ্টার জন্য তুমি শীঘ্র আগ্রায় ফিরিয়া আসিবে।"

আকবরশাহ যে প্রকারে এ ষড়্‌যন্ত্র নিষ্ফল করেন, তাহা ইতিহাসে বর্ণিত আছে; এ স্থলে সে বিবরণের আবশ্যকতা নাই।

পুরস্কারপূর্ব্বক দূতকে বিদায় করিয়া, মতি পেষমন্‌কে পত্র শুনাইলেন। পেষমন্ কহিল, "এক্ষণে উপায়?"

মতি। এখন আর উপায় নাই।

পে। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) ভাল, ক্ষতিই বা কি? যেমন ছিলে, তেমনই থাকিবে মোগল বাদশাহের পুরস্ত্রীমাত্রই অন্য রাজ্যের পাটরাণী অপেক্ষাও বড়।

মতি। (ঈষৎ হাসিয়া) তাহা আর হয় না। আর সে রাজপুরে থাকিতে পারিব না। শীঘ্রই মেহের-উন্নিসার সহিত জাহাঁগীরের বিবাহ হইবে। মেহের-উন্নিসাকে আমি কিশোর বয়োবধি ভাল জানি; একবার সে পুরবাসিনী হইলে সেই বাদশাহ হইবে, জাহাঁগীর বাদশাহ নামমাত্র থাকিবে। আমি যে তাহার সিংহাসনারোহণের পথরোধের চেষ্টা পাইয়াছিলাম, ইহা তাহার অবিদিত থাকিবে না। তখন আমার দশা কি হইবে?

পেষমন্ প্রায় রোদনোন্মুখী হইয়া কহিল, "তবে কি হইবে?"

মতি কহিলেন, "এক ভরসা আছে। মেহের-উন্নিসার চিত্ত জাহাঁগীরের প্রতি কিরূপ? তাহার যেরূপ দার্ঢ্য, তাহাতে যদি সে জাহাঁগীরের প্রতি অনুরাগিণী না হইয়া স্বামীর প্রতি যথার্থ স্নেহশালিনী হইয়া থাকে, তবে জাহাঁগীর শত শের আফগন বধ করিলেও মেহের-উন্নিসাকে পাইবেন না। আর যদি মেহের-উন্নিসা জাহাঁগীরের যথার্থ অভিলাষিণী হয়, তবে আর কোন ভরসা নাই।"

পে। মেহের-উন্নিসার মন কি প্রকারে জানিবে?

মতি হাসিয়া কহিলেন, "লুৎফ-উন্নিসার অসাধ্য কি? মেহের-উন্নিসা আমার বাল্যসখী—কালি বর্দ্ধমানে গিয়া তাহার নিকট দুই দিন অবস্থিতি করিব।"

পে। যদি মেহের-উন্নিসা বাদশাহের অনুরাগিণী হন, তাহা হইলে কি করিবে?

ম। পিতা কহিয়া থাকেন, "ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে।

উভয়ে ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিলেন। ঈষৎ হাসিতে মতির ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হইতে লাগিল। পেষমন্ জিজ্ঞাসা করিল, "হাসিতেছ কেন?

মতি কহিলেন, "কোন নূতন ভাব উদয় হইতেছে।"

পে। কি নূতন ভাব?

মতি তাহা পেষমন্‌কে বলিলেন না। আমরাও তাহা পাঠককে বলিব না। পশ্চাৎ প্রকাশ পাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : প্রতিযোগিনী-গৃহে

"শ্যামাদন্যো নহি নহি প্রাণনাথে মমাস্তি।"
উদ্ধবদূত

এ সময়ে শের আফগান বঙ্গদেশের সুবাদারের অধীনে বর্দ্ধমানের কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন।

মতিবিবি বর্দ্ধমানে আসিয়া শের আফগানের আলয়ে উপনীত হইলেন। শের আফগান সপরিবারে তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদরে তথায় অবস্থিতি করাইলেন। যখন শের আফগান এবং তাঁহার স্ত্রী মেহের-উন্নিসা আগ্রায় অবস্থিতি করিতেন, তখন মতি তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ

পরিচিতা ছিলেন। মেহের-উন্নিসার সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় ছিল। পরে উভয়েই দিল্লীর সাম্রাজ্যলাভের জন্য প্রতিযোগিনী হইয়াছিলেন। এক্ষণে একত্র হওয়ায় মেহের-উন্নিসা মনে ভাবিতেছেন, "ভারতবর্ষের কর্তৃত্ব কাহার অদৃষ্টে বিধাতা লিখিয়াছেন? বিধাতাই জানেন, আর সেলিম জানেন, আর কেহ যদি জানে ত সে এই লুৎফ-উন্নিসা: দেখি, লুৎফ-উন্নিসা কি কিছু প্রকাশ করিবে না?" মতিবিবিরও মেহের-উন্নিসার মন জানিবার চেষ্টা।

মেহের-উন্নিসা তৎকালে ভারতবর্ষ মধ্যে প্রধানা রূপবতী এবং গুণবতী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাদৃশ রমণী ভূমণ্ডলে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সৌন্দর্য্যে ইতিহাসকীর্ত্তিতা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে তাঁহার প্রাধান্য ঐতিহাসিকমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কোন প্রকার বিদ্যায় তাৎকালিক পুরুষদিগের মধ্যে বড় অনেকে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। নৃত্য-গীতে মেহের-উন্নিসা অদ্বিতীয়া; কবিতা-রচনায় বা চিত্রলিখনেও তিনি সকলের মন মুগ্ধ করিতেন। তাঁহার সকল কথা, তাঁহার সৌন্দর্য্য অপেক্ষাও মোহময়ী ছিল। মতিও এ সকল গুণে হীনা ছিলেন না। অদ্য এই দুই চমৎকারিণী পরস্পরের মন জানিতে উৎসুক হইলেন।

মেহের-উন্নিসা খাস কামরায় বসিয়া তসবীর লিখিতেছিলেন। মতি মেহের-উন্নিসার পৃষ্ঠের নিকট বসিয়া চিত্রলিখন দেখিতেছিলেন, এবং তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছিলেন। মেহের-উন্নিসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিত্র কেমন হইতেছে?" মতিবিবি উত্তর করিলেন, "তোমার চিত্র যেরূপ হইয়া থাকে, তাহাই হইতেছে। অন্য কেহ যে তোমার ন্যায় চিত্রনিপুণ নহে, ইহাই দুঃখের বিষয়।"

মেহে। তাহা যদি সত্য হয় ত দুঃখের বিষয় কেন?

ম। অন্যের তোমার মত চিত্র-নৈপুণ্য থাকিলে তোমার এ মুখের আদর্শ রাখিতে পারিত।

মেহে। কবরের মাটিতে মুখের আদর্শ থাকিবে।

মেহের-উন্নিসা এই কথা কিছু গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন।

ম। ভগিনি! আজ মনের স্ফূর্ত্তির এত অল্পতা কেন?

মেহে। স্ফূর্ত্তির অল্পতা কই? তবে যে তুমি আমাকে কাল প্রাতে ত্যাগ করিয়া যাইবে, তাহাই বা কি প্রকারে ভুলিব? আর দুই দিন থাকিয়া তুমি কেনই বা চরিতার্থ না করিবে?

ম। সুখে কার অসাধ? সাধ্য হইলে আমি কেন যাইব? কিন্তু আমি পরের অধীন; কি প্রকারে থাকিব?

মেহের। আমার প্রতি তোমার ত ভালবাসা আর নাই, থাকিলে তুমি কোন মতে রহিয়া যাইতে। আসিয়াছ ত রহিতে পার না কেন?

ম। আমি ত সকল কথাই বলিয়াছি। আমার সহোদর মোগলসৈন্যে মন্সবদার—তিনি উড়িষ্যার পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে আহত হইয়া সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিলেন। আমি তাঁহারই বিপদসংবাদ পাইয়া বেগমের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম। উড়িষ্যায় অনেক বিলম্ব করিয়াছি, এক্ষণে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। তোমার সহিত অনেক দিন দেখা হয় নাই, এই জন্য দুই দিন রহিয়া গেলাম।

মেহে। বেগমের নিকট কোন্ দিন পৌঁছিবার কথা স্বীকার করিয়া আসিয়াছ?

মতি বুঝিলেন, মেহের-উন্নিসা ব্যঙ্গ করিতেছেন। মার্জ্জিত অথচ মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গে মেহের-উন্নিসা যেরূপ নিপুণ, মতি সেরূপ নহেন। কিন্তু অপ্রতিভ হইবার লোকও নহেন। তিনি উত্তর করিলেন, "দিন নিশ্চিত করিয়া তিন মাসের পথ যাতায়াত করা কি সম্ভব? কিন্তু অনেক কাল বিলম্ব করিয়াছি; আরও বিলম্বে অসন্তোষের কারণ জন্মিতে পারে।"

মেহের-উন্নিসা নিজ ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া কহিলেন, "কাহার অসন্তোষের আশঙ্কা করিতেছ? যুবরাজের, না তাঁহার মহিষীর?"

মতি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "এ লজ্জাহীনাকে কেন লজ্জা দিতে চাও? উভয়েরই অসন্তোষ হইতে পারে।"

মে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—তুমি স্বয়ং বেগম নাম ধারণ করিতেছ না কেন? শুনিয়াছিলাম, কুমার সেলিম তোমাকে বিবাহ করিয়া খাসবেগম করিবেন; তাহার কত দূর?

ম। আমি ত সহজেই পরাধীনা। যে কিছু স্বাধীনতা আছে, তাহা কেন নষ্ট করিব?

বেগমের সহচারিণী বলিয়া অনায়াসে উড়িষ্যায় আসিতে পারিলাম, সেলিমের বেগম হইলে কি উড়িষ্যায় আসিতে পারিতাম?

মে। যে দিল্লীশ্বরের প্রধানা মহিষী হইবে, তাহার উড়িষ্যায় আসিবার প্রয়োজন?

ম। সেলিমের প্রধানা মহিষী হইব, এমন স্পর্দ্ধা কখনও করি না। এ হিন্দুস্থান দেশে কেবল মেহের-উন্নিসাই দিল্লীশ্বরের প্রাণেশ্বরী হইবার উপযুক্ত।

মেহের-উন্নিসা মুখ নত করিলেন। ক্ষণেক নিরুত্তর থাকিয়া কহিলেন, "ভগিনি! আমি এমত মনে করি না যে, তুমি আমাকে পীড়া দিবার জন্য এ কথা বলিলে, কি আমার মন জানিবার জন্য বলিলে। কিন্তু তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা, আমি যে শের আফগানের বনিতা, আমি যে কায়মনোবাক্যে শের আফগানের দাসী, তাহা তুমি বিস্মৃত হইয়া কথা কহিও না।"

লজ্জাহীনা মতি এ তিরস্কারে অপ্রতিভ হইলেন না, বরং আরও সুযোগ পাইলেন। কহিলেন, "তুমি যে পতিগতপ্রাণা, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। সেই জন্যই ছলক্রমে এ কথা তোমার সম্মুখে পাড়িতে সাহস করিয়াছি। সেলিম যে এ পর্য্যন্ত তোমার সৌন্দর্য্যের মোহ ভুলিতে পারেন নাই, এই কথা বলা আমার উদ্দেশ্য। সাবধান থাকিও।"

মে। এখন বুঝিলাম। কিন্তু কিসের আশঙ্কা?

মতি কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "বৈধব্যের আশঙ্কা।

এই কথা বলিয়া মতি মেহের-উন্নিসার মুখ পানে তীক্ষ্ণদৃষ্টি করিয়া রহিলেন, কিন্তু ভয় বা আহ্লাদের কোন চিহ্ন তথায় দেখিতে পাইলেন না। মেহের-উন্নিসা সদর্পে কহিলেন,

"বৈধব্যের আশঙ্কা! শের আফগান আত্মরক্ষায় অক্ষম নহে। বিশেষ আকবর বাদশাহের রাজ্যমধ্যে তাঁহার পুত্রও বিনা দোষে পরপ্রাণ নষ্ট করিয়া নিস্তার পাইবেন না।"

ম। সত্য কথা, কিন্তু সম্প্রতিকার আগ্রার সংবাদ এই যে, আকবরশাহ গত হইয়াছেন। সেলিম সিংহাসনারূঢ় হইয়াছেন। দিল্লীশ্বরকে কে দমন করিবে?

মেহের-উন্নিসা আর কিছু শুনিলেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিতে লাগিল। আবার মুখ নত করিলেন লোচনযুগলে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। মতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদ কেন?"

মেহের-উন্নিসা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায়?"

মতির মনস্কাম সিদ্ধ হইল। তিনি কহিলেন, "তুমি আজিও যুবরাজকে একেবারে বিস্মৃত হইতে পার নাই?"

মেহের-উন্নিসা গদ্‌গদস্বরে কহিলেন, "কাহাকে বিস্মৃত হইব? আত্মজীবন বিস্মৃত হইব, তথাপি যুবরাজকে বিস্মৃত হইতে পারিব না। কিন্তু শুন, ভগিনি! অকস্মাৎ মনের কপাট খুলিল; তুমি এ কথা শুনিলে; কিন্তু আমার শপথ, এ কথা যেন কর্ণান্তরে না যায়।"

মতি কহিল, "ভাল, তাহাই হইবে। কিন্তু যখন সেলিম শুনিবেন যে, আমি বর্দ্ধমানে আসিয়াছিলাম, তখন তিনি অবশ্য জিজ্ঞাসা করিবেন যে, মেহের-উন্নিসা আমার কথা কি বলিল? তখন আমি কি উত্তর করিব?"

মেহের-উন্নিসা কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন, "এই কহিও যে, মেহের-উন্নিসা হৃদয়মধ্যে তাঁহার ধ্যান করিবে। প্রয়োজন হইলে তাঁহার জন্য আত্মপ্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিবে। কিন্তু কখনও আপন কুলমান সমর্পণ করিবে না। দাসীর স্বামী জীবিত থাকিতে সে কখনও দিল্লীশ্বরকে মুখ দেখাইবে না। আর যদি দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক তাহার স্বামীর প্রাণান্ত হয়, তবে স্বামিহন্তার সহিত ইহজন্মে তাহার মিলন হইবেক না।"

ইহা কহিয়া মেহের-উন্নিসা সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। মতিবিবি চমৎকৃত হইয়া রহিলেন। কিন্তু মতিবিবিরই জয় হইল। মেহের-উন্নিসার চিত্তের ভাব মতিবিবি জানিলেন; মতিবিবির আশা ভরসা মেহের-উন্নিসা কিছুই জানিতে পারিলেন না। যিনি পরে আত্মবুদ্ধি-প্রভাবে দিল্লীশ্বরেরও ঈশ্বরী হইয়াছিলেন, তিনিও মতির নিকট পরাজিতা হইলেন। ইহার কারণ, মেহের-উন্নিসা প্রণয়শালিনী; মতিবিবি এ স্থলে কেবলমাত্র স্বার্থপরায়ণা।

মনুষ্যহৃদয়ের বিচিত্র গতি মতিবিবি বিলক্ষণ বুঝিতেন। মেহের-উন্নিসার কথা আলোচনা করিয়া তিনি যাহা সিদ্ধান্ত করিলেন, কালে তাহাই যথার্থীভূত হইল। তিনি বুঝিলেন যে,

মেহের-উন্নিসা জাহাঁগীরের যথার্থ অনুরাগিণী; অতএব নারীদর্পে এখন যাহাই বলুন, পথ মুক্ত হইলে মনের গতি রোধ করিতে পারিবেন না। বাদশাহের মনস্কামনা অবশ্য সিদ্ধ করিবেন।

এ সিদ্ধান্তে মতির আশা ভরসা সকলই নির্ম্মূল হইল। কিন্তু তাহাতে কি মতি নিতান্তই দুঃখিত হইলেন? তাহা নহে। বরং ঈষৎ সুখানুভবও হইল। কেন যে এমন অসম্ভব চিত্তপ্রসাদ জন্মিল, তাহা মতি প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আগ্রার পথে যাত্রা করিলেন। পথে কয়েক দিন গেল। সেই কয়েক দিনে আপন চিত্তভাব বুঝিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : রাজনিকেতনে

"পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে।"
বীরাঙ্গনা কাব্য

মতি আগ্রায় উপনীতা হইলেন। আর তাঁহাকে মতি বলিবার আবশ্যক করে না। কয়দিনে তাঁহার চিত্তবৃত্তিসকল একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

জাহাঁগীরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। জাহাঁগীর তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ সমাদর করিয়া, তাঁহার সহোদরের সংবাদ ও পথের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। লুৎফ-উন্নিসা যাহা মেহের-উন্নিসাকে বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য হইল। অন্যান্য প্রসঙ্গের পর বর্দ্ধমানের কথা শুনিয়া, জাহাঁগীর জিজ্ঞাসা করিলেন,

"মেহের-উন্নিসার নিকট দুই দিন ছিলে বলিতেছ, মেহের-উন্নিসা আমার কথা কি বলিল?" লুৎফ-উন্নিসা অকপটহৃদয়ে মেহের-উন্নিসার অনুরাগের পরিচয় দিলেন। বাদশাহ শুনিয়া নীরবে রহিলেন; তাঁহার বিস্ফারিত লোচনে দুই এক বিন্দু অশ্রু বহিল।

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "জাহাঁপনা! দাসী শুভ সংবাদ দিয়াছে। দাসীর এখনও কোন পুরস্কারের আদেশ হয় নাই।"

বাদশাহ হাসিয়া কহিলেন, "বিবি! তোমার আকাঙ্ক্ষা অপরিমিত।"

লু। জাহাঁপনা! দাসীর কি দোষ?

বাদ। দিল্লীর বাদশাহকে তোমার গোলাম করিয়া দিয়াছি; আরও পুরস্কার চাহিতেছ?

লুৎফ-উন্নিসা হাসিয়া কহিলেন, "স্ত্রীলোকের অনেক সাধ।"

বাদ। আবার কি সাধ হইয়াছে?

লু। আগে রাজাজ্ঞা হউক যে, দাসীর আবেদন গ্রাহ্য হইবে।

বাদ। যদি রাজকার্য্যের বিঘ্ন না হয়।

লু। (হাসিয়া) একের জন্য দিল্লীশ্বরের কার্য্যের বিঘ্ন হয় না।

বাদ। তবে স্বীকৃত হইলাম:—সাধটি কি শুনি।

লু। সাধ হইয়াছে একটি বিবাহ করিব।

জাহাঁগীর উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "এ নূতনতর সাধ বটে। কোথাও সম্বন্ধের স্থিরতা হইয়াছে?"

লু। তা হইয়াছে। কেবল রাজাজ্ঞার অপেক্ষা। রাজার সম্মতি প্রকাশ না হইলে কোন সম্বন্ধ স্থির নহে।

বাদ। আমার সম্মতির প্রয়োজন কি? কাহাকে এ সুখের সাগরে ভাসাইবে অভিপ্রায় করিয়াছ?

লু। দাসী দিল্লীশ্বরের সেবা করিয়াছে বলিয়া দ্বিচারিণী নহে। দাসী আপন স্বামীকেই বিবাহ করিবার অনুমতি চাহিতেছে।

বাদ। বটে! এ পুরাতন নফরের দশা কি করিবে?

লু। দিল্লীশ্বরী মেহের-উন্নিসাকে দিয়া যাইব।

বাদ। দিল্লীশ্বরী মেহের-উন্নিসা কে?

লু। যিনি হইবেন।

জাহাঁগীর মনে ভাবিলেন যে, মেহের-উন্নিসা যে দিল্লীশ্বরী হইবেন, তাহা লুৎফ-উন্নিসা ধ্রুব জানিয়েছেন। তৎকারণে নিজ মনোভিলাষ বিফল হইল বলিয়া রাজাবরোধ হইতে বিরাগে অবসর হইতে চাহিতেছেন।

এইরূপ বুঝিয়া জাহাঁগীর দুঃখিত হইয়া নীরবে রহিলেন। লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "মহারাজের কি এ সম্বন্ধে সম্মতি নাই?"

বাদ। আমার অসম্মতি নাই। কিন্তু স্বামীর সহিত আবার বিবাহের আবশ্যকতা কি?

লু। কপালক্রমে প্রথম বিবাহে স্বামী পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। এক্ষণে জাহাঁপনার দাসীকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

বাদশাহ রহস্যে হাস্য করিয়া পরে গম্ভীর হইলেন। কহিলেন, "প্রেয়সি! তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। তোমার যদি সেই প্রবৃত্তি হয়, তবে তদ্রূপই কর। কিন্তু আমাকে কেন ত্যাগ করিয়া যাইবে? এক আকাশে কি চন্দ্র সূর্য্য উভয়েই বিরাজ করেন না? এক বৃন্তে কি দুটি ফুল ফুটে না!"

লুৎফ-উন্নিসা বিস্ফারিতচক্ষে বাদশাহের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "ক্ষুদ্র ফুল ফুটিয়া থাকে, কিন্তু এক মৃণালে দুইটি কমল ফুটে না। আপনার রত্নসিংহাসনতলে কেন কণ্টক হইয়া থাকিব?"

লুৎফ-উন্নিসা আত্মমন্দিরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার এইরূপ মনোবাঞ্ছা যে কেন জন্মিল, তাহা তিনি জাহাঁগীরের নিকট ব্যক্ত করেন নাই। অনুভবে যেরূপ বুঝা যাইতে পারে, জাহাঁগীর সেইরূপ বুঝিয়া ক্ষান্ত হইলেন। নিগূঢ় তত্ত্ব কিছুই জানিলেন না। লুৎফ-উন্নিসার হৃদয় পাষাণ। সেলিমের রমণীহৃদয়জিৎ রাজকান্তিও কখন তাঁহার মনঃ মুগ্ধ করে নাই। কিন্তু এইবার পাষাণমধ্যে কীট প্রবেশ করিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আত্মমন্দিরে

"জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়নু না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ান না গেল॥
যত যত রসিক জন রসে অনুগমন অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল এক॥"

বিদ্যাপতি

লুৎফ-উন্নিসা আলয়ে আসিয়া প্রফুল্লবদনে পেষমনকে ডাকিয়া বেশভূষা পরিত্যাগ করিলেন। সুবর্ণ মুক্তাদি-খচিত বসন পরিত্যাগ করিয়া পেষমনকে কহিলেন যে, "এই পোষাকটি তুমি লও।"

শুনিয়া পেষমন্ কিছু বিস্ময়াপন্ন হইলেন। পোষাকটি বহুমূল্যে সম্প্রতিমাত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। কহিলেন, "পোষাক আমায় কেন? আজিকার কি সংবাদ?"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "শুভ সংবাদ বটে।"

পে। তা ত বুঝিতে পারিতেছি। মেহের-উন্নিসার ভয় কি ঘুচিয়াছে?

লু। ঘুচিয়াছে। এক্ষণে সে বিষয়ের কোন চিন্তা নাই।

পেষমন্ অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "তবে এক্ষণে বেগমের দাসী হইলাম।"

লু। যদি তুমি বেগমের দাসী হইতে চাও, তবে আমি মেহের-উন্নিসাকে বলিয়া দিব।

পে। সে কি? আপনি কহিতেছেন যে, মেহের-উন্নিসার বাদশাহের বেগম হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

লু। আমি এমত কথা বলি নাই। আমি বলিয়াছি, সে বিষয়ে আমার কোন চিন্তা নাই।

পে। চিন্তা নাই কেন? আপনি আগ্রায় একমাত্র অধীশ্বরী না হইলে যে, সকলই বৃথা হইল।

লু। আগ্রার সহিত সম্পর্ক রাখিব না।

পে। সে কি? আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আজিকার শুভ সংবাদটা তবে কি, বুঝাইয়া বলুন।

লু। শুভ সংবাদ এই যে, আমি এ জীবনের মত আগ্রা ত্যাগ করিয়া চলিলাম।

পে। কোথায় যাইবেন?

লু। বাঙ্গালায় গিয়া বাস করিব। পারি যদি, কোন ভদ্রলোকের গৃহিণী হইব।

পে। এরূপ ব্যঙ্গ নূতন বটে, কিন্তু শুনিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

লু। ব্যঙ্গ করিতেছি না। আমি সত্য সত্যই আগ্রা ত্যাগ করিয়া চলিলাম। বাদশাহের নিকট বিদায় লইয়া আসিয়াছি।

পে। এমন কুপ্রবৃত্তি আপনার জন্মিল?

লু। কুপ্রবৃত্তি নহে। অনেক দিন আগ্রায় বেড়াইলাম, কি ফললাভ হইল? সুখের তৃষা বাল্যাবধি বড়ই প্রবল ছিল। সেই তৃষার পরিতৃপ্তির জন্য বঙ্গদেশ ছাড়িয়া এ পর্য্যন্ত আসিলাম। এ রত্ন কিনিবার জন্য কি ধন না দিলাম? কোন্ দুষ্কর্ম্ম না করিয়াছি? আর যে যে উদ্দেশ্যে এতদূর করিলাম, তাহার কোন্‌টাই বা হস্তগত হয় নাই? ঐশ্বর্য্য, সম্পদ্, ধন, গৌরব, প্রতিষ্ঠা সকলই ত প্রচুরপরিমাণে ভোগ করিলাম। এত করিয়াও কি হইল? আজি এইখানে বসিয়া সকল দিন মনে মনে গণিয়া বলিতে পারি যে, এক দিনের তরেও সুখী হই নাই. এক মুহূর্ত্ত-(জন্যও কখনও সুখভোগ করি নাই। কখন পরিতৃপ্ত হই নাই। কেবল তৃষা বাড়ে মাত্র। চেষ্টা করিলে আরও সম্পদ্, আরও ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারি, কিন্তু কি জন্য? এ সকলে যদি সুখ থাকিত, তবে এত দিন এক দিনের তরেও সুখী হইতাম। এই সুখাকাঙ্ক্ষা পার্ব্বতী নির্ঝরিণীর ন্যায়,—প্রথমে নির্ম্মল, ক্ষীণ ধারা বিজন প্রদেশ হইতে বাহির হয়, আপন গর্ভে আপনি লুকাইয়া রহে, কেহ জানে না; আপনা আপনি কল কল করে, কেহ শুনে না। ক্রমে যত যায়, তত দেহ বাড়ে, তত পঙ্কিল হয়। শুধু তাহাই নয়; কখনও আবার বায়ু বহে, তরঙ্গ হয়, মকর কুম্ভীরাদি বাস করে। আরও শরীর বাড়ে জল আরও কর্দ্দমময় হয়, লবণময় হয়, অগণ্য সৈকত চর—মরুভূমি নদীহৃদয়ে বিরাজ করে, বেগ মন্দীভূত হইয়া যায়, তখন সেই সকর্দ্দম নদীশরীর অনন্ত সাগরে কোথায় লুকায়, কে বলিবে?

পে। আমি ইহার ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এ সবে তোমার সুখ হয় না কেন?

লু। কেন হয় না, তা এত দিনে বুঝিয়াছি। তিন বৎসর রাজপ্রাসাদের ছায়ায় বসিয়া যে সুখ না হইয়াছে, উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমনের পথে এক রাত্রে সে সুখ হইয়াছে। ইহাতেই বুঝিয়াছি।

পে। কি বুঝিয়াছ?

লু। আমি এত কাল হিন্দুদিগের দেবমূর্ত্তির মত ছিলাম। বাহিরে সুবর্ণ রত্নাদিতে খচিত; ভিতরে পাষাণ। ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণে আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াছি, কখনও আগুন স্পর্শ করি নাই। এখন একবার দেখি, যদি পাষাণমধ্যে খুঁজিয়া একটা রক্তশিরাবিশিষ্ট অন্তঃকরণ পাই।

পে। এও ত কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

লু। আমি এই আগ্রায় কখনও কাহাকে ভালবাসিয়াছি?

পে। (চুপি চুপি) কাহাকেও না।

লু। তবে পাষাণী নই ত কি?

পে। তা এখন যদি ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, তবে ভালবাস না কেন?

লু। মানস ত বটে। সেই জন্য আগ্রা ত্যাগ করিয়া যাইতেছি।

পে। তারই বা প্রয়োজন কি? আগ্রায় কি মানুষ নাই যে, চুয়াড়ের দেশে যাইবে? এখন যিনি তোমাকে ভালবাসেন, তাঁহাকেই কেন ভালবাস না? রূপে বল, ধনে বল, ঐশ্বর্য্যে বল, যাহাতে বল, দিল্লীর বাদশাহের বড় পৃথিবীতে কে আছে?

লু। আকাশে চন্দ্রসূর্য্য থাকিতে জল অধোগামী কেন?

পে। কেন?

লু। ললাটলিখন।

লুৎফ-উন্নিসা সকল কথা খুলিয়া বলিলেন না। পাষাণমধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল। পাষাণ দ্রব হইতেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : চরণতলে

"কায় মনঃ প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে।
ভুঞ্জ আসি রাজভোগ দাসীর আলয়ে॥"
বীরাঙ্গনা কাব্য

ক্ষেত্রে বীজ রোপিত হইলে আপনিই অঙ্কুর হয়। যখন অঙ্কুর হয়, তখন কেহ জানিতে পারে না—কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু একবার বীজ রোপিত হইলে, রোপণকারী যথায় থাকুন না কেন, ক্রমে অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ মস্তক উন্নত করিতে থাকে। অদ্য বৃক্ষটি অঙ্গুলি-পরিমেয় মাত্র, কেহ দেখিয়াও দেখিতে পায় না। ক্রমে তিল তিল বৃদ্ধি। ক্রমে বৃক্ষটি অর্দ্ধ হস্ত, এক হস্ত, দুই হস্তপরিমিত হইল; তথাপি, যদি তাহাতে কাহারও স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা না রহিল, তবে কেহ দেখে না, দেখিয়াও দেখে না। দিন যায়, মাস যায়, বৎসর যায়, ক্রমে তাহার উপর চক্ষু পড়ে। আর অমনোযোগের কথা নাই,—ক্রমে বৃক্ষ বড় হয়, তাহার ছায়ায় অন্য বৃক্ষ নষ্ট করে,—চাহি কি, ক্ষেত্র অনন্যপাদপ হয়।

লুৎফ-উন্নিসার প্রণয় এইরূপ বাড়িয়াছিল। প্রথম একদিন অকস্মাৎ প্রণয়ভাজনের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন প্রণয়সঞ্চার বিশেষ জানিতে পারিলেন না। কিন্তু তখনই অঙ্কুর হইয়া রহিল। তাহার পর আর সাক্ষাৎ হইল না। কিন্তু অসাক্ষাতে পুনঃ পুনঃ সেই মুখমণ্ডল মনে পড়িতে লাগিল, স্মৃতিপটে সে মুখমণ্ডল চিত্রিত করা কতক কতক সুখকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বীজে অঙ্কুর জন্মিল। মূর্ত্তিপ্রতি অনুরাগ জন্মিল। চিত্তের ধর্ম্ম এই, যে মানসিক কর্ম্ম যত অধিক বার করা যায়, সে কর্ম্মে তত অধিক প্রবৃত্তি হয়; সে কর্ম্ম ক্রমে স্বভাবসিদ্ধ হয়। লুৎফ-উন্নিসা সেই মূর্ত্তি অহরহঃ মনে ভাবিতে লাগিলেন। দারুণ দর্শনাভিলাষ জন্মিল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহজস্পৃহাপ্রবাহও দুর্নিবার্য্য হইয়া উঠিল। দিল্লীর সিংহাসনলালসাও তাঁহার নিকট লঘু হইল। সিংহাসন যেন মন্মথশরসম্ভূত অগ্নিরাশিবেষ্টিত বোধ হইতে লাগিল। রাজ্য রাজধানী, রাজসিংহাসন, সকল বিসর্জ্জন দিয়া প্রিয়জন-সন্দর্শনে ধাবিত হইলেন, সে প্রিয়জন নবকুমার।

এই জন্যই লুৎফ-উন্নিসা মেহের-উন্নিসার আশানাশিনী কথা শুনিয়াও অসুখী হয়েন নাই; এই জন্যই আগ্রায় আসিয়া সম্পদ্‌রক্ষায় কোন যত্ন পাইলেন না; এই জন্যই জন্মের মত বাদশাহের নিকট বিদায় লইলেন।

লুৎফ-উন্নিসা সপ্তগ্রামে আসিলেন। রাজপথের অনতিদূরে নগরীর মধ্যে এক অট্টালিকায় আপন বাসস্থান করিলেন। রাজপথের পথিকেরা দেখিলেন, অকস্মাৎ এই অট্টালিকা সুবর্ণ-খচিতবসনভূষিত দাসদাসীতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ঘরে ঘরে হর্ম্ম্যসজ্জা অতি মনোহর। গন্ধদ্রব্য, গন্ধবারি, কুসুমদাম সর্ব্বত্র আমোদ করিতেছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, গজদন্তাদিখচিত গৃহশোভার্থ নানা দ্রব্য সকল স্থানেই আলো করিতেছে। এইরূপ সজ্জীভূত এক কক্ষে লুৎফ-উন্নিসা অধোবদনে বসিয়া আছেন; পৃথগাসনে নবকুমার বসিয়া আছেন। সপ্তগ্রামে নবকুমারের সহিত লুৎফ-উন্নিসার আর দুই একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তাহাতে লুৎফ-উন্নিসার মনোরথ কত দূর সিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা অদ্যকার কথায় প্রকাশ হইবে।

নবকুমার কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিলেন, "তবে আমি এক্ষণে চলিলাম। তুমি আর আমাকে ডাকিও না।"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "যাইও না। আর একটু থাক। আমার যাহা বক্তব্য, তাহা সমাপ্ত করি নাই।"

নবকুমার আরও ক্ষণেক প্রতীক্ষা করিলেন, কিন্তু লুৎফ-উন্নিসা কিছু বলিলেন না। ক্ষণেক পরে নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কি বলিবে?" লুৎফ-উন্নিসা কোন উত্তর করিলেন না—তিনি নীরবে রোদন করিতেছিলেন।

নবকুমার ইহা দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন; লুৎফ-উন্নিসা তাঁহার বস্ত্রাগ্র ধৃত করিলেন। নবকুমার ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কি, বল না?"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "তুমি কি চাও? পৃথিবীতে কিছু কি প্রার্থনীয় নাই? ধন, সম্পদ্, মান, প্রণয়, রঙ্গ, রহস্য পৃথিবীতে যাহাকে যাহাকে সুখ বলে, সকলই দিব; কিছুই তাহার প্রতিদান চাহি না; কেবল তোমার দাসী হইতে চাহি। তোমার যে পত্নী হইব, এ গৌরব চাহি না, কেবল দাসী!"

নবকুমার কহিলেন, "আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ইহজন্মে দরিদ্র ব্রাহ্মণই থাকিব। তোমার দত্ত ধনসম্পদ্ লইয়া যবনীজার হইতে পারিব না।"

যবনীজার! নবকুমার এ পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই যে, এই রমণী তাঁহার পত্নী। লুৎফ-উন্নিসা অধোবদনে রহিলেন। নবকুমার তাঁহার হস্ত হইতে বস্ত্রাগ্রভাগ মুক্ত করিলেন। লুৎফ-উন্নিসা আবার তাঁহার বস্ত্রাগ্র ধরিয়া কহিলেন,

"ভাল, সে যাউক। বিধাতার যদি সেই ইচ্ছা, তবে চিত্তবৃত্তিসকল অতল জলে ডুবাইব। আর কিছু চাহি না, এক একবার তুমি এই পথে যাইও; দাসী ভাবিয়া এক একবার দেখা দিও, কেবল চক্ষুঃপরিতৃপ্তি করিব।"

নব। তুমি যবনী—পরস্ত্রী—তোমার সহিত এরূপ আলাপেও দোষ। তোমার সহিত আর আমার সাক্ষাৎ হইবে না।

ক্ষণেক নীরব। লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ে ঝটিকা বহিতেছিল। প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিবৎ নিস্পন্দ রহিলেন। নবকুমারের বস্ত্রাগ্রভাগ ত্যাগ করিলেন। কহিলেন, "যাও।"

নবকুমার চলিলেন। দুই চারি পদ চলিয়াছেন মাত্র, সহসা লুৎফ-উন্নিসা বাতোন্মূলিত পাদপের ন্যায় তাঁহার পদতলে পড়িলেন। বাহুলতায় চরণযুগল বদ্ধ করিয়া কাতরস্বরে কহিলেন,

"নির্দ্দয়! আমি তোমার জন্য আগ্রার সিংহাসন্ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তুমি আমায় ত্যাগ করিও না।"

নবকুমার কহিলেন, "তুমি আবার আগ্রাতে ফিরিয়া যাও, আমার আশা ত্যাগ কর।"

"এ জন্মে নহে।" লুৎফ-উন্নিসা তীরবৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া সদর্পে কহিলেন, "এ জন্মে তোমার আশা ছাড়িব না।" মস্তক উন্নত করিয়া, ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গি করিয়া, নবকুমারের মুখপ্রতি অনিমিষ আয়ত চক্ষু স্থাপিত করিয়া, রাজরাজমোহিনী দাঁড়াইলেন। যে অনবনমনীয় গর্ব্ব হৃদয়াগ্নিতে গলিয়া গিয়াছিল, আবার তাহার জ্যোতিঃ স্ফুরিল; যে অজেয় মানসিক শক্তি ভারতরাজ্য-শাসনকল্পনায় ভীত হয় নাই, সেই শক্তি আবার প্রণয়দুর্ব্বল দেহে সঞ্চারিত হইল। ললাটদেশে ধমনী সকল স্ফীত হইয়া রমণীয় রেখা দেখা দিল; জ্যোতির্ম্ময় চক্ষুঃ রবিকর-মুখরিত সমুদ্রবারিবৎ ঝলসিতে লাগিল; নাসারন্ধ্র কাঁপিতে লাগিল। স্রোতোবিহারিণী রাজহংসী যেমন গতিবিরোধীর প্রতি গ্রীবাভঙ্গি করিয়া দাঁড়ায়, দলিতফণা ফণিনী যেমন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনি উন্মাদিনী যবনী মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "এ জন্মে না। তুমি আমারই হইবে।"

সেই কুপিতফণিনীমূর্ত্তি প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে নবকুমার ভীত হইলেন। লুৎফ-উন্নিসার অনির্ব্বচনীয় দেহমহিমা এখন যেরূপ দেখিতে পাইলেন, সেরূপ আর কখনও দেখেন নাই। কিন্তু সে শ্রী বজ্রসূচক বিদ্যুতের ন্যায় মনোমোহিনী; দেখিয়া ভয় হইল। নবকুমার চলিয়া যান, তখন সহসা তাঁহার আর এক তেজোময়ী মূর্ত্তি মনে পড়িল। এক দিন নবকুমার তাঁহার প্রথমা পত্নী পদ্মাবতীর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে শয়নাগার হইতে বহিষ্কৃতা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা তখন সদর্পে তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল: এমনই তাহার চক্ষুঃ প্রদীপ্ত হইয়াছিল; এমনই ললাটে রেখাবিকাশ হইয়াছিল; এমনই নাসারন্ধ্র কাঁপিয়াছিল; এমনই মস্তক হেলিয়াছিল। বহুকাল সে মূর্ত্তি মনে পড়ে নাই, এখন মনে পড়িল। অমনই সাদৃশ্য অনুভূত হইল। সংশয়াধীন হইয়া নবকুমার সঙ্কুচিত স্বরে, ধীরে, ধীরে কহিলেন, "তুমি কে?"

যবনীর নয়নতারা আরও বিস্ফারিত হইল। কহিলেন, "আমি পদ্মাবতী।"

উত্তর প্রতীক্ষা না করিয়া লুৎফ-উন্নিসা স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। নবকুমারও অন্যমনে কিছু শঙ্কান্বিত হইয়া, আপন আলয়ে গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : উপনগরপ্রান্তে

————————I am settled, and bend up
Each corporal agent to this terrible feat."
Macbeth.

কক্ষান্তরে গিয়া লুৎফ-উন্নিসা দ্বার রুদ্ধ করিলেন। দুই দিন পর্য্যন্ত সেই কক্ষ হইতে নির্গত হইলেন না। এই দুই দিনে তিনি নিজ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিলেন। স্থির করিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। সূর্য্য অস্তাচলগামী। তখন লুৎফ-উন্নিসা পেষমনের সাহায্যে বেশভূষা করিতেছিলেন। আশ্চর্য্য বেশভূষা! রমণীবেশের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। যে বেশভূষা করিলেন, তাহা মুকুরে দেখিয়া পেষমন্‌কে কহিলেন, "কেমন, পেষমন্, আর আমাকে চেনা যায়?"

পেষমন্ কহিলেন, "কার সাধ্য?"

লু। তবে আমি চলিলাম। আমার সঙ্গে যেন কোন দাস দাসী না যায়।

পেষমন্ কিছু সংকুচিতচিত্তে কহিল, "যদি দাসীর অপরাধ ক্ষমা করেন, তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।" লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "কি?" পেষমন্ কহিল, "আপনার উদ্দেশ্য কি?"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "আপাততঃ কপালকুণ্ডলার সহিত স্বামীর চিরবিচ্ছেদ। পরে তিনি আমার হইবেন।"

পে। বিবি! ভাল করিয়া বিবেচনা করুন: সে নিবিড় বন, রাত্রি আগত: আপনি একাকিনী।

লুৎফ-উন্নিসা এ কথার কোন উত্তর না করিয়া গৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন। সপ্তগ্রামের যে জনহীন বনময় উপনগরপ্রান্তে নবকুমারের বসতি, সেই দিকে চলিলেন। তৎপ্রদেশে উপনীত হইতে রাত্রি হইয়া আসিল। নবকুমারের বাটীর অনতিদূরে এক নিবিড় বন আছে, পাঠক মহাশয়ের স্মরণ হইতে পারে। তাহারই প্রান্তভাগে উপনীত হইয়া, এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। কিছু কাল বসিয়া যে দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে তাঁহার অননুভূতপূর্ব্ব সহায় উপস্থিত হইল।

লুৎফ-উন্নিসা যথায় বসিয়াছিলেন, তথা হইতে এক অনবরত সমানোচ্চারিত মনুষ্যকণ্ঠ-নির্গত শব্দ শুনিতে পাইলেন। উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারি দিক্ চাহিয়া দেখিলেন যে, বনমধ্যে একটি আলো দেখা যাইতেছে। লুৎফ-উন্নিসা সাহসে পুরুষের অধিক: যথায় আলো জ্বলিতেছে, সেই স্থানে গেলেন। প্রথমে বৃক্ষান্তরাল হইতে দেখিলেন, ব্যাপার কি? দেখিলেন যে, যে আলো জ্বলিতেছিল, সে হোমের আলো: যে শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন, সে মন্ত্রপাঠের শব্দ। মন্ত্রমধ্যে একটি শব্দ বুঝিতে পারিলেন, সে একটি নাম। নাম শুনিবামাত্র লুৎফ-উন্নিসা হোমকারীর নিকট গিয়া বসিলেন।

এক্ষণে তিনি তথায় বসিয়া থাকুন; পাঠক মহাশয় বহুকাল কপালকুণ্ডলার কোন সংবাদ পান নাই, সুতরাং কপালকুণ্ডলার সংবাদ আবশ্যক হইয়াছে।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ : শয়নাগারে

"রাধিকার বেড়ী ভাঙ্গ, এ মম মিনতি।"
ব্রজাঙ্গনা কাব্য

লুৎফ-উন্নিসার আগ্রা গমন করিতে এবং তথা হইতে সপ্তগ্রাম আসিতে প্রায় এক বৎসর গত হইয়াছিল। কপালকুণ্ডলা এক বৎসরের অধিক কাল নবকুমারের গৃহিণী। যেদিন প্রদোষকালে লুৎফ-উন্নিসা কাননে, সেদিন কপালকুণ্ডলা অনমনে শয়নকক্ষে বসিয়া আছেন। পাঠক মহাশয় সমুদ্রতীরে আলুলায়িতকুন্তলা ভূষণহীনা যে কপালকুণ্ডলা দেখিয়াছেন, এ সে কপালকুণ্ডলা নহে। শ্যামাসুন্দরীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছে; স্পর্শমণির স্পর্শে যোগিনী গৃহিণী হইয়াছেন, এই ক্ষণে সেই অসংখ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল ভুজঙ্গের বাহুতুল্য, আগুল্‌ফলম্বিত কেশরাশি পশ্চাদ্ভাগে স্থূলবেণীসম্বদ্ধ হইয়াছে। বেণীরচনায়ও শিল্পপারিপাট্য লক্ষিত হইতেছে, কেশবিন্যাসে অনেক সূক্ষ্ম কারুকার্য্য শ্যামাসুন্দরীর বিন্যাস-কৌশলের পরিচয় দিতেছে। কুসুমদামও পরিত্যক্ত হয় নাই, চতুষ্পার্শে কিরীটমণ্ডলস্বরূপ বেণী বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কেশের যে ভাগ বেণীমধ্যে ন্যস্ত হয় নাই, তাহা যে মাথার উপরে সর্ব্বত্র সমানোচ্চ হইয়া রহিয়াছে, এমত নহে। আকুঞ্চন প্রযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণতরঙ্গরেখায় শোভিত হইয়া রহিয়াছে। মুখমণ্ডল এখন আর কেশভারে অর্দ্ধলুক্কায়িত নহে; জ্যোতির্ম্ময় হইয়া শোভা পাইতেছে, কেবলমাত্র স্থানে স্থানে বন্ধনবিস্রংসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলকাগুচ্ছ তদুপরি স্বেদবিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। বর্ণ সেই অর্দ্ধপূর্ণশশাঙ্করশ্মিরুচির। এখন দুই কর্ণে হেমকর্ণভূষা দুলিতেছে; কণ্ঠে হিরণ্ময় কণ্ঠমালা দুলিতেছে। বর্ণের নিকট সে সকল ম্লান হয় নাই, অর্দ্ধচন্দ্রকৌমুদীবসনা ধরণীর অঙ্কে নৈশ কুসুমবৎ শোভা পাইতেছে। তাঁহার পরিধানে শুক্লাম্বর; সে শুক্লাম্বর অর্দ্ধচন্দ্রদীপ্ত আকাশমণ্ডলে অনিবিড় শুক্ল মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

বর্ণ সেইরূপ চন্দ্রার্দ্ধকৌমুদীময় বটে, কিন্তু যেন পূর্ব্বাপেক্ষা ঈষৎ সমল, যেন আকাশপ্রান্তে কোথা কাল মেঘ দেখা দিয়াছে। কপালকুণ্ডলা একাকিনী বসিয়া ছিলেন না; সখী শ্যামাসুন্দরী নিকটে বসিয়া ছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের পরস্পরের কথোপকথন হইতেছিল। তাহার কিয়দংশ পাঠক মহাশয়কে শুনিতে হইবে।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "ঠাকুরজামাই আর কত দিন এখানে থাকিবেন?"

শ্যামা কহিলেন, "কালি বিকালে চলিয়া যাইবে। আহা! আজ রাত্রে যদি ঔষধটি তুলিয়া রাখিতাম, তবু তারে বশ করিয়া মনুষ্যজন্ম সার্থক করিতে পারিতাম। কালি রাত্রে বাহির হইয়াছিলাম বলিয়া নাথি ঝাঁটা খাইলাম, আর আজি বাহির হইব কি প্রকারে?"

ক। দিনে তুলিলে কেন হয় না?

শ্যা। দিনে তুলিলে ফল্‌বে কেন? ঠিক্ দুই প্রহর রাত্রে এলোচুলে তুলিতে হয়। তা ভাই, মনের সাধ মনেই রহিল।

ক। আচ্ছা, আমি ত আজ দিনে সে গাছ চিনে এসেছি, আর যে বনে হয়, তাও দেখে এসেছি। তোমাকে আজি আর যেতে হবে না, আমি একা গিয়া ঔষধ তুলিয়া আনিব।

শ্যা। এক দিন যা হইয়াছে তা হইয়াছে। রাত্রে তুমি আর বাহির হইও না।

ক। সে জন্য তুমি কেন চিন্তা কর? শুনেছ ত, রাত্রে বেড়ান আমার ছেলেবেলা হইতে অভ্যাস। মনে ভেবে দেখ, যদি আমার সে অভ্যাস না থাকিত, তবে তোমার সঙ্গে আমার কখনও চাক্ষুষ হইত না।

শ্যা। সে ভয়ে বলি না। কিন্তু একা রাত্রে বনে বনে বেড়ান কি গৃহস্থের বউ-ঝির ভাল? দুই জনে গিয়াও এত তিরস্কার খাইলাম, তুমি একাকিনী গেলে কি রক্ষা থাকিবে?

ক। ক্ষতিই কি? তুমিও কি মনে করিয়াছ যে, আমি রাত্রে ঘরের বাহির হইলেই কুচরিত্রা হইব?

শ্যা। আমি তা মনে করি না। কিন্তু মন্দলোকে মন্দ বল্‌বে।

ক। বল্‌ক, আমি তাতে মন্দ হব না।

শ্যা। তা ত হবে না—কিন্তু তোমাকে কেহ কিছু মন্দ বলিলে আমাদিগের অন্তঃকরণে ক্লেশ হবে।

ক। এমন অন্যায় ক্লেশ হইতে দিও না।

শ্যা। তাও আমি পারিব। কিন্তু দাদাকে কেন অসুখী করিবে?

কপালকুণ্ডলা শ্যামাসুন্দরীর প্রতি নিজ স্নিগ্ধোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। কহিলেন, ইহাতে তিনি অসুখী হয়েন, আমি কি করিব? যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।"

ইহার পর আর কথা শ্যামাসুন্দরী ভাল বুঝিলেন না। আত্মকর্ম্মে উঠিয়া গেলেন।

কপালকুণ্ডলা প্রয়োজনীয় গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া ওষধির অনুসন্ধানে গৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন। তখন রাত্রি প্রহরাতীত হইয়াছিল। নিশা সজ্যোৎস্না। নবকুমার বহিঃপ্রকোষ্ঠে বসিয়া ছিলেন, কপালকুণ্ডলা যে বাহির হইয়া যাইতেছেন, তাহা গবাক্ষপথে দেখিতে পাইলেন। তিনিও গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া মৃন্ময়ীর হাত ধরিলেন। কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "কি?"

নবকুমার কহিলেন, "কোথা যাইতেছ?" নবকুমারের স্বরে তিরস্কারের সূচনামাত্র ছিল না।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "শ্যামাসুন্দরী স্বামীকে বশ করিবার জন্য ঔষধ চাহে, আমি ঔষধের সন্ধানে যাইতেছি।"

নবকুমার পূর্ব্ববৎ কোমল স্বরে কহিলেন "ভাল, কালি ত একবার গিয়াছিলে? আজি আবার কেন?"

ক। কালি খুঁজিয়া পাই নাই; আজি আবার খুঁজিব।

নবকুমার অতি মৃদুভাবে কহিলেন, "ভাল, দিনে খুঁজিলেও ত হয়?" নবকুমারের স্বর স্নেহপরিপূর্ণ।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "দিবসে ও ঔষধ ফলে না।"

নব। কাজই কি তোমার ঔষধ তল্লাসে? আমাকে গাছের নাম বলিয়া দাও। আমি ওষধি তুলিয়া আনিয়া দিব।

ক। আমি গাছ দেখিলে চিনিতে পারি, কিন্তু নাম জানি না। আর তুমি তুলিলে ফলিবে না। স্ত্রীলোকে এলোচুলে তুলিতে হয়। তুমি পরের উপকারে বিঘ্ন করিও না।

কপালকুণ্ডলা এই কথা অপ্রসন্নতার সহিত বলিলেন। নবকুমার আর আপত্তি করিলেন না। বলিলেন, "চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

কপালকুণ্ডলা গর্ব্বিতবচনে কহিলেন, "আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কি না, স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।"

নবকুমার আর কিছু বলিতে পারিলেন না। নিশ্বাসসহকারে কপালকুণ্ডলার হাত ছাড়িয়া দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কপালকুণ্ডলা একাকিনী বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : কাননতলে

"—Tender is the night,
And haply the Queen moon is on her throne,
Clustered around by all her starry fays;
But here there is no Light."

Keats.

সপ্তগ্রামের এই ভাগ যে বনময়, তাহা পূর্ব্বেই কতক কতক উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রামের কিছু দূরে নিবিড় বন। কপালকুণ্ডলা একাকিনী এক সঙ্কীর্ণ বন্য পথে ওষধির সন্ধানে চলিলেন। যামিনী মধুরা, একান্ত শব্দমাত্রবিহীনা। মাধবী যামিনীর আকাশে স্নিগ্ধরশ্মিময়

চন্দ্র নীরবে শ্বেত মেঘখণ্ড-সকল উত্তীর্ণ হইতেছে; পৃথিবীতলে বন্য বৃক্ষ, লতা-সকল তদ্রূপ নীরবে শীতল চন্দ্রকরে বিশ্রাম করিতেছে, নীরবে বৃক্ষপত্র-সকল সে কিরণের প্রতিঘাত করিতেছে। নীরবে লতাগুল্মমধ্যে শ্বেত কুসুমদল বিকশিত হইয়া রহিয়াছে। পশু পক্ষী নীরব। কেবল কদাচিৎ মাত্র ভগ্নবিশ্রাম কোন পক্ষীর পক্ষস্পন্দনশব্দ; কোথাও ক্বচিৎ শুষ্ক-পত্রপাতশব্দ; কোথাও তলস্থ শুষ্কপত্রমধ্যে উরগজাতীয় জীবের ক্বচিৎ গতিজনিত শব্দ; ক্বচিৎ অতি দূরস্থ কুক্কুররব। এমত নহে যে, একেবারে বায়ু বহিতেছিল না; মধুমাসের দেহস্নিগ্ধকর বায়ু অতি মন্দ; একান্ত নিঃশব্দ বায়ু মাত্র; তাহাতে কেবলমাত্র বৃক্ষের সর্ব্বাগ্রভাগারূঢ় পত্রগুলি হেলিতেছিল; কেবলমাত্র আভূমিপ্রণত শ্যামা লতা দুলিতেছিল; কেবলমাত্র নীলাম্বরসঞ্চারী ক্ষুদ্র শ্বেতাম্বুদখণ্ডগুলি ধীরে ধীরে চলিতেছিল। কেবলমাত্র তদ্রূপ বায়ুসংসর্গে সম্ভুক্ত পূর্ব্বসুখের অস্পষ্ট স্মৃতি হৃদয়ে অল্প জাগরিত হইতেছিল।

কপালকুণ্ডলার সেইরূপ পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইতেছিল; বালিয়াড়ির শিখরে যে সাগর-বারিবিন্দুসংস্পৃষ্ট মলয়ানিল তাঁহার লম্বালকমণ্ডলমধ্যে ক্রীড়া করিত, তাহা মনে পড়িল; অমল নীলানন্ত গগনপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন; সেই অমল নীলানন্ত গগনরূপী সমুদ্র মনে পড়িল। কপালকুণ্ডলা পূর্ব্বস্মৃতি সমালোচনায় অন্যমনা হইয়া চলিলেন।

অন্যমনে যাইতে যাইতে কোথায় কি উদ্দেশ্যে যাইতেছিলেন, কপালকুণ্ডলা তাহা ভাবিলেন না। যে পথে যাইতেছিলেন, তাহা ক্রমে অগম্য হইয়া আসিল; বন নিবিড়তর হইল; মাথার উপর বৃক্ষশাখাবিন্যাসে চন্দ্রালোক প্রায় একেবারে রুদ্ধ হইয়া আসিল; ক্রমে আর পথ দেখা যায় না। পথের অলক্ষ্যতায় প্রথমে কপালকুণ্ডলা চিন্তামগ্নতা হইতে উত্থিত হইলেন। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, এই নিবিড় বনমধ্যে আলো জ্বলিতেছে। লুৎফ-উন্নিসাও পূর্ব্বে এই আলো দেখিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা পূর্ব্বাভ্যাসফলে এ সকল সময়ে ভয়হীনা, অথচ কৌতূহলময়ী। ধীরে ধীরে সেই দীপজ্যোতির অভিমুখে গেলেন। দেখিলেন, যথায় আলো জ্বলিতেছে, তথায় কেহ নাই। কিন্তু তাহার অনতিদূরে বননিবিড়তা হেতু দূর হইতে অদৃশ্য একটি ভগ্ন গৃহ আছে। গৃহটি ইষ্টকনির্ম্মিত, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র, অতি সামান্য, তাহাতে একটিমাত্র ঘর। সেই ঘর হইতে মনুষ্যকথোপকথনশব্দ নির্গত হইতেছিল। কপালকুণ্ডলা নিঃশব্দপদক্ষেপে গৃহসন্নিধানে গেলেন। গৃহের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র বোধ হইল, দুই জন মনুষ্য সাবধানে কথোপকথন করিতেছে। প্রথমে কথোপকথন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পরে ক্রমে চেষ্টাজনিত কর্ণের তীক্ষ্ণতা জন্মিলে নিম্নলিখিত মত কথা শুনিতে পাইলেন।

এক জন কহিতেছে, "আমার অভীষ্ট মৃত্যু, ইহাতে তোমার অভিমত না হয়, আমি তোমায় সাহায্য করিব না; তুমিও আমার সহায়তা করিও না।"

অপর ব্যক্তি কহিল, "আমিও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহি; কিন্তু যাবজ্জীবন জন্য ইহার নির্ব্বাসন হয়, তাহাতে আমি সম্মত আছি। কিন্তু হত্যার কোন উদ্যোগ আমা হইতে হইবে না; বরং তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিব।"

প্রথমালাপকারী কহিল, "তুমি অতি অবোধ, অজ্ঞান। তোমায় কিছু জ্ঞানদান করিতেছি। মনঃসংযোগ করিয়া শ্রবণ কর। অতি গূঢ় বৃত্তান্ত বলিব; চতুর্দ্দিক্ একবার দেখিয়া আইস, যেন মনুষ্যশ্বাস শুনিতে পাইতেছি।"

বাস্তবিক কপালকুণ্ডলা কথোপকথন উত্তমরূপে শুনিবার জন্য কক্ষপ্রাচীরের অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। এবং তাঁহার আগ্রহাতিশয় ও শঙ্কার কারণে ঘন ঘন গুরু শ্বাস বহিতেছিল।

সমভিব্যাহারীর কথায় গৃহমধ্যস্থ এক ব্যক্তি বাহিরে আসিলেন, এবং আসিয়াই কপাল-কুণ্ডলাকে দেখিতে পাইলেন। কপালকুণ্ডলাও পরিষ্কার চন্দ্রালোকে আগন্তুক পুরুষের অবয়ব সুস্পষ্ট দেখিলেন। দেখিয়া ভীতা হইবেন, কি প্রফুল্লিতা হইবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। দেখিলেন, আগন্তুক ব্রাহ্মণবেশী; সামান্য ধুতি পরা; গাত্র উত্তরীয়ে উত্তমরূপে আচ্ছাদিত। ব্রাহ্মণকুমার অতি কোমলবয়স্ক; মুখমণ্ডলে বয়শ্চিহ্ন কিছুমাত্র নাই। মুখখানি পরম সুন্দর, সুন্দরী রমণীমুখের ন্যায় সুন্দর, কিন্তু রমণীদুর্ল্লভ তেজোগর্ব্ববিশিষ্ট। তাঁহার কেশগুলি সচরাচর পুরুষদিগের কেশের ন্যায় ক্ষৌরকার্য্যাবশেষাত্মক মাত্র নহে স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় অচ্ছিন্নাবস্থায় উত্তরীয় প্রচ্ছন্ন করিয়া পৃষ্ঠদেশে, অংসে, বাহুদেশে, কদাচিৎ বক্ষে সংসর্পিত

হইয়া পড়িয়াছে। ললাট প্রশস্ত, ঈষৎ স্ফীত, মধ্যস্থলে একমাত্র শিরাপ্রকাশশোভিত। চক্ষু দুটি বিদ্যুদ্ভেজঃপরিপূর্ণ। কোষশূন্য এক দীর্ঘ তরবারি হস্তে ছিল। কিন্তু এ রূপরাশিমধ্যে এক ভীষণ ভাব ব্যক্ত হইতেছিল। হেমকান্ত বর্ণে যেন কোন করাল কামনার ছায়া পড়িয়াছিল। অন্তস্থল পর্য্যন্ত অন্বেষণক্ষম কটাক্ষ দেখিয়া কপালকুণ্ডলার ভীতিসঞ্চার হইল।

উভয়ে উভয়ের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। প্রথমে কপালকুণ্ডলা নয়নপল্লব নিক্ষিপ্ত করিলেন। কপালকুণ্ডলা নয়নপল্লব নিক্ষিপ্ত করাতে আগন্তুক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

যদি এক বৎসর পূর্ব্বে হিজলীর কিয়াবনে কপালকুণ্ডলার প্রতি এ প্রশ্ন হইত, তবে তিনি তৎক্ষণেই সঙ্গত উত্তর দিতেন। কিন্তু এখন কপালকুণ্ডলা কতক দূর গৃহরমণীর স্বভাবসম্পন্না হইয়াছিলেন, সুতরাং সহসা উত্তর করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণবেশী কপালকুণ্ডলাকে নিরুত্তর দেখিয়া গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন, "কপালকুণ্ডলা! তুমি রাত্রে এ নিবিড় বনমধ্যে কি জন্য আসিয়াছ?"

অজ্ঞাত রাত্রিচর পুরুষের মুখে আপন নাম শুনিয়া কপালকুণ্ডলা অবাক্ হইলেন, কিছু ভীতাও হইলেন। সুতরাং সহসা কোন উত্তর তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না।

ব্রাহ্মণবেশী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাদিগের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছ?"

সহসা কপালকুণ্ডলা বাক্‌শক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি উত্তর না দিয়া কহিলেন, "আমিও তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। এ কাননমধ্যে তোমরা দুই জনে এ নিশীথে কি কুপরামর্শ করিতেছিলে?"

ব্রাহ্মণবেশী কিছু কাল নিরুত্তরে চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন। যেন কোন নূতন ইষ্টসিদ্ধির উপায় তাঁহার চিত্তমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি কপালকুণ্ডলার হস্তধারণ করিলেন এবং হস্ত ধরিয়া ভগ্ন গৃহ হইতে কিছু দূরে লইয়া যাইতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা অতি ক্রোধে হস্ত মুক্ত করিয়া লইলেন। ব্রাহ্মণবেশী অতি মৃদুস্বরে কপালকুণ্ডলার কাণের কাছে কহিলেন, "চিন্তা কি? আমি পুরুষ নহি।"

কপালকুণ্ডলা আরও চমৎকৃতা হইলেন। এ কথায় তাঁহার কতক বিশ্বাস হইল, সম্পূর্ণ বিশ্বাসও হইল না। তিনি ব্রাহ্মণবেশধারিণীর সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। ভগ্ন গৃহ হইতে অদৃশ্য স্থানে গিয়া ব্রাহ্মণবেশী কপালকুণ্ডলাকে কর্ণে কর্ণে কহিলেন, "আমরা যে কুপরামর্শ করিতেছিলাম, তাহা শুনিবে? সে তোমারই সম্বন্ধে।"

কপালকুণ্ডলার আগ্রহ অতিশয় বাড়িল। কহিলেন, "শুনিব।"

ছদ্মবেশিনী বলিলেন, "তবে যতক্ষণ না প্রত্যাগমন করি, ততক্ষণ এই স্থানে প্রতীক্ষা কর।"

এই বলিয়া ছদ্মবেশিনী ভগ্ন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; কপালকুণ্ডলা কিয়ৎক্ষণ তথায় বসিয়া রহিলেন। কিন্তু যাহা দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কিছু ভয় জন্মিয়াছিল। এক্ষণে একাকিনী অন্ধকার বনমধ্যে বসিয়া থাকাতে উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল। বিশেষ এই ছদ্মবেশী তাঁহাকে কি অভিপ্রায়ে তথায় বসাইয়া গেল, তাহা কে বলিতে পারে? হয়ত সুযোগ পাইয়া আপনার মন্দ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্যই বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। এদিকে ব্রাহ্মণবেশীর প্রত্যাগমনে অনেক বিলম্ব হইতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা আর বসিতে পারিলেন না। উঠিয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

তখন আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় মসীময় হইয়া আসিতে লাগিল; কাননতলে যে সামান্য আলো ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিতে পারিলেন না। শীঘ্রপদে কাননাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিলেন। আসিবার সময়ে যেন পশ্চাদ্ভাগে অপর ব্যক্তির পদক্ষেপধ্বনি শুনিতে পাইলেন। কিন্তু মুখ ফিরাইয়া অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইলেন না। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন, ব্রাহ্মণবেশী তাঁহার পশ্চাৎ আসিতেছেন। বনত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববর্ণিত ক্ষুদ্র বনপথে আসিয়া বাহির হইলেন। তথায় তাদৃশ অন্ধকার নহে; দৃষ্টিপথে মনুষ্য থাকিলে দেখা যায়। কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। অতএব দ্রুতপদে চলিলেন। কিন্তু আবার স্পষ্ট মনুষ্যগতিশব্দ শুনিতে পাইলেন। আকাশ নীল কাদম্বিনীতে ভীষণতর হইল। কপালকুণ্ডলা আরও দ্রুত চলিলেন। গৃহ অনতিদূরে, কিন্তু গৃহপ্রাপ্তি হইতে না হইতেই প্রচণ্ড ঝটিকাবৃষ্টি ভীষণরবে প্রঘোষিত হইল। কপালকুণ্ডলা

দৌড়িলেন। পশ্চাতে যে আসিতেছিল, সেও যেন দৌড়িল, এমত শব্দ বোধ হইল। গৃহ দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই প্রচণ্ড ঝটিকাবৃষ্টি কপালকুণ্ডলার মস্তকের উপর দিয়া প্রধাবিত হইল। ঘন ঘন গম্ভীর মেঘশব্দ এবং অশনিসম্পাতশব্দ হইতে লাগিল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা কোন ক্রমে আত্মরক্ষা করিয়া গৃহে আসিলেন। প্রাঙ্গণভূমি পার হইয়া প্রকোষ্ঠমধ্যে উঠিলেন। দ্বার তাঁহার জন্য খোলা ছিল। দ্বার রুদ্ধ করিবার জন্য প্রাঙ্গণের দিকে সম্মুখ ফিরিলেন। বোধ হইল, যেন প্রাঙ্গণভূমিতে এক দীর্ঘাকার পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। এই সময়ে একবার বিদ্যুৎ চমকিল। একবার বিদ্যুতেই তাহাকে চিনিতে পারিলেন। সে সাগরতীরপ্রবাসী সেই কাপালিক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : স্বপ্নে

"I had a dream, which was not all a dream."
Byron.

কপালকুণ্ডলা ধীরে ধীরে দ্বার রুদ্ধ করিলেন, ধীরে ধীরে শয়নাগারে আসিলেন, ধীরে ধীরে পালঙ্কে শয়ন করিলেন। মনুষ্যহৃদয় অনন্ত সমুদ্র, যখন তদুপরি ক্ষিপ্ত বায়ুগণ সমর করিতে থাকে, কে তাহার তরঙ্গমালা গণিতে পারে? কপালকুণ্ডলার হৃদয়সমুদ্রে যে তরঙ্গমালা উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল, কে তাহা গণিবে?

সে রাত্রে নবকুমার হৃদয়বেদনায় অন্তঃপুরে আইসেন নাই। শয়নাগারে একাকিনী কপালকুণ্ডলা শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না। প্রবলবায়ুতাড়িত বারিধারাপরিসিঞ্চিত জটাজুটবেষ্টিত সেই মুখমণ্ডল অন্ধকার মধ্যেও চতুর্দ্দিকে দেখিতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কাপালিকের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়া তিনি চলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইতে লাগিল; কাপালিক নিবিড় বনমধ্যে যে সকল পৈশাচিক কার্য্য করিতেন, তাহা স্মরণ হইতে লাগিল; তৎকৃত ভৈরবীপূজা, নবকুমারের বন্ধন, এ সকল মনে পড়িতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা শিহরিয়া উঠিলেন। অদ্যকার রাত্রের সকল ঘটনাও মনোমধ্যে আসিতে লাগিল। শ্যামার ওষধি-কামনা, নবকুমারের নিষেধ, তাঁহার প্রতি কপালকুণ্ডলার তিরস্কার, তৎপরে অরণ্যের জ্যোৎস্নাময়ী শোভা, কাননতলে অন্ধকার, সেই অরণ্যমধ্যে যে সহচর পাইয়াছিলেন, তাহার ভীমকান্তগুণময় রূপ; সকলই মনে পড়িতে লাগিল।

পূর্ব্ব দিকে ঊষার মুকুটজ্যোতিঃ প্রকটিত হইল; তখন কপালকুণ্ডলার অল্প তন্দ্রা আসিল। সেই অপ্রগাঢ় নিদ্রায় কপালকুণ্ডলা স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তিনি যেন সেই পূর্ব্বদৃষ্ট সাগরহৃদয়ে তরণী আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন। তরণী সুশোভিত; তাহাতে বসন্ত রঙ্গের পতাকা উড়িতেছে; নাবিকেরা ফুলের মালা গলায় দিয়া বাহিতেছে। রাধা শ্যামের অনন্ত প্রণয়গীত করিতেছে। পশ্চিমগগন হইতে সূর্য্য স্বর্ণধারা বৃষ্টি করিতেছে। স্বর্ণধারা পাইয়া সমুদ্র হাসিতেছে; আকাশমণ্ডলে মেঘগণ সেই স্বর্ণবৃষ্টিতে ছুটাছুটি করিয়া ম্লান করিতেছে। অকস্মাৎ রাত্রি হইল, সূর্য্য কোথায় গেল। স্বর্ণমেঘসকল কোথায় গেল। নিবিড়নীল কাদম্বিনী আসিয়া আকাশ ব্যাপিয়া ফেলিল। আর সমুদ্রে দিক্ নিরূপণ হয় না। নাবিকেরা তরি ফিরাইল। কোন্ দিকে বাহিবে, স্থিরতা পায় না। তাহারা গীত বন্ধ করিল, গলার মালা সকল ছিঁড়িয়া ফেলিল; বসন্ত রঙ্গের পতাকা আপনি খসিয়া জলে পড়িয়া গেল। বাতাস উঠিল; বৃক্ষপ্রমাণ তরঙ্গ উঠিতে লাগিল; তরঙ্গমধ্য হইতে একজন জটাজুটধারী প্রকাণ্ডকায় পুরুষ আসিয়া কপালকুণ্ডলার নৌকা বাম হস্তে তুলিয়া সমুদ্রমধ্যে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইল। এমত সময়ে সেই ভীমকান্তশ্রীময় ব্রাহ্মণবেশধারী আসিয়া তরি ধরিয়া রহিল। সে কপালকুণ্ডলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমায় রাখি, কি নিমগ্ন করি?" অকস্মাৎ কপালকুণ্ডলার মুখ হইতে বাহির হইল, "নিমগ্ন কর।" ব্রাহ্মণবেশী নৌকা ছাড়িয়া দিল। তখন নৌকাও শব্দময়ী হইল, কথা কহিয়া উঠিল। নৌকা কহিল, "আমি আর এ ভার বহিতে পারি না, আমি পাতালে প্রবেশ করি।" ইহা কহিয়া নৌকা তাহাকে জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল।

ঘর্ম্মাক্তকলেবরা হইয়া কপালকুণ্ডলা স্বপ্নোত্থিতা হইলে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন; দেখিলেন,

প্রভাত হইয়াছে—গবাক্ষ মুক্ত রহিয়াছে; তন্মধ্য দিয়া বসন্তবায়ুস্রোতঃ প্রবেশ করিতেছে; মন্দান্দোলিত বৃক্ষশাখায় পক্ষিগণ কূজন করিতেছে। সেই গবাক্ষের উপর কতকগুলি মনোহর বন্য লতা সুবাসিত কুসুমসহিত দুলিতেছে। কপালকুণ্ডলা নারীস্বভাববশতঃ লতাগুলি গুছাইয়া লইতে লাগিলেন। তাহা সুশৃঙ্খল করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে তাহার মধ্য হইতে একখানি লিপি বাহির হইল। কপালকুণ্ডলা অধিকারীর ছাত্র; পড়িতে পারিতেন। নিম্নোক্ত মত পাঠ করিলেন।

"অদ্য সন্ধ্যার পর কল্য রাত্রের ব্রাহ্মণকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিবা। তোমার নিজ সম্পর্কীয় নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে কথা শুনিতে চাহিয়াছিলে, তাহা শুনিবে।

অহং ব্রাহ্মণবেশী।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : কৃতসঙ্কেতে

"——————————I will have grounds
More re'ative than this."

Hamlet

কপালকুণ্ডলা সেদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অনন্যচিত্তা হইয়া কেবল ইহাই বিবেচনা করিতেছিলেন যে, ব্রাহ্মণবেশীর সহিত সাক্ষাৎ বিধেয় কি না। পতিব্রতা যুবতীর পক্ষে রাত্রিকালে নির্জ্জনে অপরিচিত পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ যে অবিধেয়, ইহা ভাবিয়া তাঁহার মনে সঙ্কোচ জন্মে নাই; তদ্বিষয়ে তাঁহার স্থিরসিদ্ধান্তই ছিল যে, সাক্ষাতের উদ্দেশ্য দূষ্য না হইলে এমত সাক্ষাতে দোষ নাই—পুরুষে পুরুষে বা স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে যেরূপ সাক্ষাতের অধিকার, স্ত্রী পুরুষে সাক্ষাতের উভয়েরই সেইরূপ অধিকার উচিত বলিয়া তাঁহার বোধ ছিল; বিশেষ ব্রাহ্মণবেশী পুরুষ কি না, তাহাতে সন্দেহ। সুতরাং সে সঙ্কোচ অনাবশ্যক, কিন্তু এ সাক্ষাতে মঙ্গল, কি অমঙ্গল জন্মিবে, তাহাই অনিশ্চিত বলিয়া কপালকুণ্ডলা এত দূর সঙ্কোচ করিতেছিলেন। প্রথমে ব্রাহ্মণবেশীর কথোপকথন, পরে কাপালিকের দর্শন, তৎপরে স্বপ্ন, এই সকল হেতুতে কপালকুণ্ডলার নিজ অমঙ্গল যে অদূরবর্ত্তী এমত সন্দেহ প্রবল হইয়াছিল। সেই অমঙ্গল যে কাপালিকের আগমনসহিত সম্বন্ধমিলিত, এমত সন্দেহও অমূলক বোধ হইল না। এই ব্রাহ্মণবেশীকে তাহারই সহচর বোধ হইতেছে—অতএব তাহার সহিত সাক্ষাতে এই আশঙ্কার বিষয়ীভূত অমঙ্গলে পতিতও হইতে পারেন। সে ত স্পষ্ট বলিয়াছে যে, কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধেই পরামর্শ হইতেছিল। কিন্তু এমতও হইতে পারে যে, ইহা হইতে তন্নিরাকরণ-সূচনা হইবে। ব্রাহ্মণকুমার এক ব্যক্তির সহিত গোপনে পরামর্শ করিতেছিল, সে ব্যক্তিকে এই কাপালিক বলিয়া বোধ হয়। সেই কথোপকথনে কাহারও মৃত্যুর সঙ্কল্প প্রকাশ পাইতেছিল; নিতান্ত পক্ষে চিরনির্ব্বাসন। সে কাহার? ব্রাহ্মণবেশী ত স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধেই কুপরামর্শ হইতেছিল। তবে তাহারই মৃত্যু বা তাহারই চিরনির্ব্বাসন কল্পনা হইতেছিল। হইলই বা! তার পর স্বপ্ন,—সে স্বপ্নের তাৎপর্য্য কি? স্বপ্নে ব্রাহ্মণবেশী মহাবিপত্তিকালে আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, কার্য্যেও তাহাই ফলিতেছে। ব্রাহ্মণবেশী সকল কথা ব্যক্ত করিতে চাহিতেছেন। তিনি স্বপ্নে বলিয়াছেন, "নিমগ্ন কর।" কার্য্যেও কি সেইরূপ বলিবেন? না—না—ভক্তবৎসলা ভবানী অনুগ্রহ করিয়া স্বপ্নে তাঁহার রক্ষাহেতু উপদেশ দিয়াছেন, ব্রাহ্মণবেশী আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে চাহিতেছেন; তাঁহার সাহায্য ত্যাগ করিলে নিমগ্ন হইবেন। অতএব কপালকুণ্ডলা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাই স্থির করিলেন। বিজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেন কি না, তাহাতে সন্দেহ; কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তির সিদ্ধান্তের সহিত আমাদিগের সংশ্রব নাই। কপালকুণ্ডলা বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন না—সুতরাং বিজ্ঞের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন না। কৌতূহলপরবশ রমণীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভীমকান্তরূপরাশি-দর্শনলোলুপ যুবতীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, নৈশবনভ্রমণবিলাসিনী সন্ন্যাসিপালিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভবানীভক্তিভাববিমোহিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, জ্বলন্ত বহ্নিশিখায় পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন।

সন্ধ্যার পরে গৃহকর্ম্ম কতক কতক সমাপন করিয়া কপালকুণ্ডলা পূর্ব্বমত বনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কপালকুণ্ডলা যাত্রাকালে শয়নাগারে প্রদীপটি উজ্জ্বল করিয়া গেলেন। তিনি যেমন কক্ষ হইতে বাহির হইলেন, অমনি গৃহের প্রদীপ নিবিয়া গেল।

যাত্রাকালে কপালকুণ্ডলা এক কথা বিস্মৃত হইলেন। ব্রাহ্মণবেশী কোন্ স্থানে সাক্ষাৎ করিতে লিখিয়াছিলেন? এই জন্য পুনর্ব্বার লিপিপাঠের আবশ্যক হইল। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যে স্থানে প্রাতে লিপি রাখিয়াছিলেন, সে স্থান অন্বেষণ করিলেন, সে স্থানে লিপি পাইলেন না। স্মরণ হইল যে, কেশবন্ধন সময়ে ঐ লিপি সঙ্গে রাখিবার জন্য কবরীমধ্যে বিন্যস্ত করিয়াছিলেন। অতএব কবরীমধ্যে অঙ্গুলি দিয়া সন্ধান করিলেন। অঙ্গুলিতে লিপি স্পর্শ না হওয়াতে কবরী আলুলায়িত করিলেন, তথাপি সে লিপি পাইলেন না। তখন গৃহের অন্যান্য স্থানে তত্ত্ব করিলেন। কোথাও না পাইয়া পরিশেষে পূর্ব্বসাক্ষাৎস্থানেই সাক্ষাৎ সম্ভব সিদ্ধান্ত করিয়া পুনর্যাত্রা করিলেন। অনবকাশপ্রযুক্ত সে বিশাল কেশরাশি পুনর্ব্বিন্যস্ত করিতে পারেন নাই. অতএব আজি কপালকুণ্ডলা অন্যকালের মত কেশমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী হইয়া চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : গৃহদ্বারে

"Stand you awhile apart,
Confine yourself but in a patient list."
Othello.

যখন সন্ধ্যার প্রাক্কালে কপালকুণ্ডলা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন, তখন লিপি কবরী-বন্ধনচ্যুত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গিয়াছিল। কপালকুণ্ডলা তাহা জানিতে পারেন নাই। নবকুমার তাহা দেখিয়াছিলেন। কবরী হইতে পত্র খসিয়া পড়িল দেখিয়া নবকুমার বিস্মিত হইলেন। কপালকুণ্ডলা কার্য্যান্তরে গেলে লিপি তুলিয়া বাহিরে গিয়া পাঠ করিলেন। সে লিপি পাঠ করিয়া একই সিদ্ধান্ত সম্ভবে। "যে কথা কাল শুনিতে চাহিয়াছিলে, সে কথা শুনিবে।" সে কি? প্রণয়-কথা? ব্রাহ্মণবেশী মৃণ্ময়ীর উপপতি? যে ব্যক্তি পূর্ব্বরাত্রের বৃত্তান্ত অনবগত, তাহার পক্ষে দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত সম্ভবে না।

পতিব্রতা, স্বামীর সহগমনকালে, অথবা অন্য কারণে, যখন কেহ জীবিতে চিতারোহণ করিয়া চিতায় অগ্নি সংলগ্ন করে, তখন প্রথমে ধূমরাশি আসিয়া চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করে; দৃষ্টিলোপ করে; অন্ধকার করে; পরে ক্রমে কাষ্ঠরাশি জ্বলিতে আরম্ভ হইলে, প্রথমে নিম্ন হইতে সর্পজিহ্বার ন্যায় দুই একটি শিখা আসিয়া অঙ্গের স্থানে স্থানে দংশন করে, পরে সশব্দে অগ্নিজ্বালা চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া বেষ্টন করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যাপিতে থাকে; শেষে প্রচণ্ড রবে অগ্নিরাশি গগনমণ্ডল জ্বালাময় করিয়া মস্তক অতিক্রমপূর্ব্বক ভস্মরাশি করিয়া ফেলে।

নবকুমারের লিপি পাঠ করিয়া সেইরূপ হইল। প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না; পরে সংশয়, পরে নিশ্চয়তা, শেষে জ্বালা। মনুষ্যহৃদয় ক্লেশাধিক্য বা সুখাধিক্য একবারে গ্রহণ করিতে পারে না, ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করে। নবকুমারকে প্রথমে ধূমরাশি বেষ্টন করিল; পরে বহ্নিশিক্ষা হৃদয় তাপিত করিতে লাগিল; শেষে বহ্নিরাশিতে হৃদয় ভস্মীভূত হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বেই নবকুমার দেখিয়াছিলেন যে, কপালকুণ্ডলা কোন কোন বিষয়ে তাঁহার অবাধ্য হইয়াছেন। বিশেষ কপালকুণ্ডলা তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও যখন যেখানে ইচ্ছা, সেখানে একাকিনী যাইতেন; যাহার তাহার সহিত যথেচ্ছ আচরণ করিতেন; অধিকন্তু তাঁহার বাক্য হেলন করিয়া নিশীথে একাকিনী বনভ্রমণ করিতেন। আর কেহ ইহাতে সন্দিহান হইত, কিন্তু নবকুমারের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার প্রতি সন্দেহ উত্থাপিত হইলে চিরানিবার্য্য বৃশ্চিকদংশনবৎ হইবে জানিয়া, তিনি একদিনের তরে সন্দেহকে স্থান দান করেন নাই। অদ্যও সন্দেহকে স্থান দিতেন না, কিন্তু অদ্য সন্দেহ নহে, প্রতীতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

যন্ত্রণার প্রথম বেগের শমতা হইলে নবকুমার নীরবে বসিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। রোদন করিয়া কিছু সুস্থির হইলেন। তখন তিনি কিংকর্ত্তব্য সম্বন্ধে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। আজি তিনি কপালকুণ্ডলাকে কিছু বলিবেন না। কপালকুণ্ডলা যখন সন্ধ্যার সময় বনাভিমুখে

যাত্রা করিবেন, তখন গোপনে তাঁহার অনুসরণ করিবেন, কপালকুণ্ডলার মহাপাপ প্রত্যক্ষীভূত করিবেন, তাহার পর এ জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। কপালকুণ্ডলাকে কিছু বলিবেন না, আপনার প্রাণসংহার করিবেন। না করিয়া কি করিবেন?—এ জীবনের দুর্ব্বহ ভার বহিতে তাঁহার শক্তি হইবে না।

এই স্থির করিয়া কপালকুণ্ডলার বহির্গমন প্রতীক্ষায় তিনি ঋড়কীদ্বারের প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। কপালকুণ্ডলা বহির্গতা হইয়া কিছু দূর গেলে নবকুমারও বহির্গত হইতেছিলেন; এমন সময়ে কপালকুণ্ডলা লিপির জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, দেখিয়া নবকুমারও সরিয়া গেলেন। শেষে কপালকুণ্ডলা পুনর্ব্বার বাহির হইয়া কিছু দূর গমন করিলে নবকুমার আবার তদনুগমনে বাহির হইতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন, দ্বারদেশ আবৃত করিয়া এক দীর্ঘাকার পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

কে সে ব্যক্তি, কেন দাঁড়াইয়া, জানিতে নবকুমারের কিছুমাত্র ইচ্ছা হইল না। তাহার প্রতি চাহিয়াও দেখিলেন না। কেবল কপালকুণ্ডলার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য ব্যস্ত। অতএব পথমুক্তির জন্য আগন্তুকের বক্ষে হস্ত দিয়া তাড়িত করিলেন; কিন্তু তাহাকে সরাইতে পারিলেন না।

নবকুমার কহিলেন, "কে তুমি? দূর হও—আমার পথ ছাড়।"

আগন্তুক কহিল, "কে আমি, তুমি কি চেন না?"

শব্দ সমুদ্রনাদবৎ কর্ণে লাগিল। নবকুমার চাহিয়া দেখিলেন; দেখিলেন, সে পূর্ব্বপরিচিত জটাজূটধারী কাপালিক।

নবকুমার চমকিয়া উঠিলেন; কিন্তু ভীত হইলেন না। সহসা তাহার মুখ প্রফুল্ল হইল—কহিলেন,

"কপালকুণ্ডলা কি তোমার সহিত সাক্ষাতে যাইতেছে?"

কাপালিক কহিল; "না।"

জ্বলিতমাত্র আশার প্রদীপ তখনই নির্ব্বাণ হওয়াতে নবকুমারের মুখ পূর্ব্ববৎ মেঘময় অন্ধকারাবিষ্ট হইল। কহিলেন, "তবে তুমি পথ মুক্ত কর।"

কাপালিক কহিল, "পথ মুক্ত করিতেছি, কিন্তু তোমার সহিত আমার কিছু কথা আছে—অগ্রে শ্রবণ কর।"

নবকুমার কহিলেন, "তোমার সহিত আমার কি কথা? তুমি আবার আমার প্রাণনাশের জন্য আসিয়াছ? প্রাণ গ্রহণ কর, আমি এবার কোন ব্যাঘাত করিব না। তুমি এক্ষণে অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি। কেন আমি দেবতুষ্টির জন্য শরীর না দিলাম? এক্ষণে তাহার ফলভোগ করিলাম। যে আমাকে রক্ষা করিয়াছিল, সেই আমাকে নষ্ট করিল। কাপালিক! আমাকে এবার অবিশ্বাস করিও না। আমি এখনই আসিয়া তোমাকে আত্মসমর্পণ করিব।"

কাপালিক কহিল, "আমি তোমার প্রাণবধার্থ আসি নাই। ভবানীর তাহা ইচ্ছা নহে। আমি যাহা করিতে আসিয়াছি, তাহা তোমার অনুমোদিত হইবে। বাটীর ভিতরে চল, আমি যাহা বলি, তাহা শ্রবণ কর।"

নবকুমার কহিলেন, "এক্ষণে নহে। সময়ান্তরে তাহা শ্রবণ করিব, তুমি এখন অপেক্ষা কর; আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে—সাধন করিয়া আসিতেছি।"

কাপালিক কহিল, "বৎস! আমি সকলই অবগত আছি; তুমি সেই পাপিষ্ঠার অনুসরণ করিবে; সে যথায় যাইবে, আমি তাহা অবগত আছি। আমি তোমাকে সে স্থানে সমভিব্যাহারে করিয়া লইয়া যাইব। যাহা দেখিতে চাহ, দেখাইব—এক্ষণে আমার কথা শ্রবণ কর। কোন ভয় করিও না।"

নবকুমার কহিলেন, "আর তোমাকে আমার কোন ভয় নাই। আইস।"

এই বলিয়া নবকুমার কাপালিককে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া আসন দিলেন এবং স্বয়ংও উপবেশন করিয়া বলিলেন, "বল।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : পুনরালাপে

"তৎগচ্ছ সিদ্ধ্যৈ কুরু দেবকার্য্যম্।"
কুমারসম্ভব

কাপালিক আসন গ্রহণ করিয়া দুই বাহু নবকুমারকে দেখাইলেন। নবকুমার দেখিলেন, উভয় বাহু ভগ্ন।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে যে, যে রাত্রে কপালকুণ্ডলার সহিত নবকুমার সমুদ্রতীর হইতে পলায়ন করেন, সেই রাত্রে তাঁহাদিগকে অন্বেষণ করিতে করিতে কাপালিক বালিয়াড়ির শিখরচ্যুত হইয়া পড়িয়া যান। পতনকালে দুই হস্তে ভূমি ধারণ করিয়া শরীর রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহাতে শরীর রক্ষা হইল বটে কিন্তু দুইটি হস্ত ভাঙ্গিয়া গেল। কাপালিক এ সকল বৃত্তান্ত নবকুমারের নিকট বিবরিত করিয়া কহিলেন, "বাহুদ্বারা নিত্যক্রিয়া সকল নির্ব্বাহের কোন বিশেষ বিঘ্ন হয় না। কিন্তু ইহাতে আর কিছুমাত্র বল নাই। এমন কি, ইহার দ্বারা কাষ্ঠাহরণে কষ্ট হয়।"

পরে কহিতে লাগিলেন, "ভূপতিত হইয়াই যে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে, আমার করদ্বয় ভগ্ন হইয়াছে, আর আর অঙ্গ অভগ্ন আছে, এমত নহে, আমি পতনমাত্র মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম। প্রথমে অবিচ্ছেদে অজ্ঞানাবস্থায় ছিলাম। পরে ক্ষণে সজ্ঞান, ক্ষণে অজ্ঞান রহিলাম। কয় দিন যে আমি এ অবস্থায় রহিলাম, তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয়, দুই রাত্রি এক দিন হইবে। প্রভাতকালে আমার সংজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে পুনরাবির্ভূত হইল। তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমি এক স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। যেন ভবানী—" বলিতে বলিতে কাপালিকের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। "যেন ভবানী আসিয়া আমার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছেন। ভ্রূকুটি করিয়া আমায় তাড়না করিতেছেন, কহিতেছেন, 'রে দুরাচার, তোরই চিত্তাশুদ্ধি হেতু আমার পূজার এ বিঘ্ন জন্মাইয়াছে। তুই এ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়লালসায় বদ্ধ হইয়া এই কুমারীর শোণিতে এত দিন আমার পূজা করিস নাই। অতএব এই কুমারী হইতেই তোর পূর্ব্বকৃতাফল বিনষ্ট হইল! আমি তোর নিকট আর কখনও পূজা গ্রহণ করিব না।' তখন আমি রোদন করিয়া জননীর চরণে অবলুণ্ঠিত হইলে তিনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, 'ভদ্র! ইহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিব। সেই কপালকুণ্ডলাকে আমার নিকট বলি দিবে। যতদিন না পার, আমার পূজা করিও না।'

"কত দিনে বা কি প্রকারে আমি আরোগ্য প্রাপ্ত হইলাম, তাহা আমার বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই। কালে আরোগ্য পাইয়া দেবীর আজ্ঞা পালন করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম যে, এই বাহুদ্বয়ে শিশুর বলও নাই। বাহুবল ব্যতীত যত্ন সফল হইবার নহে। অতএব ইহাতে একজন সহকারী আবশ্যক হইল। কিন্তু মনুষ্যবর্গ ধর্ম্মে অল্পমতি—বিশেষ কলির প্রাবল্যে যবন রাজা, পাপাত্মক রাজশাসনের ভয়ে কেহই এমত কার্য্যে সহচর হয় না। বহু সন্ধানে আমি পাপীয়সীর আবাসস্থান জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু বাহুবলের অভাব হেতু ভবানীর আজ্ঞা পালন করিতে পারি নাই। কেবল মানসসিদ্ধির জন্য তন্ত্রের বিধানানুসারে ক্রিয়াকলাপ করিয়া থাকি মাত্র। কল্য রাত্রে নিকটস্থ বনে হোম করিতেছিলাম, স্বচক্ষে দেখিলাম, কপালকুণ্ডলার সহিত এক ব্রাহ্মণকুমারের মিলন হইল। অদ্যও সে তাহার সাক্ষাতে যাইতেছে। দেখিতে চাও, আমার সহিত আইস, দেখাইব।

"বৎস! কপালকুণ্ডলা বধযোগ্যা—আমি ভবানীর আজ্ঞাক্রমে তাহাকে বধ করিব। সেও তোমার নিকট বিশ্বাসঘাতিনী—তোমারও বধযোগ্যা; অতএব তুমি আমাকে সে সাহায্য প্রদান কর। এই অবিশ্বাসিনীকে ধৃত করিয়া আমার সহিত যজ্ঞস্থানে লইয়া চল। তথায় স্বহস্তে ইহাকে বলিদান কর। ইহাতে ঈশ্বরীর সমীপে যে অপরাধ করিয়াছ, তাহার মার্জ্জনা হইবে, পবিত্র কর্ম্মে অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয় হইবে, বিশ্বাসঘাতিনীর দণ্ড হইবে; প্রতিশোধের চরম হইবে।"

কাপালিক বাক্য সমাপ্ত করিলেন। নবকুমার কিছুই উত্তর করিলেন না। কাপালিক তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কহিলেন, "বৎস! এক্ষণে যাহা দেখাইব বলিয়াছিলাম, তাহা দেখিবে চল।"

নবকুমার ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া কাপালিকের সঙ্গে চলিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : সপত্নীসম্ভাষে

"Be at peace ; it is your sister that addresses you. Requite Lucretia's love."
Lucretia.

কপালকুণ্ডলা গৃহ হইতে বহির্গতা হইয়া কাননাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে ভগ্নগৃহ-মধ্যে গেলেন। তথায় ব্রাহ্মণকে দেখিলেন। যদি দিনমান হইত, তবে দেখিতে পাইতেন যে, তাঁহার মুখকান্তি অত্যন্ত মলিন হইয়াছে। ব্রাহ্মণবেশী কপালকুণ্ডলাকে কহিলেন যে, "এখানে কাপালিক আসিতে পারে, এখানে কোন কথা অবিধি। স্থানান্তরে আইস।" বনমধ্যে একটি অল্পায়ত স্থান ছিল, তাহার চতুষ্পার্শ্বে বৃক্ষরাজি; মধ্যে পরিষ্কার, তথা হইতে একটি পথ বাহির হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণবেশী কপালকুণ্ডলাকে তথায় লইয়া গেলেন। উভয়ে উপবেশন করিলে ব্রাহ্মণবেশী কহিলেন,

"প্রথমতঃ আত্মপরিচয় দিই। কত দূর আমার কথা বিশ্বাসযোগ্য, তাহা আপনি বিবেচনা করিয়া লইতে পারিবে। যখন তুমি স্বামীর সঙ্গে হিজলী প্রদেশ হইতে আসিতেছিলে, তখন পথিমধ্যে রজনীযোগে এক যবনকন্যার সহিত সাক্ষাৎ হয়। তোমার কি তাহা মনে পড়ে?"

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "যিনি আমাকে অলঙ্কার দিয়াছিলেন?"

ব্রাহ্মণবেশধারিণী কহিলেন, "আমিই সেই।"

কপালকুণ্ডলা অত্যন্ত বিস্মিতা হইলেন। লুৎফ-উন্নিসা তাঁহার বিস্ময় দেখিয়া কহিলেন, "আরও বিস্ময়ের বিষয় আছে—আমি তোমার সপত্নী।"

কপালকুণ্ডলা চমৎকৃতা হইয়া কহিলেন, "সে কি?"

লুৎফ-উন্নিসা তখন আনুপূর্ব্বিক আত্মপরিচয় দিতে লাগিলেন। বিবাহ, জাতিভ্রংশ, স্বামী কর্ত্তৃক ত্যাগ, ঢাকা, আগ্রা, জাহাঁগীর, মেহের-উন্নিসা, আগ্রাত্যাগ, সপ্তগ্রামে বাস, নবকুমারের সহিত সাক্ষাৎ, নবকুমারের ব্যবহার, গত দিবস প্রদোষে ছদ্মবেশে কাননে আগমন, হোমকারীর সহিত সাক্ষাৎ, সকলই বলিলেন। এই সময় কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তুমি কি অভিপ্রায়ে আমাদিগের বাটীতে ছদ্মবেশে আসিতে বাসনা করিয়াছিলে?"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "তোমার সহিত স্বামীর চিরবিচ্ছেদ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে।"

কপালকুণ্ডলা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "তাহা কি প্রকারে সিদ্ধ করিতে?"

লুৎফ-উন্নিসা। আপাততঃ তোমার সতীত্বের প্রতি স্বামীর সংশয় জন্মাইয়া দিতাম। কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি, সে পথ ত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি যদি আমার পরামর্শমতে কাজ কর, তবে তোমা হইতেই আমার কামনা সিদ্ধ হইবে—অথচ তোমার মঙ্গল সাধন হইবে।

কপা। হোমকারীর মুখে তুমি কাহার নাম শুনিয়াছিলে?

লু। তোমারই নাম। তিনি তোমার মঙ্গল বা অমঙ্গল কামনায় হোম করেন, ইহা জানিবার জন্য প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বসিলাম। যতক্ষণ না তাঁহার ক্রিয়া সম্পন্ন হইল, ততক্ষণ তথায় বসিয়া রহিলাম। হোমান্তে তোমার নামসংযুক্ত হোমের অভিপ্রায় ছলে জিজ্ঞাসা করিলাম। কিয়ৎক্ষণ তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তোমার অমঙ্গলসাধনই হোমের প্রয়োজন। আমারও সেই প্রয়োজন। ইহাও তাঁহাকে জানাইলাম। তৎক্ষণাৎ পরস্পরের সহায়তা করিতে বাধ্য হইলাম। বিশেষ পরামর্শ জন্য তিনি আমাকে ভগ্ন গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন। তথায় আপন মনোগত ব্যক্ত করিলেন। তোমার মৃত্যুই তাঁহার অভীষ্ট। তাহাতে আমার কোন ইষ্ট নাই। আমি ইহজন্মে কেবল পাপই করিয়াছি, কিন্তু পপের পথে আমার এত দূর অধঃপাত হয় নাই যে, আমি নিরপরাধে বালিকার মৃত্যুসাধন করি। আমি তাহাতে সম্মতি দিলাম না। এই সময়ে তুমি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলে। বোধ করি, কিছু শুনিয়া থাকিবে।

কপা। আমি ঐরূপ বিতর্কই শুনিয়াছিলাম।

লু। সে ব্যক্তি আমাকে অবোধ অজ্ঞান বিবেচনা করিয়া কিছু উপদেশ দিতে চাহিল। শেষটা কি দাঁড়ায়, ইহা জানিয়া তোমায় উচিত সংবাদ দিব বলিয়া তোমাকে বনমধ্যে অন্তরালে রাখিয়া গেলাম।

কপা। তার পর আর ফিরিয়া আসিলে না কেন?

লু। তিনি অনেক কথা বলিলেন, বাহুল্যবৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে বিলম্ব হইল। তুমি সে ব্যক্তিকে বিশেষ জান। কে সে, অনুভব করিতে পারিতেছ?

কপা। আমার পূর্ব্বপালক কাপালিক।

লু। সেই বটে। কাপালিক প্রথমে তোমাকে সমুদ্রতীরে প্রাপ্ত, তথায় প্রতিপালন. নবকুমারের আগমন, তৎসহিত তোমার পলায়ন, এ সমুদয় পরিচয় দিলেন। তোমাদের পলায়নের পর যাহা যাহা হইয়াছিল, তাহাও বিবৃত করিলেন। সে সকল বৃত্তান্ত তুমি জান না। তাহা তোমার গোচরার্থ বিস্তারিত বলিতেছি।

এই বলিয়া লুৎফ-উন্নিসা কাপালিকের শিখরচ্যুতি, হস্তভঙ্গ, স্বপ্ন, সকল বলিলেন। স্বপ্ন শুনিয়া কপালকুণ্ডলা চমকিয়া, শিহরিয়া উঠিলেন—চিত্তমধ্যে বিদ্যুচ্চঞ্চলা হইলেন। লুৎফ-উন্নিসা বলিতে লাগিলেন,

"কাপালিকের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ভবানীর আজ্ঞা প্রতিপালন। বাহু বলহীন, এই জন্য পরের সাহায্য তাহার নিতান্ত প্রয়োজন। আমাকে ব্রাহ্মণতনয় বিবেচনা করিয়া সহায় করিবার প্রত্যাশায় সকল বৃত্তান্ত বলিল। আমি এ পর্য্যন্ত এ দুষ্কর্ম্মে স্বীকৃত হই নাই। এ দুর্ব্বৃত্ত চিত্তের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু ভরসা করি যে, কখনই স্বীকৃত হইব না। বরং এ সঙ্কল্পের প্রতিকূলতাচরণ করিব, এই অভিপ্রায়; সেই অভিপ্রায়েই আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। কিন্তু এ কার্য্য নিতান্ত অস্বার্থপর হইয়া করি নাই। তোমার প্রাণদান দিতেছি। তুমি আমার জন্য কিছু কর।"

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "কি করিব?"

লু। আমারও প্রাণদান দাও—স্বামী ত্যাগ কর।

কপালকুণ্ডলা অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। অনেকক্ষণের পর কহিলেন, "স্বামী ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব?"

লু। বিদেশে—বহুদূরে—তোমাকে অট্টালিকা দিব—ধন দিব—দাস দাসী দিব, রাণীর ন্যায় থাকিবে।

কপালকুণ্ডলা আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অন্তঃকরণমধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না, তবে কেন লুৎফ-উন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন? লুৎফ-উন্নিসাকে কহিলেন,

"তুমি আমার উপকার করিয়াছ কি না, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। অট্টালিকা, ধন, সম্পত্তি, দাস দাসীরও প্রয়োজন নাই। আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব? তোমার মানস সিদ্ধ হউক—কালি হইতে বিঘ্নকারিণীর কোন সংবাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।"

লুৎফ-উন্নিসা চমৎকৃতা হইলেন, এরূপ আশু স্বীকারের কোন প্রত্যাশা করেন নাই। মোহিত হইয়া কহিলেন, "ভগিনি! তুমি চিরায়ুষ্মতী হও, আমার জীবনদান করিলে। কিন্তু আমি তোমাকে অনাথা হইয়া যাইতে দিব না। কল্য প্রাতে তোমার নিকট আমার একজন বিশ্বাসযোগ্যা চতুরা দাসী পাঠাইব। তাহার সঙ্গে যাইও। বর্দ্ধমানে কোন অতিপ্রধানা স্ত্রীলোক আমার সুহৃৎ।—তিনি তোমার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ করিবেন।"

লুৎফ-উন্নিসা এবং কপালকুণ্ডলা এরূপ মনঃসংযোগ করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন যে, সম্মুখবিঘ্ন কিছুই দেখিতে পান নাই। যে বন্য পথ তাঁহাদিগের আশ্রয়স্থান হইতে বাহির হইয়াছিল, সে পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া কাপালিক ও নবকুমার তাঁহাদিগের প্রতি যে করাল দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, তাহা কিছুই দেখিতে পান নাই।

নবকুমার ও কাপালিক ইহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তত দূর হইতে তাহাদিগের কথোপকথনের মধ্যে কিছুই তদুভয়ের শ্রুতিগোচর হইল না। মনুষ্যের চক্ষু কর্ণ যদি সমদূরগামী হইত, তবে মনুষ্যের দুঃখস্রোত শমিত কি বর্দ্ধিত হইত, তাহা কে বলিবে? সংসাররচনা অপূর্ব্ব কৌশলময়।

নবকুমার দেখিলেন, কপালকুণ্ডলা আলুলায়িতকুন্তলা। যখন কপালকুণ্ডলা তাঁহার হয়

নাই, তখনই সে কুন্তল বাঁধিত না। আবার দেখিলেন যে, সেই কুন্তলরাশি আসিয়া ব্রাহ্মণকুমারের পৃষ্ঠদেশে পড়িয়া তাঁহার অংসসংবিলম্বী কেশদামের সহিত মিশিয়াছে। কপালকুণ্ডলার কেশরাশি ঈদৃশ আয়তনশালী, এবং লঘু স্বরে কথোপকথনের প্রয়োজনে উভয়ে এরূপ সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া বসিয়া ছিলেন যে, লুৎফ-উন্নিসার পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত কপালকুণ্ডলার কেশের সম্প্রসারণ হইয়াছিল। তাহা তাঁহারা দেখিতে পান নাই। দেখিয়া নবকুমার ধীরে ধীরে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন।

কাপালিক ইহা দেখিয়া নিজে কটিবিলম্বী এক নারিকেলপাত্র বিমুক্ত করিয়া কহিল, "বৎস! বল হারাইতেছ, এই মহৌষধ পান কর, ইহা ভবানীর প্রসাদ। পান করিয়া বল পাইবে।"

কাপালিক নবকুমারের মুখের নিকট পাত্র ধরিল। তিনি অন্যমনে পান করিয়া দারুণ তৃষা নিবারণ করিলেন। নবকুমার জানিতেন না যে, এই সুস্বাদু পেয় কাপালিকের স্বহস্তপ্রস্তুত প্রচণ্ড তেজস্বিনী সুরা। পান করিবামাত্র সবল হইলেন।

এ দিকে লুৎফ-উন্নিসা পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে কপালকুণ্ডলাকে কহিতে লাগিলেন,

"ভগিনি! তুমি যে কার্য্য করিলে, তাহার প্রতিশোধ করিবার আমার ক্ষমতা নাই; তবু যদি আমি চিরদিন তোমার মনে থাকি, সেও আমার সুখ। যে অলঙ্কারগুলি দিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়াছি, তুমি দরিদ্রকে বিতরণ করিয়াছ। এক্ষণে নিকটে কিছুই নাই। কল্যকার অন্য প্রয়োজন ভাবিয়া কেশমধ্যে একটি অঙ্গুরীয় আনিয়াছিলাম, জগদীশ্বরের কৃপায় সে পাপ প্রয়োজন সিদ্ধির আবশ্যক হইল না। এই অঙ্গুরীয়টি তুমি রাখ। ইহার পরে অঙ্গুরীয় দেখিয়া যবনী ভগিনীকে মনে করিও। আজি যদি স্বামী জিজ্ঞাসা করেন, অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলে, কহিও, লুৎফ-উন্নিসা দিয়াছে।" ইহা কহিয়া লুৎফ-উন্নিসা আপন অঙ্গুলি হইতে বহুধনে ক্রীত এক অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া কপালকুণ্ডলার হস্তে দিলেন। নবকুমার তাহাও দেখিতে পাইলেন; কাপালিক তাঁহাকে ধরিয়াছিলেন, আবার তাঁহাকে কম্পমান দেখিয়া পুনরপি মদিরা সেবন করাইলেন। মদিরা নবকুমারের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রকৃতি সংহার করিতে লাগিল, স্নেহের অঙ্কুর পর্য্যন্ত উন্মূলিত করিতে লাগিল।

কপালকুণ্ডলা লুৎফ-উন্নিসার নিকট বিদায় হইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। তখন নবকুমার ও কাপালিক লুৎফ-উন্নিসার অদৃশ্য পথে কপালকুণ্ডলার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ: গৃহাভিমুখে

"No spectre greets me—no vain shadow this."

Wordsworth.

কপালকুণ্ডলা ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন। অতি ধীরে ধীরে মৃদু মৃদু চলিলেন। তাহার কারণ, তিনি অতি গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া যাইতেছিলেন। লুৎফ-উন্নিসার সংবাদে কপালকুণ্ডলার একেবারে চিত্তভাব পরিবর্ত্তিত হইল; তিনি আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইলেন। আত্মবিসর্জ্জন কি জন্য? লুৎফ-উন্নিসার জন্য? তাহা নহে।

কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণ সম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান; তান্ত্রিক যেরূপ কালিকাপ্রসাদাকাঙ্ক্ষায় পরপ্রাণ সংহারে সঙ্কোচশূন্য, কপালকুণ্ডলা সেই আকাঙ্ক্ষায় আত্মজীবন বিসর্জ্জনে তদ্রূপ। কপালকুণ্ডলা যে কাপালিকের ন্যায় অনন্যচিত্ত হইয়া শক্তিপ্রসাদপ্রার্থিনী হইয়াছিলেন, তাহা নহে; তথাপি অহর্নিশ শক্তিভক্তি শ্রবণ, দর্শন ও সাধনে তাঁহার মনে কালিকানুরাগ বিশিষ্ট প্রকারে জন্মিয়াছিল। ভৈরবী যে সৃষ্টিশাসনকর্ত্রী মুক্তিদাত্রী, ইহা বিশেষ মতে প্রতীত হইয়াছিল। কালিকার পূজাভূমি যে নরশোণিতে প্লাবিত হয়, ইহা তাঁহার পরদুঃখদুঃখিত হৃদয়ে সহিত না, কিন্তু আর

কোন কার্য্যে ভক্তি প্রদর্শনের ত্রুটি ছিল না। এখন সেই বিশ্বশাসনকর্ত্রী, সুখদুঃখবিদায়িনী, কৈবল্যদায়িনী ভৈরবী স্বপ্নে তাঁহার জীবনসমর্পণ আদেশ করিয়াছেন। কেনই বা কপালকুণ্ডলা সে আদেশ পালন না করিবেন?

তুমি আমি প্রাণত্যাগ করিতে চাহি না। রাগ করিয়া যাহা বলি, এ সংসার সুখময়। সুখের প্রত্যাশাতেই বর্ত্তুলবৎ সংসারমধ্যে ঘুরিতেছি—দুঃখের প্রত্যাশায় নহে। কদাচিৎ যদি আত্মকর্ম্মদোষে সেই প্রত্যাশা সফলীকৃত না হয়, তবেই দুঃখ বলিয়া উচ্চ কলরব আরম্ভ করি। তবেই দুঃখ নিয়ম নহে, সিদ্ধান্ত হইল; নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। তোমার আমার সর্ব্বত্র সুখ। সেই সুখে আমরা সংসারমধ্যে বদ্ধমূল; ছাড়িতে চাহি না। কিন্তু এ সংসার-বন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু। কপালকুণ্ডলার সে বন্ধন ছিল না—কোন বন্ধনই ছিল না। তবে কপালকুণ্ডলাকে কে রাখে?

যাহার বন্ধন নাই, তাহারই অপ্রতিহত বেগ। গিরিশিখর হইতে নির্ঝরিণী নামিলে, কে তাহার গতি রোধ করে? একবার বায়ু তাড়িত হইলে কে তাহার সঞ্চার নিবারণ করে? কপালকুণ্ডলার চিত্ত চঞ্চল হইলে কে তাহার স্থিতিস্থাপন করিবে? নবীন করিকরভ মাতিলে কে তাহাকে শান্ত করিবে?

কপালকুণ্ডলা আপন চিত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেনই বা এ শরীর জগদীশ্বরীর চরণে সমর্পণ না করিব? পঞ্চ ভূত লইয়া কি হইবে?" প্রশ্ন করিতেছিলেন, অথচ কোন নিশ্চিত উত্তর দিতে পারিতেছিলেন না। সংসারের অন্য কোন বন্ধন না থাকিলেও পঞ্চভূতের এক বন্ধন আছে।

কপালকুণ্ডলা অধোবদনে চলিতে লাগিলেন। যখন মনুষ্যহৃদয় কোন উৎকট ভাবে আচ্ছন্ন হয়, চিন্তার একাগ্রতায় বাহ্য সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তখন অনৈসর্গিক পদার্থও প্রত্যক্ষীভূত বলিয়া বোধ হয়। কপালকুণ্ডলার সেই অবস্থা হইয়াছিল।

যেন ঊর্দ্ধ হইতে তাঁহার কর্ণকুহরে এই শব্দ প্রবেশ করিল, "বৎসে! আমি পথ দেখাইতেছি।" কপালকুণ্ডলা চকিতের ন্যায় ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন, যে আকাশমণ্ডলে নবনীরদনিন্দিত মূর্ত্তি! গলবিলম্বিত নরকপালমালা হইতে শোণিতক্ষতি হইতেছে; কটিমণ্ডল বেড়িয়া নরকররাজি দুলিতেছে— বাম করে নরকপাল— অঙ্গে রুধিরধারা, ললাটে বিষমোজ্জ্বলজ্বালাবিভাসিতলোচনপ্রান্তে বালশশী সুশোভিত! যেন ভৈরবী দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া কপালকুণ্ডলাকে ডাকিতেছেন।

কপালকুণ্ডলা ঊর্দ্ধমুখী হইয়া চলিলেন। সেই নবকাদম্বিনীসন্নিভ রূপ আকাশমার্গে তাঁহার আগে আগে চলিল। কখনও কপালমালিনীর অবয়ব মেঘে লুক্কায়িত হয়, কখনও নয়নপথে স্পষ্ট বিকশিত হয়। কপালকুণ্ডলা তাঁহার প্রতি চাহিয়া চলিলেন।

নবকুমার বা কাপালিক এ সব কিছুই দেখেন নাই। নবকুমার সুরাগরলপ্রজ্বলিতহৃদয়— কপালকুণ্ডলার ধীর পদক্ষেপ অসহিষ্ণু হইয়া সঙ্গীকে কহিলেন, "কাপালিক!"

কাপালিক কহিল, "কি?"

"পানীয়ং দেহি মে।"

কাপালিক পুনরপি তাঁহাকে সুরা পান করাইল।

নবকুমার কহিলেন, "আর বিলম্ব কি?"

কাপালিক উত্তর করিল, "আর বিলম্ব কি?"

নবকুমার ভীমনাদে ডাকিলেন, "কপালকুণ্ডলে!"

কপালকুণ্ডলা শুনিয়া চমকিতা হইলেন। ইদানীন্তন কেহ তাঁহাকে কপালকুণ্ডলা বলিয়া ডাকিত না। তিনি মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন। নবকুমার ও কাপালিক তাঁহার সম্মুখে আসিলেন। কপালকুণ্ডলা

প্রথমে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না—কহিলেন,

"তোমরা কে? যমদূত?"

পরক্ষণেই চিনিতে পারিয়াই কহিলেন, "না না পিতা, তুমি কি আমায় বলি দিতে আসিয়াছ?"

নবকুমার দৃঢ়মুষ্টিতে কপালকুণ্ডলার হস্তধারণ করিলেন। কাপালিক করুণার্দ্র মধুময় স্বরে কহিলেন, "বৎসে! আমাদিগের সঙ্গে আইস।" এই বলিয়া কাপালিক শ্মশানাভিমুখে পথ দেখাইয়া চলিলেন।

কপালকুণ্ডলা আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; যথায় গগনবিহারিণী ভয়ঙ্করী দেখিয়াছিলেন, সেই দিকে চলিলেন; দেখিলেন, রণরঙ্গিণী খল খল হাসিতেছে; এক দীর্ঘ ত্রিশূল করে ধরিয়া কাপালিকগত পথপ্রতি সঙ্কেত করিতেছে। কপালকুণ্ডলা অদৃষ্টবিমূঢ়ার ন্যায় বিনা বাক্যব্যয়ে কাপালিকের অনুসরণ করিলেন। নবকুমার পূর্ব্ববৎ দৃঢ়মুষ্টিতে তাঁহার হস্তধারণ করিয়া চলিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ: প্রেতভূমে

"বপুষা করণোজ্ঝিতেন সা নিপতন্ত্রী পতিমপ্যপাতয়ৎ।
ননু তৈলনিকেবিন্দুনা সহ দীপ্তার্চ্চিরুপৈতি মেদিনীম্॥—রঘুবংশ

চন্দ্রমা অস্তমিত হইল। বিশ্বমণ্ডল অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল। কাপালিক যথায় আপন পূজাস্থান সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তথায় কপালকুণ্ডলাকে লইয়া গেলেন। সে গঙ্গাতীরে এক বৃহৎ সৈকতভূমি। তাহারই সম্মুখে আরও বৃহত্তর দ্বিতীয় এক খণ্ড সিকতাময় স্থান। সেই সৈকতে শ্মশানভূমি। উভয় সৈকতমধ্যে জলোচ্ছ্বাসকালে অল্প জল থাকে, ভাঁটার সময়ে জল থাকে না। এক্ষণে জল ছিল না। শ্মশানভূমির যে মুখ গঙ্গাসম্মুখীন, সেই মুখ অত্যুচ্চ; জলে অবতরণ করিতে গেলে একেবারে উচ্চ হইতে অগাধ জলে পড়িতে হয়। তাহাতে আবার অবিরতবায়ুতাড়িত তরঙ্গাভিঘাতে উপকূলতল ক্ষয়িত হইয়াছিল; কখনও কখনও মৃত্তিকাখণ্ড স্থানচ্যুত হইয়া অগাধ জলে পড়িয়া যাইত। পূজাস্থানে দীপ নাই—কাষ্ঠখণ্ড মাত্রে অগ্নি জ্বলিতেছিল, তদালোকে অতি অস্পষ্টদৃষ্ট শ্মশানভূমি আরও ভীষণ দেখাইতেছিল। নিকটে পূজা, হোম, বলি প্রভৃতির সমগ্র আয়োজন ছিল। বিশাল তরঙ্গিণীহৃদয় অন্ধকারে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। চৈত্র মাসের বায়ু অপ্রতিহত বেগে গঙ্গাহৃদয়ে প্রধাবিত হইতেছিল; তাহার কারণে তরঙ্গাভিঘাতজনিত কলকল রব গগন ব্যাপ্ত করিতেছিল। শ্মশানভূমিতে শবভুক্ পশুগণ কর্কশকণ্ঠে ক্বচিৎ ধ্বনি করিতেছিল।

কাপালিক নবকুমার ও কপালকুণ্ডলাকে উপযুক্ত স্থানে কুশাসনে উপবেশন করাইয়া তন্ত্রাদির বিধানানুসারে পূজারম্ভ করিলেন। উপযুক্ত সময়ে নবকুমারের প্রতি আদেশ করিলেন যে, কপালকুণ্ডলাকে স্নাত করাইয়া আন। নবকুমার কপালকুণ্ডলার হস্ত ধারণ করিয়া শ্মশানভূমির উপর দিয়া স্নান করাইতে লইয়া চলিলেন। তাঁহাদিগের চরণে অস্থি ফুটিতে লাগিল। নবকুমারের পদের আঘাতে একটা জলপূর্ণ শ্মশান-কলস ভগ্ন হইয়া গেল। তাহার নিকটেই শব পড়িয়া ছিল—হতভাগার কেহ সৎকারও করে নাই। দুইজনেরই তাহাতে পদস্পর্শ হইল। কপালকুণ্ডলা তাহাকে বেড়িয়া গেলেন, নবকুমার তাহাকে চরণে দলিত করিয়া গেলেন। চতুর্দ্দিক বেড়িয়া শবমাংসভুক্ পশুসকল ফিরিতেছিল; মনুষ্য দুই জনের আগমনে উচ্চকণ্ঠে রব করিতে লাগিল, কেহ আক্রমণ করিতে আসিল, কেহ বা পদশব্দ করিয়া চলিয়া গেল। কপালকুণ্ডলা দেখিলেন, নবকুমারের হস্ত কাঁপিতেছে; কপালকুণ্ডলা স্বয়ং নির্ভীক, নিষ্কম্প।

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভয় পাইতেছ?"

নবকুমারের মদিরার মোহ ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। অতি গম্ভীর স্বরে নবকুমার

উত্তর করিলেন,

"ভয়ে, মৃণ্ময়ি? তাহা নহে।"

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কাঁপিতেছ কেন?"

এই প্রশ্ন কপালকুণ্ডলা যে স্বরে করিলেন, তাহা কেবল রমণীকণ্ঠেই সম্ভবে। যখন রমণী পরদুঃখে গলিয়া যায়, কেবল তখনই রমণীকণ্ঠে সে স্বর সম্ভবে। কে জানিত যে, আসন্ন কালে শ্মশানে আসিয়া কপালকুণ্ডলার কণ্ঠ হইতে এ স্বর নির্গত হইবে?

নবকুমার কহিলেন, "ভয়ে নহে। কাঁদিতে পারিতেছি না, এই ক্রোধে কাঁপিতেছি।"

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসিলেন, "কাঁদিবে কেন?"

আবার সেই কণ্ঠ!

নবকুমার কহিলেন, "কাঁদিব কেন? তুমি কি জানিবে মৃণ্ময়ি! তুমি ত কখন রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই—" বলিতে বলিতে নবকুমারের কণ্ঠস্বর যাতনায় রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। "তুমি ত কখনও আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিতে আইস নাই।" এই বলিয়া সহসা নবকুমার চীৎকার করিয়া রোদন করিতে করিতে কপালকুণ্ডলার পদতলে আছাড়িয়া পড়িলেন।

"মৃণ্ময়ি!—কপালকুণ্ডলে! আমায় রক্ষা কর। এই তোমার পায়ে লুটাইতেছি—একবার বল যে, তুমি অবিশ্বাসিনী নও—একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই।"

কপালকুণ্ডলা হাত ধরিয়া নবকুমারকে উঠাইলেন—মৃদু স্বরে কহিলেন, "তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই!"

যখন এই কথা হইল, তখন উভয়ে একেবারে জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; কপালকুণ্ডলা অগ্রে, নদীর দিকে পশ্চাৎ করিয়া ছিলেন, তাঁহার পশ্চাতে এক পদ পরেই জল। এখন জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হইয়াছিল, কপালকুণ্ডলা একটা আড়রির পর দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, "তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই!"

নবকুমার ক্ষিপ্তের ন্যায় কহিলেন, "চৈতন্য হারাইয়াছি, কি জিজ্ঞাসা করিব—বল—মৃণ্ময়ি! বল—বল—বল—আমায় রাখ। —গৃহে চল।"

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, বলিব। আজি যাহাকে দেখিয়াছ,—সে পদ্মাবতী। আমি অবিশ্বাসিনী নহি। এ কথা স্বরূপ বলিলাম। কিন্তু আর আমি গৃহে যাইব না। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব। তুমি গৃহে যাও। আমি মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না।"

"না—মৃণ্ময়ি!—না!—" এই রূপ উচ্চ শব্দ করিয়া নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে বাহু প্রসারণ করিলেন। কপালকুণ্ডলাকে আর পাইলেন না। চৈত্রবায়ুতাড়িত এক বিশাল তরঙ্গ আসিয়া, তীরে যথায় কপালকুণ্ডলা দাঁড়াইয়া, তথায় তটাধোভাগে প্রহত হইল; অমনি তটমৃত্তিকাখণ্ড কপালকুণ্ডলা সহিত ঘোর রবে নদীপ্রবাহমধ্যে ভগ্ন হইয়া পড়িল। নবকুমার তীরভঙ্গের শব্দ শুনিলেন, কপালকুণ্ডলা অন্তর্হিত হইল দেখিলেন। অমনি তৎপশ্চাৎ লম্ফ দিয়া জলে পড়িলেন। নবকুমার সন্তরণে নিতান্ত অক্ষম ছিলেন না। কিছুক্ষণ সাঁতার দিয়া কপালকুণ্ডলার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পাইলেন না, তিনিও উঠিলেন না।

সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে, বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?

শব্দার্থের ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনী

প্রথম খণ্ড/১ম পরিচ্ছেদ —Floating straight ইত্যাদি অংশটি কবি নাট্যকার শেক্সপীয়ারের *The Commedy of Errors* নাটক থেকে গৃহীত। সূচনা অংশটি এই রকম — And floating straight, obedient to the stream were carried towards Corinth, as we thought.

(Act-I, Section=I) AEGEON নামক এক বণিক (Syracuse শহরের) স্ত্রী-পুত্রদের মাস্তুল বা পালে বেঁধে কীভাবে ঝড় ও কুয়াশার মধ্যে ভীতসন্ত্রস্ত চিত্তে (A doubtful warrant of immediate death) স্রোত অভিমুখে পাড়ি দিয়েছিলেন, তারই ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র উদ্ধার করেছেন আলোচ্য অংশে। Ephesus-এর Duke, Solinus-এর কাছে AEGEON তার স্বদেশভূমি পরিত্যাগ করে আসার কারণ ব্যাখ্যা করেছিল।

যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি .....হইতে পারে—স্থানমাহাত্ম্যের ভিত্তিতে পুণ্য বা মোক্ষ লাভের আশায় হিন্দু-ধর্মাশ্রিত মানুষের প্রচলিত বিশ্বাস, আধুনিক যুক্তিবাদী দর্শন মননের অধিকারী নবকুমার অর্থহীন সংস্কার বলে মনে করে।

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী ...কলঙ্করেখা—মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশম' (ত্রয়োদশ সর্গে) কাব্যে রাবণকে বধ করে শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতাসহ পুষ্পকরথে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন রামের দৃষ্টিতে সমুদ্রের রূপ-বর্ণনায় আলোচ্য উদ্ধৃতিটি ব্যবহৃত। "দূর থেকে ক্ষীণরেখার মত প্রতীয়মান লবণাম্বুরাশির তমালতালীবনরাজিতে নীল বলাকার তীরভূমি লৌহচক্রাকার ধারাভাগে কলঙ্করেখার মত দেখা যাচ্ছে।"

বারদরিয়ায়– বাহির সমুদ্রে। দরিয়ার পাঁচ পীরের নাম—পীর হল মুসলিম ধর্মপ্রচারক ও অসীম ক্ষমতাশালী মানুষ। মুসলমান মাঝিরা নদী বা সমুদ্রে বিপদে পড়লে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এই পাঁচ পীরের স্মরণ নেয় উদ্ধারের আশায়—বদর, গিয়াসুদ্দিন, কালুগাজি, সামসুদ্দিন ও সেকেন্দার। **কলধৌত**—রৌপ্য, মধুর ধ্বনি।

প্রথম খণ্ড/২ পরিচ্ছেদ—**Ingratitude! Thou marble-hearted** ইত্যাদি অংশটি বঙ্কিমচন্দ্র শেক্সপীয়রের **King Lear** নামক ট্রাজেডি লক্ষণাক্রান্ত নাটক থেকে চয়ন করেছেন। কন্যা Goneril-এর রূঢ় ব্যবহারে ক্ষুব্ধ ও আহত Lear এই উক্তি করেছিলেন—

Ingratitude! Thou marble-hearted friend,
More hideous, when thou show's thee in a child,
Than the sea-monster. (Act-I, Scene-IV)

Goneril এবং Regan কন্যাদ্বয় Lear-এর সঙ্গে যে ব্যবহার করে তাতে তাদের মানবী বলে মনে হয় না। সমস্ত ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্য দান করে দিলেও এই কন্যারা তাঁকে তাড়িয়ে দেয়। স্নেহ-প্রেমহীন কন্যাদ্বয়ের আচরণ লিয়ারকে মর্মান্তিক দুঃখ দেয়। নিষ্ঠুর এই আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে লিয়রের এই উক্তি গভীর বেদনাদায়ক ও মর্মস্পর্শী বিশ্বাশঘাতকতার চূড়ান্ত নিদর্শন। **প্রাগুক্ত**—পূর্বে কথিত ; **সমাহরণ**—সম্যকরূপে আরহণ বা সংগ্রহ ; **সমভিব্যাহারিগণ**—সঙ্গী-সাথীরা।

প্রথম খণ্ড। ৩য় পরিচ্ছেদ—প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি Byron-এর অপূর্ব কাব্য Don Juan থেকে নেওয়া এই অংশে গাঢ় অন্ধকারের করাল রূপটি স্মরণ করা হয়েছে। Don Juan সমুদ্রপথে জাহাজে করে যাওয়ার সময় সূর্য অস্তমিত হ'লে যে জমাট ঘনান্ধকার কুটিল কটাক্ষে রাত্রির কালোছায়া বিস্তৃত করে তাকে ও সঙ্গিনীকে আশাহত করে তুলেছিল, তারই ইঙ্গিতময়তায় আলোচ্য অংশটি উদ্ধৃত। **সচরাচর অনুদ্ঘাতিনী**—সাধারণভাবে দৃষ্ট সমতলভূমি।

বালিয়াড়ির ধবল শিখরমালা—ছোট পাহাড়ের মত বালুকাময় স্তূপ, শীর্ষদেশ সাদা আভাযুক্ত। **হিমবর্ষী আকাশতলে**--রাত্রির আকাশে হিম পড়ার প্রসঙ্গ।

প্রথম খণ্ড/৪র্থ পরিচ্ছেদ—"সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে/ভীষণ , দর্শনমূর্ত্তি"—অংশটি কবি মধুসূদন রচিত (**মেঘনাদবধ কাব্যের** পঞ্চম সর্গ থেকে উৎকলিত। রামচন্দ্রের আজ্ঞাবর্তী অনুজ লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎ-হত্যার পূর্বে নির্ভয়ে উত্তর দ্বারে চণ্ডীর পূজা দেবার জন্য গমন করেন। কিন্তু চণ্ডী মন্দিরের সম্মুখে ঘুরে বেড়ান "ভীষণ দর্শন মূর্ত্তি" চন্দ্রচূড় (মহাদেব)। এই ভয়ংকর দর্শন শিব চণ্ডীর পূজা দেওয়ায় ইচ্ছুক 'উর্মিলা-বিলাসী' লক্ষ্মণকে পথ অবরোধ করে দাঁড়ান। পরে অবশ্য শিব পথ-মুক্ত করে লক্ষ্মণকে চণ্ডীর পূজা করার অনুমতি দেন---"ছাড়ি দিলা দুয়ার দুয়ারী/কপর্দ্দী; কানন মাঝে পশিলা সৌমিত্রী।" **দাবানল**—অরণ্যে অনেক সময় আপনা থেকেই আগুন জ্বলে, একেই দাবানল বলে। গাছে-গাছে ঘর্ষণের ফলেই এ আগুনেব সৃষ্টি হয়। **ভৈরবীপ্রেরিতোহসি; মামনুসর; পরিতোষঃ তে ভবিষ্যতি**—ভৈরবী কর্তৃক প্রেরিত তুমি আমাকে অনুসরণ কর, তুমি পরিতুষ্ট হবে। **ক্লেশহেতু**—ক্লান্তিজনিত কারণে।

প্রথম খণ্ড/৫ম পরিচ্ছেদ—যোগপ্রভাবো ন চ লক্ষতে তে ...হৈমমিবোপরাগম—অংশটি কবি কালিদাসের **রঘুবংশম**', কাব্যের ষোড়শ সর্গের সপ্তম শ্লোক। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর রাম-পুত্র কুশ কুশাবতী নগরীতে রাজত্ব করতেন। একদিন রাত্রিকালে শয়নকক্ষে রাজা কুশ স্তিমিত আলোকে অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীকে তাঁর গৃহে প্রবেশ করতে দেখে আলোচ্য বিস্ময়সূচক উক্তিটি করেন। যোগপ্রভাবহীন বিষণ্ন মূর্তি, হিমের উপদ্রব ক্লিষ্টা পদ্মের মত রাজলক্ষ্মীকে বিবর্ণ দেখাচ্ছে। বিস্মিত কুশ হঠাৎ রাজলক্ষ্মীর সাক্ষাৎ পেয়ে কেমন হতবাক হয়েছিল, তার পরিচয় আছে এখানে।

নীলাম্বুমণ্ডল—নীল আভাযুক্ত জলরাশি/সমুদ্র। **প্রদোষ-তিমির**—আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার। **সংসর্পিত**—অনেকটা ঢেউ খেলানো, ছড়িয়ে থাকা। **আগুলফলম্বিত**—গোড়ালি পর্যন্ত বিস্তৃত ; **অলোকাবলী**-কেশদাম। **অর্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদিবর্ণ**—অর্ধচন্দ্র জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ। **মন্দানিল সঞ্চালিত**—বসন্তের মৃদুমন্দ বাতাসে আন্দোলিত।

প্রথম খণ্ড/৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ—বিখ্যাত নাট্যকার শ্রীহর্ষ রচিত **রত্নাবলী** নাটকের চতুর্থ অঙ্কের শেষাংশ থেকে উদ্ধৃতিটি গৃহীত। বৎসদেশের রাজা উদয়ন ও রাণী বাসবদত্তার গল্পের সঙ্গে নায়িকা সাগরিকার (রত্নাবলী) সম্পর্কস্থাপন এবং রাজার সঙ্গে বিবাহ আলোচ্য নাটকের বিষয়বস্তু। দাসীপুত্র সম্বরসিদ্ধি ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতাশালী জাদুকর। রাণী বাসবদত্তার নির্দেশে সিংহলরাজ বিক্রমবাহুর কন্যা সাগরিকাকে রাজঅন্তঃপুরে বন্দী করে রাখা হয়। সম্বরসিদ্ধির জাদুতে সেখানে আগুন লাগে। বাসবদত্তার সম্মতিতে রাজা উদয়ন অন্তঃপুরের প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করেন সাগরিকাকে উদ্ধারের আশায়। সাগরিকাকে রাজা বলেন---"কথং নিগড়সংযতাসি ? দ্রুতং নয়ামি ভবতীমিতঃ প্রিয়তমেহবলম্বস্ব মাম্।" (বঙ্গানুবাদ : "একি তুমি শৃঙ্খলে বাঁধা ? দ্রুত তোমায় এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি, প্রিয়তমা আমাকে ধরো।") মিলনাত্মক নাটকের পরিণামে উদয়ন সাগরিকার(রত্নাবলী) বিবাহ/মিলন সম্ভব হয়েছিল বাসবদত্তার অনুমোদনে।

কাপালিকের মায়া মাত্র—অলৌকিক ক্ষমতাশালী কাপালিক মায়ার দ্বারা এই অপূর্ব নারী সৃষ্টি করেছেন কিনা ভাবনায় নবকুমারের সংশয়।

সায়াহ্নকৃত্য— সন্ধ্যাকালীন আহারের আয়োজনকে বোঝানো হয়েছে।

উদাসীন—তান্ত্রিক সাধনায় মনোযোগী হ'লেও অন্যান্য বিষয়ে উদাসীন।

তান্ত্রিকেরা সকলই করিতে পারে—তান্ত্রিক সাধনায় নিষ্ঠুরতার প্রতি ইঙ্গিত।

প্রথম খণ্ড/৮ম পরিচ্ছেদ—And the great Lord of Luna.....ইত্যাদি অংশটি লর্ড মেকলে (Macaulay) রচিত কাব্যগ্রন্থ ***Lays of Ancient Rome*** বা রোমানদের শৌর্যবীর্য, থেকে সংগৃহিত। রোমানদের সঙ্গে বিপক্ষীয় শত্রুদের সংঘাত কালে Luna র রাজা বীর Astur এর পতনকে তুলনা করা হয়েছে এইভাবে—এলভার্নাস পর্বতের একটা বৃহৎ ওক্ বৃক্ষ যেন বজ্রাহত হয়ে ভুলুণ্ঠিত হ'ল।

মহিষের ন্যায় —কাপালিকের বিশাল দেহ মহিষের মত বলাতে তার পশুশক্তির প্রতি কিছুটা কটাক্ষ করা হয়েছে।

প্রথম খণ্ড/৭ম পরিচ্ছেদ—And that very night ইত্যাদি অংশটি শেক্সপীয়রের প্রথম পর্বের ট্রাজিক লক্ষণাক্রান্ত নাটক Romeo and Juliet থেকে নেওয়া। Paris নামক সম্ভ্রান্ত যুবকের সঙ্গে Juliet এর বিবাহ আসন্ন -- তাই Romeo কে ভালবাসার পূর্ণতা না ঘটায় Juliet ছোড়ার আঘাতে আত্মঘাতিনী হতে চায় শুনে ধর্মযাজক Friar Laurence তাকে মুক্তির অভিনব উপায় বলেছিলেন (I ll give three remedy) -- লরেন্সের দেওয়া তীব্র মদিরা খেয়ে জুলিয়েত বিয়াল্লিশ ঘন্টা মৃত্যু সদৃশ সংজ্ঞাহীন হয়ে থাকেবেন (No warmth, no breath, shall testify thou livest)। ইতিমধ্যে লরেন্স খবর পাঠাবেন রোমিওকে, হত্যার অপরাধে যে Mantua-তে নির্বাসিত। ক্যাপির্ডলেট বংশের প্রাচীন সমাধিক্ষেত্রে জুলিয়েতকে কবর দেবার জন্য নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানেই রোমিও উপস্থিত হয়ে জুলিয়েতকে Mantua-তে নিয়ে যাবেন। Laurence বলেন -

And that very night
Shall Romeo bear thee hence to Mantua.
And this shall free thee from this present shame ;

তদ্বত্মসংবর্তী—ষোড়শী কপাল যে পথে চলেছিল, কেবল তার অনুসরণ করা। **খদ্যোতমালাসংবৃত** —অনেক জোনাকির দ্বারা আবৃত। **কোন গাঁই**—কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। **পুরুষোত্তম দর্শনে** —পুরীর জগন্নাথ দর্শনে। **রাজধানী রাজমহল** —ষোড়শ শতকের শেষে বাঙলার রাজধানী। **যোগসিদ্ধিমানসে** —বামাচারী তান্ত্রিকদের নারী কেন্দ্রিক সাধনা।

প্রথম খণ্ড/৯ম পরিচ্ছেদ—কণ্ব। অলংরুদিতেন ; ইত্যাদি অংশটি মহাকবি কালিদাসের **"অভিজ্ঞান শকুন্তলম্** নাটকের চতুর্থ অংকের শেষাংশ থেকে সংকলিত। শকুন্তলার পালক-পিতা, আশ্রম-প্রধান মহর্ষি কাশ্যপ (কণ্ব) দুষ্মন্তের উদ্দেশ্যে বা পতিগৃহে যাত্রার প্রাক্কালে এই কথা বলেছিলেন শকুন্তলাকে অলং রুদিতেন। স্থিরা ভব। ইতঃ পন্থানসালেক্য। (এখন, কেঁদ না। শান্ত হও। এই পথের দিকে তাকাও)। পরের অংশটিতে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়—চোখের জলের ধারায় দৃষ্টিপথ বাধাপ্রপ্ত হচ্ছে—তাই দেখতে না পাওয়াতে উঁচুনিচু পথে শকুন্তলার পা ঠিক মতো পড়ছে না, (অস্মিন্নলক্ষিত নতোন্নত ভূমিভাগে/মার্গে পদানি খলু তে বিষমীভবান্তি।) ক্রন্দনরতা শকুন্তলার সঙ্গে মহর্ষি কণ্বও যেন অন্তর্বেদনায় কাতর হলেন।

খুঙ্গীর মধ্যে—বেতের তৈরি ঝাঁপি যেখানে পুঁথি-পত্রাদি রাখা হয়।

পত্রটি পড়িয়া গেল—ভবানী বিল্বপত্র গ্রহণ করেন নি ; অশুভ-ইঙ্গিত।

দ্বিতীয় খণ্ড/৩য় পরিচ্ছেদ— ধরদেখি মোহন মূরতি ইত্যাদি অংশটি মদুসূদন দত্তের **মেঘনাদ বধ কাব্যের** দ্বিতীয় স্বর্গ থেকে নেওয়। উদ্বৃতিতে 'মোহন' শব্দের পরিবর্তে 'মোহিনা' হবে—মূল অংশটি এইরকম ঃ—

ধর, দেখি, মোহিনী মূরতি
নেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বর বপুঃ, আনি
নানা আভরণ ; হেরি যে সবে, পিনাকী
ভুলিবেন, ভুলে যথা ঋতুপতি,

ইন্দ্র কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে দেবী উমা/অম্বিকা/পার্বতী, হিমালয়-শিখরে ধ্যানমগ্ন মহাদেবের শরণাপন্ন হ'তে রাজী হলেন। রাবণ-রাজার আরাধ্য দেবতা শিবের অনুগ্রহ লাভের উদ্দেশ্যে গমন করার প্রাক্‌কালে মদন-পত্নী রতি একথা পার্বতীকে বলেছিলেন। পার্বতীকে বিভিন্ন আভরণে সজ্জিত করে ধূর্জ্জটীর মন-হরণ করার বাসনায় রতি-কর্তৃক পার্বতীর এই অঙ্গসজ্জা।

অদ্বিতীয়া রূপসী—কপাল-সম্পর্কে মতির এই উক্তি ব্যঙ্গাত্মক।

মেরা শৌহর—আমার স্বামী।

দ্বিতীয় খণ্ড/৪-র্থ পরিচ্ছেদ—খুলিনু সত্বরে কঙ্কণ , বলায়—ইত্যাদি অংশটি মাইকেল মধুসূদন রচিত **মেঘনাদ বধ কাব্যের** চতুর্থ সর্গের অন্তর্গত সীতার উক্তি বিশেষ। 'অশোক কাননে' বন্দিনী সীতা বিভীষণ-পত্নী সরমার কাছে রাবণ কর্তৃক অপহৃত হবার প্রসঙ্গ বিবৃত করেছেন। অভাগী সীতার আর্তনাদ কেউ শুনতে পেলেন না — তাই নিরুপায় হয়ে—"খুলিনু সত্বরে/কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা/কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী ; ছড়াইনু পথে; " সীতার এহেন আচরণের উদ্দেশ্য ছিল—এই চিহ্ন লক্ষ্য করে রামচন্দ্র যাতে তাঁকে খুঁজে পান। রামের জন্য সীতার বিচ্ছেদ যন্ত্রণাও এই মূল্যবান রত্নরাজি পরিত্যাগের একটি কারণ হতে পারে। কপালকুণ্ডলা ধনরত্ন বা অলঙ্কারের মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞ— আসক্তিহীন। সাধারণ নারীসুলভ ভাবের পরিবর্তে তার এই পার্থিব বিষয়বস্তুর পরে ঔদাসীন্য তাকে স্বেচ্ছায় দান করতে উৎসাহিত করেছে। সীতার অলঙ্কার ত্যাগ ও কপালকুণ্ডলার দান কেবল বাহ্যিক দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ—অভ্যন্তরীণ নয়।

ভিক্ষুক দৌড়িল কেন ? —হতচকিত ভিক্ষুক অপ্রত্যাশিত ও অভাবিতপূর্ব অলঙ্কার প্রাপ্তিতে বিস্মিত হয়ে পলায়ন করেছিল। কপালের মোহহীন এ দান যেমন তার ঔদাসীন্যের প্রতীক, তেমনই সংসার অনভিজ্ঞতা তার কাছে ভিক্ষুকের পলায়ন কার্যকারণ সূত্রে স্পষ্ট নয়।

দ্বিতীয় খণ্ড/৫-ম পরিচ্ছেদ—শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে.....অংশ কালিদাসের **মেঘদূত** কাব্যের উত্তরমেঘ পর্যায় থেকে গৃহীত। স্বর্গ থেকে নির্বাসিত যক্ষ প্রিয়ার সঙ্গলাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে বিরহ যন্ত্রণায় কাতর সেই গভীর অন্তর্বেদনা থেকে চেতন অচেতনের পার্থক্য বিস্মৃত হয়ে মেঘকে দূত করে, স্বর্গ বা অলকাপুরীতে প্রেরণ করতে চেয়েছিল। 'উত্তরমেঘ' অংশে অলকাপুরীতে দূত কার্যে রত মেঘ কি দেখবে এবং যক্ষপ্রিয়াকে কি বার্তা পৌঁছে দেবে, যক্ষ তা মেঘের কাছে ব্যক্ত করেছে। মেঘ তার প্রিয়াকে কি বলবে, তারই একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত হয়েছে—শব্দাখ্যেয়ই যদাপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ

কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদানন - স্পর্শলোভাৎ।
সোহতিক্রান্তাঃ শ্রবণবিষয়ং লোচনাভ্যামাদৃশ্য
স্তামুৎকণ্ঠাবিরচিতপদং মন্মুকেনেদমাহ ॥

"তাকে বোলো ---'সখীদের সামনে যে কথা প্রকাশ্যে বলা চলে সেই কথাও শুধু তোমার মুখস্পর্শের লোভেই কানে কানে বলবার জন্য যে উন্মুখ হয়ে উঠতো -- আজ সে এত দূরে যে সেখানে কথা পৌঁছয় না, দৃষ্টিও চলে না। আজ সে-ই তার উৎকণ্ঠায় ভরা হৃদয়ের কথা আমার মুখে তোমাকে বলে পাঠিয়েছে।" কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের গভীর প্রেম ও তার প্রতিধ্বনি আলোচ্য উদ্ধৃতিতে পাওয়া যায়।

তপস্বিনীকে— কপালকুণ্ডলা আক্ষরিক অর্থে যোগিনী বা তপস্বিনী, তবু সংসারী মানুষের চোখে তার নিরাসক্ত ভাব তপস্বিনীরই মত।

তাঁহার হৃদয়াকাশ কপালকুণ্ডলার মূর্ত্তিতেই ব্যাপ্ত রহিয়াছিল—কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের গভীর প্রেমের নিদর্শন।

দ্বিতীয় খণ্ড/৬-ষ্ঠ পরিচ্ছেদ — কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে.....ইত্যাদি অংশ কবি কালিদাসের "কুমারসম্ভবম্ কাব্যগ্রন্থের পঞ্চম সর্গের অন্তর্গত চুয়াল্লিস সংখ্যক শ্লোক। মহাদেব ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে তপস্বিনী উমাকে ছলনা করতে গিয়ে এই কথাগুলি বলেছিলেন---"এই যৌবনকালেই তুমি অঙ্গের সমস্ত সাজসজ্জা ছেড়ে, বার্ধক্যের দিনে শোভনীয় যে বল্কল বাস, তা ধারণ করেছ। আচ্ছা বল তো, সন্ধ্যাকালে পরিস্ফুট চন্দ্রতারকাসমন্বিত রাত্রি কি কখনো অরুণের নিকট যেতে পারে? কপালকুণ্ডলা যৌবনেই তপস্বিনীর মত অঙ্গ-সজ্জার প্রতি উদাসীন। তুলনাটি অত্যন্ত সার্থক।

নবদ্বীপ—এককালে বিখ্যাত বাণিজ্যিক শহর। **সপ্তগ্রাম**—"হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিশবিঘা রেল-স্টেশনের নিকটবর্তী সরস্বতী নদী তীরস্থ প্রসিদ্ধ গ্রাম। ইহার সমৃদ্ধি ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ১৫৯২ অব্দে এই বাণিজ্যবন্দর পাঠানগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। পরে সরস্বতীর স্রোত রুদ্ধ হওয়ায় খ্রীঃ ১৬৩২ অব্দে সপ্তগ্রাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।"

মৃন্ময়ী—বিবাহোত্তর জীবনে এই নামকরণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মাটির সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক গৃহী জীবনকে অপূর্ণ করে রেখেছিল।

পুরুষের বাতাসে যোগিনীও গৃহিণী হইয়া যায়—"পুরুষের সান্নিধ্যে যোগিনী নারীরও রূপান্তর ঘটে" শ্যামার এই উক্তি প্রচলিত ধারণার অনুবর্তী সিদ্ধান্ত হলেও কপালকুণ্ডলার সম্পর্কে এ উক্তি প্রযোজ্য নয়।

সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে—অকপট এই উক্তির মধ্যে কপালকুণ্ডলার সারল্য ও সংসার অনাসক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট।

যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি—গীতার প্রসিদ্ধ একটি শ্লোকের অংশ। বিধাতা যে কাজে নিযুক্ত করবেন, তাই করব---এই ভাব কপালকুণ্ডলার বিধি-নির্দিষ্ট বিধানের দ্বারাই যেন নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

কপালের কি আছে জানি না—মা (ভবানী) ত্রিপত্র ধারণ করলেন না--- এই অশুভ সংকেত কপালকুণ্ডলার মনে গভীর রেখাপাত করলেও, তার জীবন সম্পর্কে একটা সামগ্রিক নিস্পৃহ ভাব আগাগোড়া বর্তমান ছিল।

তৃতীয় খণ্ড/১-ম পরিচ্ছেদ—**কষ্টোহয়ং খলু ভৃত্যভাবঃ**—নাট্যকার শ্রীহর্ষ রচিত 'রত্নাবলী' নাটকের প্রথম অঙ্কের অংশবিশেষ। উক্তিটি উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের। রাজার কল্যাণ কামনায় মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের রাজার অনভিপ্রেত কাজ করতে হচ্ছে। তাই আত্মকথনে মন্ত্রী বলেন---"তবেদং নিষ্পন্নপ্রায়মপি প্রভুপ্রয়োজনং ন মে ধৃতিমাবহতীতি। কষ্টোহয়ং খলু ভৃত্যভাবঃ।"(এভাবে প্রভুর প্রয়োজন প্রায় নিষ্পন্ন হলেও আমার মন স্থির হচ্ছে না। এই ভৃত্যভাব সত্যই কষ্টকর।) প্রভুর

মঙ্গল সাধিত হ'লেও ভৃত্য পরাধীন বলে সর্বদাই প্রভুর মুখাপেক্ষী। লুৎফ উন্নিসার ভৃত্যভাবের সঙ্গে যৌগন্ধরায়ণের উক্তির সাদৃশ্য আছে।

মতিবিবির চরিত্র মহাদোষ কলুষিত, মহদ্‌গুণেও শোভিত—লুৎফ উন্নিসা দেশ-বিদেশে ভ্রমণকালে মতিবিবি ছদ্মনাম গ্রহণ করতেন। কপালকুণ্ডলাকে অতি প্রিয় ধনরত্ন দান করে ঔদার্য গুণের পরিচয় রেখেছিল। আবার শিক্ষার দিক থেকে সংস্কৃত, পারসীক, নৃত্যগীত তার অধিগত ছিল। কিন্তু ইন্দ্রিয়াসক্তির প্রাবল্যে তার মনোবৃত্তি সকল দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠেছিল---উপন্যাসে তার পরিচয় আছে।

কুসুমে কুসুমে বিহারিণী ভ্রমরীর পক্ষচ্ছেদ কেন করাইব ?—সৎ ও অসৎ--উভবিধি কর্মে তার ইচ্ছাধীন মানসিকতা কাজ করেছে। অসৎকর্ম্মে অন্তঃকরণ সুখী হলে ভ্রমরীর মতো মধুপানে তার আগ্রহ। প্রবৃত্তির অপ্রতিরোধ্য আবেগের দ্বারাই সে নিয়ন্ত্রিত হত চায়, আলোচ্য অংশে তারই ইঙ্গিত।

সেলিম মেহের-উন্নিসার নিকট চিত্ত রাখিয়া গেলেন—আকবর শাহের পুত্র রাজকুমার সেলিমের সঙ্গে এইভাবে মেহের-উন্নিসার সাক্ষাৎকার ঐতিহাসিকদের দ্বারা অনুমোদিত নয়। কাহিনীবৃত্তের সঙ্গে সঙ্গতিসূত্রে বঙ্কিম কল্পিত এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন।

খসরু তাঁহার পুত্র—যুবরাজ সেলিমের প্রধানা মহিষীর পুত্র ছিলেন খসরু। আকবরের পৌত্র প্রিয়দর্শন এই যুবককে পিতা সেলিমের পরিবর্তে সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্র করা হয়।

যুবরাজ খসরুকে সিংহাসন দান—বঙ্কিম এই অংশটি ইতিহাস থেকে নিয়েছেন। সেলিম-পুত্র খসরুকে যে সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্র হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ ইতিহাস-সম্মত। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক বলেন---Salim submitted and resigned himself to his father's will, thinking that if he misbehaved the emperor would nominate his son Khusrav as his heir-apparant and deprive him of his birth-right. The fear was not groundless, as he had so much discredited himself that some of the prominent nobles, such as Man Singh and Khan Azam Mirza Aziz Koka, were openly supporting Khusrav who was then seventeen years of age and quite promising and popular.....it is said that Man Singh and Aziz Koka wanted to arrest prince Salim and to secure the throne for Khusrav. (*The Mughal Empire* by Dr. A. L. Srivastava).

তৃতীয় খণ্ড/২-য় পরিচ্ছেদ ঃ যে মাটিতে পড়ে লোকে.....হতে পারে কাল—অংশটি নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের অন্তর্গত। লম্পট মন্ত্রী জলধর, পরস্ত্রী মালতীর প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করলেও এবং মালতীর দ্বারা নিজ পত্নীর কাছে অপদস্থ হয়েও ব্যর্থতাই আগামী দিনের সাফল্য সূচিত করবে—এমন সম্ভবনায় আশান্বিত হচ্ছে। জলধরের এই মনোভাবের সঙ্গে মতিবিবির মানসিকতার যথেষ্ট মিল আছে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র উদ্ধৃতাংশটি সংযোজিত করেছেন এই অংশে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, 'নবীন তপস্বিনী' নাটকটি দীনবন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছিলেন এবং বঙ্কিমও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ দীনবন্ধুর নাটকের অংশ-বিশেষ শিরোমামে সংযোজিত করেছেন।

খসরু বাদশাহ হইলে—সেলিমের পরিবর্তে খসরুকে রাজ-সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ইঙ্গিত---His condition (Akbar's) grew worse owing to embittered relations between

Salim and his son Khusrav and the intrigues of the nobles who became divided into two factions, one supporting Salim and the other Khusrav.(*The Mughal Empire*-Dr. A. L. Srivastava).

আমার ন্যায় সতীর দুই স্বামী বড় অন্যায় কথা—মতিবিবির নিজের উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাত্রার প্রতি আত্মকৃত কটাক্ষ।

ওমরাহ —মোগল আমলে বিশেষ পদাধিকারী ব্যাক্তি। **ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে**—ক্ষেত্র বা স্থান-কাল অনুযায়ী কর্ম নিরূপণ করা উচিত।

তৃতীয় খণ্ড/৩-য় পরিচ্ছেদ—'শ্যামাদন্যো নহি নহি প্রাণনাথো মমস্তি'---উদ্ধবদূত কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কবীন্দ্র ভট্টাচার্যের পদ এ'টি। উদ্ধবের প্রতি রাধার এই উক্তিতে কৃষ্ণপ্রেমের আকুলতা ব্যক্ত হয়েছে---কৃষ্ণ ভিন্ন তাঁর আর কোন প্রাণনাথ নেই। মেহের-উন্নিসা-শের আফগানের পত্নী হওয়া সত্ত্বেও যুরাজ সেলিমের পরে অনুরক্ত ছিলেন। মতিবিবি কৌশলে মেহেরের এই মনোভাব জ্ঞাত হয়েছে।

মেহের-উন্নিসা তৎকালে ভারতবর্ষ মধ্যে প্রধানা রূপবতী ও গুণবতী—ইতিহাসের অনুসরণে বঙ্কিম মেহের-উন্নিসার জীবন কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। এ বিষয়ে প্রাজ্ঞ ঐতিহাসিকের অভিমত---"At the time of this marriage Jahangir was about to complete his forty-second year, while Nur Jahan was Thirty-four years of age. She still retained and continued to do so for years together, the beauty and freshness of her early youth.....Her loveliness was heightened and improved by artificial toileting and ornamentation.

নৃত্য-গীতে মেহের-উন্নিসা অদ্বিতীয়া—এখানেও বঙ্কিম ইতিহাসের বিশ্বস্ত অনুসরণ করেছেন।---Nur Jahan was endowed with a strong intellect and quick understanding. She was highly educated and was fond of poetry, music and painting.

কবরের মাটিতে মুখের আদর্শ থাকিবে—মেহের-উন্নিসার সেলিমের প্রতি অনুরাগ আপাতত: ব্যর্থতায় বিষণ্ন বলে সে মনে করেছে, সেলিমের হৃদয়ে তার ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্যপূর্ণ মুখচ্ছবি মুদ্রিত হবে না—কবরের মাটিতে এই রূপৈশ্বর্য ঝরে পড়বে।

মেহের-উন্নিসা জাহাঙ্গীরের যথার্থ অনুরাগিণী ঃ ইতিহাসের পরবর্তী ঘটনায় দেখা যায়. শের আফগান হত হলে মেহের কন্যাসহ রাজ অন্তঃপুরে স্থান পান---"It will be remembered that NurJahan was brought to the court and placed in charge of Salima Sultana Begum, who was Jahangir's step-mother and very kind and friendly to her. উত্তরকালের ঘটনাবলী মেহের-উন্নিসার সেলিম-অনুরাগকেই প্রতিষ্ঠা করে।

তৃতীয় খণ্ড/৪-র্থ পরিচ্ছেদ ঃ পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে—কবি মধুসূদন দত্ত রচিত "বীরাঙ্গনা কাব্য" গ্রন্থের অন্তর্গত নবম সর্গে "শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী" পত্র-কবিতা থেকে গৃহীত। জাহ্নবী অষ্টবসুর মাতা হওয়ার জন্য শান্তনুর পত্নীত্ব স্বীকার করেছিলেন (ঔরসে তব ধরিনু উদরে/অষ্ট শিশু,—অষ্টবসু তারা, নরমনি!)--কৃতজ্ঞচিত্তে জাহ্নবী স্বীকার করেছেন জাহ্নবী গৃহের প্রীতিস্নিগ্ধ পরিবেশ (যত দিন ছিনু তব গৃহে,/পাইনু পরম প্রীতি)। কিন্তু এখনও প্রণয়ে উৎসুক রাজা শান্তনুকে বিমুখ করে জাহ্নবী বলেছেন---"পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে।/অসীম মহিমা তব; কুল মান ধনে/নরকুলেশ্বর তুমি এ বিশ্বমণ্ডলে।"

জাহাঙ্গীরের সঙ্গে মতির ইতিপূর্বে অবৈধ সম্পর্ক থাকলেও পূর্বস্বামী নবকুমারের প্রতি নতুন অনুরাগ সৃষ্ট হওয়ায় এই অংশে জাহ্নবীর মতো প্রত্যাখ্যানের মনোভাব স্পষ্ট।

মেহের-উন্নিসা যে দিল্লীশ্বর হইবেন—মতিবিবির এই সিদ্ধান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর ইতিহাস পাঠের পরিচয়। **লুৎফ-উন্নিসার হৃদয় পাষাণ.....প্রবেশ করিয়াছিল**—লোভ, ক্ষমতালিপ্সা কিংবা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করবার উপায় হিসেবে মতিবিবি মোঘল হারেমে স্থান লাভ করেছিল। কিন্তু তার চিত্তে নবকুমার দর্শনজাত প্রণয়োন্মেষের সঞ্চার হয়েছিল বলেই বঙ্কিম পাষাণমধ্যে প্রণয়রূপে কীটের অনুপ্রবেশ কল্পনা করেছেন।

তৃতীয় খণ্ড/৫-ম পরিচ্ছেদ ঃ জনম অবধি.....মিলন এক——বৈষ্ণব পদাবলীর অতি বিখ্যাত এই পদটির কবি হলেন "কবিবল্লভ"। 'অনুরাগ' রস পর্যায়ের পদ এটি। বঙ্কিমচন্দ্র পদটি বিদ্যাপতির রচনা বলে মনে করেছিলেন। কবিতাটির পাঠান্তর থাকায় হয়ত বঙ্কিমের কিছু ভ্রান্তি ঘটেছিল -- দু-একটি অংশের শব্দগত পরিব র্ন তারই ইঙ্গিতবাহী। যাইহোক্, পূর্বরাগের অব্যবহিত পরে শ্রীরাধার অন্তরে কৃষ্ণপ্রেমের যে নিত্য নব-রাগের উন্মেষ ঘটেছিল, কবিবল্লভের এই পদে তা চমৎকার ব্যঞ্জনা লাভ করেছে'—, 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ান না গেল—অংশের ব্যঞ্জনা গভীরতা রাধার প্রেমার্তির চমৎকার রস-রূপায়ণ। ভোগসর্বস্বতায় মতিবিবিও ক্লান্ত ও শ্রান্ত--নবকুমারের প্রতি তার নব-উন্মেষিত প্রেম ক্রমান্বয়ে রাধিকার মত গভীরতার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এজন্যই সাদৃশ্যমূলক উদ্বৃতি উদ্ধার করেছেন বঙ্কিম।

আগ্রার সহিত সম্পর্ক রাখিব না—নবকুমার দর্শনের পর মতির অন্তরে নব-প্রেমের আবির্ভাব ও ভোগসর্বস্ব জীবনের পরে বৃতস্পৃহা।

সুখের তৃষ্ণা বাল্যাবধি বড়ই প্রবল ছিল.....এ পর্যন্ত আসিলাম ঃ মতিবিবি নিজের অতীত পর্যালচনায় বুঝেছে জীবনে স্থূল,সুখ ইন্দ্রিয়নির্ভর তাই তা শান্তি ও আনন্দের কারণ হতে পারে না। বর্তমানে প্রেমের সামান্য আকর্ষণে অনুভূতির গভীরতায় আনন্দময় প্রেমানুভূতির ঐশ্বর্য উপলব্ধি করেছে মতিবিবি। এ তারই ইঙ্গিত।

পাষাণ মধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল। পাষাণ দ্রব হইতেছিল— লুৎফ-উন্নিসার কঠিন চিত্তে অগ্নিরূপী প্রেমের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। অগ্নির দাহিকা শক্তি প্রবল। অগ্নিরূপী প্রেমের দাহিকা শক্তিতে মতিবিবির পাষাণবৎ, ঐশ্বর্যমুখী চিত্তের স্থূলতা অপসৃত হয়ে প্রেমের অরুণোদয় সূচিত হয়েছিল---ঔপন্যাসিকের এই বর্ণনা মতিবিবির চরিত্র পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী ব্যঞ্জনা।

তৃতীয় খণ্ড/৬-ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ কবি মাইকেলের 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র অন্তর্গত পঞ্চম সর্গ--"লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পনখা" অংশ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র "**কায় মনঃ.....দাসীর আলয়ে**" উদ্ধৃতিটি গ্রহণ করেছেন। রাবণ ভগিনী শূর্পণখা লক্ষ্মণকে আহ্বান জানিয়েছেন এই বলে যে, তিনি যেন রাজভোগ সম্ভোগে দাসীকে গহণ করেন। শূর্পনখার চমৎকার উক্তি —(১) গুরুর দক্ষিণা রূপে প্রেমগুরু-পদে/দিব এ যৌবন ধন প্রেম-কুতুহলে।" (২)"কোন্ যুবতীর নব যৌবনের মধু/বাঞ্ছা তব? অনিমেষে রূপ তার ধরি,/(কামরূপা আমি নাথ,) সেবিব তোমারে।" শূর্পণখা লক্ষ্মণকে প্রেম নিবেদন করে ব্যর্থ হয়েছিল---তেমনি লুৎফ-উন্নিসা বা মতিবিবি নবকুমারকে প্রেম-নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এই সাদৃশ্যবশতঃ শূর্পণখার উদ্বৃতিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সিংহাসন যেন মন্মথ শরসম্ভূত অগ্নিরাশিবেষ্টিত বোধ হইতে লাগিল—দিল্লীর সিংহাসন মতিবিবির কাছে এখন মদনের বাণে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখাবেষ্টিত বলে মনে হ'ল। নবকুমারের প্রেম তার এইমুহূর্তের আকাঙ্ক্ষিত ধন। তুলনায় সুখৈশ্বর্য অপাঙ্‌ক্তেয়।

যবনীজার—মুসলমান পত্নীর উপপতি। **উন্মাদিনী যবনী**—নবকুমারের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত দলিতফণা ফণিনীর মত মতিবিবি নবকুমারকে পাবার আশায় উন্মাদিনী প্রায়।

তৃতীয় খণ্ড/৭-ম পরিচ্ছেদ ঃ I am settled.....terrible feat অংশটি শেক্সপীয়রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডি Macbeth নাটকের প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্য থেকে গৃহীত। Macbeth অন্তরের অসাধু উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বাহ্য মন্দ প্রভাবের সংঘাতে দ্বন্দ্বময় চরিত্র। Macbeth ছিল Scotland -এর রাজা Duncan-এর সৈন্যাধ্যক্ষ। Lady Macbeth এর নির্ম্মম কাঠিন্য Macbeth কে Duncan. হত্যায় অনুপ্রাণিত করেছে। Mecneth হত্যার সিধান্ত গ্রহণ করেও অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত এ ভাব এই অংশের উদ্বৃতিতে ব্যক্ত হয়েছে----

I am settled and bend up
Each corporal agent to This terrible feat.
Away, and mock the time with fairest show;
False must hide what the false heart death know.

(Act I, Scene - VII)

কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের চির-বিচ্ছেদ রচনা করার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল মতিবিবি। সাদৃশ্য-সূত্রে এ প্রসঙ্গ বঙ্কিম উত্থাপন করেছেন।

মন্ত্রপাঠের শব্দ—কাপালিক কর্তৃক হোমসহ মন্ত্রপাঠের শব্দের সঙ্গে লুৎফ-উন্নিসা কপালকুণ্ডলার নামোচ্চারণ শুনেছিলেন। কাপালিকের উদ্দেশ্যের সঙ্গে মতিবিবির মানসিকতার মিল থাকায় বঙ্কিমচন্দ্র কৌশলে একত্রে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। উভয়ের দুরাভিসন্ধির আবর্তে কপালকুণ্ডলার অনিশ্চিৎ পরিণাম সম্পর্কে পাঠকের আগ্রহ বাড়ে।

চতুর্থ খণ্ড/১-ম পরিচ্ছেদ ঃ রাধিকার বেড়ী ভাঙ্গ, এ মন মিনতি—মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সারিকা' কবিতাংশ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করেছেন। নিজে 'দুঃখিনী,' বন্দিনী বলে রাধা 'সারিকার' পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থা থেকে তাকে মুক্ত করতে চান – খাঁচা থেকে তাকে মুক্ত করে শুকের সাথে মিলিত করার সুযোগ দেওয়া হোক্। নিজেকেও সংসার খাঁচা থেকে (রাধিকারে বেঁধো না লো সংসার পিঞ্জরে) মুক্ত করার আর্তি নিয়ে তাঁর ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে, এই উক্তিতে-

শুকে দেখি সুখে ওর জুড়াবে হৃদয়!
সারিকার ব্যথা সারি, ওলো দয়াবতি,
রাধিকার বেড়ি ভাঙ—এ মম মিনতি।

কপালকুণ্ডলার সাংসারিক জীবনের প্রতি অনীহা ও উদার, মুক্ত বন্যজীবনে প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আলোচ্য উদ্বৃতির চমৎকার সাযুজ্য আছে। বন্দিনীর বিবাহোত্তর জীবন যে দাসীত্ব--কপালের এ ভাব প্রাসঙ্গিক তাৎপর্যে পরিপূর্ণ।

ভুজঙ্গের ব্যূহতুল্য— সাপের বুহ্য-রচনার মতো কপালকুণ্ডলার ঘন জমাট কুন্তলরাশি।

চতুষ্পার্শে কিরীটমণ্ডল স্বরূপ বেণী বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে—শ্যামাসুন্দরীর দ্বারা কপালকুণ্ডলার কেশ-বিন্যাসের কবিত্বময় বর্ণনা, ফুলের দ্বারা বেণীর চতুর্দিকে যে অলঙ্করণ করা হয়েছে তা তো মুকুটের মত ঔজ্জ্বল্যে আভাসিত।

বন্ধনবিস্রংসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলকগুচ্ছ—কেশবন্ধনের বাইরে কিছু কিছু চুল এলোমেলোভাবে বিস্রস্ত — কপালের উপরে আগত কেশগুচ্ছ 'অলকগুচ্ছ' বলে কথিত হয়।

অর্ধপূর্ণশশাঙ্ক রশ্মিরুচির—অর্ধ-চন্দ্রের জ্যোৎস্নার মতো রমণীয়। **শুক্লাম্বর** —শুক্ল বস্ত্র। ঈষৎ

সমল —কিছুটা মালিন্যযুক্ত। **হেমকর্ণভূষা** —কানে সোনার দুল। **হিরন্ময় কণ্ঠমালা** —সোনার গলার হার।

যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব-তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না—কপালকুণ্ডলার গৃহী জীবনের প্রতি অনীহা---জীবন পরিণামের অনিবার্য ইঙ্গিত।

আমি অবিশ্বাসিনী কিনা স্বচক্ষে দেখিয়া যাও — নবকুমারের সন্দেহ কপালকুণ্ডলার গর্বিত উক্তির মধ্যে কপালকুণ্ডলার অন্তর্লোকের পরিবর্তনের ভাবটি কৌশলে বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড/২-য় পরিচ্ছেদ ঃ Tender is the night.....There is no light—কবি John Keats এর বিখ্যাত কবিতা Ode to a Nightingale কবিতার অংশবিশেষ--চতুর্থ স্তবকের ৩৫ থেকে ৩৮ সংখ্যক চরণ। কবি নাইটেঙ্গেলের সঙ্গে যেন ভেসে চলেছেন, মধুময় রাত, আকাশে আনন্দিত চন্দ্ররাণী যেন সিংহাসনে আসীন,---চতুর্দিকে পরীরা ঘিরে রেখেছে। আকাশরূপী স্বর্গভূমে আলোর বন্যা, কিন্তু পৃথিবীর বুকে/অরণ্যে অন্ধকার---স্বর্গলোক থেকে আহৃত আলোকরশ্মি বহন করে এনেছিল বাতাস, কিন্তু মোটা মোটা পত্রগুচ্ছ ও শাখা-প্রশাখাকে ভেদ করে ঝোপঝাড়ে পৌঁছনো বেশ কষ্টকর হয়েছিল। "The poet escapes into the forest and joins the Nightingale by virtue of his poetic fancy. Lines 35-40 describe the beauty of Nature in the midst of which the poet finds himself. (John Keats :*An Evaluation of his Poetry* B y Ramji Lall) সে রাত্রে কপালকুণ্ডলা ঔষধ সংগ্রহের জন্য অরণ্যে পদার্পণ করে সেখানেও আলো-অন্ধকার সহাবস্থান দেখা যায়।

অশনিসম্পাতশব্দ — বজ্রপাতের শব্দ। **শব্দমাত্রাবিহীনা** — মধুরা রাত্রি নিস্তব্ধ। **উরগজাতীয় জীবের** — সর্প-জাতীয় জীব-জন্তুর। **শ্বেতাম্বুদখণ্ডগুলি** — সাদা মেঘ খণ্ডগুলি। **লম্বালকমণ্ডল মধ্যে** — দীর্ঘ-লম্বিত কেশরাশির মধ্যে। **অমল নীলানন্ত গগনপ্রতি** — নীল রঙে অনন্ত প্রসারিত নির্মল আকাশের দিকে তাকিয়ে। **হেমকান্ত বর্ণে যেন কোন করাল কামনার ছায়া** —স্বর্ণাভ রঙে যেন ভীষণ কামনার ছায়া। **দ্রুত পাদবিক্ষেপে** — দ্রুত চরণক্ষেপে বা পায়ে। **অশনিসম্পাতশব্দ**--বজ্রপাতের শব্দ।

চতুর্থখণ্ড ৩-য় পরিচ্ছেদ ঃ—কবি বায়রণের 'ডনজুয়ান' কাব্যের Darkness কবিতার অংশবিশেষ--I had a dream, which was not all a dream. কাব্যের নায়িকা হেইডি স্বপ্নদর্শনে সম্ভাব্য ঘটনার ছায়াপাত দেখেছিল। তেমনি, কপালকুণ্ডলাও স্বপ্নে ভবিষ্যতের চিত্র দেখেছে—প্রত্যক্ষ করেছে অলৌকিক শক্তির লীলা।

জটাজূটবেষ্টিত সেই মুখমণ্ডল—কাপালিকের বারি-ধারায় সিক্ত, জটার দ্বারা অবারিত মুখ স্মরণ করল কপালকুণ্ডলা। **কাদম্বিনী**—মেঘমালা, মেঘশ্রেণী। **নিমগ্ন-কল্প**—স্বপ্নদর্শনের তাৎপর্যময় ইঙ্গিত। **চক্ষুরুন্মীলন**—চোখ খুলল। **অহং ব্রাহ্মণবেশী**—আমিই ব্রাহ্মণবেশী।

চতুর্থ খণ্ড/৪-র্থ পরিচ্ছেদ ঃ I will have grounds/More relative than this শেক্সপীয়ার রচিত বিখ্যাত ট্রাজেডি-নাটক Hamlet থেকে গৃহীত। ডেনমার্কের রাজকুমার Hamlet রাজা Cladudius এর ভাইপো। পিতার হত্যাকারী এই পিতৃব্যকে সে চিহ্নিত করেছে পিতার প্রেতাত্মার সহায়তায়। পিতৃব্যের কাছে আপন পিতৃ-হত্যার অনুরূপ 'নাটক' করে Hamlet হত্যাকারীকে যথার্থভাবে সনাক্ত করতে চায় (play something like the murder of my

father / Before mine uncle; I'll observe his looks;) প্রেতাত্মার কথাকে যাচই করতে গিয়ে Hamlet এই কথাগুলি বলেছিলেন—

I'll have grounds
More relative than this : The play's the thing
Wherever I'll catch the conscience of the king.

ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে দেখা করার সংকল্পের মধ্যে কপালকুণ্ডলার কর্তব্যসন্ধান আছে ---যেমন হ্যামলেটের মধ্যে দেখা গিয়েছিল রহস্য সন্ধানের তৎপরতা।

তন্নিরাকরণ–সূচনা—অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকবে না। **নৈশবনভ্রমণবিলাসিনী সন্ন্যাসিপালিতার** ন্যায়—রাত্রিকালে বনমধ্যে ভ্রমণে ইচ্ছুক কাপালিক পালিতা সেই নারীর ন্যায়। **কক্ষ হইতে বাহির হইলেন অমনি গৃহের প্রদীপ নিবিয়া গেল** —অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত। **অনবকাশপ্রযুক্ত সে বিশাল কেশরাশি** — কপালকুণ্ডলার খোলাচুলের মধ্যে প্রকৃতি উন্মুক্ত জীবনের ব্যঞ্জনার আভাস।

চতুর্থ খণ্ড/৫-ম পরিচ্ছেদ ঃ Stand you awhile..... .....list.

অংশটি নাট্যকার শেক্সপীয়রের Othello নামক বিখ্যাত ট্রাজেডি লক্ষণাক্রান্ত নাটকের চতুর্থ অঙ্ক থেকে গৃহীত। ওথেলোর স্ত্রী দেস্‌দিমনা সম্পর্কে ইয়াগো নামক কুচক্রী ও শয়তান, ওথেলোর অন্তরে সন্দেহের বীজ বপন করেছিল। ওথেলোর সৈনিক, লেফ্‌টেন্যান্ট ক্যাসিওর(Cassio) প্রতি যে দেস্‌দিমনা প্রণয়াসক্ত একথা প্রমাণের জন্য ওথেলোকে ইয়াগো দূর থেকে সমস্তই ধৈর্য-সহকারে লক্ষ্য করতে বলছে---Stand you awhile apart;/Confine yourself but in a patient list.ইয়াগো মিথ্যা কথায় প্ররোচিত করে স্ত্রী দেস্‌দিমনাকে হত্যা করার ইন্ধন জুগিয়েছিল, তেমনি কাপালিক সত্য জানলেও নবকুমারকে বিশ্বাসঘাতিনী কপালকুণ্ডলার পরিচয় দেবার জন্য মিথ্যাচার করেছে। নবকুমারকে প্ররোচিত করে আপন কার্য সিদ্ধি করতে চেয়েছে কাপালিক।

পরে সংশয়, পরে নিশ্চয়তা, শেষে জ্বালা —ব্রাহ্মণবেশীর পত্র পাঠ করে নবকুমারের সংশয়, সন্দেহ নিশ্চিত সিদ্ধান্তের অভিমুখী।

বহ্নিরাশিতে হৃদয় ভস্মিভূত—কপালকুণ্ডলার দ্বিচারিণী স্বভাবের কথা মনে করে নবকুমারের হৃদয় যন্ত্রণার আগুনে যেন ভস্মীভূত হ'ল।

প্রতীতি আসিয়া উপস্থিত—নবকুমারের মনে সন্দেহ বিশ্বাসের রূপ নিয়েছে।

সমুদ্রনাদবৎ — সমুদ্রের গর্জনের মত ধ্বনি বা শব্দ।

তুমি সেই পাপিষ্ঠার অনুরসণ করিবে—কাপালিকের মিথ্যাচার কপালকুণ্ডলাকে পাপিষ্ঠা বলায় স্পষ্ট হয়।

চতুর্থ খণ্ড/৬-ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ তদ্‌গচ্ছ সিদ্ধৈ কুরু দেবকার্যম্---মহাকবি কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম্' কাব্যের তৃতীয় সর্গের অষ্টাদশ সংখ্যক শ্লোক। তারকাসুরের উৎপীড়নে স্বর্গের দেবতারা যখন সন্ত্রস্ত, তখন তাকে বধের জন্য পার্বতীর গর্ভজাত শিবের পুত্রকেই নির্দিষ্ট করলেন ব্রহ্মা। প্রয়োজন হ'ল সমাধিমগ্ন মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করে পার্বতীর সঙ্গে মিলন ঘটানোর। দেবরাজ ইন্দ্রের সহস্র-নয়ন মদনের ওপর নিবদ্ধ হ'ল। এদিকে হিমালয়ের নির্দেশে পার্বতী তপস্যামগ্ন রুদ্রের সেবায় আত্মনিয়োজিত। ইন্দ্র কাম দেবতা মদনকে নির্দেশ দিলেন---"তদগচ্ছ সিদ্ধৈ কুরু দেকার্য্যমর্থোহয়মর্থান্তরভাব্য এব।" (কার্যসিদ্ধির জন্য যাত্রা কর—দেবকার্য সম্পন্ন করো। এই

প্রয়োজন'সিদ্ধি অন্য কারণের উপর নির্ভরশীল।) কাপালিক যেন নবকুমারকে কপালকুণ্ডলার বধের জন্য নিযুক্ত করল।

চিত্তাশুদ্ধি হেতু—চিত্তের অশুদ্ধিজনিত কারণে। **কুমারীর শোণিতে**—কুমারীর রক্তে. **পূর্বকৃত্যফল**—আগের সুকর্মজনিত শুভফল। **মানসসিদ্ধির জন্য তন্ত্রের বিধানানুসারে**—কাপালিকের দুই ভগ্ন বাহু বলিদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে—তাই তান্ত্রিকরীতি-অনুযায়ী মানস-পূজায় সে নিজেকে যুক্ত করেছে। **বিশ্বাসঘাতিনীর দণ্ড হইবে ; প্রতিশোধের জমি হইবে**—কাপালিক কপালকে বধের জন্য নবকুমারকে প্ররোচিত করেছে। কপালকুণ্ডলার অবিশ্বাসিনী স্বভাবের জন্য প্রতিশোধ নিতে আহ্বান করছে।

চতুর্থ খণ্ড/৭-ম পরিচ্ছেদ ঃ " Lord Lytton-এর Lucretia Or The Children of Night নামক উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে যুবক Main Waring-এর প্রতি লুক্রেশিয়া ভগিনী Susan-এর উক্তি। Lucretia Clavering বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া Main Waring কে ভালবাসেন, কিন্তু হীনচরিত্র যুবক তৎপরিবর্তে ভালবাসেন লুক্রেশিয়ার ভগিনী Susan কে। তাহা বুঝিতে পারিয়া Susan Main Waring এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং এই কথাগুলি বলেন -- 'শান্ত হও। আমাকে ভগিনীর মত মনে কর, লুক্রেশিয়ার প্রেমের প্রতিদান দাও।' Susan-এর সম্পূর্ণ উক্তিটি এইরূপ— Be at peace : it is your sister that addresses you. Requite Lucretia's love--it is deep and strong ; give her as she gives to you--a whole heart ; and in your happiness, I, your sister--to both--I shall be blest (অধ্যাপক জাহ্নবী চক্রবর্তী সম্পাদিত, কপালকুণ্ডলা)

কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি, সে পথ ত্যাগ করিয়াছি—লুৎফ-উন্নিসা কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের 'চির-বিচ্ছেদ' ঘটাবার যে আয়োজন করেছিল, এখন সে পথ পরিত্যাগ করেছে।

আমি ইহজন্মে কেবল পাপই করিয়াছি.....মৃত্যুসাধন করি—অপরাধহীনা কপালকুণ্ডলার মৃত্যু লুৎফ-উন্নিসার কাম্য নয়,—তার আপন জীবনের পাপের কথা স্মরণ করে লুৎফ-উন্নিসা এই মুহূর্তে, কপালকুণ্ডলার মঙ্গলসাধনে ব্রতী—তাকে জীবন-দান করার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী ত্যাগের অনুরোধ জানিয়েছিল লুৎফ-উন্নিসা কপালকুণ্ডলাকে।

অন্তঃকরণমধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—কপালকুণ্ডলা আপন অন্তরের গভীরে দৃষ্টিপাত করে দেখেছিলেন, সেখানে নবকুমারের প্রতি কোন আকর্ষণ অনুভূত হয়নি।

আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব—কাপালিক প্রতিপালিতা বনবাসিনী কপালকুণ্ডলা গৃহ জীবনে প্রতি আকৃষ্ট নয়। তাই স্বচ্ছন্দে মতিবিবির -"স্বামীত্যাগের প্রস্তাব" গ্রহণ করে 'বনচর' হবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে।

সংসাররচনা অপূর্ব কৌশলময়—মানুষের চোখ ও কান সমদূরগামী নয় বলে দূরবর্তী অনুচ্চ ধ্বনি/কথা সে শুনতে পায় না। যদি দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি সমদূরগামী হোত, তাহলে হয়ত মানুষের দুঃখ শান্ত ও বর্দ্ধিত হত—এই অর্থে বিশ্বস্রষ্টার সংসাররচনা অপূর্ব কৌশলময়।

কপালকুণ্ডলা আলুলায়িতকুন্তলা—কপালের কেশগুচ্ছ অবিন্যস্ত—কপাল চরিত্রে বন্ধনহীন কবরীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

প্রকৃতি সংহার করিল—মদ সেবনে নবকুমারের স্বাভাবিকত্ব বিনষ্ট হ'ল, একথা তারই ইঙ্গিত।

চতুর্থ খণ্ড / ৮ম পরিচ্ছেদ : No spectre greets me – no vain shadow this – রোমান্টিক কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বিখ্যাত কবিতা 'LAODAM A'-র অংশ। ট্রয়যুদ্ধে নিহত স্বামী প্রটেসিলিউস্‌কে দেবতার অনুগ্রহে মাত্র তিন ঘণ্টার জন্য দর্শন করেন স্ত্রী Laodamia. প্রেতলোক থেকে আবির্ভূত মৃত স্বামী বাস্তব মানুষের মতো আবির্ভূত হলেন। কেবল দর্শন ও বাক্যালাপ নয়, স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে পতিগতপ্রাণা স্ত্রী Laodamia। এমন অভিব্যক্তির মুহূর্তে Laodamia একথা বলেছিল। কপালকুণ্ডলার ভৈরবীমূর্তি দর্শনের সঙ্গে এই অনৈসর্গিক ঘটনার মিল আছে।

● কৈবল্যদায়িনী ভৈরবী—সংসার মুক্তি বা মোক্ষদাত্রী ভৈরবী।

● কিন্তু এ সংসারবন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু—কপালকুণ্ডলার সে বন্ধন ছিল না—সংসার-বন্ধনহীনা কপালকুণ্ডলার মানসিকতার পরিচয়, তার আত্মোৎসর্গের উপযুক্ত কারণ। ● নবীন করিকরভ—নবজাতক হস্তীশাবক।

● পঞ্চভূত—আমাদের শরীর পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্)। ● পঞ্চভূতের এক বন্ধন আছে—দেহের প্রতি মায়া ও বন্ধনের ইঙ্গিত। ● অনৈসর্গিক পদার্থও প্রত্যক্ষীভূত—প্রবল ভাবাবেগের কারণে ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়বস্তুও কপালকুণ্ডলার কাছে সত্য ও প্রত্যক্ষ বলে তার প্রত্যয় জন্মালো। ● আকাশমণ্ডলে নবনীরদনিন্দিত মূর্ত্তি—ভবানীর ভাবনায় ভাবিত কপালকুণ্ডলা কালিকা ভবানীর অপূর্ব মূর্তি প্রত্যক্ষ করল। ● নরকররাজি—মানুষের হাত। ● বালশশী—হাল্‌কা চন্দ্রের ঔজ্জ্বল্য। নবকাদম্বিনীসন্নিভ—নব মেঘপুঞ্জ সদৃশ। ● কপালমালিনী—নরমুণ্ডের দ্বারা সজ্জিতা দেবী কালিকা। ● রণরঙ্গিনী খলখল হাসিতেছে—কালিকা অসুরদের দমনের জন্য রণরঙ্গিনী মূর্তি (বিনাশায় চ দুষ্কৃতম্) গ্রহণ করেন। কপালের জীবনে কালিকার এই হাস্যময়ী রণরঙ্গিনী মূর্তি বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ।

● অদৃষ্টমূঢ়ার ন্যায় বিনা বাক্যব্যয়ে কাপালিকের অনুসরণ করিলেন—অদৃষ্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কপালের জীবন অনিবার্য পরিণতির দিকে ধাবিত হ'ল। নিয়তি বা অদৃষ্টবাদ এই উপন্যাসের কাহিনীবৃত্ত গভীর প্রভাব ফেলেছে।

চতুর্থ খণ্ড / ৯ম পরিচ্ছেদ : বপুষা করণোজ্ঝিতেন……মেদিনীম্—মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশম্' কাব্যগ্রন্থের অষ্টম সর্গের আটত্রিশ সংখ্যক এই শ্লোকে চমৎকার একটি প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। দেবর্ষি নারদের বীণা থেকে দৈবীমাল্য খসে পড়ল, তা স্পর্শ করল ইন্দুমতীর অঙ্গ। ইন্দুমতী মূর্চ্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল, তাঁর স্বামী রাজা অঙ্গও ভূতলে পড়লেন। দীপ্ত দীপশিখা থেকে তেল মাটিতে পড়লে দীপশিখাও ভূতলে পতিত হয় (দীপশিখা নিভে যায়)। কপালকুণ্ডলা নদীপ্রবাহে পড়ে গেলে নবকুমারও 'তৎপশ্চাৎ লম্ফ দিয়া জলে পড়িলেন'। চমৎকার সাদৃশ্য-সূত্রে বঙ্কিম শিরোনামে প্রসঙ্গটির উত্থাপন করেছেন। ● নবকুমারের হস্ত কাঁপিতেছে; কপালকুণ্ডলা স্বয়ং নির্ভীক নিষ্কম্প—নবকুমারে হস্ত কাঁপা প্রসঙ্গটি চারিত্রিক দৌর্বল্যের প্রতীক। আবার কপালকুণ্ডলার ভয়লেশহীন ঔদাসীন্য তার স্বভাবকে নিষ্কম্প করেছে। ● আমি অবিশ্বাসিনী নহি—নবকুমারের উদ্দেশে কপালের এই আত্মপ্রত্যয়ী উক্তর তার চরিত্রের দৃঢ়তা ও সংকল্পবদ্ধতার পরিচয়বাহী। ● বীচিমালার—তরঙ্গ বা ঢেউয়ের মালা।

॥ তাৎপর্য বিশ্লেষণ ॥

১। যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে। (১ম খণ্ড/১ম পরিঃ)

মাঘ মাসের রাত্রিশেষে ঘোর কুজ্ঝটিকার মধ্যে গঙ্গাসাগর থেকে একদল যাত্রীর নৌকায় প্রত্যাবর্তনের সময় এক বৃদ্ধের সঙ্গে এক যুবাপুরুষের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে উভয়ের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। বৃদ্ধ তার গৃহ সংসারের সমস্যা সম্পর্কে উল্লেখ কালে "পরকালের কর্ম" করার মানসিকতায় তীর্থস্নানে গিয়েছিল বলে জানালে যুবা পুরুষ নবকুমার আলোচ্য উক্তিটি করে। ধর্মীয় সংস্কারের বশবর্তী হয়ে গৃহী মানুষেরা পুণ্যার্জনের জন্য অথবা পরকালের কর্ম করার জন্য তীর্থস্থানে গমন করে। প্রাচীন বৃদ্ধ মানুষটি সাংসারিক বিষয়-আশয় নিয়ে চিন্তিত মনে ধর্ম করতে এসেছিল নেহাৎ-ই পুণ্য লাভের আশায়। ধর্ম ও মোক্ষ লাভের ইচ্ছা অথচ প্রবল বিষয়ানুরাগ এই প্রাচীন বৃদ্ধ-চরিত্রের অসঙ্গতি। আধুনিক যুক্তিবাদী যুবক নবকুমার শাস্ত্রের মর্মার্থ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশ্লেষণ করেছে। কেবল তীর্থদর্শনের আধ্যাত্মিকতা সে স্বীকার করে না—তার মতে পবিত্র, বিশুদ্ধ অন্তরই ধর্মার্জনের পথ সুগম করে। সুতরাং ঘরে বসেও তীর্থদর্শনের সুফল পাওয়া যায়। তান্ত্রিক সাধকরা তাই তীর্থ-স্থানের মাহাত্ম্যের পরিবর্তে দেহ-সাধনার কথা বলেন এবং ঘরে বসে শুদ্ধ চিন্তায় ঈশ্বর আরাধনার সহজ পথকেই গ্রহণ করেন।

২। একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন করিয়া আসিয়াছিল, ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই,—সেই কেবল কাঁদিল না। (১ম/১ম)

গঙ্গাসাগর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে চতুর্দিক গাঢ় কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন থাকায় মাঝিরা দিক নিরূপণ করতে অসমর্থ হলে, যাত্রীদের মধ্যে আশঙ্কা 'আতঙ্কে' পরিণত হল। প্রত্যেকেই যেন আসন্ন মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। নবকুমার ছাড়া আর সব পুরুষেরা নিঃশব্দে দুর্গানাম জপ করতে এবং স্ত্রীলোকেরা বিচিত্র সুর তুলে "বিবিধ শব্দবিন্যাসে" ক্রন্দন করতে শুরু করে ছিল। একজন রমণী কেবল এই সমবেত ক্রন্দন ধ্বনির অংশীদার হয়নি। গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্জনের জন্যই যাত্রীরা যায়—এবং প্রথানুসারের সন্তান বিসর্জনের দ্বারা দেবী গঙ্গার সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টাও হয়ত এককালে ছিল। পরবর্তীকালে, সন্তান জলে বিসর্জন দিয়ে অবিলম্বে নানান্ প্রক্রিয়ায় তাকে তুলে নেওয়া হোত—এতে দুটো উদ্দেশ্যই সম্পন্ন হোত—এক দেবীর কৃপা লাভ, দুই সন্তান হারানোর দুঃখ থেকে অব্যাহতি। এই স্ত্রীলোকটি ছেলে জলে দিয়ে আর তুলতে পারে নি। সন্তান হারানোর সীমাহীন বেদনা তাকে নীরব ও আবেগহীন করেছে। তাই, সঙ্কটকালে অন্য সকলে যখন উৎকণ্ঠিত, তখন এই রমণী আপন অন্তরের গভীর বেদনায় নিরুত্তাপ ও নিরুদ্বিগ্ন হয়ে রইল। তাই —"সেই কেবল কাঁদিল না।"

৩। তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন ? (১ম/২য়)

নৌকারোহীদের কল্যাণার্থে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য নবকুমার একাকী নির্জন সমুদ্রতীরের বনের মধ্যে কাষ্ঠাহরণে গমন করেছিল। নৌকাযাত্রীরা যে স্বার্থপর, সুবিধাবাদী ও অকৃতজ্ঞ তার প্রমাণ ঔপন্যাসিক স্বল্প অবকাশে দিয়েছেন। প্রথমতঃ নবকুমার একজন সঙ্গী চাওয়ায়, কেউই স্বীকৃত হয়নি—সুতরাং তাদেরই আহারের ব্যবস্থা করতে তাকে একাকী বনে যেতে হয়। দ্বিতীয়তঃ তাদের স্বার্থপরতা যে কতটা সাংঘাতিক তাও দেখা গেল। জোয়ার আসার কারণে নৌকার বন্ধন মুক্ত করে দেওয়াতে নৌকা নদী মধ্যবর্তী হতে থাকে। তখন তাদের মন্তব্য—'তাকে শিয়ালে খাইয়াছে' অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক মনোভঙ্গীর পরিচায়ক। তাদেরই কল্যাণে নবকুমারের আত্মত্যাগ, পরোপরিকীর্ষা—এর মধ্যে মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি একটা মমত্ববোধের ভাবও স্পষ্ট হয়। নবকুমারকে বাঘে খেয়েছে, এই সিদ্ধান্তের পরিণতিতে নৌকারোহীরা বনবাসেই পরোপকারীকে বিসর্জন দিয়েছে। নবকুমারের চরিত্র-স্বভাবের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থকার সংক্ষিপ্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ এই মন্তব্যটি করেছেন। অপরে অধম হলেও নিজেদের উত্তম হতে বাধা নেই। চরিত্র-স্বভাবকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে কোন কিছুই সাপেক্ষ হতে পারে না—মানবিক স্নেহ-প্রেম মায়া মমতায় দীক্ষিত হতে গেলে কোন শর্তেরই প্রয়োজন নেই। এখানেই মন্তব্যটির নিহিতার্থ।

৪। তোমার জন্ম আজি সার্থক হইল। ভৈরবীর পূজায় তোমার এই মাংসপিণ্ড অর্পিত হইবেক, ইহার অধিক তোমার তুল্য লোকের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে ? (১ম/৬ষ্ঠ)

সমুদ্রবেষ্টিত অরণ্যে যাত্রীদের দ্বারা বিসর্জিত নবকুমার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনায় ম্রিয়মান—এমনই সময় আশ্রয়-স্বরূপ কাপালিকের দর্শন পায় এবং আর পর্ণকুটীরে স্থান লাভ করে। কাপালিক ঈশ্বর কালিকার সাধক এবং সে তান্ত্রিক। 'জীব-বলি'—এই সাধন-ক্রিয়ার অঙ্গ। শ্মশান হ'ল এই পূজার উপযুক্ত স্থান—শবের উপর বাস তাদের এই সাধনা। কাপালিক বিশ্বাস করেছিল যে নবকুমার "ভৈরবীপ্রেরিতোঽসি—তাকে বধ করে—ঈশ্বর উপাসনায়-উৎসর্গ করলে তার জীবনেরই সার্থকতা প্রতিপন্ন হবে। এজন্য কাপালিক বলেছে—"পরিতোষঃ তে ভবিষ্যতি।" ঈশ্বর পূজায় জীবদেহ সমর্পিত হলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হবেন, এই ধারণা ও বিশ্বাস থেকে কাপালিক নবকুমারের প্রতি আলোচ্য উক্তিটি করে। নবকুমারের মতো একজন তুচ্ছ, সাধারণ মানুষের এই আত্মোৎসর্গ তার জীবনের পবিত্রতম কর্তব্য এবং এখানেই তার জীবনের সার্থকতা।

৫। তখন তোমার জীবনের আশঙ্কা করি নাই, বিশেষ যে সদুপায়ের সম্ভাবনা ছিল না, এখন সে সদুপায় হইতে পারিবে। আইস, মায়ের অনুমতি লইয়া আসি। (১ম/৮ম)

কালীমন্দিরের সাধক অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে কন্যার মতই স্নেহ করতেন। তাঁর কল্যাণ চিন্তা কত গভীর ছিল আলোচ্য উক্তিটি তার প্রমাণ। নতুন পথিক

নবকুমারের সঙ্গে দেশান্তরে যাওয়ার প্রস্তাব অধিকারী দিলে কপালের মনে কিছু প্রশ্ন উদিত হয়। অধিকারী ইতিপূর্বে বলেছিলেন যে যুবতীর এমন যুবাপুরুষের সঙ্গে যাওয়া অনুচিত—অথচ, এখন তিনি নবকুমারের সঙ্গে যেতে আদেশ দিচ্ছেন। সংসার-অনভিজ্ঞা কপালের কাছে তা আশ্চর্যের ব্যাপার বলে মনে হ'ল। অধিকারী সুবিবেচক—বিশেষতঃ তিনি কপালের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাই কপাল-কর্তৃক নবকুমারের উদ্ধারের প্রসঙ্গ জেনে কাপালিকের রুষ্ট হবার সাংঘাতিক কারণের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকারী একথা বলেন। এখনকার সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে কপালের নবকুমারের সঙ্গে যাওয়া উচিত বলে তিনি বিবেচনা করেন। কারণ সেটিই কপালকে কাপালিকের হাত থেকে উদ্ধার করার উপায়। কিন্তু অধিকারী কালীর উপাসক এবং পরাশক্তির নির্দেশকে আপন বুদ্ধি বিবেচনার সঙ্গে একাত্ম করে দেখতেই অভ্যস্ত। তাই, কপালের বিবাহ বিষয়ে তিনি মাতৃরূপিণী পরাশক্তি কালিকার অনুমতি নিতে দেবালয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। অধিকারীর কপালের প্রতি কন্যাস্নেহ ও কালীর প্রতি ভক্তিভাব, আলোচ্য উদ্ধৃতিতে বিধৃত আছে।

৬। কিন্তু তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে আমার মন সরিতেছে না। তিনি যে আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। (১ম/৮ম)

অধিকারীর কাছে "বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্মের সোপান"—এই কথা অস্পষ্টভাবে বুঝলেন কপালকুণ্ডলা। সুতরাং অধিকারীর প্রস্তাবে তার সম্মতি পাওয়া গেল। কপালকুণ্ডলা বাল্যকালে খ্রীস্টান তস্করদের দ্বারা অরণ্যে পরিত্যক্ত হলে কাপালিকই তাকে প্রতিপালন করেন। সেই পালকপিতা কাপালিককেই পরিত্যাগ করে যেতে কপালের অন্তঃকরণ সায় দেয়নি। এতে গ্রন্থকার কপাল-চরিত্র সৃষ্টিতে সম্পূর্ণতা এনেছেন। কপাল কৃতঘ্ন নন—তাই কাপালিকে পরিত্যাগ করে যেতে তার এত দ্বিধা। আলোচ্য উক্তিটিতে কপালকুণ্ডলা জীবনে কাপালিক, সমুদ্রবেষ্টিত অরণ্য ও ভবানী—এই ত্রিবিধ-প্রভাবের প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্র কৌশলে ব্যক্ত করেছেন।

৭। একমাত্র উপায় হইতে পারে,—সে আপনার ঔদার্য গুণের অপেক্ষা করে। (১ম/৮ম)

অধিকারী নবকুমারকে একথা বলেছিলেন। নবকুমার প্রাণরক্ষয়িত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ সুতরাং কপালের মঙ্গলের জন্য যে কোন কাজ করা তার পক্ষে অসাধ্য নয়। কিন্তু অধিকারী কপালকুণ্ডলা অনূঢ়া অবস্থায় এই যুবা পুরুষের সঙ্গে যেতে দিতে চায় না। অধিকারী সংসারী মানুষ নন—কিন্তু মহর্ষি কণ্বের মতো তিনিও সংসার সম্পর্কে অভিজ্ঞ—রীতি-নীতি, আচার পদ্ধতি তাঁর অজানা নয়। সুতরাং কেবলমাত্র কপালের পরিচয় জানানোই যথেষ্ট নয়—নবকুমারের আত্মীয়-স্বজন তাতে সন্তুষ্ট হবে না। তাছাড়া, অধিকারী কন্যারূপিণী কপালের প্রতি দায়িত্ব-সচেতন বলে নবকুমারকে কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করতে অনুরোধ করেছে। নবকুমারের ঔদার্যগুণেই কপালকুণ্ডলার এই বিপদ থেকে উদ্ধার সম্ভব বলে তিনি সঙ্গতভাবেই মনে করেছেন। নবকুমারের সঙ্গে এই কথোপকথনে অধিকারী চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য-স্বরূপ-পরিসরেও বঙ্কিম ফুটিয়ে তুলেছেন।

৮। প্রদীপ নিবিয়া গেল। (২য়/২য়)

'পান্থনিবাসে' নবকুমার মতিবিবির রূপদর্শনে বিমোহিত হয়েছিল। মতিবিবি রহস্যালাপে পটু—তার বুদ্ধি ও সঙ্কোচহীনা স্বভাব তার অভ্যস্ত জীবনধারার ফলশ্রুতি। তার প্রগল্‌ভ বাক্‌রীতি চিত্তাকর্ষক। কপালের পাশে বঙ্কিম এক আশ্চর্য রমণী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। যাইহোক, নবকুমারের দৃষ্টিতে মতিবিবির বাঙলা উচ্চারণ বাঙালীর মতো—অথচ, পরিচ্ছদ "পশ্চিমপ্রদেশীয় মুসলমানীর ন্যায়।" মতিবিবির জিজ্ঞাসার উত্তরে নবকুমার আপন নিবাস সপ্তগ্রাম জানালে মতি পান্থনিবাসের প্রদীপ উজ্জ্বল করে তুলল। নিজের নাম মতিবিবি জানালে নবকুমার শর্মা আপন পরিচয় দিল। তখনই "প্রদীপ নিবিয়া গেল"। মতিবিবি পূর্ব জীবনে পদ্মাবতী—নবকুমারের স্ত্রী। কিন্তু মুসলমান ধর্ম গ্রহণের কারণে নবকুমার কর্তৃক পরিত্যক্তা। সেই পূর্বস্বামীর সম্মুখে আত্মপরিচয় না দেবার বাসনায় এই প্রদীপ নিবে যাওয়ার ঘটনা বঙ্কিম উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া, প্রদীপ নিবে যাওয়ার মধ্যে মতিবিবির স্মৃতি-চারণার অবকাশ পাওয়ার ব্যঞ্জনা আছে। আগামী জীবনে নবকুমারের প্রতি প্রেমবোধে মতিবিবি উত্তীর্ণ হবে, এমন আত্ম-অনুভবের অবকাশে প্রদীপ নিবে যাওয়ার তাৎপর্য ধরা পড়তে পারে।

৯। এ সকল অলঙ্কার এই অঙ্গেরই উপযুক্ত—এই জন্য পরাইলাম (২য়/৩য়)

মতিবিবি অসামান্যা সুন্দরী হলেও কপালকুণ্ডলার রূপ দর্শনে বিস্মিত হয়ে নবকুমারকে একথা বলেছিল। কপাল দর্শনের প্রাক্‌কালে মতিবিবি—"নিরলঙ্কার দেহ অলঙ্কারে খচিত করিয়াছেন"—কবরী, কুণ্ডল, কপাল, কণ্ঠে, বাহুযুগে বহুবিধ অলঙ্কারের দ্বারা অঙ্গসজ্জা দেখে নবকুমারের চক্ষু অস্থির হ'ল। অদ্বিতীয়া রূপসী কপাল-দর্শনে ইচ্ছুক অসামান্যা সুন্দরী মতিবিবির রাজৈশ্বর্যময় অঙ্গবিন্যাস লক্ষ্য করার মতো। দোকান ঘরের আর্দ্র মৃত্তিকায় উপবিষ্টা একাকিনী কপালকুণ্ডলার দর্শনলাভে মতিবিবি বিস্মিতা, মুগ্ধা/আপন অঙ্গের অলঙ্কার খুলে কপালকে পরিয়ে দিলে নবকুমার জিজ্ঞাসু চোখে প্রশ্ন করলে, মতিবিবি যে উত্তর দেয়, তারই অংশ বিশেষ আলোচ্য উক্তিটি। মতিবিবি দিল্লী-আগ্রার রাজ-ঐশ্বর্যের বিলাসিতায় জীবনের অনেকটা অংশ অতিবাহিত করেছে। রাজোদ্যানেও এমন অপরূপ রূপমূর্তির সাক্ষাৎ লাভ তার ঘটেনি। কপালের নিরাভরণ লাবণ্যময়ী অপরূপা রূপ দর্শনে মতিবিবি যারপরনাই মুগ্ধা—তাই অলঙ্কার তো উপযুক্ত দেহের অঙ্গশোভা বিবেচনায় কপালকে অলঙ্কার রাশি পরিয়েছে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে।

১০। পৃথিবী সৎকর্মের জন্য মাত্র সৃষ্টা বোধ হইতে লাগিল; সকল সংসার সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। (২য়/৫ম)

কপালকে বিবাহ করে নবকুমার-'স্বদেশে' উপনীত হওয়ার পর আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক নববধূ সাদরে গৃহীত হলে, নবকুমারের চিত্তলোকে প্রণয়ভাব তীব্র হবার অবকাশ পায়। কপালকুণ্ডলার প্রতি অন্তরের প্রেমানুভব নবকুমারের কথায়, কাজে

ভাবে-ভঙ্গীতে প্রকাশ পেতে লাগল। চিত্তের চাঞ্চল্য নয়—সম্পূর্ণ গভীরতায় নবকুমারের হৃদয় স্নেহ-মমতা-প্রেমে অভিষিক্ত হতে শুরু করল। অন্তর্লোকের এই প্রসন্নতার ভাব বাইরের জগতের মধ্যেও প্রসারিত। বিশ্বজগৎ আনন্দময় বলে অনুভূত হতে লাগল। অন্তরের গভীর প্রেমভাবের অনুভূতি পার্থিব জগতের তাবৎ বস্তুর উপর আরোপিত হয়ে জগৎ-সংসারকে সুন্দর বলে মনে হতে লাগল। 'মানব-জীবন-দর্শনের একটা চমৎকার সত্যকে উদ্ভাষিত করেছেন বঙ্কিম। সৌন্দর্যবোধ বস্তুসাপেক্ষ নয়—ব্যক্তিসাপেক্ষ। নবকুমারের উপলব্ধিতে তারই আভাস। প্রসন্নতার আলোয় বিশ্ব-সংসার-সৃজন প্রক্রিয়াকে সৎকর্মের জন্য বলে মনে হল। মনুষ্যমাত্রই প্রিয়জন অনুভূত হতে লাগল। নবকুমারের কপাল-প্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণে বঙ্কিম আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

১১। যখন এই ব্রাহ্মণসন্তানের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, তখন ত আমি যোগিনীই ছিলাম। (২য়/৬ষ্ঠ)

শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে কথোপকথনকালে কপালকুণ্ডলা আলোচ্য উক্তিটি করেছিল। সপ্তগ্রামে নবকুমারের গৃহে কুলীনপত্নী, ভগ্নী শ্যামার দৃষ্টিতে মৃন্ময়ীর সংসার-অনাসক্তির ভাবটি বঙ্কিমচন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন। অপরূপা সৌন্দর্যময়ী হয়েও কপাল নারীর স্বাভাবিক অঙ্গসজ্জার প্রতি উদাসীন রূপচর্চা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। প্রকৃতি কোলে বিবর্ধিতা এ নারীর স্বভাব-প্রকৃতিও নিসর্গের মতো নিরাভরণা। অপূর্ব কেশযুক্তা হয়েও কবরী-বন্ধনহীনা—গৃহস্থ নারীর স্বভাব-গুণ বঞ্চিতা। এ হেন ঔদাসীন্যের কারণ অনুসন্ধানে আগ্রহী শ্যামা কপালকে সংসারী নারীর ভূমিকায় প্রত্যাশা করে। কিন্তু কপাল তো আক্ষরিক অর্থে যোগিনী। যোগিনীর অঙ্গসজ্জার প্রয়োজন হয় না। তপস্বিনী প্রকৃতিময়তায় আচ্ছন্ন, উদাসীন – তান্ত্রিক সাধক কাপালিকের প্রভাব-যুক্তা এবং ভবানীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিতা। পূর্ব প্রসঙ্গের উল্লেখ করে মৃন্ময়ী শ্যামাকে জানিয়েছে যে ব্রাহ্মণ সন্তান নবকুমারের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্বে সে তো তপস্বিনীই ছিল।

১২। পুরুষের বাতাসে যোগিনীও গৃহিণী হইয়া যায়। তুই সেই পাতর ছুঁয়েছিস্। (২য়/৬ষ্ঠ)

[প্রসঙ্গ পূর্ববৎ] তপস্বিনী কপালকুণ্ডলাকে শ্যামা সংসার আসক্তিতে মৃন্ময়ী-রূপে দেখতে চেয়েছিল। তাই বিবাহ-পূর্ব জীবনে কপাল যোগিনী হলেও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে পূর্ণ গৃহিণীরূপে অভিষিক্ত করাতে চায় শ্যামা। মেয়েমানুষের পরশ পাথর হল স্বামী সেই পুরুষের সাহচর্যে উদাসীন নারীও সংসারী হয়ে পড়ে। নবকুমাররূপী 'পরশ পাতরে' যোগিনী কপালকুণ্ডলা উদাসীনতা ত্যাগ করে সংসার আসক্ত হয়ে উঠুক, এই ভাবনায় শ্যামা সচেষ্ট। শ্যামাসুন্দরী চরিত্রের সরলতা ও রঙ্গরসিকতার মেজাজটি এখানে চমৎকারভাবে ধরা পড়েছে—তার কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের প্রতি আন্তরিকতাও স্পষ্ট।

১৩। বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে। (২য়/৬ষ্ঠ)।

শ্যামার কথায় কপালকুণ্ডলার মানসিকতার অথবা স্বভাবের কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি। পরশপাথরের স্পর্শে যদি সংসারে প্রার্থিত বস্তু লাভও করা যায়, তা হ'লে তাতেই বা কি সুখ—এই প্রশ্ন মৃন্ময়ীকে করতে দেখি। তার অন্তরের গভীরে যে প্রবল সংসার-অনাসক্তির ভাব সুপ্ত অবস্থায় সব সময়ের কাজ করেছিল, তারই গভীর প্রভাবে কপালকুণ্ডলা উদাসীনা তপস্বিনী। তাহ'লে কপালকুণ্ডলার কিসে সুখের সঞ্চার হয়—এ জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে মৃন্ময়ীর অকপট উক্তি তার চরিত্র স্বভাবেরই ইঙ্গিত দেয়। প্রকৃতি-দুহিতা কপাল প্রকৃতির নির্জন প্রান্তরে, সমুদ্রতীরে, বন্যময় জীবনে, স্বাভাবিক ছন্দ-সুষমায় প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা করে। একদিকে নবকুমারের সংসার-জীবনের বন্ধন ও অন্যদিকে বন্ধনমুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা বনোন্মত্তা তপস্বিনীকে উদ্‌ভ্রান্ত করে। মৃন্ময়ীর আলোচ্য উক্তির মধ্যে তারই আভাস।

১৪। দরিদ্র ব্রাহ্মণ যদি ওমরাহ হয়, তবে সুন্দর পুরুষ হইবে কি না? (৩য়/২য়)

'পথান্তরে' মতিবিবি দাসী পেষমনের সঙ্গে কথোপকথনকালে একথা বলেছিল। নবকুমার দর্শনের পর এবং নবকুমারই তার পূর্ব স্বামী একথা জেনে, দিল্লী-আগ্রার উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রায় অভ্যস্থ মতিবিবি ধীরে ধীরে নবকুমারের প্রতি প্রেমবোধে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। এই মুহূর্তে, মতিবিবির অন্তরে নবকুমারের প্রতি-প্রেম-ভাব, জাগরিত হবার অবকাশে, পেষমনের কাছ থেকে নবকুমার সম্পর্কে অভিমত জেনে নিতে চায় মতিবিবি। ভালো লাগা মানুষটি সম্পর্কে এই কৌতূহল মতিবিবির সিদ্ধান্ত গ্রহণে অথবা প্রেমভাবের গভীরতা আনয়নে সহায়ক হবে, এমন ভাবনা এখানে যুক্ত আছে। কিন্তু পেষমন নবকুমারের পরে সন্তুষ্ট ছিল না—তার লক্ষ্য ছিল মতিবিবির অলঙ্কারগুলি। কিন্তু মতি তো সব অলঙ্কারই কপালকে দান করেছে—অতএব, দরিদ্র ব্রাহ্মণের পরে অসন্তোষ জন্মেছিল পেষমনের। মতিবিবির জিজ্ঞাসার উত্তরে তাই সে অকপটে বলে—"দরিদ্র ব্রাহ্মণ আবার সুন্দর কুৎসিৎ কি?" মতিবিবিও দাসীর মনোভাব বুঝে প্রত্যুত্তর করেছে, আমীর ওমরাহের মত ধনশালী হলে, নবকুমার নিশ্চয় পেষমনের কাছে সুন্দর বলে মনে হবে। পেষমনের স্থূল বিষয়বুদ্ধিতে মানুষের গুণাগুণ অর্থ সাপেক্ষ ব্যাপার বলেই গণ্য হয়েছে—দাসী চরিত্র-নির্মাণে বঙ্কিম যেমন সঙ্গতি রক্ষা করেছেন। তেমনি মতিবিবি চরিত্রে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সঙ্গে রহস্যালাপের মেজাজটিও প্রখর বুদ্ধিবৃত্তির আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে।

১৫। কবরের মাটিতে মুখের আদর্শ থাকিবে। (৩য়/৩য়)

মতিবিবি বর্ধমানে শের আফগানের "প্রতিযোগিনী গৃহে" মেহের উন্নিসার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে—উদ্দেশ্য, সেলিম সম্পর্কে অসামান্যা সুন্দরী মেহেরের মনোভাব জানা এবং প্রতিযোগিনী হিসেবে নিজ কর্তব্য স্থির করা। কারণ, দিল্লীর সাম্রাজ্য-লাভের জন্য উভয়েই উভয়েই প্রতিযোগিনী হয়েছিল। যাইহোক, মতি যখন মেহেরের সাক্ষাৎ পায়, তখন মেহের-উন্নিসা চিত্র রচনায় ব্যস্ত। মেহের উন্নিসার

চিত্র-নৈপুণ্য বিস্ময়কর—মতি তার প্রশংসা করেও অপরে চিত্র-নিপুণ নয়, এ কথা জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করল। তার ইচ্ছে ছিল, সেলিম মেহেরের রূপৈশ্বর্যে কতটা আগ্রহী, মেহেরের মাধ্যমে তা পরিমাপ করা। সংক্ষিপ্ত বাক্যে মেহের-উন্নিসা আপন জীবনের ব্যর্থতার চিত্র দিয়েছে আলোচ্য উদ্ধৃতিটিতে। বাহ্যতঃ সে শের আফগানের স্ত্রী এবং অন্তরে গভীরভাবে জাহাঙ্গীরের প্রণয়াসক্ত। অথচ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিপরীত অবস্থা-বৈষম্যে মেহেরের জীবন যে গভীর নৈরাশ্যে আচ্ছন্ন, উক্তিটি তারই প্রমাণ। মেহেরের অন্তরের বেদনা সংযত, মার্জিত ভঙ্গীতে ব্যক্ত হয়েছে।

১৬। আত্মজীবন বিস্মৃত হইব, তথাপি যুবরাজকে বিস্মৃত হইতে পারিব না। (৩য়/৩য়)

মতিবিবি প্রতিযোগিনী মেহের-উন্নিসার গৃহে এসেছিলেন সেলিম সম্পর্কে তার মনোভাব যাচাই করতে। আকবর বাদশাহের মৃত্যু হয়েছে, সুতরাং মেহের-উন্নিসার এখন সাবধানে থাকা উচিত—যেহেতু সেলিম এখন রাজসিংহাসনে এবং মেহেরের প্রতি সেলিম প্রণয়াসক্ত। মেহের-উন্নিসা মতিবিবির এই কথার প্রতিবাদ করে জানিয়েছে যে মেহের "কায়মনোবাক্যে শের আফগানের দাসী" এবং শের আফগান আত্মরক্ষায় অক্ষম নয়। তবু, সেলিমের প্রতি মেহেরের অনুরাগ-ও প্রণয়ের ভাব গোপন থাকেনি। জাহাঙ্গীর রাজসিংহাসনে, অথচ মেহের বহুদূরে—সুতরাং গোপন দুঃখের অভিব্যক্তিতে মেহেরের দীর্ঘনিঃশ্বাস দেখে মতিবিবির মনস্কাম সিদ্ধ হয়েছে। যুবরাজকে বিস্মৃত হওয়া প্রসঙ্গে মেহেরের অকপট উক্তি তার অন্তরের প্রেমবোধকে স্পষ্ট করে। মেহের প্রণয়িনীর স্বাভাবিক গভীরতা সংযতভঙ্গীতে জানিয়েছে, নিজের জীবনের কথা বিস্মৃত হলেও, সে যুবরাজকে বিস্মৃত হতে পারবে না। আলোচ্য অংশটি মেহের-উন্নিসার প্রণয়াসক্ত চিত্তশোকের রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে।

১৭। কপালক্রমে প্রথম বিবাহে স্বামী পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। এক্ষণে জাঁহাপনার দাসীকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না। (৩য়/৪র্থ)

"রাজনিকেতনে" মতিবিবি জাহাঙ্গীরের সঙ্গে কথোপকথনে মেহের সম্পর্কে বাদশাহের অনুরাগ কতটা তা পরিমাপ করতে চেয়েছিল। মতিবিবির আপন স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করতে চাইলে জাহাঙ্গীর বিস্ময় প্রকাশ করেন। মেহের-উন্নিসাকে জাহাঙ্গীরের কাছে নিয়ে যাবার প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বাদশাহের মনোভঙ্গী জেনে নেবার অপূর্ব কৌশলময় সংলাপ করতে দেখি মতিবিবিকে। মহারাজ অনুমান করলেন যে মতিবিবি নিশ্চিতই ধরে নিয়েছে মেহের রাজরাণী হবে। তাই স্বেচ্ছায় বিদায় চাইছে। জাহাঙ্গীর দুঃখিত মনে প্রশ্ন করেছিলেন, স্বামীর সঙ্গে পুনরায় বিবাহের আবশ্যকতা কি। সেই কথার প্রত্যুত্তরে মতিবিবি (এখানে লুৎফ-উন্নিসা) জানিয়েছে যে প্রথম বিবাহের পর স্বামী নবকুমার তার স্ত্রী পদ্মাবতীকে ত্যাগ করেছিল। কিন্তু, তার বিশ্বাস, এখন আর স্বামী ত্যাগ করতে পারবে না। বঙ্কিমচন্দ্র মতিবিবি চরিত্রের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন ঘটনা ও দৃশ্য সংস্থাপনায়। নবকুমারের প্রতি তার নবউন্মেষিত প্রেম অনুকূল অবকাশের প্রতীক্ষা করেছিল। কিন্তু

পূর্ব-সম্বন্ধের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না করলে মতিবিবির রাজৈশ্বর্যময় প্রবৃত্তিমুখীন জীবন ত্যাগের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যায় না। কেবল বর্ণনায় নয়, নাটকীয় ঘটনা ও দৃশ্য সংস্থাপনে বিষয়টি বঙ্কিম স্পষ্ট করেছেন। এতে মতিবিবির স্বভাব-চরিত্রের একটা পূর্ণাঙ্গ আভাস দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

১৮। এক বৃন্তে কি দুটি ফুল ফুটে না! (৩য়/৪র্থ)

(প্রসঙ্গ পূর্ববৎ) বাদশাহ জাহাঙ্গীর মতিবিবির কথার উত্তরে একথা বলেছিলেন। মতি আপন স্বামীকে পুনরায় বিবাহের অনুমতি প্রার্থনায় বিস্মিত হন। মনে করেন, মেহের রাজরাণী হবে, এই সম্ভাবনায় লুৎফ-উন্নিসা রণে ভঙ্গ দিচ্ছে। বাদশাহ মতিবিবিকে আপন অভিরুচি অনুযায়ী কাজ করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু মতিবিবিও তাঁর প্রিয়—তাই তাঁকে প্রস্তাব দিলেন যে মতি ইচ্ছে করলে রাজ-মহিষী হতে পারে। মুসলমান রাজ-পরিবারে একাধিক বিবাহের প্রচলন ছিল – তাই স্বচ্ছন্দে সেখানে মতিবিবির স্থান হতে পারে। বাদশাহ গম্ভীরভাবে প্রেয়সীকে জানিয়েছেন, আকাশে একই সঙ্গে চন্দ্র-সূর্যও থাকে। এমন কি একই বৃন্তে দু'টি ফুলও ফোটে। সুতরাং মতিবিবির রাজ-পরিবার পরিত্যাগের কোনও কারণ নেই। এই সংলাপে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সঙ্গে মতিবিবির সম্পর্কটি প্রকাশিত হয়েছে।

১৯। কিন্তু এইবার পাষাণ মধ্যে কীট প্রবেশ করিয়াছিল। (৩য়/৪র্থ)
অথবা
পাষাণ দ্রব হইতেছিল। (৩য়/৫ম)

রাজনিকেতনে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বাক্যালাপে মতিবিবির অভিপ্রায় এবং নবকুমারের প্রতি অনুরাগের ভাব বঙ্কিম কৌশলে প্রকাশ করেছেন। বাদশাহের মহিষী হবার আবেদনকে উপেক্ষা করেছিল লুৎফ-উন্নিসা—সেলিমের রূপ-গুণ তাকে আকৃষ্ট করেনি। তাই স্ব-ইচ্ছায়, স্বচ্ছন্দে রাজ-পরিবারের ভোগৈশ্বর্যময় জীবনকে উপেক্ষা করে বাংলায় প্রত্যাবর্তনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হ'ল সে। কারণ, চরিত্রের অন্তঃপ্রকৃতি বিশ্লেষণে বঙ্কিম অভিমত দিয়েছেন যে মতিবিবির হৃদয়-পাষাণে কীট প্রবেশ করেছিল। সে কীট নবকুমারের প্রতি ভালোবাসার প্রথম অঙ্কুরোদ্গম। এই প্রেমবোধই মতিকে আগ্রা পরিত্যাগে প্ররোচিত করে এবং বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পথকে সুগম করে।

'আত্মমন্দিরে' লুৎফ-উন্নিসা দাসী পেষমনের সঙ্গে কথোপকথনকালে আগ্রার জীবনে তার "ইন্দ্রিয়া সুখান্বেষণে" দিন অতিবাহিত হওয়ার কথা বলে। প্রেমহীন এই প্রবৃত্তির আগুনে তার বিতৃষ্ণা জন্মেছে। নবকুমার দর্শনে তার পূর্ব স্বামীর প্রতি প্রেমানুরাগ সঞ্চিত হয়েছে। সুতরাং ভালোবাসার কারণে মতিবিবির বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ। পেষমন তার স্বাভাবিক স্থূল বুদ্ধিতে এই ঐশ্বর্য ত্যাগের কারণ অনুভব করতে অক্ষম। মতিবিবি আপন জীবনে ললাট-লিখনকে সত্য বলে মনে করেছে। তার হৃদয়রূপ পাষাণের মধ্যে অগ্নিরূপ প্রেমের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তাতেই নিষ্প্রাণ প্রবৃত্তিরূপ পাষাণের পরিবর্তন হ'ল। অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত হ'ল প্রেমের বিচিত্র বর্ণ বৈভব। মতিবিবির রূপান্তরের এই প্রেক্ষাপটটি বঙ্কিম সংক্ষিপ্ত

পরিসরে খুব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের এই মন্তব্যটি মতিবিবির চরিত্র-পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। উপমা প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়।

২০। বাঙ্গালায় গিয়া বাস করিব। পারি যদি, কোন ভদ্রলোকের গৃহিণী হইব। (৩য়/৫ম)

রাজ দর্শনের পর লুৎফ উন্নিসা পেষমন কথোপকথনকালে এ উক্তি করে মতিবিবি। 'আত্মমন্দিরে' লুৎফ উন্নিসার আত্ম অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। রাজৈশ্বর্যময় জীবন পরিত্যাগ করে বাংলাদেশে গমনের জন্য তার আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। পেষমন এই শুভ সংবাদের অর্থ বোঝে না—তার মত সাধারণ দাসীর পক্ষে মনোলোকের সূক্ষ্ম পরিবর্তনের কারণগুলি বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়—তাই মতিবিবির কথার তাৎপর্য না বুঝে সে কেবল প্রশ্নই করেছে। লুৎফ উন্নিসা জীবনের মতো আগ্রা ত্যাগ করে যাওয়ার প্রস্তাব ব্যক্ত করলে পেষমন বিস্মিত হয়। মতি জানিয়েছে দরিদ্র হলেও কোন ভদ্রলোকের গৃহিণী হওয়া আগ্রার বহির্মুখী জীবন থেকে শতগুণে ভালো। মতিবিবির অন্তর যথার্থ প্রেম-ভাবনার যে উত্তীর্ণ হতে চলেছে, মতির সংলাপে বঙ্কিম তা দেখালেন। বহির্মুখী নয়, অন্তর্মুখীনতায় লুৎফ-উন্নিসার জীবন সার্থক হতে চলল—এমন ব্যঞ্জনা এই অংশে অস্পষ্ট নয়।

২১। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা তখন সদর্পে তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; এমনই তাহার চক্ষুঃ প্রদীপ্ত হইয়াছিল; এমনই ললাটে রেখা বিকাশ হইয়াছিল; এমনই নাসারন্ধ্র কাঁপিয়াছিল। এমনই মস্তক হেলিয়াছিল। বহুকাল সে মূর্ত্তি মনে পড়ে নাই, এখন মনে পড়িল। এমনই সাদৃশ্য অনুভূত হইল। সংশয়াধীন হইয়া নবকুমার সঙ্কুচিত স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "তুমি কে?" (৩য়/৬ষ্ঠ)

আগ্রার ভোগৈশ্বর্যময় প্রবৃত্তিমুখীন জীবনধারা থেকে মতিবিবির প্রত্যাবর্তন হল বাঙ্গলা দেশে—নবকুমারের হৃদয়ের দুর্নিবার আকর্ষণে। মতিবিবির পরিবর্তন সূচিত হ'ল। 'চরণতলে' মতিবিবিকে দেখা গেল সপ্তগ্রামের ঔপনগরিক প্রান্তে—নবকুমারের দাসী হবার প্রার্থনা ধ্বনিত হ'ল তার কণ্ঠে। নবকুমারের প্রত্যাখ্যানে ও "আমার আশা ত্যাগ কর" কথার পরিপ্রেক্ষিতে "দলিত ফণা ফণিনীর" মতো মতিবিবি উন্মাদিনীর ন্যায় "তুমি আমারই হইবে" এই স্থির প্রতিজ্ঞার কথা দৃঢ় ভঙ্গীতে ব্যক্ত করে। প্রত্যাখ্যাতা নারীর এই অভিব্যক্তি নবকুমারকেও ভীত করে তোলে। নবকুমার অতীতে আপন পত্নী পদ্মাবতীকে পরধর্ম গ্রহণের জন্য বিরক্ত হয়ে 'শয়নাগার' থেকে বহিষ্কৃতা করেছিল। তখনও এমনভাবে দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা সদর্পে তার দিকে ক্রুর বক্রদৃষ্টি হেনেছিল—কুঞ্চিত ললাটরেখার সঙ্গে নাসারন্ধ্র কেঁপেছিল। দলিত ও কুপিত ফণিনীর রূপমূর্তি। তুলনা দিয়ে গ্রন্থকার বলেছেন, নবকুমারের দৃষ্টিতে মতিবিবির এ রূপ "বজ্রসূচক বিদ্যুতের ন্যায় মোহিনী"। অশঙ্কিতচিত্তে নবকুমার পূর্ব স্মৃতি-চারণায় সংশয়াচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, সে কে? আখ্যায়িকার এই অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মতিবিবির প্রেম প্রত্যাখ্যাত হলে, তার চরিত্রের কৃতসঙ্কল্পতা যে কত গভীর ছিল পরবর্তী ঘটনাবৃত্তে প্রতিযোগিনী কপালের অনিষ্টসাধনের ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করাতেই তা প্রমাণিত হয়। লুৎফ-উন্নিসা আগ্রা ত্যাগ করলেও স্বভাব বৈশিষ্ট্যে পূর্ব ভাবকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারেনি, তার ইঙ্গিত বঙ্কিম কৌশলে দিয়েছেন। আর নবকুমারের চিত্তাকাশে আশঙ্কা, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভীতিতে পরিণত হয়েছে। মৃন্ময়ীকেন্দ্রিক নবকুমারের জীবনে এই নতুন সমস্যা তার নিস্তরঙ্গ জীবন-প্রবাহে সঙ্কটের আভাস দিয়েছে।

২২। স্পর্শমণির স্পর্শে যোগিনী গৃহিণী হইয়াছে। (৪র্থ/১ম)

কপালকুণ্ডলা একান্তই প্রকৃতি দুহিতা। নবকুমারের সংসারে সে মৃন্ময়ী। বঙ্কিম অবশ্য নবকুমার মৃন্ময়ীর সংসার জীবন-বৃত্তান্ত বিস্তৃত আকারের বলেননি—বরং কিছুটা অন্তরালেই রেখেছেন ভূষণহীনা আলুলায়িত কুন্তলা কপালিনী প্রকৃতি-পরিবেশে তপস্বিনী। সংসার জীবনে থেকেও মৃন্ময়ী সংসার অনাসক্তা—উদাসীন, বনোন্মত্তা। এই রূপে, প্রকৃতিতে বা স্বভাবে বঙ্কিম কপালকে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু এই অংশে দেখা যাচ্ছে, কপালকুণ্ডল এক বছরের সাংসারিক জীবনে, স্পর্শমণির স্পর্শে, তপস্বিনী যোগিনী গৃহিণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। দেহ হয়েছে অলঙ্কারে সজ্জিত - কেশবিন্যাসে সূক্ষ্ম কারুকার্য, শিল্পের পারিপাট্য। বর্ণ লাবণ্যময় কেশবিন্যাসে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য, শিল্পের পারিপাট্য। বর্ণ লাবণ্যময় "নৈশ কুসুমবৎ," কপালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলকগুচ্ছে, পরিধানে শুক্লাম্বর—জ্যোতির্ময়ী রূপের অপরূপ চিত্রাভাস। মনে হয়, বঙ্কিম অসতর্কভাবে কপালকুণ্ডলার এই সংসারী মৃন্ময়ীর রূপমূর্তি গড়েছেন। কারণ পরবর্তীকাহিনীবৃত্তে কপাল যোগিনীর স্বভাবকে প্রকাশ করেছে অকপটে বারবার। সংসার অনাসক্ত প্রকৃতি দুহিতা কপালকুণ্ডলা ঔদাসীন্যে, বনোন্মত্তায় সংসার জীবনে নিঃসঙ্গ, একাকিনী। আলোচ্য মন্তব্যে বঙ্কিম কিছুটা অসতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন।

২৩। যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না। (৪র্থ/১ম)

শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথোপকথনে মৃন্ময়ী আপন অন্তরের অভিব্যক্তিকে ব্যক্ত করেছে অকপটে। কুলীনপত্নী শ্যামা স্বামীকে বশ করার জন্য উৎকণ্ঠিত—বনৌষধি সংগ্রহের প্রসঙ্গ নিয়েই শ্যামা মৃন্ময়ীর বাক্যালাপ। রাত্রিতে এই ঔষধ তুলতে হয়—কিন্তু কপালের রাত্রিকালীন বনগমন শ্যামার অনভিপ্রেত। লোকাচারের পরিপ্রেক্ষিতে রাত্রিতে সধবা নারীর বনে গমন অবাঞ্ছিত—কেননা তাতে লোকনিন্দার সম্ভাবনা এবং এ ঘটনা শ্যামার ভ্রাতা নবকুমারের পক্ষে সুখকর হবে না। এই আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করাতে মৃন্ময়ীর আত্মনির্লিপ্ত উত্তর তা স্বভাবেরই উপযুক্ত হয়েছে। বিবাহ যদি স্ত্রীলোকের দায়িত্ব হয়, তাহলে কপালের মত তপস্বিনী নারীর তা অবাঞ্ছিত ঘটনা বলেই মনে হবে। যে স্বাধীন মুক্ত প্রকৃতির প্রাঙ্গণে কপালকুণ্ডলা প্রতিপালিতা, সেখানে লোকাচার, নিয়মের শাসন ছিল না—রাত্রিতে

বনমধ্যে বেড়ানোই ছিল তার স্বভাব। সেই স্বভাবের বিরোধিতা জনিত সাংসারিক জীবন কপালকুণ্ডলার কাছে দুঃসহ বোঝা বলেই মনে হয়েছে। সংসার অনাসক্তির তীব্র ভাব আছে মৃন্ময়ীর আলোচ্য উক্তিটিতে। কপালকুণ্ডলার চরিত্রস্বভাবের উপযুক্ত ইঙ্গিতময় উক্তি।

২৪। সে কপালকুণ্ডলাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমায় রাখি, কি নিমগ্ন করি?' অকস্মাৎ কপালকুণ্ডলার মুখ হইতে বাহির হইল, "নিমগ্ন কর।" ব্রাহ্মণবেশী নৌকা ছাড়িয়া দিল। তখন নৌকাও শব্দময়ী হইল, কথা কহিয়া উঠিল। নৌকা কহিল, "আমি আর এ ভার বহিতে পারি না, আমি পাতালে প্রবেশ করি।" ইহা কহিয়া নৌকা তাহাকে জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল। (৪র্থ/৩য়)

শ্যামার জন্য রাত্রিতে বনৌষধি সংগ্রহের লক্ষ্যে বনে গমন করলে কপালকুণ্ডলা কাপালিকের সঙ্গে এক ষড়যন্ত্রকারী ব্রাহ্মণ পুরুষকে দেখে—ষড়যন্ত্র তাকে কেন্দ্র করেই, ব্রাহ্মণবেশীর একথা শুনে কপালের ভাবান্তর হয়। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর গৃহ প্রত্যাবর্তনকালে মেঘশব্দ ও অশনি সম্পাতের মাঝখানে গৃহ প্রাঙ্গণে দীর্ঘকায় কাপালিককে দর্শন করে। তৃতীয় পরিচ্ছেদের 'স্বপ্নে' অধ্যায়ে কপালের নিদ্রাকালীন অপ্রগাঢ় আচ্ছন্নতায় ভীতিকর অনুভূতি ও দুশ্চিন্তা স্বপ্নমূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছে। এই স্বপ্ন কেবল স্বপ্ন নয়—তার জীবন পরিণামের ইঙ্গিত ও বটে (I had a dream, which was not all a dream)—কবি বায়রনের উক্তিটি যথার্থ প্রয়োগের ক্ষেত্র পেয়েছেন বঙ্কিম। কাপালিকের জটাজুটবেষ্টিত মুখমণ্ডল, নিবিড় বনমধ্যে তার পৈশাচিক কার্য, কাপালিকের ভৈরবীপূজা, নবকুমারকে বন্ধনমুক্ত করার কারণে কাপালিকের রুষ্ট মূর্তি স্মরণ করেই এই নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিল কপাল। তার স্বপ্নপ্রদর্শনের বিষয়বস্তুত গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী এবং তার জীবনের ক্ষেত্রে প্রতীকী ইঙ্গিতময়তায় উপস্থাপিত। সমুদ্রের তরঙ্গমালায় উত্তাল তরণীকে একজন জটাজুটধারী প্রকাণ্ডকায় পুরুষ "ভীমকান্তশ্রীময় ব্রাহ্মণ বেশধারীর" বাধা উপেক্ষা করে সমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হল। কপালকে সে রক্ষা করবে, না বিনাশ করবে জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে কপালকুণ্ডলা 'নিমগ্ন কর'—নির্দ্বিধায় একথা জানিয়েছিল। স্বপ্নের পরিণামটিও ইঙ্গিতধর্মী। ব্রাহ্মণবেশী নৌকা ছেড়ে দিলে, নৌকাও কপালকে জলে নিক্ষেপ করে পাতালে প্রবেশ করল। বঙ্কিমচন্দ্র স্বপ্ন-দর্শনের অলৌকিক বিষয়কে উপন্যাসের ঘটনাবস্তুর সঙ্গে যুক্ত করেছেন। আসন্ন জীবনপরিণামের ইঙ্গিত বাহী ঘটনারূপে এই স্বপ্নদর্শনের গুরুত্ব আছে। প্রকৃতি, কাপালিক ও ভবানী—এই তিন প্রভাবে কপালের জীবন পরিণামমুখী। স্বপ্নে যেন তারই সংকেত।

২৫। তিনি যেমন কক্ষ হইতে বাহির হইলেন, অমনি গৃহের প্রদীপ নিবিয়া গেল। (৪র্থ/৪র্থ)

কপালকুণ্ডলার স্বপ্ন-দর্শনের পর ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নির্দেশযুক্ত

পত্রপ্রাপ্তিতে মৃন্ময়ীর ভাবান্তর উপস্থিত হয়। একদিকে নবকুমারের নিষেধ ও অন্যদিকে স্বপ্নদর্শন—এই দ্বিবিধ টানাপোড়েনে কপাল দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল। স্বপ্নের ব্রাহ্মণবেশী তাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন বাস্তবেও ব্রাহ্মণবেশী তার হিতাকাঙ্ক্ষী বলে মনে হ'ল। ভক্তবৎসলা ভবানী যেন অনুগ্রহ করে তার রক্ষার উপায় বলেছেন —ব্রাহ্মণবেশী কপালকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন। সুতরাং কপালকুণ্ডলার মনে হ'ল, ব্রাহ্মণবেশীর সাক্ষাৎ না করলে তার বিনাশ অনিবার্য। তাই সাক্ষাতের জন্য গৃহের প্রদীপ উজ্জ্বল করে যে মুহূর্তে গৃহ প্রাঙ্গণের বাইরে এল কপাল, অমনি প্রদীপ নিবে গেল। প্রদীপ নিবে যাওয়া অমঙ্গলের প্রতীক। বনোন্মত্তা তপস্বিনীর সংসার জীবন শেষের পথে, এমন ইঙ্গিত এ ঘটনা থেকে লাভ করা যায়।

২৬। আমি তোমার প্রাণবধার্থ আসি নাই। ভবানীর তাহা ইচ্ছা নহে। আমি যাহা করিতে আসিয়াছি, তাহা তোমার অনুমোদিত হইবে। (৪র্থ/৫ম)

ব্রাহ্মণবেশীর পত্র-প্রাপ্তিতে নবকুমারের মনে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল—উত্তরকালে এই সংশয় সন্দেহে পরিণত হয়। বিভ্রান্ত নবকুমার আপনার প্রাণ-বিসর্জনের মানসিকতায় যখন দ্বিধাগ্রস্ত এবং কপালের অনুগমনের জন্য উদ্যত তখন 'গৃহদ্বারে' কাপালিক নবকুমারে পথ-রোধ করে দাঁড়ায়। কাপালিককে পথ মুক্ত করতে বলায় কাপালিক তার সঙ্গে কিছু কথা বলতে আগ্রহ প্রকাশ করে। নবকুমার পূর্বস্মৃতি স্মরণ করে পীড়িত হ'ল এই ভেবে যে ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জন করলে, তার এ ফলভোগের কষ্ট উপলব্ধি করতে হোত না। তাই কাপালিকের প্রতি তার অনুরোধ, কপাল অনুসরণে সে যেন বাধা না দেয়, প্রত্যাবর্তন করে এসে কাপালিকের কাছে সে আত্মসমর্পণ করবে। কাপালিক তখন উদ্ধৃত উক্তিটি করেছিল। তার আগমনের হেতু নবকুমারের প্রাণনাশের জন্য নয়। ভবানীর প্রতি অবিচল বিশ্বাসে কাপালিক একথা বলেছিল। নবকুমারের মৃত্যু ভবানীর অভিপ্রেত নয়। তবে নবকুমারের মানসিকতা দেখে কাপালিক অনুমান করে কপালের অনিষ্ট সাধনে তার সাহায্য পাওয়া যাবে। হাত ভাঙ্গার কারণে তার এ সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। নবকুমারের সন্দেহ, কাপালিকের কপালকুণ্ডলার মৃত্যু কামনা ও ভবানীচরণে উৎসর্গ করার ইচ্ছাও ভবানীর নির্দেশ—তিনদিক থেকেই কপালকুণ্ডলার জীবন ট্রাজেডি ঘনিয়ে এসেছিল। কাপালিকের ষড়যন্ত্রে তারই ইঙ্গিত।

২৭। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব। (৪র্থ/৭ম)

লুৎফ-উন্নিসার কাছে কপালকুণ্ডলা কাপালিকের অভিপ্রায় যে তার মৃত্যু একথা শুনেছিল। তার নির্বিকার চিত্তে এ প্রসঙ্গ কোন তরঙ্গ তোলে নি। কাপালিক ব্রাহ্মণবেশীর সহায়তা চেয়েছিল হাত ভাঙ্গার কারণে। মতিবিবি কাপালিকের দুষ্কর্মের সঙ্গে একমত নয়। কিন্তু কেবল নিঃস্বার্থভাবে এ কাজ মতি করেনি—

প্রাণদানের পরিবর্তে কপাল তাকে প্রতিদানে জীবন দান করুক এ অনুরোধ কপালের কাছে মতি রেখেছিল। স্বামীত্যাগের মাধ্যমে লুৎফ-উন্নিসার জীবনদান হতে পারে। বিস্মিত কপালকুণ্ডলা স্বামী ত্যাগ করে কোথায় যাবে বলাতে মতিবিবি তাকে অট্টালিকা, ধন-দৌলত, দাস-দাসী দিতে চেয়েছিল। কপালকুণ্ডলা পরের দুঃখে সহানুভূতিশীলা এবং দুঃখিনীও বটে। কিন্তু আত্মবিষয়ে উদাসীন। সেই ঔদাসীন্যের বশে সংসার অনাসক্তির ভাব ব্যক্ত করেছে ধন-সম্পত্তি প্রত্যাখ্যানের প্রসঙ্গে। কিন্তু মতিবিবির দুঃখের কারণস্বরূপ 'বিঘ্নকারিণী'র স্বেচ্ছায় আপন আসন ত্যাগ করার বাসনা ব্যক্ত হয়েছে আলোচ্য উক্তিটিতে। বনচারী প্রকৃতি-দুহিতা কপালকুণ্ডলা নিসর্গলোকের স্বাধীন মুক্ত জীবনে প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী। মতিবিবির নবকুমার লাভের আগ্রহ ও সংসার আসক্তির পাশে তপস্বিনী কপালকুণ্ডলার ওদাসীন্য চমৎকার বৈপরীত্য মূলক ব্যঞ্জনায় বঙ্কিম প্রকাশ করেছেন।

২৮। সংসার রচনা অপূর্ব কৌশলময়। (৪র্থ/৮ম)

'সপত্নীসম্ভাষে' কপালকুণ্ডলার সঙ্গে ব্রাহ্মণবেশী মতিবিবির সাক্ষাৎকারকে কেন্দ্র করে গ্রন্থকারের মন্তব্য গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। লুৎফ-উন্নিসা কপালকে স্বামী-ত্যাগের অনুরোধ করলে কপাল সহজেই স্বীকৃত হয়—বনোন্মত্তা প্রকৃতি-দুহিতা তপস্বিনী মতিবিবির মানস সিদ্ধ করার ব্যাপারে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত—কারণ তার স্বভাবের মধ্যে ছিল তীব্র সংসার-অনাসক্তি। কপালের এই সহজ স্বীকৃতিতে মতিবিবির মনোগত অভিলাষ পূর্ণতা পেল। তাই মোহিত হয়ে কপালকে "আমার জীবনদান করিলে" বলে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল। কপালের ঔদার্যে মুগ্ধ লুৎফ-উন্নিসা তাকে সব রকমের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। নির্জন বনমধ্যে, অন্ধকারে ব্রাহ্মণবেশী পুরুষের সঙ্গে কপালের এই মৃদুস্বরে কথোপকথন দূরে দণ্ডায়মান কাপালিক ও নবকুমারের কাছে অবৈধ প্রেমালাপ বলে গণ্য হ'ল। আমাদের চক্ষু-কর্ণ 'সমদূরগামী' নয়—তাই দৃশ্য-শব্দের বাইরের জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে ভালো-মন্দ অনুভবের ক্ষেত্রও বিস্তৃত হয়। এক্ষেত্রে ঐ দৃশ্য-চিত্রের বিরূপ প্রতিক্রিয়া কাপালিক ও নবকুমারের হৃদয়কে ভিন্ন ভিন্নভাবে বিদ্ধ করেছে। কপাল বধে কাপালিক প্রস্তুতি নেবার অবকাশ পেয়েছে, আবার নবকুমারের সন্দেহ দৃঢ় হয়ে তার অন্তর্লোকে তীব্র ঝড় তুলছে। মানুষের সুখ-দুঃখের অনেকটাই স্থান-কাল-পাত্রের দূরত্বজনিত ব্যবধানের ফল—জীবন-দর্শনের এই দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে বঙ্কিমচন্দ্র সংসার রচনা অপূর্ব কৌশলময় বলে মন্তব্য করেছেন।

২৯। কিন্তু এ সংসার-বন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু। কপালকুণ্ডলার সে বন্ধন ছিল না—কোন বন্ধনই ছিল না। (৪র্থ/৮ম)

ব্রাহ্মণবেশী মতিবিবির সঙ্গে সাক্ষাতের পর কপালকুণ্ডলার গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে গভীর চিন্তায় আত্মবিসর্জনে প্রস্তুত হলেন। বাহ্য-কারণ মতিবিবিকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে নয়, অন্তরের গভীরে দেবী ভবানীর নির্দেশই কার্যকরী

করতে চেয়েছিল কপালকুণ্ডলা তপস্বিনীর দৃষ্টিতে পরাশক্তি ভবানী সৃষ্টিশাসনকর্ত্রী ও মুক্তিদাত্রী—তাই স্বপ্নে দেবীর জীবনসমর্পণের আদেশ দান কপালের স্বভাব-প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অলৌকিক ঘটনা। একদিকে অদৃষ্টবাদ ও অন্যদিকে চরিত্রের গভীরে নিরাসক্ত উদাসীনতার ভাব—বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তিবাদের অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন বঙ্কিম। যাইহোক, কপাল অন্তঃপ্রকৃতির দিক থেকে তান্ত্রিকের সন্তান,—দেবী ভবানীপ্রীতির সঙ্গে তার চরিত্রে যুক্ত হয়েছে বনোন্মত্ততা এবং তীব্র সংসার-অনাসক্তি। মুক্ত, স্বাধীন সমুদ্রবেষ্টিত অরণ্যময় জীবনে কপালকুণ্ডলার স্বচ্ছন্দ পদচারণা তপস্বিনীর উপযুক্ত। এক বছর অতিক্রান্ত হলেও সংসার-জীবনের প্রতি আসক্তিহীনতার কারণ অনুসন্ধানে বঙ্কিম আবিষ্কার করেছেন যে কপালের প্রণয়-ভাবের অভাবই তার বন্ধনহীনতার কারণ। কপালকুণ্ডলা নারীর স্বাভাবিক প্রণয়াকৃতি থেকে বঞ্চিতা—সাংসারিক পরিবেশ সম্পর্কে অনভিজ্ঞা, সংসারের প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার যে স্বর্গীয় জগৎ গড়ে তোলে মেয়েরা, কপালের তা ছিল না। তাই তপস্বিনীর সংসার-প্রীতি কখনও দেখা যায়নি।

৩০। কেনই বা এ শরীর জগদীশ্বরীর চরণে সমর্পণ না করিব? পঞ্চভুত লইয়া কি হইবে? (৪র্থ/৮ম)

(প্রসঙ্গ পূর্ববৎ) কপালকুণ্ডলা অন্তরের দিক থেকে তান্ত্রিকের সন্তান। দেবী কালিকার সন্তুষ্টির জন্য কাপালিক অপরের প্রাণ-সংহারে সঙ্কোচশূন্য। কিন্তু কপালকুণ্ডলা কালিকানুরাগের বশবর্তী হয়ে আত্ম-জীবনবিসর্জনে কৃতসংকল্পা। সুতরাং তপস্বিনীর জীবনে দেবী ভবানীর অনিবার্য প্রভাব ছিল। বিশেষতঃ ভবানী যে বিশ্বশাসনকর্ত্রী, সুখদুঃখ বিধায়িনী ও কৈবল্যদায়িনী এই বিশ্বাস থেকে স্বপ্নদর্শনে ভৈরবীর আদেশ পালনের জন্য সে কৃতসংকল্প হয়েছিল। তাছাড়া, সংসার বন্ধনের যে আকর্ষণ, সেই প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার যথার্থ জন্ম কপালের অন্তরে হয়নি। সুতরাং সংসার-অনাসক্তি তার স্বভাবগত। কিন্তু সংসারের অন্য বন্ধন না থাকলে পঞ্চভূতাত্মক এই দেহের অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ্, মরুৎ ও ব্যোমের একটা আকর্ষণ আছে। কপালকুণ্ডলার আপন অন্তরের জিজ্ঞাসা ক্রমান্বয়ে সিদ্ধান্তে পরিণত হচ্ছিল, তার প্রমাণ কপালকুণ্ডলার আলোচ্য উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। এ শরীর জগদীশ্বরীর চরণে সমর্পণ করাই তার কাছে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছে। তাছাড়া, পঞ্চভূতাত্মক এই দেহের অন্য প্রয়োজনই বা কি? এই দেহ ঈশ্বর চরণে সমর্পিত হলেই এই জীবনের সার্থকতা, এমন ব্যঞ্জনা আলোচ্য অংশে আছে।

৩১। তুমি কি জানিবে মৃন্ময়! তুমি ত কখন রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই। (৪র্থ/৯ম)

'প্রেতভূমে' কাপালিক কপালকুণ্ডলার বধের আয়োজন সম্পূর্ণ করেছিল। বধের প্রাক্‌কালিক তান্ত্রিক পূজা পদ্ধতিরও সূচনা হ'ল। নবকুমার কপালকুণ্ডলার চরিত্র

সম্পর্কে সন্দেহবশতঃ কাপালিকের সহযোগী। কাপালিকেরও হাত ভাঙ্গার কারণে নবকুমারের সহায়তার প্রয়োজন ছিল। শ্মশানভূমির ভীতিকর-পরিবেশে নবকুমার দৃঢ় মুষ্টিতে কপালের হাত ধরে বধের পূর্বে স্নান করাতে কপালকে নিয়ে চলল। কপালকুণ্ডলা আসন্ন মৃত্যুতেও উদাসীন—নির্ভীক ও নিষ্কম্প। এই মৃত্যু তার আকাঙ্ক্ষিত—বিশেষতঃ জীবন-বিসর্জন ভবানীর আদেশ। জীবমুক্তির আদেশ বলেই তার মনে হয়েছিল। কারণ ভবানী তো তার কাছে মুক্তিদাত্রী। কিন্তু বিপরীত দিকে, নবকুমারের ক্রোধোন্মত্ততা তার হাত কাঁপার কারণ হয়েছে। কপালকুণ্ডলার নিষ্কম্প রমণীকণ্ঠে "কাঁদিবে কেন" প্রশ্নের উত্তরে নবকুমার একথা বলেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র পুরুষ চরিত্র নবকুমারের মধ্যে যে তীব্র রূপানুরাগ দেখেছিলেন, তার অন্তিম চিত্র-প্রদর্শন করেছেন আলোচ্য দৃশ্যে। এই অতিরিক্ত রূপমুগ্ধতা নবকুমারকে কপাল সম্পর্কে সহজেই সন্দেহ করার অবকাশ দিয়েছে—আবার সংশয়-সন্দেহ মনের পরে গভীর ক্রিয়া করার ফলে ক্রোধের জন্ম হয়েছে। কপালের প্রতি নবকুমারের এই উক্তি প্রমাণ করে যে নবকুমার মৃন্ময়ীর প্রতি রূপান্ধতায় উন্মত্ত। নবকুমারের রূপান্ধতা তাকে মৃন্ময়ীর অনুসরণে বাধ্য করবে, এমন ইঙ্গিত হয়ত এই অংশে পাওয়া সম্ভব।

৩৩। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জন করিতে আসিয়াছে—নিশ্চিত তাহা করিব। তুমি গৃহে যাও। আমি মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না। (৪র্থ/২ম)

নবকুমার কাপালিকের নির্দেশে কপালের হস্ত ধারণ করে স্নান করাতে নিয়ে যায়। কপাল আসন্ন মৃত্যুতেও উদাসীন। কিন্তু নবকুমার ক্রোধোন্মত্ত হয়ে কপালকে বলেছিল যে রূপ দেখে আত্মবিস্মৃত হয়ে "চৈতন্য হারাইয়াছে"—সুতরাং কপাল অবিশ্বাসিনী নয়, একথা জানিলে তাকে গৃহে নিয়ে যাবার জন্য নবকুমার উন্মুখ। লক্ষণীয়, নবকুমারের রূপমুগ্ধতা তার উন্মত্ততার কারণ—তাই চৈতন্য হারানোর প্রসঙ্গ। কপালকুণ্ডলা সংক্ষিপ্ত উত্তরে সে যে অবিশ্বাসিনী নয়, বনমধ্যে ব্রাহ্মণবেশী যে পুরুষ নয়—পদ্মাবতী একথা জানিয়েছে। একই সঙ্গে নবকুমারের গৃহে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। আলোচ্য উদ্ধৃতিতে মৃন্ময়ীর আত্ম-বিসর্জনের কৃতসঙ্কল্পতা ব্যক্ত হয়েছে দৃঢ়ভাবে। ঐশী লীলার অন্তর্গত কপালের জীবন, মুক্তিদাত্রী ভবানীর নির্দেশ পালনের জন্য এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই, তার চরণে দেহ বিসর্জনের একাগ্রতা প্রকাশ পেয়েছে। গ্রন্থকার কপাল-চরিত্রের ঔদাসীন্যের সঙ্গে সংসার-অনাসক্তির ভাব যুক্ত করলেও তার মধ্যে অপরের জন্য সহানুভূতি ও সহমর্মিতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন আখ্যায়িকার বিভিন্ন অংশে। নবকুমার তার কাছে ব্রাহ্মণসন্তানের অধিক না হলেও আলোচ্য উক্তিতে তার প্রতি কপালের মমত্ববোধ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। কপালকুণ্ডলার স্নেহময়ী কণ্ঠের—'তুমি গৃহে যাও, আমার জন্য রোদন করিও না'—মধ্যে কোমল স্বভাবের চমৎকার নিদর্শন রেখেছেন বঙ্কিম। ভবানী-চরণে দেহ-বিসর্জনের কৃতসঙ্কল্পতা ও নবকুমারের প্রতি মমত্ববোধ—এই উভয় বৈশিষ্ট্যের কারণে আলোচ্য উদ্ধৃতিটির একটি স্বতন্ত্র গুরুত্ব আছে।